বাংলাবুক.অর্গ

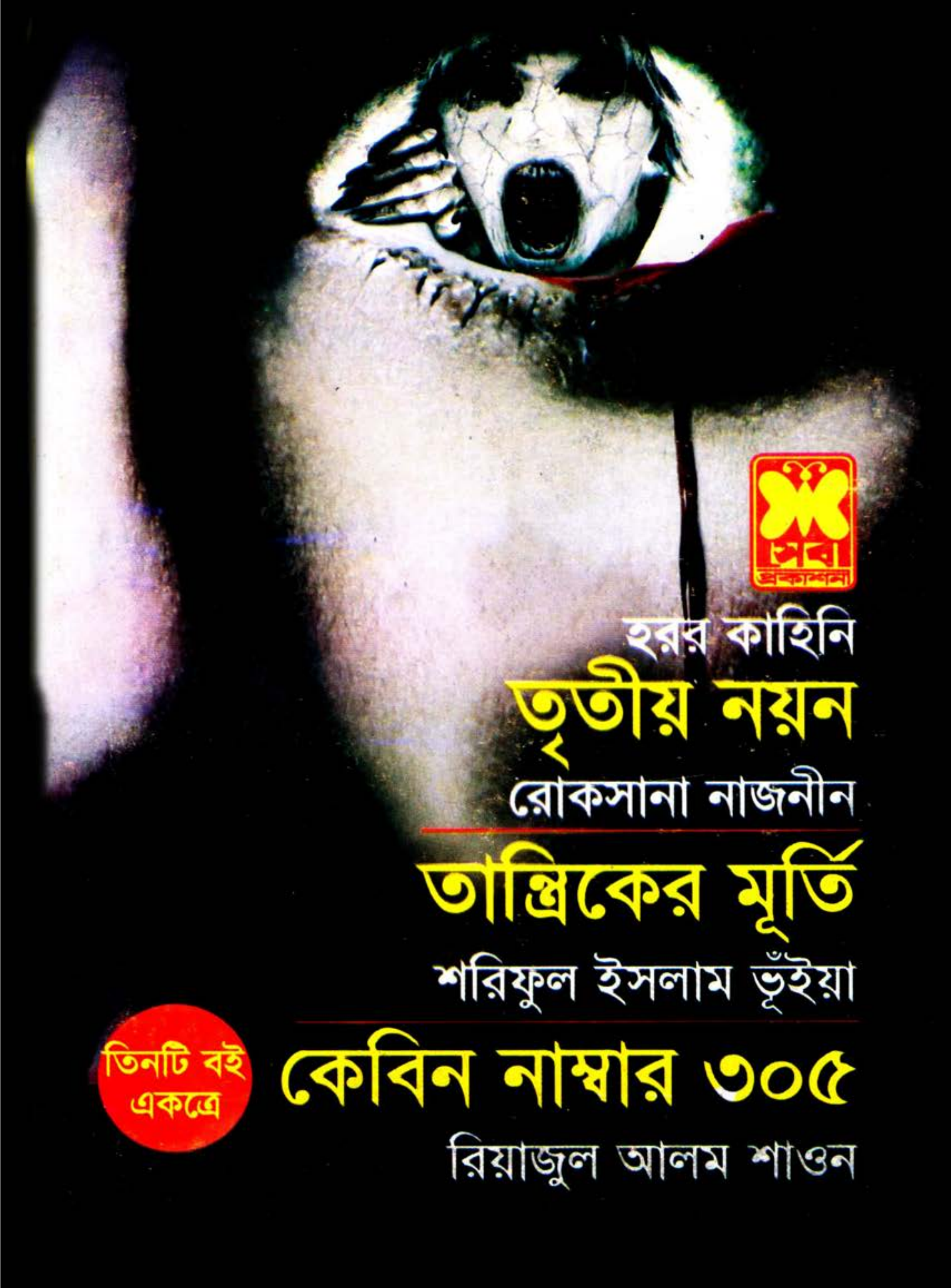
সেবা প্রকাশনী
হরর কাহিনি
তৃতীয় নয়ন
রোকসানা নাজনীন
তান্ত্রিকের মূর্তি
শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া
তিনটি বই একত্রে
কেবিন নাম্বার ৩০৫
রিয়াজুল আলম শাওন

হরর কাহিনি
তিনটি বই একত্রে

তৃতীয় নয়ন/রোকসানা নাজনীন: খুন হলেন শরীফ খান। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সদালাপী নির্বিরোধী, ভালমানুষ জাহিদ হাসানের দোরগোড়ায় এসে হাজির হলো পুলিস—অকাট্য প্রমাণ রয়েছে তাদের হাতে, তিনিই হত্যাকারী। খুনীর ফিঙ্গারপ্রিন্ট, রক্তের গ্রুপ, এমনকী ভয়েস প্রিন্ট পর্যন্ত হুবহু মিলে গেছে জাহিদ হাসানের সঙ্গে। এবার সামলান, প্রফেসর সাহেব—প্রমাণ করুন আপনি নির্দোষ।

তান্ত্রিকের মূর্তি/শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া: একদিন রাতে স্বপ্নে বাথটাবের উপর চোখ পড়তেই আঁতকে ওঠে রবিন। ওরই বয়েসী দুটি ছেলে পাশাপাশি শুয়ে আছে। পুরো দেহ সাদা কাপড়ে ঢাকা। মুখ দুটো শুধু বেরিয়ে। নীল ঠোঁট দিয়ে চাপা গোঙানি বেরিয়ে আসছে। এ কী! হাতগুলো এমন লম্বা হয়ে বেরিয়ে আসছে কেন?

এমনি সাতটি গল্পে, লেখক ভৌতিক আবহের সাথে রহস্যের সংযোগ ঘটিয়ে ভিন্ন একটা স্বাদ দিতে চেয়েছেন পাঠক-পাঠিকাকে।

কেবিন নাম্বার ৩০৫/রিয়াজুল আলম শাওন: ৩০৫ নাম্বার কেবিনে থাকা মানে মৃত্যুকে কাছ থেকে দেখা। কিন্তু ঘটনাচক্রে ডা. সুমনের বাগ্‌দত্তা স্ত্রী রোদেলাকে রাখা হলো ৩০৫ নাম্বার কেবিনে। এরপর দেখা গেল রোদেলার অক্সিজেন মাস্কটা খোলা। পুরো শরীরে অসংখ্য আঁচড়ের চিহ্ন। গলার কাছ থেকে রক্ত ঝরছে। মনে হচ্ছে কোনও জন্তু যেন কামড় বসিয়েছে সেখানে। শরীরটা কেমন যেন কালচে হয়ে গেছে ওর...। সব জানতে পারল রহস্যপিপাসু আনোয়ার। সেধে বিপদ ডেকে আনল সে। থাকতে চাইল ৩০৫ নাম্বার কেবিনে। সম্ভবত জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটি করল আনোয়ার। কেবিন নাম্বার ৩০৫ সংকলনের রক্ত হিম করা গল্পগুলো পড়লে সীমাহীন ভয়, তীব্র রোমাঞ্চ আপনাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলবে। সর্বোপরি মৌলিক এবং ভিন্ন স্বাদের এই গল্পগুলো আপনাকে নিয়ে যাবে অন্য এক জগতে। সাবধান! একবার এই ভয়ের জগতে প্রবেশ করলে আর বেরোতে পারবেন না।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

তৃতীয় নয়ন
রোকসানা নাজনীন

তান্ত্রিকের মূর্তি
শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া

কেবিন নাম্বার ৩০৫
রিয়াজুল আলম শাওন

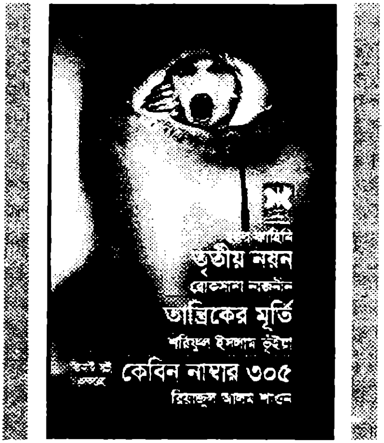

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব লেখকত্রয়ের

প্রথম প্রকাশ: ২০১৫

রচনা: বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
ভিক্টর নীল

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

TRITIYO NAYON
By: Roksana Nazneen

TANTRIKER MURTI
By: Shariful Islam Bhuiyan

CABIN NUMBER 305
By: Reazul Alam Shawon

একশ' আট টাকা

সূচি

তৃতীয় নয়ন ৫

তান্ত্রিকের মূর্তি

চূড়ান্ত পর্ব ১৪৫

পুবের পাহাড় ১৫৬

১৩ নম্বর কামরা ১৬৯

লাল কুঠুরি ১৮০

স্বয়ম্ভু ১৮৭

পিশাচী ১৯২

তান্ত্রিকের মূর্তি ২০৭

কেবিন নাম্বার ৩০৫

শিগব ২২৪

সন্দেহ ২৩৮

লাল বৃত্তে বন্দি ২৪৬

দূষিত রক্ত ২৫৪

ওরা ভয়ংকর ২৬৮

অন্য জগতের কেউ ২৮০

কেবিন নাম্বার ৩০৫ ২৯০

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

তৃতীয় নয়ন

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৩

মানুষের জীবন–দৈহিক সত্তার বাইরে সত্যিকারের যে জীবন–তা যে-কোন বয়সেই শুরু হতে পারে। জাহিদ হাসানের সত্যিকারের জন্ম হয় ১৯৬০ সালে, যখন ওর বয়স এগারো বছর। ওই বছর ওর জীবনে দুটো ঘটনা ঘটে। প্রথমটি ওর ভবিষ্যৎ জীবনের অনুপ্রেরণা জোগায়, আর দ্বিতীয়টি ওর জীবন প্রায় শেষ করে এনেছিল।

সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র জাহিদ আন্তঃস্কুল রচনা প্রতিযোগিতায় চট্টগ্রাম বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করে নগদ এক হাজার টাকা পুরস্কার পায়। সেটা ছিল জানুয়ারি মাস। পুত্র-গর্বে গর্বিত জাহিদের মা-বাবা প্রতিবেশী এবং আত্মীয় পরিজনদের ভুরিভোজে আপ্যায়িত করেছিলেন। সেই উৎসবের রাতে এক অতিথির প্রশ্নের উত্তরে জাহিদ বলেছিল বড় হয়ে সে লেখক হতে চায়। বাবা আবুল হাসানের হাস্যোজ্জ্বল চোখে ছায়া নেমে আসে। হাত ধরে ওকে তিনি বাইরে বাগানে নিয়ে এলেন।

'জাহিদ, একটু আগে কাশেম চাচাকে যা বললে সেটা কি তোমার মনের কথা?' একটু ভারী শোনায় তাঁর কণ্ঠ।

'হ্যাঁ, বাবা,' ভয়ে ভয়ে বলেছিল জাহিদ। ও ঠিক বুঝতে পারছিল না অপরাধটা কোথায় হয়েছে।

'হুঁ।' এরপর কয়েক মিনিট কোন কথা না বলে জাহিদের হাত ধরে বাগানের মাঝখানের সুরকি বিছানো পথটায় পায়চারি করলেন তিনি। অবশেষে বললেন, 'দেখ, জাহিদ, তুমি আমাদের একমাত্র ছেলে। তোমার উপর আমাদের অনেক আশা। আমি চাই তুমি ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হবে। লেখকদের জীবন বড় অনিশ্চিত, আমি চাই না জীবনে তুমি কোন কষ্ট পাও। কি বললাম তা হয়ত তুমি এখন বুঝতে পারবে না, কিন্তু ছেলেবেলা থেকে মানুষের জীবনে কোন লক্ষ্য না থাকলে ভবিষ্যতে উন্নতি হয় না। তাই এখনি তোমাকে কথাটা বললাম।'

আবুল হাসান সাহেব পেশায় ছিলেন নৌ-বাহিনীর অফিসার। প্রখর নিয়মানুবর্তিতা ছিল তাঁর অস্থিমজ্জায়। স্বভাবে ছিলেন দয়ালু এবং পরোপকারী। চাকরিসূত্রে দেশের বিভিন্ন জায়গায় থাকতে হলেও জাহিদের ছেলেবেলা কেটেছে চট্টগ্রামের পতেঙ্গায়। আবুল হাসান সাহেব নিজেও ছিলেন তাঁর বাবা-মার একমাত্র সন্তান। তাই পতেঙ্গার পৈতৃক সূত্রে পাওয়া বাড়িটার ভাগীদার না থাকাতে

BanglaBook.org

চট্টগ্রামে পোস্টিং পাবার পর ওখানেই স্থায়ীভাবে থেকে গেলেন। মাঝে মাঝে তাকে বাইরে যেতে হলেও জাহিদ ও তার মা বরাবর পতেঙ্গাতেই থেকেছে। লাল ইঁটের তৈরি পুরানো দোতলা বাড়ি এবং কয়েক একর নিয়ে বিছিয়ে থাকা ঘন গাছপালা ঢাকা বাগানে জাহিদের শৈশব এবং কৈশোর কেটেছে চমৎকার। তবে বাবার সঙ্গে এই ছোট্ট আলাপচারিতা ওর সাফল্যের আনন্দে অনেকখানি জল ঢেলে দিল।

১৯৬০ সালে দ্বিতীয় যে ঘটনাটি ঘটে, তা শুরু হয়েছিল মার্চ মাসে। মাথাব্যথা। প্রথমে অতটা কষ্ট দিত না। সপ্তায় দু'সপ্তায় একবার দেখা দিত। কিন্তু রমজানের ছুটির পর স্কুল খুলতেই মৃদু চাপ চাপ ব্যথাটা মাথার সামনে থেকে পিছনে ছড়িয়ে ধীরে ধীরে ঘাড়ের দিকে নেমে আসতে থাকল। একই সঙ্গে বাড়তে লাগল কষ্ট। অবশেষে এমন হল যে মাথাব্যথা শুরু হলে অন্ধকার ঘরে বিছানায় শুয়ে বালিশে মাথা গুঁজে ছটফট করতে করতে জাহিদ মৃত্যু কামনা করত। চোখে এক ফোঁটা আলো গেলে ঝিনঝিন করে উঠত সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রী, শ্বাস নেবার মত যথেষ্ট অক্সিজেন থাকত না বাতাসে। কোন অষুধপত্রেই কাজ হল না। বড় বড় ডাক্তার দেখানো হল। হাসান দম্পতি পাশে বসে থেকে সন্তানের কষ্ট দেখা ছাড়া আর কিছুই করতে পারলেন না।

এই মাথাব্যথা শুরু হবার একটা লক্ষণ ছিল। শত শত হাজার হাজার পাখির কলধ্বনি আর ডানা ঝাপটানর শব্দ শুনতে পেত জাহিদ, মনে হত যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে। বলা বাহুল্য আর কেউ তা শুনতে পেত না। কিন্তু অভিজ্ঞতাটা এতই বাস্তব ছিল যে জাহিদের মনে হত পাখিগুলোকে ও দেখতেও পাচ্ছে। শুধু তাই নয়, ও জানত পাখিগুলো চড়ুই—সার বেঁধে বসে আছে টেলিফোনের তারে, গাছের ডালে, বাড়ির ছাদে—সর্বত্র।

কোরবানীর ঈদের ঠিক দু'দিন আগে জাহিদের স্কুল থেকে ফোন এল। মাঠে খেলতে খেলতে জাহিদ হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। অনেক চেষ্টা করেও জ্ঞান ফেরাতে না পেরে অ্যাম্বুলেন্সে করে ওকে মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ওর বাবা তখন অফিসে। মিসেস হাসান ছুটলেন হাসপাতালে।

সন্ধ্যার আগেই জাহিদের জ্ঞান ফিরে এল। তখন ও সম্পূর্ণ সুস্থ। কষ্টের চিহ্নমাত্র নেই। কিন্তু ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক আরও দু'দিন জাহিদকে হাসপাতালে আটকে রাখলেন কিছু টেস্ট করার জন্যে।

দু'দিন পর নিউরোলজিস্ট রফিক উদ্দীনের অফিসে ডাক পড়ল হাসান সাহেব আর তার স্ত্রীর। ভদ্রলোক কথাবার্তায় আন্তরিক, নামকরা অন্যান্য বড় ডাক্তারদের মত অধৈর্য নন।

'লক্ষণ দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক আপনাদের ছেলের মৃগীরোগ হয়েছে,' চশমার ভারী কাঁচ মুছতে মুছতে বললেন তিনি, 'কিন্তু আমার তা মনে হয় না।'

কি বলবেন বুঝতে পারলেন না হাসান সাহেব।

টেবিলের উপর রাখা কটা-হলদে রঙের বড় একটা খাম থেকে এক্স-রে শীট বের করলেন ডাক্তার। 'মৃগী হলে সেটা "গ্র্যাণ্ড মল্" টাইপের হত, অন্তত লক্ষণ

BanglaBook.org

তাই বলে। কিন্তু জাহিদ "লিটন লাইট টেস্টে রিয়্যাক্ট" করেনি।'

'তাতে কি বোঝায়?' হাসান সাহেব রীতিমত বিরক্ত হলেন। ডাক্তাররা কি সহজ ভাষায় কথা বলতে পারেন না!

'তার মানে এটা মৃগী নয়। বিশেষ করে এর আগে এরকম যখন আর হয়নি।' এবার তিনি এক্স-রে শীটটা হাসান সাহেবের দিকে বাড়িয়ে দিলেন, 'যে জায়গাটা হলুদ পেন্সিল দিয়ে দাগিয়ে রেখেছি, সেটা ভাল করে দেখুন।'

মাথার এক্স-রে। দাগিয়ে রাখা জায়গাটা আবছা কালচে একটা ছায়া। হাসান সাহেব কিছুই বুঝলেন না। মিসেস হাসান ফ্যাকাসে মুখে এক্স-রেটা টেনে নিয়ে দেখতে লাগলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

স্থির চোখে চেয়ে আছেন ডাক্তার। 'যতদূর মনে হচ্ছে ওর মগজে একটা টিউমার রয়েছে। মাথাব্যথার কারণটাও এই টিউমার।'

ঘরের মধ্যে বাজ পড়ল। মিসেস হাসান অস্ফুট আর্তনাদ করে স্বামীর বাহু আঁকড়ে ধরলেন। হাসান সাহেবের মনে হল তিনি নিজের মৃত্যুদণ্ড শুনলেন। অনেকক্ষণ পর অনেক চেষ্টা করে শুধু বললেন, 'ও আমাদের একমাত্র ছেলে।'

ডাক্তার চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে হাসান সাহেবের কাঁধে হাত রাখলেন। 'আমারও জাহিদের বয়সী ছেলে আছে। আপনি সচ্ছল লোক। ওকে বিদেশের কোন হাসপাতালে নিয়ে যান। লণ্ডনে এ ধরনের বেশ ক'টা সার্জারি হয়েছে। মিথ্যে আশা আপনাকে দেব না। বিদেশে নিলে অন্তত চেষ্টা করা হবে। এদেশে এর কোন চিকিৎসা নেই। তবে আমার ব্যক্তিগত অভিমত, টিউমারটা এখনও বেশ ছোট, আপনার ছেলের যথেষ্ট আশা রয়েছে।'

ডাক্তার রফিক উদ্দীনই লণ্ডনের হাসপাতালে জাহিদের চিকিৎসার সব ব্যবস্থা করে দিলেন। দেড় মাসের মধ্যে হাসান সাহেব জাহিদকে নিয়ে লণ্ডনে পৌঁছে গেলেন। এক সপ্তাহ পরে অপারেশনের তারিখ দেয়া হল।

এটা ডক্টর জে. ম্যাকলিনের তৃতীয় ব্রেন টিউমার অপারেশন। অপারেশন থিয়েটারে ঢুকে প্রথমেই তিনি সহকারী ডাক্তার এবং নার্সদের উদ্দেশ্যে পরবর্তী কয়েক ঘণ্টার কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে ছোটখাট একটা বক্তৃতা দিলেন। তারপর তৎপরতার সঙ্গে কাজে লেগে গেলেন। প্রথম বিশ মিনিট প্রাণরক্ষাকারী বিদঘুটে যন্ত্রটার হিসহিস, খুলি কাটার করাতের (NEGLI SAW) গা শিউরানো শব্দ আর চাপা গলায় যন্ত্রপাতি এগিয়ে দেবার জন্যে ডাক্তার ম্যাকলিনের আদেশ ছাড়া কোন শব্দ শোনা যায়নি।

সহকারী ও. আর. নার্সই প্রথমে দেখল।

মহিলার উঁচু পর্দার বিলম্বিত চিৎকার মুহূর্তের জন্যে উপস্থিত প্রতিটা মানুষের হৃৎপিণ্ডে ছুরি বসিয়ে দিল। প্রচণ্ড ভয়ে সে পিছিয়ে আসতে লাগল, বাঁ হাতে মুখ চেপে ধরে প্রাণপণে চেষ্টা করছে বুকচেরা আর্তনাদটা গিলে ফেলতে। পিছাতে গিয়ে ধাক্কা খেল রস্ ট্রের সাথে। ঝনঝন শব্দ করে মেঝেতে ছিটকে পড়ল ছোটবড় দুই ডজন যন্ত্রপাতি, একটু আগে ও নিজেই এগুলো সাজিয়ে রেখেছিল

BanglaBook.org

ট্রের ওপর।

'প্যাম!' হেড নার্স ধমকে উঠল দরজার দিকে ধেয়ে যাওয়া নার্সের উদ্দেশ্যে, কিন্তু খেয়াল করেনি নিজেও ওকে অনুসরণ করার জন্যে পা বাড়িয়েছে, ভয় এমনি সংক্রামক!

ডক্টর হেমিংস্, যিনি ম্যাকলিনকে সাহায্য করছেন, ও.টি.-তে ব্যবহারের কাপড়ের মোজা পরা পায়ে হেড নার্সের পায়ে ছোট্ট চাঁটি কশালেন, 'ভুলে যেয়ো না কোথায় আছ!'

'ইয়েস, ডক্টর!' সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল হেড নার্স, বহু কষ্টে চোখ সরিয়ে নিল দরজা থেকে। এখান থেকেও যেন পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে করিডরে প্যামের আর্তনাদ, মনে হচ্ছে ভূতে তাড়া করেছে ওকে।

ডক্টর ম্যাকলিনকে দেখে মনে হচ্ছে এসব কিছুই তিনি লক্ষ করেননি। গভীর মনোযোগের সঙ্গে তিনি চেয়ে আছেন জাহিদের মাথার খুলিতে কাটা ছোট্ট জানালাটার দিকে।

'অদ্ভুত!' বিড়বিড় করে বললেন তিনি, 'আশ্চর্য! বই পত্রেও এমন ঘটনা পড়িনি! নিজের চোখে যদি না দেখতাম—'

স্টেরিলাইজারের হিসহিস শব্দে তাঁর চমক ভাঙল, সরাসরি তাকালেন ডক্টর হেমিংসের দিকে।

'সাক্শন! সাক্শন চাই এক্ষুণি! তারপর তোমাকে একটা জিনিস দেখাব, বব্, বাজি ধরতে পারি তুমি কেন, তোমার চোদ্দপুরুষ কেউই এমনটা দেখেনি!'

রবার্ট হেমিংস্ যতটা দ্রুত সম্ভব সাক্শন পাম্পটা নিয়ে এলেন গড়িয়ে, উত্তেজনায় ঘামতে শুরু করেছেন। হেড নার্স ইতিমধ্যে মেঝেতে ছড়ানো যন্ত্রপাতি সরিয়ে ট্রেতে নতুন সেট সাজিয়ে ফেলেছে।

ম্যাকলিন এবার অ্যানেসথেশিওলজিস্টের দিকে চাইলেন।

'একটা ভাল বি.পি. চাই, বন্ধু, আর কিছু না।'

'ওয়ান-ও-ফাইভ ওভার সিক্সটি-এইট। এর চেয়ে ভাল কিছু হতেই পারে না,' উত্তেজনা সংক্রমিত হয়েছে তাঁর মধ্যেও।

হেমিংস সাক্শন ব্যবহার করে অতিরিক্ত রক্ত শুষে নিলেন ধীরে ধীরে। মনিটরিং ইকুইপমেন্টের একঘেয়ে বিপ বিপ শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। নাহ্! আর রক্ত নেই। কৌতূহলী চোখে তাকালেন তিনি সদ্য পরিষ্কার করা গর্তটার ভিতরে, সঙ্গে সঙ্গে মনে হল কেউ যেন লাথি কষিয়েছে তলপেটে।

'ও, মাই গড! ওহ্, যিসাস ক্রাইস্ট!' মাস্ক এবং টুপিতে ঢাকা থাকায় শুধু চশমার পিছনে হেমিংসের ভয় পাওয়া গোল-গোল চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে। 'এটা...এটা কি?'

'যা দেখছ তাই,' ম্যাকলিন শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'বীভৎস, কিন্তু সত্যি। এরকম সম্ভাবনার কথা বইতে পড়েছি, কিন্তু কখনও কোথাও ঘটেছে কিনা জানি না। নিজের চোখে দেখব তা চিন্তাও করিনি।'

জাহিদ হাসানের ধূসর-গোলাপি মগজের মসৃণ জমি থেকে একদৃষ্টে চেয়ে

আছে একটা চোখ! বিকৃত কিন্তু জ্যান্ত একটা চোখ! মগজটা একটু একটু কাঁপছে, সঙ্গে সঙ্গে কাঁপছে ভৌতিক চোখটাও! হেমিংস মর্মে মর্মে বুঝলেন প্যাম কেন দৌড়ে পালিয়েছে।

'হায় আল্লাহ্! এটা কি!' আবার বিড়বিড় করে একই সুরে বলে উঠলেন হেমিংস।

'কিচ্ছু না,' ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন ম্যাকলিন। 'কোন একসময় জীবন্ত মানবদেহের অংশ ছিল। এখন এটা ঝামেলা ছাড়া আর কিছু না। আর এই ঝামেলাটা ঝেঁটিয়ে বিদায় করা কঠিন কিছু নয়।'

অ্যানেসথেশিওলজিস্ট এবার গলা বাড়ালেন, 'স্যার, আমি একটু দেখতে পারি?'

'রোগীর অবস্থা কেমন?'

'একদম ঠিক।'

'তাহলে আসুন। ভবিষ্যতে নাতি-নাতনিদের কাছে গল্প করতে পারবেন। তবে তাড়াতাড়ি করুন।'

দেখার পর ভদ্রলোক ভাবলেন না দেখলেই ভাল হত। দুঃস্বপ্নের মধ্যে তাড়া করে ফিরবে চোখটা কতদিন কে জানে!

ডক্টর ম্যাকলিন ফিরলেন তাঁর দিকে। 'নেগলিটা চাই। খুলির ফুটো আর একটু বড় করতে হবে। এরপর ওটা ধরব। আমি জানি না পুরোটা তুলে আনতে পারব কিনা, তবে যতটুকু পারা যায় ততটুকুই লাভ।'

অ্যানেসথেশিওলজিস্ট এখন অনুপস্থিত প্যামের জায়গা নিয়েছেন। চাওয়ামাত্রই স্টেরিলাইজ করা প্রোবটা ম্যাকলিনের বাড়ানো হাতে তুলে দিলেন। ম্যাকলিন গুন্‌গুন্ করে কি একটা সুর ভাঁজছেন আর একমনে কাজ করে চলেছেন। আশ্চর্য নার্ভ ভদ্রলোকের!

চোখটার সঙ্গে আরও পাওয়া গেল নাকের কিছু অংশ, তিনটে নখ, দুটো দাঁত। চোখটা কেটে আনার আগে নিড্‌ল্ স্কালপেল দিয়ে খুঁটে দেবার সময় ডক্টর ম্যাকলিনের মনে হল যেন চোখটা নড়ে উঠল। অজান্তেই শিউরে উঠলেন তিনি। আধ ঘণ্টার মধ্যেই সব কাজ হয়ে গেল। জাহিদের কামানো মাথার পাশে রাখা র‍স্ ট্রেতে জমা পড়ল পাঁচটা ছোট ছোট ভিজে ঘিনঘিনে মাংসের ডেলা।

'মনে হয় সবটুকুই বের করতে পেরেছি,' অবশেষে ঘোষণা করলেন ডক্টর ম্যাকলিন। 'ফরেন টিস্যুগুলো রুডিমেন্টারি গ্যাঙগ্লিয়া দিয়ে যুক্ত ছিল। কিছু অংশ যদি ভেতরে থেকেও থাকে, আমার মনে হয় সেটুকু আর জ্যান্ত নেই।'

'কিন্তু সেটা কেমন করে হয়! ছেলেটা তো এখনও পর্যন্ত জ্যান্ত! মানে···বলতে চাচ্ছিলাম যে এগুলো তো ওর দেহেরই অংশ। তাই নয় কি?' অ্যানেসথেশিওলজিস্ট আমতা আমতা করে প্রশ্ন করলেন।

তর্জনী তুলে ট্রের দিকে তাক করলেন ম্যাকলিন। 'কি কি পেয়েছি আমরা? একটা চোখ, কয়টা দাঁত আর নখ। তা-ও ছেলেটার মগজ থেকে। আপনি এখনও ভাবছেন ওগুলো ওর দেহের অংশ? আপনি পরীক্ষা করে দেখুন তো ছেলেটার

চোখ···দাঁত আর নখ সব জায়গামত আছে কিনা, নাকি খোয়া গিয়েছে!'

'কিন্তু···স্যার, ক্যানসারও তো রোগীর দেহেরই অংশ···'

'এটা ক্যানসার নয়।' ম্যাকলিনের হাত কিন্তু থেমে নেই, কথা বলতে বলতেই কাজ করে চলেছেন তিনি। 'ভ্রূণ অবস্থায় মানবশিশু যখন জীবন শুরু করে, অনেক সময়ই তা শুরু হয় যমজ ভ্রূণ থেকে। এমনকি প্রতি ১০ জনের মধ্যে ২ জনের ক্ষেত্রেই এটা হতে পারে। একটা ভ্রূণ পুরোপুরি মানবদেহে পরিণত হয়। বাকি ভ্রূণটার ভাগ্যে কি লেখা থাকে? শক্তিশালী ভ্রূণটাই যুদ্ধে টিকে যায় দুর্বলটাকে আত্মসাৎ করে!'

'আত্মসাৎ করে!' আঁৎকে উঠলেন ডাক্তার। 'আপনি বলতে চাইছেন শক্তিশালী ভ্রূণ দুর্বলটাকে খেয়ে নেয়! ইউটেরো-ক্যানিবালিজ্‌ম্‌!'

'যা খুশি নাম দিতে পারেন, এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। তবে আমরা আজ যা দেখলাম তা একেবারেই অস্বাভাবিক। ছেলেটার যমজ ভ্রূণের কিছু অংশ পুরোপুরি নষ্ট হয়নি। সেটুকু আশ্রয় নিয়েছে ছেলেটার মস্তিষ্কের প্রোফ্রন্টাল লোবে। মস্তিষ্ক না হয়ে পাকযন্ত্র, প্লীহা, মেরুদণ্ড যে-কোন জায়গাতেই টিস্যুগুলো বাসা বাঁধতে পারত,' ম্যাকলিনের হাত চলছে।

'আশ্চর্য!'

'কোন কারণে টিস্যুগুলো বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। কেন তা হয়ত কোনদিনই জানা যাবে না। ছেলেটার মাথাব্যথার শুরুও সম্ভবত তখন থেকে। শুধুমাত্র ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেশারই মাথাব্যথা এবং আনুষঙ্গিক শারীরিক কষ্টের জন্যে যথেষ্ট।'

'কিন্তু···কেন এরকমটা হল!'

'ত্রিশ বছর পরে প্রশ্নটা করলে হয়ত উত্তর দিতে পারতাম। এ মুহূর্তে শুধু এটুকুই জানি, ছেলেটার মগজ থেকে দুষ্প্রাপ্য একটা "বেনাইন টিউমার" সরিয়েছি। ছেলেটার বাবাও যেন এর চেয়ে বেশি কিছু না জানে। ভয় পাইয়ে কি লাভ! ছেলে ভাল হয়ে উঠবে এটাই ভদ্রলোকের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। উনি বলেছিলেন ছেলেটা নাকি ভবিষ্যতের শেক্সপিয়ার,' একটুক্ষণ থেমে কি যেন ভাবলেন ডক্টর ম্যাকলিন, তারপর উষ্ণকণ্ঠে বললেন, 'যে নার্সটা বেকুবের মত চিৎকার করতে করতে বেরিয়ে গেল, ওকে এই হাসপাতালে আমি আর চাই না।'

'ইয়েস, ডক্টর।'

ঠিক এক মাস পর জাহিদ দেশের পথে বিমানে চাপল বাবার সঙ্গে। প্রায় ছ'মাস শরীরের বাম দিকে ও কোন জোর পেত না, একটু পরিশ্রম করলেই চোখে রঙধনু খেলত। তবে ধীরে ধীরে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠল জাহিদ। অপারেশনের পর পাখির কাকলি আর শুনতে পায়নি ও একদিনের জন্যেও।

BanglaBook.org

এক

২৩ মে ১৯৯২-এর 'সাপ্তাহিক শনিবার'-এর সংখ্যাটা অন্যান্যবারের চেয়ে কোনদিক দিয়েই অসাধারণ ছিল না। প্রচ্ছদে বিরোধী দলীয় এক রাজনৈতিক নেতার ক্লোজ আপ, ভেতরে সাক্ষাৎকার। বার্সেলোনা অলিম্পিকের জন্যে নির্বাচিত বাংলাদেশ দলের খবরাখবর। যৌতুকের শিকার আসিয়া বেগমের আত্মহত্যা। আন্তর্জাতিক খবরের মধ্যে আছে আমেরিকার প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী বুশ এবং ক্লিনটনের সম্পর্কে কিছু ভবিষ্যদ্বাণী আর ফ্যরিয়েভোর গৃহযুদ্ধ।

তবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক জাহিদ হাসান ওসব কিছু পড়ছিল না। পত্রিকার তেত্রিশ নাম্বার পৃষ্ঠাটা মনোযোগ দিয়ে দেখছিল সে। শিরোনামে বড় বড় করে ছাপা আছে 'ডক্টর জাহিদ হাসান: না বলা এক অতীত।'

'সাপ্তাহিক শনিবার' ঢাকার প্রথম সারির পত্রিকা। একটু আগেই সম্পাদক নির্মল হাজারি ফোনে জানিয়েছেন এ হপ্তার সংস্করণ গরম কেকের মত বিকিয়েছে। কিন্তু জাহিদ হাসান কেন যেন কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছে না। মোনা সকাল থেকেই লক্ষ করছে পত্রিকাটা হাতে পাওয়ার পর থেকেই জাহিদ চুপ মেরে আছে। রূপক আর রুমকি, ওদের দশ মাসের যমজ ছেলেমেয়েকে গোসল করাতে করাতে বাথরুম থেকেই একটু উঁচু গলায় চেঁচিয়ে উঠল মোনা, 'কি ব্যাপার, জাহিদ? তোমার কি কোন অনুশোচনা হচ্ছে? সকাল থেকে যে একেবারে রাম গরুড়ের ছানা!'

দূর থেকে একটু অস্পষ্ট শোনালেও জাহিদের বুঝতে কোন অসুবিধা হল না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও, 'প্রথমত, এটা একা আমার সিদ্ধান্ত ছিল না। দু'জনেই আমরা একসঙ্গে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।' অস্বস্তি নিয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল জাহিদ অফসেটে ছাপা মোনা আর ওর যুগল ছবিটার দিকে। 'দ্বিতীয়ত, কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক পাবলিকলি এভাবে বেকুবের মত দাঁত বের করে হাসে?' পত্রিকাটা হাতে করে বাথরুমের দরজায় এসে দাঁড়াল জাহিদ। 'দেখ না, দু'জনকেই দেখাচ্ছে এক জোড়া ছাগলের মত।'

রুমকি-রূপককে তোয়ালেতে মুড়ে বাথরুম থেকে বেরুতে বেরুতে মোনা কাঁচ ভাঙা হাসিতে ভেঙে পড়ল, 'কি যে সব বল না তুমি! ধ্যাৎ!' মা'কে হাসতে দেখে বাচ্চা দুটোও হাত-পা নেড়ে হাসতে শুরু করেছে। ওদেরকে লিভিং রুমের সোফার ওপর নামিয়ে দিয়ে পাউডার মাখাতে শুরু করল মোনা। 'তুমি যাই বল না কেন, আমার মনে হয় আমরা ঠিক কাজটাই করেছি। যতদিন ব্যাপারটা গোপন ছিল, কেন যেন আমি কিছুতেই স্বস্তি পেতাম না।'

যুগল ছবিটা ছাড়াও আধা পৃষ্ঠা জুড়ে ছাপা হয়েছে আর একটা ছবি। চোখে না পড়েই যায় না এমন একটা ছবি। ছবিতে জাহিদ হাসানের হাতে একটা

BanglaBook.org

কোদাল, মোনা দাঁড়িয়ে আছে পাশে। ওদের বাঁ দিকে দেখা যাচ্ছে একটা সমাধি। পায়ের কাছে ফুলের তোড়া। সমাধি স্তম্ভে লেখা প্রতিটা শব্দ পরিষ্কার পড়া যাচ্ছে।

রুস্তম শের

১৯৮৩-১৯৯১

মন্দ এক লোক ছিল সে

বলা বাহুল্য এটা একটা সাজানো ছবি। 'শনিবারের' এক নাম্বার রিপোর্টার খান জয়নুল তার উদ্ভাবনী শক্তির পুরোটাই ব্যবহার করেছে লেখাটাকে নাটকীয় করে তোলার উদ্দেশ্যে। ছবিটা তুলেছে আর্ট কলেজের ছাত্রী ফ্রি ল্যান্সার সোহানা মল্লিক। তবে ছবির পরিকল্পনার পুরোটাই খান জয়নুলের। সোহানাও এতে মজা কম পায়নি। 'হাসুন...হাসুন...একটু ডান দিকে...ব্যস্! দারুণ!' বলতে বলতে খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠেছিল সে। জাহিদ কেন যেন তখন অস্বস্তি নিয়ে তাকিয়ে ছিল নকল সমাধি ফলকটার অবাস্তব লেখাগুলোর দিকে।

'মন্দ এক লোক ছিল সে।'

আশ্চর্য! ফটোগ্রাফার মেয়েটা কোত্থেকে জোগাড় করল ফলকটা! দেখে একদম আসল বলে মনে হচ্ছে।

ছবিটা দুর্বোধ্য হলেও আর্টিকলটার বিষয়বস্তু খুবই সহজ সরল। জাহিদ হাসান তাঁর শিক্ষক পরিচয়ের বাইরেও একজন বিখ্যাত লেখক। তাঁর লেখা তিনটে বইয়ের মধ্যে একটা বাংলা একাডেমি পুরস্কার পেয়েছে। কিন্তু সমালোচকরা ছাড়া সাধারণ মানুষ তাঁর লেখা নিয়ে একটুও মাথা ঘামায়নি। অর্থাৎ জাহিদ হাসানের লেখা বই বিক্রি হয়নি।

মানুষ যাকে গ্রহণ করেছে সে আদৌ রক্তমাংসের মানুষই নয়, কাল্পনিক এক চরিত্র মাত্র। জাহিদ হাসান, 'রুস্তম শের' ছদ্মনাম নিয়ে পর পর চারটি রহস্য কাহিনী লেখেন যার প্রতিটা রেকর্ড পরিমাণ সাফল্য বয়ে আনে—আর্থিক এবং পরিচিতি দু'দিক থেকেই। কিন্তু আজকের আগে কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি জাহিদ হাসান আর রুস্তম শের একই ব্যক্তি। এতদিন রুস্তম শের তার সৃষ্ট চরিত্রগুলোর মতই ছিল রহস্যে মোড়া, আজ যবনিকাপাত হল। হালকা বিষয়বস্তু নিয়ে লেখার লজ্জাই জাহিদকে ছদ্মনাম নিতে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু আজ ঝোলার বেড়াল বের হয়ে যাওয়ার পর জাহিদ অস্বীকার করতে পারছে না, লজ্জার বাইরেও এ এক মুক্তির আনন্দ। সাহিত্যের আসরে জাহিদ হাসানের সম্মান এতে কমে যাবে সন্দেহ নেই, কিন্তু গোপনীয়তার বেড়াজাল ছিল এর চেয়েও বেশি বেদনাদায়ক।

সাক্ষাৎকার নেবার সময় খান জয়নুল প্রশ্ন করেছিল, 'আচ্ছা, জাহিদ ভাই, রুস্তম শের কেমন লোক ছিল?'

মৃদু হেসে জাহিদ উত্তর দিয়েছিল, 'মন্দ লোক ছিল সে।' সমাধি ফলকে এই মন্তব্যটাই ব্যবহার করেছে খান জয়নুল।

নাটকীয়তাই আজকাল প্রচারের মূলধন। কি অদ্ভুত ছেলেমানুষী!

হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠল জাহিদ মোনাকে চমকে দিয়ে।

BanglaBook.org

ছবিটার শিরোনামে লেখা হয়েছে, 'মৃতব্যক্তি এঁদের দু'জনেরই অতি পরিচিত ছিলেন। তাহলে এই দম্পতি হাসছেন কেন?'

'কারণ প্রতিটা মানুষই অদ্ভুত এক জন্তু,' হাসতে হাসতে নিজের মনেই বলে উঠল জাহিদ। তারপরই নানান কথা মনে আসতে লাগল। কেন এই লেখাটা আমাকে এত বিব্রত করছে? সহকর্মীদের টিটকারির ভয়? ছাত্র-ছাত্রীদের শ্রদ্ধা হারানর ভয়? এই লেখাটা এতদিনের শান্ত নিরুদ্বিগ্ন জীবনে কতটুকু আলোড়নই বা তুলতে পারে! নাহ্! এসব কিছু নয়। জেনেশুনেই তো পুরো ব্যাপারটাতে সম্মতি দিয়েছে সে। হঠাৎ করেই বুঝতে পারল জাহিদ—সমাধি ফলকটা!

রুস্তম্ শের
১৯৮৩-১৯৯১
মন্দ এক লোক ছিল সে

গোটা গোটা কালো অক্ষরগুলোই বিব্রত করছে ওকে। শব্দ করে পত্রিকাটা আছড়ে ফেলল জাহিদ কফি টেবিলের ওপর।

'তাতে কিইবা আসে যায়!' বিড়বিড় করে নিজেকে শোনাল, 'বেজন্মাটা এখন মৃত।'

বাচ্চাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে কটে শুইয়ে দিয়ে মোনা লিভিংরুমে এল, 'অ্যাই, চা খাবে?'

কিন্তু তা কানে গেল না জাহিদের, একদৃষ্টে চেয়ে আছে ও মোনার টানা টানা কাজল কালো চোখের দিকে, 'আচ্ছা, মোনা, রুস্তম শেরকে কি আমি খুন করেছি?'

'কি যে ছাই আজেবাজে বকছ তুমিই জান!' বিরক্ত হয়ে মোনা রান্নাঘরের দিকে চলে গেল, হয়ত চা বানাতে।

জাহিদ সিঁড়ি বেয়ে ওপর তলার স্টাডিতে উঠে এল। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাতেই ওদের কোয়ার্টার, তবে হেঁটে যাবার জন্যে ডিপার্টমেন্ট একটু দূর হয়ে যায়। জাহিদ সাধারণত ওর ইঁট রঙা পাবলিকা ড্রাইভ করেই যায়। কোথাও বাইরে যাবার দরকার হলে মোনাই অসুবিধেয় পড়ে। এদিকটা এত নির্জন যে রিকশা পাওয়া যায় না। বড় রাস্তা পর্যন্ত হেঁটে যেতে হয়। এই রাস্তায় তিনটে মাত্র কোয়ার্টার। ওদের উল্টোদিকে থাকেন ইংরেজি বিভাগের চেয়ারম্যান ডক্টর রকিব চৌধুরী, ছেলেমেয়ে দুটোই ঢাকায় থেকে পড়ে। পাশের বাসার সুনীল দত্ত দর্শন বিভাগের শিক্ষক। কাছাকাছি বয়সের কারণে এই পরিবারের সাথেই জাহিদ-মোনার সখ্যতা গড়ে উঠেছে।

জাহিদ ওর লেখার টেবিলের পাশে এসে দাঁড়াল। পুরানো হলেও টাইপ রাইটারটা ঝকঝক করছে। জাহিদ নিজেই লেখার সাজসরঞ্জাম গুছিয়ে রাখে। বাঁশের তৈরি পেন্সিল হোলডার থেকে হলুদ রঙের এইচ-বি পেন্সিলটা তুলে নিল জাহিদ। এমনিতে ও টাইপ রাইটারে কাজ করে। কিন্তু রুস্তম শের ছদ্মনামে লেখা চারটি বইয়ের প্রতিটা ও লিখেছে এই পেন্সিল দিয়ে। এই পেন্সিলেই ও সৃষ্টি করেছে গালকাটা জয়নালের মত উন্মাদ এক খুনীকে যার পাশবিক ক্রিয়াকলাপের

BanglaBook.org

বর্ণনা পড়তে পড়তে শিউরে উঠেছে পাঠকরা আর বিক্রি বেড়েছে রুস্তম শেরের বইয়ের। কিন্তু ওই ক'টা বছর জাহিদ কি সুখে ছিল?

'না, রুস্তম শেরকে আমি হত্যা করিনি,' বিড়বিড় করে বলে উঠল জাহিদ, 'সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কারণেই মৃত্যু ঘটেছে ওর,' পেন্সিলটা ছুঁড়ে ফেলে দিল ও ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে।

•

দুই

সেরাতে জাহিদ দুঃস্বপ্ন দেখল।

স্বপ্নের পুরো সময়টা রুস্তম শের ওর সঙ্গে ছিল, কিন্তু সর্বক্ষণ সে ওর পেছনে থাকাতে ওকে জাহিদ দেখতে পায়নি। কালো রঙের একটা ফোর্ড এসকর্ট চালিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছে ওরা। যদিও জাহিদ গাড়ির ভেতরে বসে আছে, তবুও যেন পেছনের বাম্পারে লাগানো কার্টুনের রঙিন স্টিকারটা দেখতে পাচ্ছে পরিষ্কার— 'ওস্তাদের মাইর শেষ রাতে'! আরে! এ যে রুস্তম শেরের গাড়ি! তাই যদি হয়ে থাকে, গাড়ির নাম্বার প্লেট নিশ্চয়ই খুলনার। প্রকাশকের দপ্তরে রুস্তম শেরের কাল্পনিক ঠিকানা খুলনার। নদীর পাশ দিয়ে রাতের আঁধার কেটে ওরা একসময় ডান দিকের কাঁচা রাস্তা ধরল। রাস্তার শেষে কাঠের রেলিংওয়ালা লাল ইঁটের তৈরি পুরানো একটা দোতলা বাড়ির গাড়ি-বারান্দায় এসে থামল ওরা।

'সুন্দর দেখতে বাড়িটা, তাই না?' রুস্তম শেরের চমৎকার পুরুষালী কণ্ঠ ভেসে এল জাহিদের কাঁধের পেছন থেকে।

'এটা তো আমারই বাড়ি,' জাহিদ বলল।

'না, এ বাড়ির মালিক মৃত। স্ত্রী-ছেলেমেয়েকে খুন করে নিজেও সে আত্মহত্যা করেছে।' বলতে বলতে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল রুস্তম শের, জাহিদ ওকে দেখতে পেল না কিন্তু ইশারা বুঝে নিয়ে ঠিকই দরজার উদ্দেশে হাঁটতে শুরু করল। রুস্তম শেরের অদৃশ্য হাত এক গোছা চাবি ওর নাকের সামনে ধরল। চাবি দিয়ে দরজা খুলে জাহিদ ভেতরে পা দিল। নিজেরই বাড়ি, কিন্তু ভেতরের কিছুই জাহিদ চিনতে পারল না। সমস্ত আসবাবপত্র কারা যেন প্রচণ্ড আক্রোশে ভেঙে চুরে দিয়ে গেছে, দরজা-জানালাগুলোও ভাঙা। সোফার ফোমগুলো বেরিয়ে পড়েছে, সারা ঘরে চেয়ার-টেবিলের ভাঙা অংশ। সবকিছুর ওপর পুরু ধুলোর আস্তরণ, মাকড়সার জাল। মনে হচ্ছে বহুবছর কেউ এ বাড়িতে ঢোকেনি। হঠাৎ প্রচণ্ড ভয় পেল জাহিদ, ঘুরে দৌড় দেবার ইচ্ছেটাকে বহুকষ্টে গলা টিপে মারল। রুস্তম শেরের সামনে ভয় পাওয়া চলবে না। দেখতে না পেলেও জাহিদ জানে রুস্তম শেরের ডান হাতে একটা ক্ষুর আছে, যে ক্ষুরটা দিয়ে গালকাটা জয়নাল তার রক্ষিতাকে ফালাফালা করে কেটে ফেলেছিল। নিজের অজান্তেই জাহিদ এগিয়ে গিয়ে ঘরের একমাত্র আস্ত টেবিলটার পাশে দাঁড়াল। আশ্চর্য! ফুলদানিটাও

BanglaBook.org

আস্ত আছে। আলতো করে হাত ছোঁয়াল জাহিদ ফুলদানিটার কানায়। ঝনঝন শব্দ তুলে হাজারো টুকরো হয়ে মাটির তৈরি ফুলদানিটা গুঁড়িয়ে গেল। জাহিদ টেবিলের ওপর হাত রাখল। নিমেষে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল সেটাও। আতঙ্কে ঘামতে শুরু করল জাহিদ। হারামজাদা রুস্তম শের! কি করেছিস তুই আমার বাড়িটার! কিচেনের দরজায় পড়ে আছে মোনার বাদামি রঙের চামড়ার হ্যাণ্ডব্যাগটা। দৌড়ে এল জাহিদ। মিটসেফের গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে মোনা। গত বছর বিবাহবার্ষিকী উপলক্ষে জাহিদের দেয়া মেরুন টাঙাইল শাড়ি পরনে, মাথাটা সামনে ঝুঁকে থাকায় একরাশ খোলাচুলে ঢেকে আছে মুখটা। বুঝতে অসুবিধা হয় না ওর দেহে প্রাণ নেই। তীক্ষ্ণ চিৎকার করে জাহিদ দৌড়ে গেল ওর কাছে, চুল সরিয়ে দু'গালে হাত দিয়ে মুখটা উঁচু করে ধরে আকুল হয়ে ডাকল, 'মোনা!' খরার তাপে দগ্ধ মাটির মত ফেটে গেছে মোনার হালকা বাদামি ত্বক। কাজল কালো চোখ দুটো বিস্ফোরিত হল, গরম সবজেটে পদার্থ ভিজিয়ে দিল জাহিদের শার্ট। দাঁতগুলো ছিটকে বেরিয়ে এল, মাথা নামিয়ে নেয়ায় জাহিদের কপালে দু'একটা আঘাত করল। কালচে রক্ত গড়িয়ে নামছে মোনার দু'কশ বেয়ে, জিভটা খসে পড়ল কোলে। কাঁপতে শুরু করল জাহিদ, মনে হল এক্ষুণি জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। পেছন থেকে রুস্তম শের হিসহিস করে উঠল, 'আমার সাথে বিটলামি!' সাপের মত ঠাণ্ডা ঘিনঘিনে সেই কণ্ঠস্বর, 'মনে রাখিস, লাগতে এলে সব ছারখার করে দেব···সব···'

চিৎকার করে ঘুম ভেঙে উঠে বসল জাহিদ। সারা গা ঘামে ভিজে গেছে। হাঁটুতে মুখ গুঁজে কাঁপুনি থামাবার চেষ্টা করল।

'জাহিদ,' ঘুমঘুম গলায় মোনা জিজ্ঞেস করল পাশ থেকে, 'কি হয়েছে? বাচ্চারা ঠিক আছে?' কেন ঘুম ভেঙেছে তা হয়ত বুঝতে পারেনি।

'অ্যাঁ···হ্যাঁ,' অনেক কষ্টে গলায় স্বর ফোটাল জাহিদ। হাত দিয়ে দেখল বালিশটা ভেজা। ঘাম, নাকি চোখের জল?

বিড়বিড় করে কি যেন বলে মোনা পাশ ফিরল। তারপর নিশ্চিন্তে তলিয়ে গেল ঘুমে। আস্তে আস্তে খাট থেকে নেমে এল জাহিদ। জানালায় দাঁড়িয়ে খোলা বাতাসে শ্বাস নিল। ভয়টা ধীরে ধীরে কমে আসছে। বাচ্চাদের খাটের পাশে দাঁড়াল। ডিম লাইটের আবছা আলোতে ওদের ঘুমন্ত ছোট্ট শরীর দুটোকে কেমন অপার্থিব মনে হচ্ছে। দু'জনের দু'গালে চুমু খেয়ে আবার বিছানায় ফিরে এল জাহিদ।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙার পর জাহিদ আবিষ্কার করল, স্বপ্নের কোন অংশই ভোলেনি ও।

BanglaBook.org

তিন

পতেঙ্গা এলাকার গোরস্থানটা ছোট। কেয়ার-টেকার করিম বক্স পাশেই থাকে বৌ-বাচ্চা নিয়ে। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে করিম বক্স এই গোরস্থানের দেখাশোনা করছে, ফলে আশেপাশে যারা থাকে সবাইকেই প্রায় চেনে। বলতে গেলে ওর চোখের সামনেই গড়ে উঠেছে শহরটা।

ফজরের নামাজ পড়ে প্রতিদিনের অভ্যাসমত আজও করিম বক্স সুরেলা গলায় দোয়া পড়তে পড়তে গোরস্থানে পায়চারি করছে। সবুজ গাছপালা আর রঙবেরঙের ফুলের গাছ সাজানো গোরস্থানটাকে পার্ক বলে ভুল করা অস্বাভাবিক নয়। করিম বক্স নিজের হাতে এসবের পরিচর্যা করে। কবরগুলোর মাঝে সুরকিঢাকা সরু পথে হাঁটতে হাঁটতে করিম বক্স শুকনো ডাল-পাতা কুড়িয়ে তুলে ফেলে দিচ্ছে, মাঝে মাঝে ঘুচিয়ে নিচ্ছে ফুলগাছের গোড়ার মাটি।

'পোলাপানের জ্বালায় দেহি আর শান্তি নাই!' দূরে সদ্য খোঁড়া একটা গোল গর্ত দেখে রাগে গজগজ করতে করতে সেদিকে এগোল করিম বক্স। ফাঁক পেলেই বস্তির ছেলেপিলেরা দেয়াল ডিঙিয়ে ঢুকে ফুল ছিঁড়ে নিয়ে যায়। নিশ্চয়ই তাদের কাজ! এ বয়সে কত শয়তানিই যে মাথা খেলে! 'মনে কয় মাথাত তুলি আছাড় দি,' বিড়বিড় করতে করতে ক্ষতির পরিমাণ যাচাই করতে লাগল।

কোন কবর ছিল না জায়গাটাতে। গর্তটা বেশ গভীর, এবড়োখেবড়ো। গর্তের চারপাশে মাটি, শুধু কিনারার একটা জায়গা মসৃণ, ঢালু হয়ে আছে কিছুর চাপ খেয়ে। হঠাৎ কেমন যেন ভয় ভয় লেগে উঠল করিম বক্সের। মনে হচ্ছে যেন জ্যান্ত কাউকে গোর দেয়া হয়েছিল জায়গাটাতে। জেগে উঠে মাটি সরিয়ে বেরিয়ে এসেছে লোকটা। জোরে জোরে আয়াতুল কুরসি আউড়ে ভয় তাড়াতে চেষ্টা করল করিম বক্স।

যতসব আজেবাজে চিন্তা! করিম বক্স ভাল করেই জানে এখানে কাউকে কবর দেয়া হয়নি। কয়েকদিন আগে ঢাকা থেকে কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে সুন্দরমত দেখতে এক আপা এসে জাহিদ সাহেব আর তাঁর বিবিকে দাঁড় করিয়ে ঠিক এই জায়গাটাতেই ছবি তুলেছিলেন। এই জায়গাটাতেই করিম বক্সের দুই সহকারী শরীফ সাহেবের নির্দেশে নকল কবর খোদে, শরীফ সাহেব এজন্যে ভাল বখ্শীশও দেন। শরীফ সাহেব জাহিদ সাহেবের বাবার বন্ধু। করিম বক্সের সাথে ভাল পরিচয় আছে। এই এলাকার সবাই ওঁকে শ্রদ্ধা করে। জাহিদ সাহেবদের বাড়ির পাশেই ওঁর বাড়ি। জাহিদ সাহেবদের মত শরীফ সাহেবরাও এই এলাকার আদি বাসিন্দা। জাহিদ সাহেব আজকাল সাভারে থাকেন বলে খালি বাড়িটা শরীফ সাহেবই নিয়মিত দেখাশুনা করেন। সেদিন ওনার গাড়িতে করেই ছবি তোলার ছোট্ট দলটা যন্ত্রপাতি নিয়ে এখানে আসে। শরীফ সাহেব সেদিন সকালে এসে

BanglaBook.org

করিম বক্সের সঙ্গে কথা বলে যান এই ছবি তোলার ব্যাপারে। আপত্তির কোন কারণ দেখেনি করিম বক্স। ওনারাই তো সমাজের মাথা, কোন বাজে কাজ তো আর করবেন না। তাছাড়া জাহিদ সাহেবের দাদাই তো এই গোরস্থানকে জমি দিয়েছিলেন। কোন্ মুখে না করবে করিম বক্স?

ঠিক এখানেই ছবিটা তোলা হয়েছিল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে ভাল করে চারদিক পরীক্ষা করে দেখতে শুরু করল করিম বক্স। পায়ের ছাপ! ঘাসের উপর পায়ের ছাপ! তাতে কি হল, নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করল সে। যে গর্ত খুঁড়েছে সে তো আর হাওয়ায় উড়ে আসেনি, পায়ে হেঁটে এসেছে। পায়ের ছাপ অনুসরণ করে গর্তের কিনারায় এসে দাঁড়াল করিম বক্স। সদ্য খোঁড়া মাটিতে ছাপ গভীর হয়ে বসেছে। দুটো ব্যাপার লক্ষ করে বিস্মিত হল সে। প্রথমত, পায়ের ছাপটা পূর্ণবয়স্ক মানুষের, কোন কিশোরের নয়। দ্বিতীয়ত, ছাপগুলো খালি পায়ের নয়, জুতো পরা পায়ের ছাপ। জুতো পায়ে কোন্ বুদ্ধু এখানে গর্ত খুঁড়তে আসবে! তৃতীয় ব্যাপারটা লক্ষ করে করিম বক্সের ঘাড়ের পিছনের চুল সরসর করে দাঁড়িয়ে গেল। ছাপগুলো গর্ত থেকে উঠে বাইরে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু গর্তের দিকে এগিয়ে যাবার কোন চিহ্ন নেই। অর্থাৎ বাইরে থেকে কেউ আসেনি। কিন্তু না এলে কেউ গর্ত থেকে বেরুবেই বা কেমন করে! গতকাল সন্ধ্যায় বৃষ্টি হয়েছে। যাবার পায়ের ছাপ গভীর হয়ে পড়েছে, আর আসার ছাপ পড়বে না, এটা একটা কথা হল?

ভয়ের চেয়ে কৌতূহল বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। করিম বক্স গর্তের কিনারায় উপুড় হয়ে বসে অনুসন্ধান চালাল। জুতোয় কাদা লেগে থাকার কারণেই ঘাসের উপর ছাপগুলো এমন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এতগুলো বছর কেটেছে এই গোরস্থানে, কিন্তু একদিনের জন্যেও ভৌতিক কিছু দেখেনি করিম বক্স। গর্তের কিনারার যে জায়গাটায় মাটির ঢিবি ঢালু হয়ে আছে, তার দু'দিকে হাতের ছাপ, গর্ত বেয়ে উঠতে গিয়ে ডান হাতটা ভিজে মাটিতে পিছলে গিয়েছিল সেটাও বোঝা যাচ্ছে। আশ্চর্য! বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না, গর্ত থেকে উঠে কোন লোক দেয়াল টপকে বাইরের রাস্তায় চলে গেছে। কিন্তু লোকটা এল কোন্ পথে? ভূত বলেও বিশ্বাস হতে চায় না, কারণ এখানে কোন কবর কখনোই ছিল না। গুণ্ডা-বদমাশের কাণ্ড হতে পারে।

ব্যাপারটা কি থানায় রিপোর্ট করা দরকার? পতেঙ্গা থানার ইন্সপেক্টর শাহেদ রহমানকে চেনে করিম বক্স। বয়স কম হলে কি হবে, কাজকামে খুব ভাল। ভদ্র আর সৎ। আগের জনের মত ঘুষখোর নয়। কিন্তু গোরস্থানে বিনা অনুমতিতে গর্ত খোঁড়া কি শাস্তিযোগ্য অপরাধ? কোন কিছু তো চুরি যায়নি। এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে থানায় গেলে ওরা যদি হাসাহাসি করে? ভেবেচিন্তে ঝামেলা না করারই সিদ্ধান্ত নিল করিম বক্স।

দুপুরে জুম্মার নামাজ আদায় করার জন্যে গোরস্থান সংলগ্ন মসজিদে গিয়ে খবরটা শুনল। শরীফ খান সাহেবকে কারা নাকি খুন করে ফেলে রেখে গেছে সমুদ্রের কাছাকাছি নদীর পারে বোল্ডারের আড়ালে। ভোরে নৌকা নামাতে গিয়ে

BanglaBook.org

মৃতদেহ আবিষ্কার করেছে স্থানীয় এক জেলে। শুনে আর বসে থাকতে পারল না করিম বক্স, থানার দিকে হাঁটা দিল চোখ মুছতে মুছতে।

শরীফ খানের হত্যাকাণ্ড ইন্সপেক্টর শাহেদ রহমানকে অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলে দিয়েছে। পতেঙ্গা থানায় পোস্টিং পাবার পর থেকে চোরাচালানীদের তাড়িয়ে বেড়ানই ওর প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া ছুটকোছাটকা দু'একটা চুরি-ডাকাতি কিংবা ছিনতাইয়ের কেস আসে। কালেভদ্রে জাহাজীরা ঝামেলা পাকায়। কিন্তু খুনের ক্ষেত্রে এই প্রথম। তার ওপর শরীফ খানের মত গণ্যমান্য একজন লোকের খুন। যাঁকে এলাকার সবাই মুরুব্বী বলে মানে, সমাজসেবা করেন বলে সকলেই চেনে। ষাট বছরের বেশি বয়স, শান্ত-নির্বিরোধী ভালমানুষ লোকটাকে কে মারতে পারে? কেনই বা মারবে? শরীফ খান সরকারী চাকুরে ছিলেন, বছর তিনেক আগে অবসর গ্রহণ করেন। স্ত্রী আছেন, তবে নিঃসন্তান। সমাজসেবা করেই দু'জনের সময় কাটে। গতরাতে মিসেস খান থানায় ফোন করে জানিয়েছিলেন স্বামী বাড়ি ফেরেননি রাত দুটোর পরেও। প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উনি অফিসার্স ক্লাবে যান, রাত বারোটার মধ্যেই ফিরে আসেন।

ডিউটিরত অফিসার ধারণা করে অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে হয়ত ক্লাবেই পড়ে রয়েছেন, গাড়ি চালিয়ে আসতে পারেননি। তবুও সরেজমিনে তদন্তের জন্যে ক্লাবে গিয়ে জানতে পারল শরীফ খান বেরিয়ে গেছেন এগারোটার আগেই। ঘুম চোখে দারোয়ান আরও জানাল গত বিশ বছরে কেউ শরীফ খানকে মদ্যপান করতে দেখেনি।

অফিসার যখন থানায় ফেরে, তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। রিপোর্ট লিখে ডিউটি শেষে বাড়ি ফিরে যায় সে। ইন্সপেক্টর শাহেদ সকালে অফিসে এসেই ঘটনাটা জানতে পারে। মৃতদেহ আবিষ্কার হয় ঘণ্টাখানেক পরে।

অফিসার্স ক্লাব থেকে শরীফ খানের বাড়ির দূরত্ব মাইল আটেকের বেশি হবে না। দোকানপাট অত রাতে নিশ্চয়ই বন্ধ ছিল। তাই শুধু রাস্তার পাশের বাড়িগুলোতেই জিজ্ঞাসাবাদ করার সিদ্ধান্ত নিল শাহেদ। শরীফ খানের টয়োটা করোনাটার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি, যতদূর মনে হয় মানিব্যাগেও কেউ হাত দেয়নি। শুধু প্রচণ্ড আক্রোশে কেউ ধারাল অস্ত্র দিয়ে ফালাফালা করে কেটেছে বৃদ্ধের সমস্ত শরীর। ব্যক্তিগত আক্রোশ না থাকলে এমন পাশবিক কাণ্ড কেউ করতে পারে না।

বেশ কয়েকটা বাড়ি ঘুরে আসার পর বার্মা ইস্টার্নের কোয়ার্টারের বাসিন্দা মিসেস আমান কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিলেন।

'আমার ইনসোমনিয়া আছে। রাতে ভাল ঘুম হয় না। কিছুক্ষণ পরপরই বিছানা থেকে উঠে পড়ি। কাল রাতে বাথরুমে যাবার সময় জানালা দিয়ে গাড়িটা দেখেছি।'

'তখন ক'টা বাজে মনে আছে?'

চোখ বন্ধ করে একটু চিন্তা করলেন মিসেস আমান। 'সোয়া এগারোটা কি

BanglaBook.org

সাড়ে এগারোটা হবে। কারণ তার খানিকটা আগে সাড়ে দশটার দিকে আমেরিকা থেকে আমার ভাই ফোন করেছিল, তখন ঘড়ি দেখেছিলাম।'

'মিস্টার আমান কোথায় ছিলেন?'

'ও তো ঘুমে কাদা। আমি জানালায় দাঁড়িয়ে দেখলাম গাড়িটা থামল।'

'থামল!' চমকে উঠল শাহেদ। 'গাড়িটা থেমেছিল? আপনি ঠিক দেখেছিলেন?'

মিসেস আমানের কপালে বিরক্তির ভাঁজ পড়ল। এমনিতেই রান্নাঘরে রাজ্যের কাজ পড়ে আছে, পুলিস লোকটা বিদায় হলেই বাঁচেন তিনি। 'না দেখলে কি আর বলছি, ভাই?'

শাহেদ তাড়াতাড়ি গলার স্বরে গদগদ ভাব নিয়ে এল, 'না না, ম্যাডাম। আমি সেভাবে বলিনি। আপনি এমনিতেই আমাদেরকে অনেক সাহায্য করেছেন। আপনাদের সাহায্য ছাড়া কি আর আমি চাকরি করতে পারতাম?' পুলিসে চাকরি নিলে কত রকম ট্রেনিং যে দরকার হয়!

'খুন হয়েছে বলেই না আমরাও এত ভয় পেয়েছি। এই এলাকাতেই তো থাকি। আমার তো ঘর থেকে বেরুতেই ভয় লাগছে,' উঠে গিয়ে ফ্যানটা এক দাগ বাড়িয়ে দিলেন মিসেস আমান। দরজার কাছে দাঁড়ানো ছোটমত কাজের মেয়েটার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, 'হাসিনা, যা তো, বুয়াকে দু'কাপ চা করতে বল্।'

'না না চায়ের কি দরকার,' মনে মনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল শাহেদ, 'আপনার সময় নষ্ট করছি, এতেই আমি লজ্জিত। শত হলেও শরীফ সাহেবের মত লোকের খুন...'

'শরীফ সাহেবকে আমি চিনতাম না, নাম শুনেছি। ওই গাড়িটা যে ওনার তা-ও জানতাম না। আপনি ছবিটা দেখানর পরেই গাড়িটা চিনতে পেরেছি। প্রায়ই এই রাস্তায় আসা যাওয়া করতে দেখতাম গাড়িটাকে।' শাহেদ গাড়ির ছবিটা জোগাড় করেছে মিসেস শরীফ খানের কাছ থেকে।

'গাড়িটা থামল কেন কিছু বুঝলেন?' চট করে শাহেদ প্রসঙ্গে চলে এল।

'একটা লোক হাত দেখাল যে!'

'লোক!' আবার চমকে উঠল শাহেদ, নোটবুকে দ্রুত লিখতে শুরু করল। 'লোকটাকে ভাল করে দেখতে পেরেছিলেন?'

'রাস্তার আলোতে যতটুকু দেখা যায়। তবে খুব লম্বা, গাঢ় রঙের সুট পরা ছিল। দাঁড়িয়ে ছিল রাস্তার ওপাশে। গাড়িটা শহরের দিক থেকে আসছিল, দেখে লোকটা হাত তুলে ইশারা করে,' আঁচলে গলার ঘাম মুছতে মুছতে বললেন মিসেস আমান।

'তখন গাড়িটা থেমে দাঁড়াল?' শাহেদের প্রশ্নের উত্তরে মিসেস আমান ওপর-নিচ মাথা নাড়লেন। 'তারপর কি হল?'

'তারপর লোকটাকে তুলে নিয়ে গাড়িটা চলে গেল।'

'গাড়ির চালককে দেখেছিলেন?'

'না, অন্ধকার ছিল, অত খেয়াল করিনি।'

BanglaBook.org

'বাইরে দাঁড়ানো লোকটার সম্বন্ধে আর কিছু বলতে পারবেন?'

চোখ বন্ধ করে কয়েক সেকেণ্ড ভাবলেন মিসেস আমান, তারপর বললেন, 'যতটুকু দেখেছি, মনে হয়েছে লোকটা খুব ফর্সা…আর…আর…খুব হ্যাণ্ডসাম।'

'লম্বা বলছেন, ঠিক কতটা লম্বা হবে?' দ্রুত চলছে শাহেদের কলম।

'কম করেও ছ'ফিট, কিন্তু এতদূর থেকে নিশ্চিত করে বলা সম্ভব না, তাছাড়া কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার মাত্র। বাথরুমে যাবার সময় জানালার পর্দা টেনে দেবার জন্যে দাঁড়াতেই লোকটাকে দেখি, সঙ্গে সঙ্গেই গাড়িটা এল আর ওতে উঠে চলে গেল লোকটা।'

'সুটের রং কি কালো ছিল, না ডিপ ব্লু?'

'বলতে পারব না, কালচে ছিল এটুকুই মনে আছে। তবে সুটটা দামি সন্দেহ নেই। লোকটাকে দেখে মোটেই সাধারণ লোক মনে হচ্ছিল না, সেজন্যেই আমি লক্ষ করেছিলাম।'

'গাড়িটা কি যেদিকে যাচ্ছিল সেদিকেই গেছে?'

'হ্যাঁ।'

সেটাই স্বাভাবিক। মৃতদেহ পাওয়া গেছে সাগরের কাছাকাছি। কিন্তু অত রাতে শরীফ খান একটা অপরিচিত লোককে গাড়িতে তুলবেন কেন? নাকি লোকটা পরিচিত?

ডিউটিরত সার্জেন্ট মাসুদ আলম যাত্রাবাড়ির কাছে ডোবার ধারে পার্ক করা ক্রিম কালারের টয়োটা করোনাটা দেখে বাইক থামাল। গাড়ির আশেপাশে কেউ নেই। দোকানপাট সবে খুলতে শুরু করেছে, শুক্রবার বলে রাস্তায় লোকজন কম। গাড়ির মালিক হতে পারে এমন কাউকে দেখা যাচ্ছে না। কাছে গিয়ে নোটবুক খুলে নাম্বারটা মিলিয়ে দেখল, কোন সন্দেহ নেই এটাই সেই পতেঙ্গা থেকে হারিয়ে যাওয়া গাড়িটা। মাত্র কিছুক্ষণ আগেই চিটাগাং থেকে গাড়িটার নাম্বার যাত্রাবাড়ির থানায় জানানো হয়েছে নিয়মমত। চুরি যাওয়া গাড়িগুলো সাধারণত অন্য শহরে আবিষ্কৃত হয় বলে দ্রুত সবখানে খবর পাঠাবার নির্দেশ আছে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি গাড়িটাকে খুঁজে পাওয়া যাবে সার্জেন্ট মাসুদ চিন্তাই করতে পারেনি।

সাবধানে গাড়ির নিচে একা ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখল কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ভেতরটা ভাল করে লক্ষ্য করতেই চমকে উঠল সার্জেন্ট। অতি বড় গর্দভও বুঝবে সামনের সিটের হালকা সোনালী কভারে কালচে মত দেখতে ওগুলো শুকিয়ে যাওয়া রক্তের দাগ। সিটের নিচে কয়েকটা খালি কোকের ক্যান, আলু ভাজার টুকরা, ছেঁড়া পরোটার কিছু অংশ, ঠোঙা ইত্যাদি আবর্জনা দেখা যাচ্ছে। আধ খাওয়া কয়েকটা সিগারেটও আছে, কিছু নিচে, কিছু সিটের ওপর। কিন্তু রক্তের দাগটাই সার্জেন্টকে চিন্তায় ফেলে দিল। শুধু সিটে নয়, স্টিয়ারিঙ হুইলেও শুকনো রক্ত লেগে আছে, কিছু ছিটকে পড়েছে সামনের উইণ্ড শীল্ডে। মনোযোগ দিয়ে দেখলে বোঝা যায় রিয়ার ভিউ মিররেও লেগে আছে ছোপ ছোপ রক্ত, দরজার হাতলও বাদ যায়নি। খাকি রঙের কাগজের ঠোঙা রক্তে ভিজে চুপসে

BanglaBook.org

গেছে।

সাবধানে গাড়ির দরজায় চাপ দিতেই খুলে গেল, লক্ করা ছিল না। ভেতরে ঝুঁকে ভালমত দেখতে গিয়ে রক্তভেজা ঠোঙাটা তুলে ধরল সার্জেন্ট। কয়েকটা চুল আটকে আছে চটচটে রক্তে। হঠাৎ একটা বদগন্ধ নাকে যেতেই ঝটিতি মাথা বের করে আনল সার্জেন্ট। রক্তপচা গন্ধ নয়, কিন্তু তার চেয়েও খারাপ গা গুলিয়ে ওঠার মত গন্ধ, যা সার্জেন্টের অভিজ্ঞতার বাইরে। খারাপ, খুব খারাপ একটা গন্ধ।

সার্জেন্ট দ্রুত গাড়িটার কাছ থেকে দূরে সরে এল। নিজের বাইকে হেলান দিয়ে কিছুক্ষণ লম্বা করে শ্বাস নিল। তারপর ওয়াকি-টকিতে সহকর্মীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল। কেন যে দিনে দুপুরে এমন ভয় লাগল কে জানে!

থানায় ফিরে প্রথমেই পতেঙ্গা থানায় ফোন করল সার্জেন্ট মাসুদ আলম।

চার

আমেনা বেগম তাঁর বিশাল শরীরটা টেনে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে দোতলায় বিশ্রামের জন্যে থামলেন। সাঁই সাঁই করে নিঃশ্বাস বইছে, ঘামে ভিজে উঠেছে চুলের গোড়াগুলোও। আর পারি না! মনে মনে আর্তনাদ করে উঠলেন ভদ্রমহিলা। স্বামীর মৃত্যুর পর সব ঝামেলা এসে পড়েছে ঘাড়ে। ছেলেমেয়েগুলোও সব শয়তানের ঝাড়। তা না হলে অত বড় ছেলেমেয়ে আছে যার তাকে কষ্ট করে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ভাড়া তুলতে হয়! না করেও তো পারেন না তিনি, আট ফ্ল্যাটের এই বাড়িটাই যে তাঁকে খাওয়াচ্ছে। প্রতি মাসের পাঁচ তারিখে প্রতিটা ফ্ল্যাটে ঘুরে ঘুরে ভাড়া তোলেন তিনি। আজ ভাড়া নেবার তারিখ নয়। কিন্তু বাধ্য হয়ে আসতে হয়েছে। প্রায় ছ'মাস হল তিনতলার একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছে আমিন ইকবাল নামের অল্পবয়েসী এক ছোকরা। একাই থাকে। এমনিতে আমেনা বেগম ব্যাচেলারদের বাড়ি ভাড়া দেন না। কিন্তু বড় ছেলে এই ছোকরাকে নিয়ে এলে, না করতে পারেননি, ল' কলেজে ওর সঙ্গে নাকি পড়ে। এমনিতে ছোকরা কোন কাগজে সাংবাদিকের চাকরি করে। কিন্তু বজ্জাত ছোকরা গত ছ'মাসের ভাড়া বাকি রেখে আমেনা বেগমকে বিপদে ফেলেছে। ছেলের বন্ধু-টন্ধু মানেন না, আজ আমেনা বেগম শেষ কথা জানিয়ে দিতে এসেছেন—সামনের মাসে একবারে পুরো তিন মাসের ভাড়া না পেলে লোক ডেকে তিনতলা থেকে ওর জিনিসপত্র সব ফেলে দেবেন। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব! ঢাকা শহরের মত জায়গায় গোপীবাগে বড় রাস্তার ওপর দু'কামরার সুপরি মত ফ্ল্যাট কখনও খালি পড়ে থাকে! আমেনা বেগম আজই একটা হেস্তনেস্ত করবেন। নিচ থেকে দেখেছেন ছোঁড়ার ফ্ল্যাটের জানালা খোলা, তার মানে বাসাতেই আছে।

একটু দম নিয়ে আবার সিঁড়ি বাইতে গিয়েই মেজাজ আরও খারাপ হয়ে

BanglaBook.org

গেল। উপরের কোন ফ্ল্যাটে প্রচণ্ড জোরে ক্যাসেট বাজছে—'দেখা হ্যায় প্যাহলি বার, সাজানকে আঁখো মে পেয়ার'! তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাজখাঁই স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন আমেনা বেগম, 'এত জোরে গান বাজায় কে র‍্যা! বিয়াবাড়ি নাকি!' সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ কমে গেল। গজগজ করতে করতে তিনতলায় উঠে এলেন তিনি মেদবহুল দেহটাকে টানতে টানতে। সিঁড়ির মুখে কোমরে হাত দিয়ে একপাশে হেলে দাঁড়িয়ে আবার খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিলেন। ছোঁড়া নাকি আবার সাংবাদিক, ঝামেলা করবে না তো! অবশ্য পকেট যার খালি তার জোর আর কতটা হবে। ছেলের কাছ থেকে আমেনা বেগম শুনেছেন আমিন ইকবাল বিখ্যাত সব লোকের পিছনে লেগে থেকে বিব্রতকর মুহূর্তের ছবি তোলে, তারপর মোটা টাকার বিনিময়ে পত্রিকার কাছে বিক্রি করে দেয়। যাই হোক না কেন আমেনা বেগমের সাথে কেউ বেগড়বাঁই করে ছাড়া পায় না।

নিজের মনে গজগজ করতে করতে আমিন ইকবালের দরজায় ঘা দিলেন আমেনা বেগম। হাতের মুঠি দরজায় পিছলে গেল, দরজাটা খোলাই ছিল। ও, ছোঁড়া তাহলে গলার আওয়াজ পেয়েছে। দরজাটার খোলা অংশ দিয়ে ছোট্ট করিডরের শেষে বেডরুমটা দেখা যাচ্ছে। এলোমেলো জিনিসপত্র—বাসাটাকে শুয়োরের খোঁয়াড় করে রেখেছে।

'আমিন!' দরজার কড়া ধরে নাড়লেন আমেনা বেগম। কোন সাড়া না পেয়ে দরজা ঠেলে ছোট্ট লিভিংরুমটায় ঢুকে পড়লেন, 'আমিন, বাবা, এদিকে একটু শুনে যাও তো!'

ভক্ করে চিমসে একটা গন্ধ নাকে এসে লাগল। কিছু পচেছে! নাকে শাড়ির আঁচল চেপে আরও এক পা এগিয়ে গেলেন আমেনা বেগম। 'আমিন, কোথায় তুমি, বাবা?' ঘরের কোথাও নিচু ভল্যুমে রেডিও বাজছে। গন্ধটা বিকট আকার ধারণ করেছে। আমেনা বেগমের ইচ্ছে হল ছুটে বেরিয়ে যান, গন্ধটা কেমন যেন অশুভ সঙ্কেত বয়ে আনছে। বাইরে এখনও আঁধার নামেনি, তবে ঘরে আলো জ্বলছে। ভয়ের চেয়ে কৌতূহলটাই বড় হল। বইয়ের বড় আলমারিটা পেরিয়ে ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন তিনি। রাস্তার উপরের জানালাটা খোলা, তবে পর্দা টেনে দেয়া। পায়ের নিচে কি যেন পড়তে উপুড় হয়ে দেখলেন সোফার কুশন। মাথাটা তুলে ডান দিকে তাকাতেই শরীরের সমস্ত রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

খুব বেশি হলে তিন সেকেণ্ডের জন্যে তাকিয়ে ছিলেন আমেনা বেগম, কিন্তু ওই স্বল্প সময়ে ঘরের দৃশ্যের প্রতিটা খুঁটিনাটি মনের পর্দায় ছবির মত ছাপ ফেলে গেল—জীবনের বাকি সময়টা যা তাড়া করে বেড়াবে তাঁকে।

টেবিলের উপরে সিগারেটের আধপোড়া অংশ, আমেনা বেগম ভাল করেই জানেন আমিন সিগারেট খায় না, ছোট একটা প্লাস্টিকের কৌটা থেকে টেবিলের উপর ছড়িয়ে পড়েছে অসংখ্য বোর্ড-পিন, কয়েকটা পড়ে আছে 'সাপ্তাহিক শনিবারে'র খোলা পাতায়—যেখানে জাহিদ হাসান আর তাঁর স্ত্রী দাঁড়িয়ে আছেন রুস্তম শেরের কবরের পাশে, দু'জনের মুখেই হাসি।

সোফায় নয়, আমিন ইকবাল বসে আছে দেয়াল ঘেঁসে রাখা একটা কাঠের

BanglaBook.org

চেয়ারে। উলঙ্গ, দড়ি দিয়ে চেয়ারের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। জামাকাপড় মেঝেতে লুটোচ্ছে। পেটের কাটা অংশ থেকে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে গড়িয়ে পড়েছে মেঝেতে। বাম চোখটা কোটর ছেড়ে বেরিয়ে গালের উপর ঝুলছে। জিভটা কেটে নেয়া হয়েছে, সেটাকে দেয়ালের গায়ে বোর্ড-পিন দিয়ে আটকে দেয়া হয়েছে। কাটা জিভ থেকে টপ টপ করে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে দেয়াল বেয়ে। আর একটা বোর্ড-পিন দিয়ে আমিনের বুকের ওপর আটকে দেয়া হয়েছে 'শনিবারে'র আর একটা পৃষ্ঠা—রক্তে ভিজে চুপসে গেলেও জাহিদ হাসান আর তাঁর স্ত্রীকে চিনতে ভুল হয় না। রক্তের বন্যায় ভেসে যাচ্ছে চেয়ারে বসা আমিনের চারদিক। সেই রক্তে আঙুল বুলিয়ে দেয়ালে সাঁটানো জিভটার ঠিক ওপরে লেখা হয়েছে কয়েকটা শব্দ, সাদা হোয়াইটওয়াশের পটভূমিকায় শব্দ ক'টা বড় স্পষ্ট—

'পাখিরা আবার উড়ছে!'

এই অবস্থাতেও অস্পষ্ট একটা শব্দ আমেনা বেগমের কানে ঠিকই পৌঁছল। বুকফাটা আর্তচিৎকারটা গলা দিয়ে কেমন ঘড়ঘড় শব্দ হয়ে বেরোচ্ছে, বাতাসে সাঁতার কাটার মত টলতে টলতে আমেনা বেগম অতি ধীরে ঘুরে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন। আশ্চর্য! এখনও বোধবুদ্ধি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়নি!

দরজাটা বন্ধ! খোদা! দরজাটা কেউ বন্ধ করে দিয়েছে! আমেনা বেগম নিশ্চিত তিনি দরজা বন্ধ করেননি ঘরে ঢোকার পর। তার মানে খুনী তখনও ঘরের ভেতরেই ছিল, তাঁকে ঢুকতে দেখে দরজার পেছনে লুকিয়ে পড়ে। এখন সুযোগ বুঝে বেরিয়ে গেছে, যাবার সময় দরজাটা টেনে দিয়ে গেছে!

জীবনে এই প্রথমবার আমেনা বেগম জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়লেন কাটা কলাগাছের মত।

পাঁচ

পুলিস যখন আসে জাহিদ তখন দোতলার স্টাডিতে, মোনা বসার ঘরে রূপক-রুমকিকে কার্পেটের উপর ছেড়ে দিয়ে সোফায় শুয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সেই সময়' পড়ছে। শেষ বিকেলের সোনালী আলো জানালায়।

বেলের শব্দ কানে যেতে বিন্দুবাসিনীর ঠাকুরঘর থেকে নিজেকে জোর করে বাস্তবে ফিরিয়ে আনল মোনা, বিরক্ত হয়ে এগিয়ে গেল সদর দরজার দিকে।

পিপহোল দিয়ে বাইরে দাঁড়ানো ইউনিফর্ম পরা পুলিস দেখে অন্য যে-কোন লোকের মত মোনারও অস্বস্তি হল। কি ব্যাপার! পুলিস! এই অসময়ে! সাথে সাথে মনে হল—কি ছেলেমানুষী চিন্তা—পুলিসের আবার সময়-অসময় আছে নাকি!

'কাকে চাই?' দরজা খুলে মোনা বাইরে গলা বাড়াল।

'আপনি কি মিসেস জাহিদ হাসান?' তিনজনের একজন জিজ্ঞেস করল গম্ভীর কণ্ঠে।

banglabook.org

'জী…কি ব্যাপার?'

'আপনার স্বামী কি বাসায় আছেন?' এবার আর একজন প্রশ্ন করল।

'কেন তা কি জানতে পারি?' দরজাটা মুখের ওপর বন্ধ করে দেবার ইচ্ছেটাকে বহুকষ্টে দমন করছে মোনা।

তৃতীয় পুলিস অফিসার, ইন্সপেক্টর শাহেদ রহমান—মোনা তখনও তাকে চেনে না—অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল, 'পুলিসী কাজ। আপনি কি দয়া করে ওনাকে একটু ডেকে দেবেন?'

মোনা যখন ওপরে ডাকতে এল, টাইপ রাইটার থেকে উঠতে পেরে খুশিই হল জাহিদ। সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে চিন্তা করতে লাগল হঠাৎ পুলিস কেন এল। হলের ছেলেরা কোন গণ্ডগোল করেনি তো!

ওরা এখনও বাইরেই দাঁড়িয়ে আছে।

'স্লামালেকুম,' সহাস্যে ডান হাত বাড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে গেল জাহিদ।

'আপনিই জাহিদ হাসান?' রূঢ় প্রশ্নটা শুনে একটু থমকে গেল জাহিদ। সালামের জবাব তো দেয়ইনি, আবার নাম ধরে সম্বোধন করল! 'ডক্টর' নয়, 'মিস্টার' নয়—শুধু জাহিদ হাসান! বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক জাহিদ হাসান বহুদিন এমন সম্ভাষণ শোনেনি। অথচ দেখে মনে হচ্ছে অফিসার কম করেও পাঁচ বছরের ছোট হবে বয়সে। 'আমি ইন্সপেক্টর শাহেদ রহমান, পতেঙ্গা থানায় আছি। আপনি হাতটা ফেরত নিতে পারেন, হ্যাণ্ডশেক করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই।'

বিমূঢ় জাহিদ হাতটা গুটিয়ে নিয়ে বিস্মিত চোখে চেয়ে রইল। হঠাৎ করেই কেন যেন মনে হল অস্বীকার করে কোন লাভ নেই, সত্যিই ভয়ঙ্কর অপরাধ করেছে ও। ভয় পেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে দোতলায় ওঠার সিঁড়ির শেষ ধাপে দাঁড়ানো মোনার দিকে চাইল। রূপক-রুমকি মুখে 'তা তা দা দা' শব্দ তুলে আপনমনে খেলা করছে, মোনার সেদিকে মনোযোগ নেই। ভয় পাওয়া বড় বড় চোখ মেলে মোনা একদৃষ্টে চেয়ে আছে পুলিস অফিসারের দিকে, রক্তশূন্য চেহারা, এক হাতে রেলিঙ আঁকড়ে ধরে আছে।

হঠাৎ করেই জাহিদের মাথায় রক্ত চড়ে গেল। কি অধিকার আছে পুলিসের নিরীহ নাগরিকের বাড়িতে ঢুকে অভদ্র ব্যবহার করার, অকারণে ভয় দেখাবার?

'খুব ভাল। হ্যাণ্ডশেক না হয় নাই করলেন, কিন্তু আসার কারণটা দয়া করে বলবেন কি?' ব্যক্তিত্ব ফিরে পেল জাহিদ, এখন শুধু বিরক্তিই বোধ করছে।

হঠাৎ করে মনে হল, পতেঙ্গা থানার ইন্সপেক্টর এই সাভারে কি করছে!

কঠোর চোখে চেয়ে আছে ইন্সপেক্টর শাহেদ রহমান। 'খুনের তদন্তে আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে আমরা এখানে এসেছি। যদি ইচ্ছে করেন তবে উকিলের সঙ্গে পরামর্শের আগে কোনরকম বক্তব্য নাও দিতে পারেন, আপনার অধিকার সম্বন্ধে নিশ্চয়ই আপনি সচেতন—শিক্ষিত লোক যখন,' কোনরকম ভাবান্তর ছাড়াই এক নিঃশ্বাসে বলে গেল সে।

BanglaBook.org

'খোদা! কি হচ্ছে এসব!' ডুকরে কেঁদে উঠল মোনা। রূপক-রুমকি খেলা থামিয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে আছে অবাক চোখে।

'দাঁড়ান, দাঁড়ান! কি বলতে চাচ্ছেন আপনি?' প্রচণ্ড রাগে-অপমানে চিৎকার করে উঠল জাহিদ।

কিন্তু শাহেদ রহমান যেন তা শুনতেই পেল না, একইভাবে বলে যেতে থাকল, 'আপনার সামর্থ্য না থাকলে সরকার আপনার জন্যে উকিল ঠিক করে দেবে। এ মুহূর্তে আপনাকে আমাদের সঙ্গে থানায় যেতে হবে।'

'জাহিদ!' ভয় পাওয়া ছোট্ট মেয়েটির মত চেঁচিয়ে উঠল মোনা, দৌড়ে গিয়ে রূপক-রুমকিকে ছোঁ মেরে মেঝে থেকে কোলে তুলে নিল—ওরা একযোগে কাঁদতে শুরু করেছে।

'এ মুহূর্তে আপনাদের সঙ্গে কোথাও যাবার কোন ইচ্ছে নেই আমার। আইন সম্বন্ধে যতটুকু ধারণা আছে, তাতে মনে হয় আমাকে জোর করার কোন অধিকারও আপনাদের নেই,' কাঁপা কাঁপা গলায় বলল জাহিদ, কপালে ঘাম জমতে শুরু করেছে।

শাহেদের ডান পাশে দাঁড়ানো ভদ্রলোক এবার বললেন, 'তাহলে আমাদেরকে থানায় ফিরে গিয়ে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট ইস্যু করিয়ে আনতে হবে, জাহিদ সাহেব। আমাদের কাছে যা তথ্য আছে তাতে কাজটা খুব একটা কঠিন হবে না।' তারপর আড়চোখে ইন্সপেক্টর শাহেদের দিকে একবার চেয়ে যোগ করলেন, 'ইন্সপেক্টর শাহেদ ওয়ারেন্ট নিয়েই আসতে চেয়েছিলেন। আপনি একজন সম্মানিত এবং বিখ্যাত লোক বলে আপনার ভালর জন্যেই আমরা তা সমর্থন করিনি।'

শাহেদকে দেখে মনে হল কথাটা বলার জন্যে অফিসারের উপর সে খুব খেপে গেছে। আশ্চর্য! লোকটা এমন অস্থির হয়ে আছে কেন, কি এমন ঘটেছে! কে খুন হয়েছে?

'আমি বুঝতে পারছি আপনারা শুধু কর্তব্য পালন করছেন,' জাহিদ আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে, কণ্ঠস্বরেই তা বোঝা গেল, 'কিন্তু অফিসার, আমি তো ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'আপনি সত্যিই যদি কিছু বুঝতে না পারতেন, তবে আমাদের এখানে আসার দরকার হত না,' হিসহিসিয়ে উঠল শাহেদ।

আর ধৈর্য ধরে রাখতে পারল না জাহিদ, চিৎকার করে উঠল ঘর ফাটিয়ে, 'আপনি কি জানেন আর না জানেন তার থোড়াই পরোয়া করি আমি। পতেঙ্গায় আমার পৈতৃক বাড়ি, এলাকার সবাই আমাকে ভাল করেই চেনে। পতেঙ্গা থেকে কয়েকশো মাইল দূরে নিজের এলাকার বাইরে কোন রাজকাজে আপনি এখানে এসেছেন তাতেও আমার কোন আগ্রহ নেই। কোন কিছু না জেনে বাড়ির বাইরে এক পাও দিচ্ছি না আমি। কিন্তু মনে রাখবেন, আজকের পুরো ঘটনার দায়িত্ব নিতে হবে আপনাকেই। কারণ আমি খুব ভাল করেই জানি আমি নিরপরাধ।'

দুই পুলিস অফিসারকে একটু বিব্রত মনে হল, কিন্তু জাহিদের রাগ ইন্সপেক্টর শাহেদ রহমানকে স্পর্শ করতে পেরেছে বলে মনে হল না।

BanglaBook.org

রূপক-রুমকি তারস্বরে চিৎকার শুরু করেছে এই গোলমালে। জাহিদ ওদের দিকে চেয়ে মোনাকে বলল, 'ওদেরকে নিয়ে ওপরে চলে যাও।'

'কিন্তু...' মোনা ইতস্তত করতে লাগল।

'সবকিছু ঠিক আছে, মোনা, চিন্তা কোরো না। ওরা ভয় পাচ্ছে, ওদেরকে সরিয়ে নিয়ে যাও,' জাহিদ দৃঢ় স্বরে বলল।

মোনার দু'চোখে মিনতি ঝরে পড়ছে, যেন বলতে চাইছে কথা দিচ্ছ তো তুমি? এক পলক মাত্র, তারপর বাচ্চাদের নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চলে গেল ও।

'শরীফ খান হত্যা সম্পর্কে আপনাকে আমরা কিছু প্রশ্ন করতে চাই,' নীরবতা ভাঙল শাহেদ।

'কে?' শুনতে ভুল করেছে কি জাহিদ?

'আপনি কি বলতে চান তাঁকে আপনি চেনেন না?' তীক্ষ্ণ দৃষ্টি শাহেদের চোখে।

'অবশ্যই না! শরীফ চাচা! পতেঙ্গায় আমাদের বাড়ির পাশে থাকেন, সেই শরীফ খানের কথা বলছেন আপনারা! উনি খুন হয়েছেন? কি বলছেন আপনারা!' জাহিদের চোখে নির্ভেজাল বিস্ময়। কিন্তু কেউ কোন উত্তর না দেয়াতে নিচু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'কে এমন কাজ করল? কখন?'

'আমাদের হাতে অকাট্য প্রমাণ আছে ঘটনাটা আপনিই ঘটিয়েছেন, জাহিদ সাহেব,' অফিসারের কণ্ঠ বরফের মত শীতল, 'সেজন্যেই আমরা এখানে এসেছি।'

শূন্য চোখে চেয়ে রইল জাহিদ, বিড়বিড় করে উঠল, 'অসম্ভব! কি যা-তা বলছেন আপনারা!'

'আপনি কি পোশাক বদলে নিতে চান?' তৃতীয়জন এতক্ষণে কথা বলল।

'আমি আপনাদের সঙ্গে কোথাও যাচ্ছি না,' ঝড়ের বেগে চিন্তা চলছে জাহিদের মাথায়।

'আপনাকে আমাদের সঙ্গেই যেতে হবে, জাহিদ সাহেব,' শাহেদ পলকহীন চোখে চেয়ে আছে জাহিদের চোখে, 'এখন অথবা এক ঘণ্টা পরে।'

'তাহলে নাহয় এক ঘণ্টা অপেক্ষাই করি,' ব্যঙ্গের সুরে বলল জাহিদ। আশ্চর্য! শরীফ চাচা খুন হয়েছেন অথচ জাহিদকে খবরটা কেউ জানাল না! 'শরীফ চাচাকে কখন খুন করা হয়েছে?'

রূপক-রুমকিকে ওদের কটের ভেতর বসিয়ে রেখে মোনা সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছিল, প্রশ্নটা কানে যেতে ফুঁপিয়ে উঠল, 'শরীফ চাচা খুন হয়েছেন! হায় আল্লাহ্!'

ওদিকে নজর দিল না শাহেদ। 'আপনাকে তথ্য দেবার জন্যে আমাদেরকে পাঠানো হয়নি, জাহিদ সাহেব!'

কোণের টেবিলে রাখা টেলিফোনটার দিকে ছুটল মোনা, আঁচলে চোখ মুছছে, 'চাচী না জানি কি করছে! হায় আল্লাহ্! কি করে হল!'

BanglaBook.org

শাহেদ ওকে বাধা দিল, 'টেলিফোন পরেও করতে পারবেন, আপাতত জাহিদ সাহেবের দু'একটা দরকারি জিনিসপত্র গুছিয়ে দিন।'

বোকার মত কিছুক্ষণ চেয়ে রইল মোনা, তারপর ঝড়ের বেগে এগিয়ে এসে পর পর ওদের তিনজনের দিকে অগ্নিদৃষ্টি বর্ষণ করে চেঁচিয়ে উঠল অপ্রকৃতিস্থ গলায়, 'আপনাদের কি মাথা খারাপ হয়েছে! বাড়ি বয়ে এসে অপমান করছেন! কি করেছি আমরা? বেরিয়ে যান, এক্ষুণি বেরিয়ে যান আমার বাড়ি থেকে!' উত্তেজনায় কাঁপছে ও।

হাত বাড়িয়ে ওকে কাছে টেনে নিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করল জাহিদ। মোনা ওর কাঁধে মুখ লুকিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে। জাহিদ চোখ বুজে একটু ভাবল। তারপর মুখ তুলে বলল, 'ইন্সপেক্টর, শুনুন, আমি শরীফ চাচাকে হত্যা করিনি। কিন্তু আপনারা যদি ভেতরে এসে একটু বসেন, তাহলে হয়ত আমরা এ ব্যাপারে কথাবার্তা বলতে পারি। এভাবে সদর দরজায় দাঁড়িয়ে···'

'আপনি দয়া করে তৈরি হয়ে নিন, আমরা সারারাত দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না,' মনে হল শাহেদ ওর কথা শুনতেই পায়নি।

হাল ছেড়ে দিয়ে জাহিদ অন্য দু'জনের দিকে ঘুরে তাকাল, 'আপনারা কি ওনাকে একটু বোঝাতে পারেন না? উনি যদি শুধু খুনের সময়টা আমাকে জানান, তাহলে অনেক ঝামেলা থেকে বেঁচে যাই আমরা।' একটু চিন্তা করে জাহিদ যোগ করল, 'কোথায় খুনটা হয়েছে? ঢাকা বা সাভারে যদি হয়ে থাকে···কিন্তু ঢাকায় এলে শরীফ চাচা অবশ্যই আমাকে জানাতেন। আর আমি পতেঙ্গা থেকে ফিরেছি প্রায় মাসখানেক হয়ে গেল। এরমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ছেড়ে বাইরে কোথাও যাইনি আমি।'

ভদ্রলোক একটু চিন্তা করে বললেন, 'যদি কিছু মনে না করেন আমরা নিজেদের মধ্যে একটু আলাপ করে দেখি।'

অনিচ্ছুক শাহেদকে একরকম জোর করে টেনে নিয়ে দুই অফিসার রাস্তায় দাঁড়ানো নিজেদের জীপের কাছে চলে গেল। ওদের নিচু স্বরের কথাবার্তা এ পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে না। মোনা চোখ ভরা জল নিয়ে ব্যাকুল হয়ে একের পর এক প্রশ্ন করতে থাকল জাহিদকে। আলতো করে ওর ঠোঁটে চুমু খেয়ে থামিয়ে দিল ওকে জাহিদ, 'মোনা, কিচ্ছু চিন্তা কোরো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। যে অপরাধ করিনি, তার জন্যে কোন্ বিচারে ওরা আমাকে গ্রেপ্তার করবে? তুমি বরং বাচ্চাদের কাছে যাও, ওরা একা আছে।'

চোখ মুছতে মুছতে মোনা ওপরে চলে গেল। জাহিদ দরজা থেকে সরে এসে জানালায় দাঁড়াল। সন্ধ্যা নেমে আসছে। আবছা হলেও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ওরা তিনজন একইভাবে দাঁড়িয়ে কথাবার্তায় মগ্ন। অফিসার দু'জন ইন্সপেক্টর শাহেদকে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করছে, শাহেদ বিরক্ত হয়ে দু'দিকে মাথা নাড়ছে। আশ্চর্য! লোকটা কেন এত রেগে আছে? মনে হচ্ছে যেন ব্যক্তিগত আক্রোশ। পতেঙ্গা থানার ইন্সপেক্টর, নিশ্চয়ই শরীফ চাচার সঙ্গে পরিচয় ছিল। শুধু একারণেই জাহিদের উপর এত রাগ? কিন্তু কি এমন করেছে জাহিদ? জানালা

BanglaBook.org

থেকে সরে সোফায় এসে বসল জাহিদ পেছনে মাথা হেলিয়ে।

মোনা রূপক-রুমকিকে কোলে নিয়ে নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে। সামলে নিয়েছে নিজেকে। জিজ্ঞাসু চোখে চাইল, 'ওরা এতক্ষণ কি করছে?'

হাত বাড়িয়ে রূপককে ওর কাছ থেকে নিজের কোলে নিল জাহিদ। 'মনে হয় ইন্সপেক্টর শাহেদকে ওরা বোঝাবার চেষ্টা করছে যাতে আমাকে সবকিছু খুলে বলে।'

রুমকিকে নিয়ে ওর পাশে বসল মোনা। রুমকি দু'হাতে মায়ের খোলা চুল নিয়ে খেলছে মুখে নানা শব্দ তুলে। রূপক বোনের দেখা-দেখি মুখে একই রকম শব্দ তুলে ব্যস্ত হয়ে পড়ল জাহিদের ডান কানটা নিয়ে। বাচ্চা দুটো সবসময় একই রকম আচরণ করে। একজন হাসলে অন্যজন হাসে, কাঁদলে বাকি জন সুর মেলায়। যমজ বলেই কি?

'বিশ্বাসই হচ্ছে না শরীফ চাচার মত এমন ভালমানুষ পরোপকারী লোককে কেউ খুন করতে পারে,' মোনা ক্লান্ত গলায় বলল। 'মনে হচ্ছে যেন দুঃস্বপ্ন দেখছি।'

প্রায় দশ মিনিট পর ঘরে এল ওরা।

'ঠিক আছে,' ইন্সপেক্টর শাহেদের চোখমুখ লাল হয়ে আছে, 'আমার সহকর্মীদের অনুরোধে আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে রাজি হয়েছি।' থেমে একটু দম নিল সে, '২৭ মে, মানে গত পরশু রাত এগারোটা থেকে ভোর চারটে পর্যন্ত আপনি কোথায় ছিলেন?'

দ্রুত দৃষ্টি বিনিময় করল জাহিদ আর মোনা। হঠাৎ করে জাহিদের বুক থেকে কেউ যেন ভারী একটা পাথর সরিয়ে নিল। মোনার সুন্দর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'গত পরশু রাত, মানে বৃহস্পতিবার রাতেই তো, তাই না মোনা?' জাহিদের বিশ্বাস হতে চাইছে না, ভাগ্যদেবী ওকে এতটা দয়া করবেন।

'কোন সন্দেহ নেই, বৃহস্পতিবার রাতেই,' উজ্জ্বল চোখে সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ইন্সপেক্টরের সামনাসামনি দাঁড়াল মোনা।

শাহেদ বিব্রত হল, 'দেখুন, আমি জানতে চেয়েছি ওই সময়টায় উনি কোথায় ছিলেন,' মনেপ্রাণে আশা করছে জাহিদ বলবে সে সময়টায় ও শোবার ঘরে ঘুমোচ্ছিল, সেটাই তো স্বাভাবিক। তবে প্রমাণ করা কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে স্ত্রী ছাড়া অন্য কারও সাক্ষ্য না পেলে।

'বৃহস্পতিবার রাত! খোদা! কি যে ভয় পেয়েছিলাম!' বাচ্চা মেয়ের মত খুশি হয়ে উঠল মোনা।

একটু রেগে গেল এবার শাহেদ, 'দয়া করে প্রশ্নের উত্তর দেবেন কি?'

'আমাদের বাড়িতে সেরাতে একটা পার্টি ছিল। ঘর ভর্তি মেহমান ছিল, তাই না, জাহিদ?' চোখে জল মুখে হাসি নিয়ে জাহিদের দিকে ফিরল মোনা।

'ঠিক তাই, ইন্সপেক্টর,' তৃপ্তির সঙ্গে বলল জাহিদ।

BanglaBook.org

'ঠিক ওই রাতেই পার্টি! সেটাও একটা সন্দেহের কারণ হতে পারে,' সরু চোখে চেয়ে আছে শাহেদ, কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছে আগের আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরেছে।

'ভারি অদ্ভুত লোক তো আপনি!' ভয় দূর হয়ে যাচ্ছে মোনার চেহারা থেকে, স্বতঃস্ফূর্ত হাসিখুশি ভাবটা ফিরে এসেছে। ঘুরে তাকাল ও বাকি দু'জন অফিসারের দিকে, 'জাহিদের অ্যালিবাই থাকলেও কি আপনারা ওকে জেলে পুরে দেবেন নাকি? কেন?'

'মোনা, তুমি থাম। ওনারা শুধু কর্তব্য পালন করছেন। ইন্সপেক্টর-শাহেদ যদি একা আসতেন, তাহলে আমি ভাবতাম উনি আন্দাজে ঢিল মারছেন। কিন্তু উনি একা আসেননি, তারমানে সত্যিই কিছু একটা ঝামেলা বেধেছে,' জাহিদের কণ্ঠে শুধুই ব্যঙ্গ।

সাপের মত শীতল হয়ে এল শাহেদের দৃষ্টি, 'সেরাতের পার্টি সম্বন্ধে বলুন।'

ছোট্ট কাজের ছেলেটা এতক্ষণ কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে রান্নাঘরের দরজা থেকে উঁকিঝুঁকি মারছিল। মোনা ওকে ডাকল, 'পিচ্চি, ওপর থেকে বাবুদের খেলনা গাড়িটা নিয়ে এস তো।' বছর দশেকের ফুটফুটে ছেলেটা দৌড় লাগাল সিঁড়ির দিকে, উত্তেজনাকর ঘটনার কোন অংশই বাদ দিতে চায় না সে।

খুক খুক করে গলা পরিষ্কার করল জাহিদ, 'আমার সহকর্মী ডক্টর সিরাজুল ইসলাম আমেরিকা যাচ্ছেন এক বছরের জন্যে। সেজন্যেই বন্ধুবান্ধবদের দাওয়াত করেছিলাম।'

'মেহমানরা কতক্ষণ ছিলেন?'

'বাংলা সাহিত্যের শিক্ষক আমরা। একসঙ্গে বসলে সারারাত কাটিয়ে দিতে পারি। সেরাতে সবাই আসতে শুরু করে আটটার পর পর। পরদিন শুক্রবার, ছুটির দিন। তাই বেশ রাত পর্যন্তই গল্পগুজব চলেছে।' চোখ বুজে একটু ভাবল জাহিদ, তারপর মোনার দিকে তাকাল, 'আচ্ছা, কারা সবচেয়ে শেষে বেরিয়েছিল?'

'ওই যে কেমন যেন অদ্ভুত মত ভদ্রলোক…ভুঁইয়া সাহেব আর তাঁর স্ত্রী।' পিচ্চির এনে দেয়া খেলনা দিয়ে রূপক-রুমকিকে কার্পেটে বসিয়ে দিয়েছে মোনা। পিচ্চিও ওদের সঙ্গে খেলার ভান করে কান খাড়া করে রেখেছে এদিকে।

'হ্যাঁ, আবুল হাশেম ভুঁইয়া, আমার সহকর্মী, খুব ঘনিষ্ঠ না হলেও আমরা বন্ধু।'

'হুঁ। ঠিক ক'টায় ওনারা বের হন?'

উত্তরটা দিল মোনা, 'দেড়টার দিকে।'

'অত রাতে!' ভুরু কোঁচকাল শাহেদ।

'এমন কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয় সেটা,' মোনার কণ্ঠ শ্লেষ মাখা, 'এর চেয়েও বেশি রাতে দাওয়াত খেয়ে ফিরেছি আমরা বহুদিন। পরদিন শুক্রবার বলে কারোই বাড়ি যাবার তাড়া ছিল না। তাছাড়া সবাই আশেপাশেই থাকেন, পাঁচ মিনিটও হাঁটতে হয় না। সারারাত চৌকিদার পাহারা দেয়, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা খুবই নিরাপদ। তাই রাত জেগে আড্ডা মারতে কারোই আপত্তি থাকে না।'

BanglaBook.org

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। অফিসার দু'জন মুখ নিচু করে আছে, ইন্সপেক্টর শাহেদকেও একটু বিচলিত মনে হচ্ছে।

অবশেষে লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলল শাহেদ। 'হুঁ। ধরে নিচ্ছি আপনি সত্যি কথা বলছেন। তাতে কিছুই প্রমাণ হয় না। আপনার মেহমানদের সাথে কথা না বলে এ মুহূর্তে কিছুই বলা যাবে না।' এত সহজে ছেড়ে দিতে ইতস্তত করছে সে, তা উপস্থিত কারও অনুভব করতে অসুবিধা হচ্ছে না।

'এখন বলুন তো খুনটা হয়েছে কোথায়?' জাহিদ প্রশ্ন করল।

'পতেঙ্গায় লাশ পাওয়া গেছে গতকাল সকালে। খুনটা হয়েছে রাত এগারোটা থেকে চারটার মধ্যে কোন সময়।'

'ধরুন সব মেহমানরা চলে গেল, আর আমি সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে···অথবা যে-কোন যানবাহনেই হোক না কেন···চেপে বসলাম চিটাগাঙের উদ্দেশে। কিন্তু পৌঁছাতেই তো ভোর হয়ে যাবে, খুন করব কখন?'

শাহেদের সহকর্মীদের একজন নড়েচড়ে উঠল, বলল, 'তাছাড়া বার্মা ইস্টার্নের ওই মহিলা তো রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ···'

শাহেদ দ্রুত বাধা দিল, 'এখন সবকিছু আলোচনা করার দরকার নেই।'

দু'হাত শূন্যে তুলে বিরক্তির একটা ভঙ্গি করল মোনা। লোকটা কেন এমন করছে! স্বামীর দিকে ফিরে মোনা বলল, 'রাত একটা পর্যন্তও প্রচুর লোক ছিল বাড়িতে, তাই না, জাহিদ?' তারপর চকিতে ফিরল শাহেদের মুখোমুখি, 'ইন্সপেক্টর, কেন আপনি আমার স্বামীর পেছনে লেগেছেন? প্রথম থেকেই আপনি খারাপ ব্যবহার করে আসছেন। ব্যাপারটা কি?'

'দেখুন, ম্যাডাম···'

জাহিদ বাধা দিল, 'আপনি নিশ্চিত আমিই খুনটা করেছি, তাই না?'

'এখনও আপনার বিরুদ্ধে তেমন কোন অভিযোগ আনা হয়নি।'

'কিন্তু আপনি তো তা বিশ্বাস করেন।'

একটু ইতস্তত করল শাহেদ, তারপর বলল, 'হ্যাঁ। আপনি এবং আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার পরেও সেরকমই আমার বিশ্বাস।'

অবাক হল জাহিদ। কেমন করে লোকটা এত নিশ্চিত হচ্ছে? শিরদাঁড়া বেয়ে হঠাৎ করে শীতল একটা স্রোত উঠে এল। তারপর অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটল। প্রায় ত্রিশ বছর পর জাহিদ আবার শুনতে পেল লক্ষ লক্ষ পাখির পাখা ঝাপটানর শব্দ, কিচিরমিচির কাকলি। মনে হল যেন গত জন্মের কোন ঘটনা, কেমন যেন ভৌতিক, অপার্থিব সেই শব্দ।

মাথা নিচু করে ডান হাতে কপালের হালকা সাদাটে দাগটায় আঙুল বোলাল, আবার শিউরে উঠল।

মোনা ওর দিকে চেয়ে আছে, 'জাহিদ, অ্যাই, কি হল?'

'উঁ?' প্রশ্নবোধক চোখে চাইল জাহিদ।

'কি হল হঠাৎ? মুখটা কেমন শুকিয়ে গেছে!'

'না। ঠিক আছে সব। কিছু হয়নি,' শব্দটা আর শুনতে পাচ্ছে না জাহিদ, শুধু

BanglaBook.org

কেমন যেন ক্লান্ত লাগছে নিজেকে। শাহেদের দিকে ফিরল ও, 'ইন্সপেক্টর, আপনার ধারণা শরীফ চাচাকে আমি খুন করেছি। কিন্তু আমি জানি এটা সত্যি নয়। বইয়ের পৃষ্ঠায় ছাড়া কোনদিন কাউকে খুন করিনি আমি।'

'জাহিদ সাহেব…'

'আমি আপনার অবস্থাটা বুঝতে পারছি। শরীফ চাচাকে একবার যে দেখবে, সে কোনদিনই ভুলতে পারবে না। এমন ভালমানুষ হাসিখুশি লোকটার হত্যাকারী অবশ্যই আপনার ঘৃণার পাত্র। আমি, আমার স্ত্রী, আমরাও কম কষ্ট পাইনি। আমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব সবই করব আপনাদের কাজে সাহায্য করার জন্যে। কিন্তু দয়া করে চোর পুলিস খেলাটা বন্ধ করুন। সবকিছু খুলে বলুন।'

শাহেদ একদৃষ্টে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল ওর দিকে, তারপর আস্তে করে বলল, 'মনে হচ্ছে আপনি সত্যি কথাই বলছেন, জাহিদ সাহেব।'

'উঃ! এতক্ষণে একটা ভাল কথা শুনলাম,' নিঃশ্বাস ছাড়ল মোনা।

শাহেদ ওর দিকে তাকাল না, 'যদি প্রমাণ হয় আপনি সত্যি কথা বলছেন, তবে এ. এস. আর. আই. ডিপার্টমেন্টের বারোটা বাজিয়ে ছাড়ব আমি।'

'এ. এস. আর. আই., সেটা আবার কি?'

'আর্মড্ সার্ভিসেস রেকর্ডস অ্যাণ্ড আইডেনটিফিকেশন। আজ পর্যন্ত ওদেরকে ভুল করতে দেখিনি আমি। অবশ্য "প্রথমবার" বলে একটা কথা আছে সবখানেই।'

'সবকিছু খুলে বলা যায় না?'

'এতদূর এসেছি যখন, বলেই ফেলি,' জাহিদের মুখোমুখি সিঙ্গেল সোফায় বসল শাহেদ, সঙ্গীদেরও বসতে ইঙ্গিত করল। মোনা পিচ্চিকে চা বানাতে পাঠাল রান্নাঘরে, পিচ্চি পরনের দু'সাইজ বড় হাফ প্যান্টটা উপর দিকে টানতে টানতে প্রবল অনিচ্ছায় বেরিয়ে গেল। 'আপনাদের শেষ মেহমান কখন গেছেন সেটা আসলে খুব একটা জরুরি ব্যাপার নয়। মোটামুটি যদি প্রমাণ করতে পারেন যে রাত বারোটা পর্যন্ত বাসাতেই ছিলেন, তাহলেই…'

'রাত বারোটায় সকলেই ছিলেন, কম করেও দশ বারোজন,' মোনা দিল উত্তরটা।

'তাহলে বোধহয় আপনি বেঁচে গেলেন। একটু আগে আমার সহকর্মী বার্মা ইস্টার্নের যে মহিলার কথা বললেন, তাঁর সাক্ষ্য, আর পোস্ট মর্টেম রিপোর্টের ভিত্তিতে নিশ্চিত করেই বলা যায় শরীফ সাহেব খুন হয়েছেন রাত বারোটা থেকে তিনটার মধ্যে।' মাথা নিচু করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল শাহেদ। 'খুনী ধারাল কোন অস্ত্র দিয়ে ফালাফালা করে কেটেছে প্রতিটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। কিডনি, লিভার, হার্ট—সব পাওয়া গেছে শরীরের বাইরে চারদিকে ছড়ানো অবস্থায়।'

শিউরে উঠল মোনা, 'আর আপনি ভেবেছেন জাহিদ এমন কাজ করেছে!'

'সকালবেলাই যাত্রাবাড়ির কাছে শরীফ সাহেবের গাড়িটা পাওয়া যায়। গাড়ির সর্বত্র ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া গেছে, যার বেশিরভাগই শরীফ সাহেবের নিজের। তবে আর একজন লোকের বেশ কিছু স্পষ্ট ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া গেছে

BanglaBook.org

রিয়ার ভিউ মিররে, স্টিয়ারিঙে, দরজার হাতলে। সবচেয়ে ভাল স্পষ্ট ছাপটা পাওয়া গেছে ড্যাশবোর্ডের উপরে আটকে রাখা আধ খাওয়া একটা চিউইংগাম থেকে। মুখ থেকে বের করে বুড়ো আঙুল দিয়ে সেটাকে ড্যাশবোর্ডে সেঁটে দিয়েছে কেউ। পরে গামটা শক্ত হয়ে গেছে, ওই ছাপটা স্পষ্ট।'

'কিন্তু তাহলে জাহিদকে জড়াচ্ছেন কেন?' মোনা প্রশ্ন করে।

শাহেদ মোনার চোখের দিকে সরাসরি তাকাল, 'কারণ ফিঙ্গারপ্রিন্টগুলো আপনার স্বামীর সঙ্গে মিলে গেছে।'

মনে হল সময় থমকে গেছে। শূন্য দৃষ্টি নিয়ে পরস্পরের দিকে চেয়ে আছে জাহিদ আর মোনা। অবশেষে মোনার মুখেই কথা ফুটল, 'তাহলে নিশ্চয়ই আপনাদের ভুল হয়েছে। ভুল তো সবারই হয়, তাই না?'

'তা হয়। কিন্তু এরকম ভুল হয় না। এ. এস. আর. আই. ডিপার্টমেন্টে তো নয়ই।'

'কিন্তু জাহিদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট আপনারা কোথায় পেলেন?'

'শরীফ খান সাহেব সেদিন বিকেলে আপনাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন তদারক করতে, প্রতি বৃহস্পতিবারই নাকি যান। তখনই আমার জাহিদ সাহেবের কথা মনে হয়। আরও অনেকের ফিঙ্গারপ্রিন্টই পরীক্ষা করা হয়েছে, রুটিন মত। গত বছর আপনাদের বাড়িতে চুরি হয়। ওই ফাইলেই জাহিদ সাহেবের ফিঙ্গারপ্রিন্টের রেকর্ড পেলাম। কৌতূহলবশেই মিলিয়ে দেখতে গিয়েছিলাম, ভাবতেই পারিনি মিলে যাবে। তাছাড়া একটা দুটো নয়, সারা গাড়িতে অসংখ্য ছাপ পাওয়া গেছে। এ. এস. আর. আই.-এর ভুল হয়নি। আমি নিজেও লে-আউট দেখেছি। শুধু মিল হলে কথা ছিল, ছাপগুলো হুবহু এক।'

রূপক আর রুমকি নীরবতা ভেঙে একযোগে কাঁদতে শুরু করল, ওদের খিদে পেয়েছে।

ছয়

রাত দশটায় আবার যখন ডোরবেল বাজল, তখন মোনাই এগিয়ে গেল দরজা খুলতে। জাহিদ ওপরের স্টাডিতে। পিচ্চি খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, ভূমিকম্প হলেও এখন সে জাগবে না। মোনা নিচের বাথরুমে রূপক আর রুমকির গা মুছিয়ে রাতের শোবার পোশাক পরাচ্ছিল। শোবার আগে গা মুছিয়ে না দিলে রাতে গরমে ওদের ভাল ঘুম হয় না। গায়ে পাউডার ছিটিয়ে পাতলা মলমলের জামাগুলো পরাতে যেতেই বেলের শব্দ কানে এল। ওদের দু'জনকে সোফার সামনে দাঁড় করিয়ে দরজা খুলতে গেল মোনা।

পিপহোল দিয়ে-উঁকি দিতেই অবাক হয়ে গেল। ঘণ্টা চারেক হয়নি বিদায় হয়েছে, আবার কেন এসেছে ইন্সপেক্টর শাহেদ! দৌড়ে সিঁড়ির গোড়ায় এসে

BanglaBook.org

জাহিদের উদ্দেশ্যে চেঁচাল মোনা, 'জাহিদ, ইন্সপেক্টর সাহেব এসেছেন!'

জাহিদ কোন উত্তর দিল না। অপেক্ষা করতে করতে আবার ডাকার জন্যে মোনা মুখ খুলতেই জাহিদকে দেখা গেল। খালি পায়ে স্লিপিং সুট পরে আছে। নিচু, ভাঙা ভাঙা কণ্ঠে জানতে চাইল, 'কে?'

'ইন্সপেক্টর শাহেদ রহমান,' জাহিদকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে, মোনার ভয় ভয় করতে লাগল, 'জাহিদ, কি হয়েছে? শরীর খারাপ?'

'না না, ঠিক আছে। দরজাটা খুলে দাও, আমি আসছি।'

শাহেদ বাইরে থেকে মোনার গলা শুনেছে, তাই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছিল। গম্ভীর মুখে একরাশ বিরক্তি নিয়ে দরজা খুলল মোনা।

জাহিদ স্টাডিতে বসে বসে ঘামছে। কেন এত ভয় লাগছে! একদিনে পর পর এত কিছু ঘটে যাওয়াতেই ভয় হচ্ছে? প্রথমেই বিনা নোটিশে পুলিস এল, অদ্ভুত এক অভিযোগ নিয়ে। তার উপর শাহেদ রহমানের অস্বস্তিকর আচরণ। তারপরই জাহিদ শুনতে পেয়েছিল পাখির শব্দ। প্রথমে বুঝতেই পারছিল না কিসের শব্দ, কিন্তু কেমন যেন বড় পরিচিত মনে হচ্ছিল ওই অদ্ভুত শব্দ।

রাতের খাবার খেয়ে নিয়ে উপরে এলে শব্দটা আবার শুনতে পেয়েছিল জাহিদ।

নতুন একটা লেখায় হাত দিয়েছে সম্প্রতি। টাইপ রাইটারে সেই কাজই করছিল। একটা বানান ভুল হয়ে যেতে ঝুঁকে পড়ে ঠিক করতে গেলেই আবার শব্দটা ভেসে আসে।

চড়ুই পাখি!

হাজার হাজার কোটি কোটি চড়ুই পাখি! ঘরবাড়ির ছাদে, গাছের ডালে, ইলেকট্রিক তারে সার বেঁধে বসে আছে। কিচিরমিচির শব্দ উঠছে চারপাশ থেকে।

মাথার ব্যথাটা কি আবার ফিরে আসছে! ওহ্! খোদা! ভয়ে কুঁকড়ে গেল জাহিদ। টিউমার! টিউমারটা কি আবার গজিয়েছে? বড় হতে শুরু করেছে?

পাখিদের কিচিরমিচির ডাক আস্তে আস্তে বাড়তে থাকল, একসময় কানে তালা ধরিয়ে দিল। সঙ্গে যোগ হয়েছে পাখা ঝাপটানর শব্দ। জাহিদের মনে হল যেন ও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সার বেঁধে বসে থাকা পাখিগুলো একযোগে পাখা মেলেছে, ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে।

'উত্তর দিকে যেতে হবে, দোস্ত,' বিড়বিড় করে আওড়াল জাহিদ শব্দ ক'টা, কিন্তু এর অর্থ কি নিজেই জানে না।

এরপর হঠাৎ করেই সব শব্দ মিলিয়ে গেল। এটা ১৯৯২ সাল, ১৯৬০ নয়। স্টাডিতে বসে আছে জাহিদ। প্রাপ্ত বয়স্ক, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা আছে ওর, আর আছে একটা টাইপ রাইটার।

লম্বা করে শ্বাস নিল জাহিদ। না, মাথাব্যথা হয়নি। সবকিছু ঠিকই আছে। কিন্তু…

টাইপ রাইটারে আটকানো পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠার দিকে চোখ পড়তেই অবাক হয়ে গেল জাহিদ। একটা নতুন লাইন লেখা হয়েছে, কখন লিখেছে মনে পড়ল না

BanglaBook.org

ওর।

'পাখিরা আবার উড়ছে।'

কিন্তু শব্দগুলো টাইপ করা নয়, এইচ-বি পেন্সিলে লিখেছে ও, পেন্সিলটা পড়ে আছে টাইপ রাইটারের পাশে। আশ্চর্য! কখন লিখল ও! তাছাড়া পেন্সিল তো সে ব্যবহারই করে না! পেন্সিল নির্বাসনে দিয়েছে ওর মৃত অতীতের সঙ্গেই। কাঁপা কাঁপা হাতে পেন্সিলটা তুলে হোল্ডারে রেখে দিল জাহিদ।

ঠিক তখনি মোনা নিচ থেকে ডাকল। জাহিদের ইচ্ছে হল ওকে সবকিছু খুলে বলে। কিন্তু কি এক অজানা সঙ্কোচ ওকে চেপে ধরেছে। যদি টিউমারটা সত্যিই গজিয়ে থাকে, মোনা খবরটা কিভাবে নেবে? ভয়টা কিছুতেই দূর হচ্ছে না। ব্যাপারটা কি হল? হঠাৎ করে কেন পুরানো স্মৃতি মনে পড়ে গেল এত বছর পর! আর কাগজের লেখা কথাটার মানেই বা কি?

হাত দুটো চোখের সামনে ধরল জাহিদ। থরথর করে কাঁপছে এখনও।

ঠিক পাঁচ মিনিট পর নিচে নামল জাহিদ। কেন ফিরে এসেছে আবার শাহেদ রহমান? 'কি ব্যাপার, ইন্সপেক্টর?' কণ্ঠে শুধুই কাঠিন্য।

উত্তরে ইন্সপেক্টর শাহেদ রহমান সিগারেটের খোলা প্যাকেট বাড়িয়ে ধরল, 'জাহিদ সাহেব, যদি কিছু মনে না করেন আমি আপনাদের দু'জনের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।'

'ধন্যবাদ, ইন্সপেক্টর। আমি সিগারেট খাই না। ভেতরে আসুন।'

টেলিভিশনে কি একটা ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। ভল্যুম কমিয়ে দিয়ে জাহিদ সোফায় বসল, মুখোমুখি বসেছে ইন্সপেক্টর। মোনা বাচ্চাদেরকে শুইয়ে দেবার জন্যে ওপরের শোবার ঘরে চলে গেল, দু'জনেই চুপচাপ কিছুক্ষণ টেলিভিশনের দিকে চেয়ে রইল।

বাচ্চাদেরকে শুইয়ে দিয়ে মোনা নেমে এল। জাহিদের পাশে বসে পড়ল সোফায়।

শাহেদ নীরবতা ভাঙল, 'জাহিদ সাহেব, আপনি এখন একটা নয়, দুটো খুনের সাসপেক্ট।'

আঁৎকে উঠল মোনা, 'কী!'

'আমি সবই বলব। বলার জন্যেই এসেছি। জানি দ্বিতীয় খুনের জন্যেও আপনার স্বামীর অ্যালিবাই আছে, না থেকেই পারে না।'

'কে খুন হয়েছে?' জাহিদের কণ্ঠ বরফের মত শীতল।

'আমিন ইকবাল নামের এক সাংবাদিক। ঢাকায়, গোপীবাগে ভদ্রলোকের নিজের ফ্ল্যাটে লাশ পাওয়া গেছে।' মোনা থরথর করে কেঁপে উঠল। মৃদু হেসে শাহেদ বলল, 'মনে হচ্ছে ভদ্রলোক আপনাদের পরিচিত!'

'কি হচ্ছে এসব!' ফিসফিস করে বলে উঠল মোনা।

'কেমন করে বলব, মিসেস হাসান, ভাবতে গিয়ে তো আমার মাথাও খারাপ হবার জোগাড় হয়েছে। আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করতে আসিনি, জাহিদ সাহেব। আমি এসেছি আপনাদের কাছে সাহায্য চাইতে।'

BanglaBook.org

দীর্ঘশ্বাস ফেলল জাহিদ। 'এবারও কি আমিন ইকবালের মৃতদেহের আশেপাশে আমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া গেছে?'

'ঠিক তাই। অসংখ্য। আচ্ছা, গত সপ্তাহে "শনিবার"-এ আপনার উপর একটা লেখা বেরিয়েছিল, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'পত্রিকার ওই সংখ্যাটা আমিন ইকবালের ঘরে পাওয়া গেছে, একটা পৃষ্ঠা মৃতদেহের বুকে বোর্ড-পিন দিয়ে আটকানো ছিল।'

'খোদা!' দু'হাতে মুখ ঢাকল মোনা।

'আমিন ইকবালের সঙ্গে আপনাদের কি সম্পর্ক বলতে আপত্তি আছে কি?'

'মোটেই না।' নড়েচড়ে বসল জাহিদ, চোখ থেকে চশমাটা খুলে নিয়ে অকারণেই কাঁচটা মুছতে লাগল। 'লেখাটা পড়েছেন?'

'আমার স্ত্রী রুস্তম শেরের ভক্ত, ওই পত্রিকাটা কিনে এনেছিল। তবে সত্যি বলতে কি আমি লেখাটা পড়িনি, ছবিগুলো দেখেছি। তবে খুব তাড়াতাড়িই পড়ার ইচ্ছে আছে।'

'পড়ার দরকার নেই। তবে লেখাটা ছাপা হবার পেছনে আমিন ইকবালের অবদান আছে।'

'আচ্ছা, ও বিষয়ে পরে আসছি। শরীফ খান থেকে শুরু করি। ওনার গাড়িতে যেসব ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া গেছে, আর আমিন ইকবালের ফ্ল্যাটে যেসব ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া গেছে, তা হুবহু এক। অর্থাৎ একই লোকের কাজ। দুটো খুনের পদ্ধতিও সেটাই প্রমাণ করে। ছাপগুলো যদি আপনার না হয়, তবে এই ঘটনা নিঃসন্দেহে গিনেস বুক অভ ওয়ার্লড রেকর্ডস-এ স্থান পাবে।'

'জানি, পৃথিবীর প্রতিটা মানুষের ফিঙ্গারপ্রিন্ট ভিন্ন। একজনের সঙ্গে অন্য একজনের ছাপের মিল হয় না।'

'আচ্ছা, আপনার বাচ্চা দুটো তো যমজ, তাই না?'

খাপছাড়া প্রশ্নে একটু অবাক হল জাহিদ। 'হ্যাঁ।'

'ওরা কি আইডেন্টিকাল টুইন্‌স্?'

এবার মোনা উত্তর দিল, 'ছেলে-মেয়ের জোড়া কখনও আইডেন্টিক্যাল হয় না। শুধু ছেলে বা মেয়ে হলেই সেটা হতে পারে। তবে রূপক আর রুমকি দেখতেও একই রকম।'

মাথা নাড়ল শাহেদ। 'আইডেন্টিকাল টুইন্‌সের ফিঙ্গারপ্রিন্টও কখনও আইডেন্টিকাল হয় না।' একটু থেমে হঠাৎ সরাসরি চাইল জাহিদের দিকে, 'আপনার কি কোন যমজ ভাই আছে, জাহিদ সাহেব?'

এ প্রশ্নটাই আশা করছিল জাহিদ। দু'দিকে মাথা নেড়ে বলল, 'না। যমজ ভাই কেন, আমার কোন ভাই-বোনই নেই। বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান আমি। সত্যি বলতে কি রূপক আর রুমকি ছাড়া পৃথিবীতে আমার রক্তসম্পর্কের আত্মীয় কেউ নেই। যে ক'জন ছিলেন, সবাই মারা গেছেন।' একটু থেমে যোগ করল, 'ভাবছেন এত বয়স্ক লোকের অতটুকু ছেলেমেয়ে কেন, তাই না? বিয়ের পরপরই

BanglaBook.org

ডক্টরেট করার জন্যে আমি ইংল্যাণ্ডে যাই, মোনাও সঙ্গে যায়। পাঁচ বছর পর ফিরে আসি। তারপর থেকেই সন্তানের আশায় দিন গুনেছি আমরা। অবশেষে এতদিন পরে হল। নতুন বাবা-মা হিসেবে আমরা একটু বুড়োই, কিন্তু কি আর করা যাবে!' কাঁধ ঝাঁকিয়ে একটু হাসার চেষ্টা করল জাহিদ। 'ওরা জন্মাবার পরেই আমি আবার নিজের নামে লেখায় হাত দিয়েছি।'

'ছদ্মনামটা তো রুস্তম শের, তাই না?'

'হ্যাঁ।' একটু বিষণ্ন দেখাল জাহিদকে। 'তবে ওই পর্ব শেষ হয়ে গেছে। বাবা হবার পর আবার নতুন জীবন শুরু করেছি আমি।'

কিছুক্ষণের জন্য নিশ্ছিদ্র নীরবতা নেমে এল ঘরে। হঠাৎ জাহিদ বলে উঠল, 'স্বীকার করুন, ইন্সপেক্টর।'

ভুরু কুঁচকে চাইল শাহেদ, 'মাফ করবেন, কি বললেন?'

হাসল জাহিদ। 'আমি বাজি ধরে বলতে পারি আপনি কি ভাবছেন। আপনি ভাবছেন আমার এক যমজ ভাই আছে, যে দেখতে হুবহু আমার মত। তাকে লোকজনের সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে আমি চিটাগাঙ গিয়ে শরীফ চাচাকে খুন করে এসেছি। তারপর তাঁর গাড়িতে চেপে ঢাকায় পৌঁছেছি, গাড়ির সর্বত্র হাতের ছাপ রেখে দিয়েছি আপনাদের জন্যে। তারপর গোপীবাগে গিয়ে আমিন ইকবালকেও খুন করলাম, হাতের ছাপ রেখে এলাম সেখানেও। এরপর বাড়ি ফিরে ভালমানুষ সেজে বসে আছি, যমজ ভাইকে লুকিয়ে রেখেছি কোথাও। দাওয়াতের মেহমানরা এবং আমার ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীরা আমাকে দেখেনি, দেখেছে আমার যমজ ভাইকে, তাই না?'

অবাক হয়ে চেয়ে রইল ওর দিকে শাহেদ, একবারও বাধা দিল না।

'জাহিদ, কি বলছ এসব!' চেতনা ফিরে আসতে রাগত কণ্ঠে ওকে মৃদু ভর্ৎসনা করল মোনা।

'সরি, মোনা। কিন্তু আমাদের ইন্সপেক্টর ঠিক এমনটাই ভাবছেন।'

'খুব একটা মিথ্যে বলেননি,' শাহেদ বিস্মিত কণ্ঠে বলল। 'তবে আপনার কল্পনাশক্তি চমৎকার। রুস্তম শেরের নামে গোয়েন্দা কাহিনীগুলো আপনারই লেখা তা বিশ্বাস করতে এখন আর কষ্ট হচ্ছে না।'

'আপনি রুস্তম শেরের ভক্ত নন, তাই না?'

'ঠিকই ধরেছেন। তবে আমার স্ত্রী রুস্তম শেরের নামে পাগল। ওর কাছ থেকেই ভাবছি লেখাগুলো সম্পর্কে কিছু তথ্য জেনে নেব।'

'ইন্সপেক্টর সাহেব, আমার জন্ম পতেঙ্গা মাতৃসদনে। ছেলেবেলাটা কেটেছে পতেঙ্গাতেই। একটু খোঁজখবর করলেই সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন। আমার কথা বিশ্বাস করার কোন প্রয়োজন নেই।'

'আপনার মেহমানদের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি। তাঁরা সবাই আপনাদের স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন।'

'মিথ্যে কথা বলার তো কোন কারণ নেই, সবাই শিক্ষিত মান্যগণ্য লোক,' ফোড়ন কাটল মোনা।

BanglaBook.org

‘আর যেহেতু আপনার যমজ কোন ভাই নেই, সেহেতু আপনাকে আর ঝামেলায় জড়ানো হবে না।’

‘তাহলে ফিঙ্গারপ্রিন্টের রহস্যের সমাধান হবে কেমন করে?’ জাহিদ প্রশ্ন করল। ‘যদি আমি এত প্ল্যান করে যমজ ভাইকে প্ল্যান্ট করে একের পর এক খুনখারাবি করার মত বুদ্ধি রাখি, তাহলে ফিঙ্গারপ্রিন্ট ছেড়ে আসার মত বোকামি করব কেন? আমাকে দেখে খুব বোকা মনে হয়?’

‘মোটেই না। আপনি দেশের গৌরব। তাছাড়া এতদিন পুলিসে চাকরি করছি, মানুষ চেনার ক্ষমতাটা আমাকে অর্জন করতে হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি আপনি মিথ্যে কথা বলছেন না। মিথ্যে কথা বলা বড় কঠিন, সবাই পারে না।’

‘কিন্তু ফিঙ্গারপ্রিন্টের ব্যাপারটাই আমাকে বেশি ভাবিয়ে তুলেছে। আপনি যেভাবে বলছেন, তাতে মনে হচ্ছে ছাপগুলো ইচ্ছেকৃত ভাবে এমন জায়গায় ফেলা হয়েছে যাতে সহজেই আপনাদের চোখে পড়ে।’

‘আমরাও ব্যাপারটা নিয়ে ভেবেছি।’

‘ফিঙ্গারপ্রিন্ট কি নকল করা যায়?’

‘না। অনেকে চেষ্টা করেছে, কিন্তু সফল হতে পারেনি। আমেরিকায় একটা কিডন্যাপিঙের কেসে এরকম একটা চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু কাজ হয়নি।’

মোনা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, ‘ইন্সপেক্টর সাহেব, আপনাকে খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে। খাওয়া-দাওয়া করেছেন তো?’

শব্দ করে হেসে উঠল শাহেদ, ‘মেয়েদের চোখ বড় সাংঘাতিক। খাওয়ার সময় আর পেলাম কই! এখান থেকে থানায় পৌঁছেই আমি ইকবালের খবরটা পেলাম। খুন হবার আধ ঘণ্টার মধ্যেই পুলিস খবর পায়, সাভারে খবরটা দেয়া হয় সঙ্গে সঙ্গে। আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি, তা ওরা জানত। এই খুনটার সঙ্গেও যে আপনার সম্পর্ক আছে, তা বুঝতে বুদ্ধির দরকার হয় না। আমিনের বুকে গাঁথা পত্রিকার ছবিটাই তা বলে দেয়। খবরটা পাবার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকায় ঘটনাস্থলে চলে যাই, রাস্তায় পাঁচ মিনিট থেমে ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্পেশালিস্টকে তুলে নিই। ওখান থেকেই সরাসরি আসছি।’

ত্বরিতে উঠে দাঁড়াল মোনা, ‘ভাত বোধহয় আর নেই। একটু রান্না করব? নাকি ক’টা স্যাণ্ডউইচ বানিয়ে দেব?’

বিব্রত হল শাহেদ, ‘না না, এত রাতে রান্না করার ঝামেলা করবেন না। একটু বিস্কুট-টিস্কুট হলেই চলবে।’ মোনা উঠে দাঁড়াতে কৃতজ্ঞ চোখে তাকাল, ‘ধন্যবাদ, ভাবী।’

সম্বোধনটা কানে লাগল। ঘুরে দাঁড়িয়ে একটু হেসে মোনা রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

পকেট থেকে একটা ছোট নোটবুক বের করে খুলল শাহেদ, ‘আপনি কি সিগারেট খান?’

‘না। প্রায় আট বছর হয়ে গেল ছেড়েছি।’

‘কোন্ ব্র্যাণ্ড খেতেন? ফাইভ ফিফটি ফাইভ?’

BanglaBook.org

অবাক হল জাহিদ, 'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি কিভাবে জানলেন?'

উত্তর না দিয়ে আবার প্রশ্ন করল শাহেদ, 'আপনার রক্তের গ্রুপ এ-নেগেটিভ?'

'এখন বুঝতে পারছি বিকেলে কেন আমাকে গ্রেপ্তার করতে এসেছিলেন। শক্ত অ্যালিবাই না থাকলে এতক্ষণে আমি হাজতে থাকতাম, তাই না?'

'ঠিক ধরেছেন। শরীফ খানের গাড়িতে ফাইভ ফিফটি ফাইভের আধপোড়া টুকরো পাওয়া গেছে, আমিনের ফ্ল্যাটেও। দু'জনের একজনও সিগারেট খেতেন না। শরীফ খানের গাড়িতে পাওয়া টুকরোগুলোর গোড়ার থুথু থেকে পুলিসের সেরোলজিস্ট ব্লাড টাইপ নির্ণয় করেছে। এ-নেগেটিভ। আমিনের ফ্ল্যাটেরগুলো পরীক্ষার জন্যে পাঠানো হয়েছে, এখনও রিপোর্ট আসেনি। তবে আমি নিশ্চিত ওটাও এ-নেগেটিভই হবে।'

'আশ্চর্য! আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না!' সোফায় এলিয়ে পড়ল জাহিদ।

'তবে একটা জিনিস মিলছে না। লালচে চুল। শরীফ খানের গাড়িতে বেশ কিছু লম্বা লালচে রঙের চুল পাওয়া গেছে, হঠাৎ করে দেখে মনে হয় অবাঙালী কারও চুল। এই চুল দেখে এলাম আমিন ইকবালের ফ্ল্যাটে সোফার কাভারে, যেখানে খুনী বসেছিল। আপনার চুল কুচকুচে কালো, ছোট করে ছাঁটা। আমার মনে হয় না আপনি পরচুলা পরেছেন।'

'না, কোন বোকাও এগুলোকে পরচুলা বলে ভুল করবে না,' হেসে উঠে টাক হবো হবো মাথায় হাত বুলাল জাহিদ। 'তবে খুনী হয়ত পরচুলা ব্যবহার করছে। পত্রিকায় ঘন ঘন ছবি ছাপার ফলে অনেকেই রাস্তায় আমাকে চিনে ফেলে আজকাল।'

'হ্যাঁ, তা হতে পারে। তবে চেহারা যদি আপনার মতই হয়, তবে পরচুলা পরলেও লোকে চিনতে পারে। পারে না?'

'তা পারবে, একটু লক্ষ করলেই পারবে।'

'তবে মিসেস আমান, বার্মা ইস্টার্নের কোয়ার্টারের একজন ভদ্রমহিলা যাকে শরীফ খানের গাড়িতে লিফট নিতে দেখেছিলেন, খুনী যদি সেই লোক হয়, তবে আপনার সঙ্গে তার আপাত দৃষ্টিতে কোন বাহ্যিক মিল নেই। তবে মিসেস আমানও খুব বেশি কিছু বলতে পারেননি। শুধু বলেছেন লোকটা ছিল খুব লম্বা, ছ'ফুটের মত, আর পরনে ছিল কালচে রঙের সুট।'

পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি লম্বা দেহটাকে নিয়ে জীবনে প্রথমবারের মত স্বস্তি পেল জাহিদ। 'ভদ্রমহিলার ভুলও হতে পারে। কৃত্রিম উপায়ে উচ্চতা বাড়ানো কঠিন কিছু নয়।'

দু'দিকে মাথা নাড়ল শাহেদ। 'তা নয়। ভদ্রমহিলা আপনাকে চেনেন, মানে সামনাসামনি দেখেছেন আগে। আপনার সঙ্গে ওই লোকের চেহারার কোন মিলই নেই। লোকটা অস্বাভাবিক লম্বা, তেমনি চওড়া। মানে মোটা নয়, কিন্তু বিরাট কাঁধ। দস্তুর মত চোখে পড়ার মত ফিগার। আপনি শত ছদ্মবেশ নিলেও ওরকম হতে পারবেন না। তবে এই লোকটাই খুনী কিনা, তা এখনও জানি না আমরা।'

BanglaBook.org

একটু চিন্তা করে শাহেদ জানতে চাইল, 'আচ্ছা, আপনার জুতোর মাপ কত?'

মোনা এসময় ট্রেতে স্যাণ্ডউইচ আর চায়ের তিনটে কাপ সাজিয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল। কফি টেবিলে রাখতেই জাহিদ চায়ের কাপ তুলে নিল। শাহেদ স্যাণ্ডউইচের প্লেটটা হাতে নিয়ে নোটবুকটা পাশে রেখে দিল। মোনাও চায়ের কাপ তুলে নিয়ে জাহিদের পাশে বসল।

'সাত,' চায়ে চুমুক দিল জাহিদ।

'আমাদের রিপোর্টে বিরাট জুতোর সাইজের কথা উল্লেখ আছে। তবে সেটা এই লোকের কিনা প্রমাণ করার উপায় নেই। এমনকি কোন ছবিও তুলে রাখা হয়নি। যে দেখেছে তার কথামত এগারো কি বারো সাইজের জুতো।'

'কোথায় পেয়েছেন এই জুতোর ছাপ?'

'বাদ দিন। ওটা জরুরি কিছু নয়। মনেও হয় না এই কেসের সঙ্গে কোন যোগ আছে। ছাপগুলো নকল হওয়াও খুব স্বাভাবিক। ছয় সাইজের যে-কোন লোক বারো সাইজের জুতো পরে কাদার উপর হেঁটে ছাপ ফেলতে পারে। তাতে কিছুই প্রমাণ হয় না। তবে ব্লাড টাইপ, ফিঙ্গারপ্রিন্ট, সিগারেটের ব্র্যাণ্ড সবই আপনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।'

'ও তো সিগারেট খায় না...' বাধা দিল মোনা।

'যে ব্র্যাণ্ড আগে খেতেন, সেটা। আপনি ঝামেলায় পড়ে গেছেন, জাহিদ সাহেব। আইনত আপনি পতেঙ্গারও বাসিন্দা, যেহেতু ওই এলাকাতেও ট্যাক্স দেন। তাই আপনার প্রতি নজর রাখার অধিকার আমার রয়েছে, যেহেতু আমি পতেঙ্গা থানার ইন্সপেক্টর। কিন্তু সবচেয়ে বড় অদ্ভুত ব্যাপারটা কি, জানেন? আমিন ইকবাল যখন খুন হয়, তখন আপনি আমাদের সামনে বসে, শুধু আমি নই, আরও দু'জন পুলিস অফিসারও ছিলেন। কিন্তু আপনি যদি এখানে বসে থাকেন, তাহলে আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্ট গোপীবাগে গেল কেমন করে?'

কেউ কোন উত্তর দিল না। জাহিদ আর মোনা নীরবে চায়ের কাপে ছোট ছোট চুমুক দিচ্ছে।

স্যাণ্ডউইচ শেষ করে চায়ের কাপটা তুলে নিল শাহেদ, 'এবার আমিন ইকবালের ব্যাপারটা খুলে বলুন তো!'

জাহিদ মোনার দিকে তাকাল, 'তুমিই না হয় বল।'

চায়ের শূন্য কাপটা টেবিলে রেখে উঠে গিয়ে টিভিটা বন্ধ করে দিল মোনা। কোথা থেকে শুরু করবে ভাবতে গিয়ে একটু সময় নিল। তারপর বলতে শুরু করল। প্রথমদিকে শাহেদ দু'একবার থামিয়ে দু'একটা প্রশ্ন করল। বাকি সময়টা চুপচাপ শুনে গেল, দরকার মত নোটবুকে টুকে নিচ্ছে।

'আমিন ইকবাল বাজে লোক ছিল। মানে আমি বলতে চাচ্ছি না যে ও খুন হওয়াতে আমি খুশি হয়েছি, কিন্তু সত্যিই বড় পাজি লোক ছিল। কিছুদিনের জন্যে আমাদের জীবনে অশান্তির ঝড় তুলেছিল লোকটা। কিভাবে জানি না, ও জেনে যায় জাহিদই আসলে রুস্তম শের। রশিদ ভাইয়ের ধারণা ওনার প্রেসের কোন

BanglaBook.org

কর্মচারীই ঘটনাটা ফাঁস করে দেয়। কিন্তু সেই লোকই বা কিভাবে জানল সেটাও এক রহস্য।'

'রশিদ ভাই…ইনি কে?' শাহেদ নোটবুকে পয়েন্ট টুকছে।

'"হীরক পাবলিশার্স"-এর মালিক। রুস্তম শেরের সব ক'টা বইয়ের প্রকাশক। ওনাদের…মানে উনি আর ওনার স্ত্রী—প্রাক্তন স্ত্রী, বছর দুয়েক আগে ডিভোর্স হয়েছে—হাসনা আপার সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত পরিচয় আছে। হাসনা আপা আমার বড় বোনের ছেলেবেলার বান্ধবী।'

'আচ্ছা, আপনার পরিবারের সবাই কে কোথায় আছে?'

'বাবা বছর পাঁচেক আগে ইন্তেকাল করেছেন। মা যশোরে আমাদের বাড়িতেই থাকেন। বড় বোনের শ্বশুরবাড়ি ওখানেই, কাছাকাছি। বড় বোনই মায়ের দেখাশোনা করে। একমাত্র ভাই আমেরিকায় থাকে। দু'বছর পর পর আসে। ব্যস্, আর কেউ নেই। মামা-চাচা আছেন, সব যশোরে।' এ পর্যন্ত বলে মোনা জাহিদের দিকে তাকাল, 'অ্যাই, অনেকক্ষণ ওপরে যাওয়া হয়নি। ওদেরকে একটু দেখে আসবে?'

জাহিদ উঠে দাঁড়াল। অনেকক্ষণ বসে থেকে পায়ে ঝিঁঝি লেগেছে। বোধশক্তি ফিরে পেতেই ওপরে রওনা দিল।

কানে এল শাহেদ জিজ্ঞেস করছে, 'তারপর? আমিন ইকবাল কি করল তথ্যটা জানার পর?'

'ব্ল্যাকমেইল,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল মোনা।

'কি চেয়েছিল সে?'

'টাকা। এক লাখ টাকা।'

শাহেদ হেসে উঠল, 'মাত্র এক লাখ? আরে, ব্যাটা, চাইবি যখন তখন নজর একটু উঁচু কর!'

মোনাও হেসে উঠল, 'টাকাটা বড় কথা নয়। ব্ল্যাকমেইলের ভিকটিম হওয়ার আঘাতটাই বড়। জাহিদ খুবই আপসেট হয়ে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে আমিও।'

জাহিদ দোতলায় এসে শোবার ঘরে ঢুকল। কটের ভেতর বাচ্চারা নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে। খালি দুধের বোতল দুটো তুলে নিল ওদের শিথিল হাত থেকে। তারপর নিচে নেমে রান্নাঘরে ঢুকে বোতল দুটো ধুয়ে রাখল। তারপর বাথরুমে গেল, অনেকক্ষণ যাওয়া হয়নি। মোনা আর শাহেদের অস্পষ্ট কথাবার্তা কানে আসছে।

'রশিদ ভাইয়ের কথা বললেন, ওনার পুরো নাম কি?'

'রশিদ তালুকদার। প্রেসের অর্ধেক মালিকানা হাসনা আপার। ডিভোর্স হয়ে গেলেও ওনাদের সম্পর্ক খুবই ভাল। তা না হলে দিনের বেশিরভাগ সময় অফিসে একসঙ্গে কাটাতে পারতেন না। সম্ভবত ব্যবসার কারণেই তা সম্ভব হয়েছে। দু'জনের সঙ্গেই আমাদের বন্ধুত্ব আছে। জাহিদ যখন রুস্তম শের নামে লিখতে শুরু করে, তখন রশিদ ভাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করেই করেছিল। ওনাকে অবিশ্বাস করারও কোন কারণ নেই। তাছাড়া বইগুলো প্রচুর লাভ করে। উনি আর হাসনা আপা ছাড়া কেউই এতদিন রুস্তম শেরের আসল পরিচয় জানত না।

BanglaBook.org

'আমিন ইকবাল ছিল রুস্তম শেরের অন্ধ ভক্ত। "রুস্তম শের ফ্যান ক্লাবের" প্রতিষ্ঠাতাও সে-ই। ও-ই সম্ভবত একমাত্র লোক যে রুস্তম শের এবং জাহিদ হাসানের লেখা সব ক'টা বই পড়েছে। তারপর কোনভাবে সন্দেহ করে দু'জনের যোগসূত্র।

'জাহিদ প্রথমে ওকে পাত্তাই দেয়নি, কারণ তখন পর্যন্ত আমিন ইকবালের হাতে কোন প্রমাণ ছিল না। মরিয়া হয়ে আমিন ইকবাল রশিদ ভাই আর হাসনা আপাকে জ্বালাতন করতে শুরু করে। ওনারাও ব্যাপারটার কোন গুরুত্ব দেননি, অফিস থেকে আমিনকে রীতিমত অপমান করে বের করে দেন।

'রশিদ ভাইয়ের পরামর্শে প্রতিটা বইয়ের পিছনে রুস্তম শেরের বানানো লেখক পরিচিতি সহ ছবি ছাপা হয়েছে। আমরাও ঠিক জানি না সে লোক কে। আমিন ইকবাল রশিদ ভাইয়ের কাছে ওই লোকের ঠিকানা দাবি করে।'

জাহিদ এসময় ধীর পায়ে এক গ্লাস পানি হাতে এসে বসল। মোনা দু'পা তুলে সোফায় আরাম করে বসেছে।

'রশিদ ভাই সেবারও লোক ডাকিয়ে তাকে বের করে দেন।'

'ঠিক কবে এসব ঘটনা ঘটে?' শাহেদ প্রশ্ন করল।

'তারিখ বলতে পারব না, সাত/আট মাস তো হবেই।'

'আমিন ইকবাল কি আপনাদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করত?'

'না। চিঠিতে। জাহিদের ডিপার্টমেন্টের ঠিকানায় চিঠি লিখত সে।'

'হুঁ। তারপর কি হল?'

'রশিদ ভাইয়ের ধারণা তাঁর প্রেসের কোন কর্মচারী আমিন ইকবালকে সাহায্য করেছে, হয়ত টাকা পয়সার বিনিময়ে। কারণ এর পরপরই "হীরক পাবলিশার্সের" সঙ্গে রুস্তম শেরের সই করা চুক্তিপত্র আর রুস্তম শেরের নামে ইস্যু করা একটা রয়্যালটি চেকের ফটোকপির সঙ্গে লেখা আমিন ইকবালের চিঠি পায় জাহিদ। চুক্তিপত্রে রুস্তম শেরের ঠিকানা খুলনার এক আবাসিক এলাকায়, তবে রয়্যালটি চেক পাঠাবার ঠিকানা ঢাকার জি. পি. ও-র একটা বক্স নাম্বার। চিঠিতে আমিন ইকবাল লেখে যে খুলনার ঠিকানাটার কোন অস্তিত্বই নেই, বাস্তবেও নেই। ওটাও ছবির মত আজগুবি। জাহিদ তখনও ভয় পেল না, কারণ প্রমাণ হিসেবে ফটোকপি দুটোর কোন মূল্য নেই।'

'পুলিসের কাছে গেলেন না কেন?'

'গিয়ে লাভ হত না। আমিন ইকবালকে আমরা দু'জন চোখে দেখিনি, চিঠিই পেয়েছি শুধু। চিঠিগুলোও লেখা হয়েছে খুব কায়দা করে, কোন ভয় দেখায়নি সে। জানেন তো নাইটে ল' পড়ে। সবচেয়ে বড় কথা, ব্যাপারটা জানাজানি হোক তা জাহিদ চায়নি তখনও পর্যন্ত। এদিকে আমিন ইকবাল ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগল। এর পরের রয়্যালটি চেক নেবার সময় এসে গেল। আমিন ইকবাল জি. পি. ও-র সামনে অপেক্ষা করতে থাকে পর পর কয়েকদিন। জাহিদ চিন্তাও করেনি সে এতটা মরিয়া হয়ে উঠেছে। ওর চেহারাও চিনত না। তাই জাহিদ যেদিন চেকটা নিতে গেল, সেদিন ওকে অনুসরণ করা আমিনের পক্ষে হল

BanglaBook.org

পানির মত সহজ কাজ। জাহিদও কিছু সন্দেহ করেনি, ও তো এমনিতেই আত্মভোলা টাইপের। পর পর কয়েকটা ছবি তোলে সে। সম্ভবত ক্যামেরাতে জুম ফিট করা ছিল। একটা ছবিতে দেখা যাচ্ছে জাহিদ ২১১ নং বক্সটা খুলছে, পরিষ্কার পড়া যাচ্ছে নাম্বারটা। আমিন ইকবালের কথা যখন আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি, তখনই ছবিগুলো আসে। জাহিদ সাংঘাতিক খেপে গেল। সঙ্গে সঙ্গে রশিদ ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলার জন্যে ঢাকা চলে গেল। রশিদ ভাই-ই শেষ পর্যন্ত ভেবেচিন্তে বুদ্ধিটা দেন। আমিন ইকবালের আগে আমরাই যেন কাহিনীটা ফাঁস করে দেই। তাহলে অন্তত অনেক স্ক্যাণ্ডাল থেকে রক্ষা পাবে জাহিদ। আমিনের হাতে যে ছবিগুলো আছে, তা যে-কোন পত্রিকা মোটা দামে কিনে নেবে। ব্যাপারটা গোপন রাখার আর কোন উপায় নেই। বাড়ি ফিরে জাহিদ আমার সঙ্গে আলাপ করে। তখন আমরা দু'জনই অনুভব করি অনেকদিন ধরে ঠিক এটাই চাচ্ছিলাম আমরা। এ যেন এক মুক্তির আনন্দ। আমিন ইকবাল এক দিক থেকে উপকারই করেছে, তা না হলে সিদ্ধান্তটা নিতে আর ক'দিন দেরি হত কে জানে। হাসনা আপাও এক বাক্যে রাজি। আমাদের ভয় ছিল ওনাদের হয়ত কিছুটা ক্ষতি হতে পারে, কারণ রুস্তম শেরের বই প্রচুর মুনাফা করেছে। সেটার লোভ ত্যাগ করা সহজ নয়। কিন্তু ওনারা দু'জন বরং উৎসাহই দিলেন। কার্যত "শনিবারে" লেখাটা বের হওয়াতে রুস্তম শেরের লেখা বইয়ের বিক্রি বেড়ে গেছে দ্বিগুণ। গতকালই রশিদ ভাই ফোন করে সেটা জানিয়েছেন।'

জাহিদ এতক্ষণ পর বলে উঠল, 'যদিও লোকটা খুন হয়েছে, ওর ওপর রাগটা কেন যেন এখনও যায়নি।'

মৃদু হাসল শাহেদ, 'এ খুনটার পিছনেও আপনার শক্ত মোটিভ আছে।'

'কিন্তু তাহলে তো ও আগেই মারা পড়ত, "শনিবারে"ও লেখাটা ছাপা হত না। সবকিছু ফাঁস হবার পর কেন ওকে মারতে যাব শুধু শুধু?'

'প্রতিশোধ। কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি শুধু একটা কারণে, কিছু মনে করবেন না, একটা ছদ্মনামের জন্যে মানুষ খুন হয়ে গেল! এটা তো আর ক্ল্যাসিফায়েড ডকুমেন্ট বা মিলিটারি সিক্রেট নয়!'

'আমিও আপনার সঙ্গে এ ব্যাপারে একমত। কিন্তু কে করতে পারে এই কাজ!'

মোনা হঠাৎ সোজা হয়ে বসল। 'আচ্ছা, রুস্তম শেরের কোন ভক্তও তো করতে পারে। রুস্তম শের আর কখনও লিখবে না জেনে হয়ত খেপে যায়, কোনভাবে জেনে যায় আমিন ইকবালই এজন্যে দায়ী। তাই বেচারাকে খুন করে সে···মানে গল্পটা খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য হচ্ছে না, তাই না?'

'ঠিক তাই,' হাসল শাহেদ।

'কিন্তু ধরুন, লোকটা যদি উন্মাদ হয়? "শনিবারে" লেখাটা ছাপা হবার পর রুস্তম শেরের অসংখ্য ভক্ত রেগে গিয়ে কুৎসিত ভাষায় জাহিদকে চিঠি লিখেছে রুস্তম শেরকে মেরে ফেলার জন্যে। এক মহিলা তো অভিশাপ দিয়েছে গালকাটা জয়নাল যাতে তার ক্ষুর দিয়ে জাহিদকে ফালাফালা করে কেটে ফেলে। এরকম

Banglabook.org

লোক উন্মাদ ছাড়া আর কি?'

সোজা হয়ে বসল শাহেদ, 'এই গালকাটা জয়নালটা কে?'

হো হো করে হেসে উঠল জাহিদ, 'শান্ত হোন, ইন্সপেক্টর, ও রক্তমাংসের কোন মানুষ নয়, রুস্তম শেরের বইয়ের নায়ক।'

'ওহ্! কল্পিত লেখকের সৃষ্ট কল্পিত চরিত্র!'

আবার হাসল জাহিদ, 'বাহ! ভালই বলেছেন।'

মোনা হাল ছাড়েনি, 'কিন্তু এমনটা তো হতে পারে! জন লেননকে তো এরকম কোন লোকই গুলি করে হত্যা করেছিল। এই সেদিন জোডি ফস্টারের এক ভক্ত ওর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে রেগানকে গুলি করেনি?'

'কিন্তু লোকটা যদি আমার ভক্তই হবে, তাহলে আমাকে জড়াবার চেষ্টা করছে কেন?'

মোনা হাল ছেড়ে দিল, 'আরে, ও তো তোমার ভক্ত নয়, রুস্তম শেরের ভক্ত। তুমি সাক্ষাৎকারে বলেছিলে রুস্তম শেরের মৃত্যুতে তুমি খুশি হয়েছ, এরপরও কি সে তোমাকে পুজো করবে?'

শাহেদ আড়মোড়া ভাঙল, 'তারপরেও ব্যাপারটা ঠিক খাপ খাচ্ছে না। ফিঙ্গারপ্রিন্টগুলো...'

বাধা দিল জাহিদ, 'আচ্ছা, আপনি তো বলেছিলেন ফিঙ্গারপ্রিন্ট নকল করা যায় না। যদি দু'জায়গাতেই একই ছাপ পাওয়া গিয়ে থাকে, তবে অবশ্যই তা নকল করা যায়। অন্তত এই লোক তা করেছে। সেক্ষেত্রে সে শুধু রুস্তম শেরের ভক্তই নয়...' বাক্যটা শেষ না করেই চুপ করল ও।

'আপনি বলতে চাচ্ছেন...'

'ইন্সপেক্টর, আপনি কি কখনও চিন্তা করে দেখেছেন, এই লোকটা নিজেকেই রুস্তম শের বলে মনে করে কিনা?'

জাহিদ টের পেল মোনা আর শাহেদ দু'জনই শিউরে উঠল।

শাহেদ যখন উঠল, তখন গভীর রাত। সদর দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখব। আর আমার নাম্বার তো রইলই।'

'আমরা ভাবছিলাম দু'একদিনের মধ্যে একবার চাটগাঁ যাব। বিকেলে চাচী...মানে মিসেস শরীফ খানের সঙ্গে কথা হয়েছে, উনি খুবই ভেঙে পড়েছেন।'

'না, এ মুহূর্তে কোথাও যাবেন না।'

'কিন্তু ক'দিন পরেই তো ঈদ, আমাদের যশোর যাবার কথা।'

'টেলিফোনে মানা করে দিন। ব্যাপারটার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আপনাদের বাসা ছেড়ে কোথাও যাওয়া উচিত হবে না। আমি অবশ্য কাল সকালেই পতেঙ্গা ফিরব। তবে নতুন কিছু ঘটলে আমাকে সঙ্গে সঙ্গে ফোনে জানাবেন।' একটু থেমে চিন্তা করল শাহেদ। 'আর একটা ব্যাপার। আমিন ইকবালের ঘরের দেয়ালে খুনী ওরই রক্তে আঙুল ডুবিয়ে কয়েকটা শব্দ লিখেছে—"পাখিরা আবার উড়ছে"— আপনারা কি এ সম্বন্ধে কিছু বলতে পারেন?'

BanglaBook.org

'না,' মোনা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল।
'না,' একটু ইতস্তত করে জাহিদও উত্তর করল।
তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল শাহেদ, 'শিওর?'
'অফ কোর্স,' ভাবলেশহীন জাহিদের কণ্ঠ।
জীপে উঠে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল শাহেদ।

সাত

ওপরে শোবার ঘরে এসে মোনা শাড়ি পাল্টে পাতলা সুতির নাইটি পরে নিল। জাহিদ বাথরুমে দাঁত ব্রাশ করছে। মোনা বাথরুমের দরজায় এসে দাঁড়াল।

'জাহিদ, তুমি কিছু একটা গোপন করেছ।' মোনার কণ্ঠে অভিমান আর কষ্ট।

ট্যাপ খুলে বেসিনে কুলি করে তোয়ালে টেনে নিল জাহিদ। মুখ হাত মুছতে মুছতে জানতে চাইল, 'কখন টের পেয়েছ?'

'শাহেদ সাহেব দ্বিতীয়বার যখন ফিরে এলেন, তখন থেকেই তোমাকে কেমন যেন অস্থির মনে হচ্ছিল। যাবার সময় উনি যে প্রশ্নটা করলেন, সেটা শুনে তুমি চমকে গিয়েছিলে, তাই না?'

'কিন্তু শাহেদ সাহেব টের পাননি।' জাহিদ শোবার উদ্‌যোগ করতে লাগল। মোনাও ওকে অনুসরণ করে খাটের অন্যদিকে এসে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে।

'শাহেদ সাহেব তো আর এক যুগ ধরে তোমার ঘর করছে না!' মোনার কণ্ঠে স্পষ্ট রাগ। 'তবে উনিও টের পেয়েছেন তোমার ভাবান্তর।' জাহিদ বিছানায় শুয়ে পড়েছে। 'তুমি যখন মিথ্যে কথা বল তখন খুব খারাপ লাগে।'

'আমি মিথ্যে বলিনি, মোনা। তোমাকে বলতাম। তবে ঠিক কিভাবে বলব বুঝতে পারছিলাম না,' বলে ওর হাত ধরে টেনে পাশে শুইয়ে দিল জাহিদ, 'এত রাগছ কেন তুমি?'

জাহিদের বুকে মুখ লুকাল মোনা, 'কারণ আমার ভয় করছে। প্রচণ্ড ভয় করছে।'

মোনাকে বুকের মধ্যে শক্ত করে কিছুক্ষণ ধরে রাখল জাহিদ। কোত্থেকে শুরু করবে ভাবতে লাগল।

'কি হল? বল! দেয়ালে কি লেখা ছিল যেন?' মোনার তর সইছে না, সারাদিনের ধকলের পরে নার্ভাস হয়ে পড়েছে।

'পাখিরা আবার উড়ছে,' ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল জাহিদ। একটু থেমে বলতে শুরু করল, 'ছেলেবেলায় আমার টিউমার অপারেশনের ব্যাপারটা তো তুমি জান। অপারেশনের আগে মাঝে মাঝে প্রচণ্ড মাথাব্যথা হত, সেটাও তো বলেছি, তাই না?' মোনার চুলে আঙুল বুলিয়ে দিচ্ছে ও।

'উঁ।' আরামে চোখ বুজে আছে মোনা।

BanglaBook.org

'তোমাকে হয়ত বলিনি যে মাথাব্যথা শুরু হবার আগে আমি ভৌতিক একটা শব্দ শুনতাম—অসংখ্য চড়ুই পাখির কিচিরমিচির আর পাখা ঝাপটানোর শব্দ। ব্যাপারটা অবশ্য একটুও ভৌতিক নয়। মগজের টিউমারের ক্ষেত্রে এরকম হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। এগুলোকে বলে "সেনসরি পারসেকিউটার"। সাধারণত এটা দেখা দেয় গন্ধ হয়ে। যেমন, পেন্সিল কাটার গন্ধ, পেঁয়াজের গন্ধ, ফল পচার গন্ধ—এগুলোই সাধারণত বেশি দেখা যায়। আমার সেনসরি পারসেকিউটার ঘ্রাণেন্দ্রিয় নয়, শ্রবণেন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল। আমি শুনতাম পাখিদের শব্দ। চড়ুই পাখি। মোনার হাত ধরে বিছানা থেকে নেমে দরজার দিকে এগুলো ও।

'কি হল?' মোনা একটু অবাক।

'চল, একটা জিনিস দেখাবো তোমাকে।'

স্টাডিটা ছোট। দোতলায় বাথরুম ছাড়া দুটো মাত্র ঘর। শোবার ঘরটা বড়, বাকি ছোটমত ঘরটাকে জাহিদ স্টাডিতে রূপান্তরিত করেছে। নিচে রান্না আর বসার ঘর ছাড়া আরেকটা ঘর আছে, মেহমান এলে সেখানেই থাকতে দেয়া হয়। পিচ্চি রাতে রান্নাঘরের সামনের করিডরে শুয়ে থাকে। রূপক-রুমকি শোবার ঘরের একপাশে রাখা কটে ঘুমায়।

লেখার টেবিলটা কিন্তু একটুও অগোছাল নয়। বই, কাগজ, নোটবুক, পেন্সিল হোল্ডার সব জায়গামত সাজানো, সামনে টাইপ রাইটার। পুরানো কিন্তু দেখতে নতুনের মত। লেখা কাগজগুলো টাইপ রাইটারের ডান দিকে রাখা। ওদিকে ইঙ্গিত করল জাহিদ, 'শাহেদ সাহেব যখন এলেন, আমি তখন লিখছিলাম।' ওপরের কাগজটা তুলে মোনার হাতে দিল, 'হঠাৎ পাখিদের শব্দ শুনতে পেলাম সেই ছেলেবেলার মত, আজ এই নিয়ে দ্বিতীয়বার। কাগজটায় কি লেখা আছে দেখেছ?'

শূন্য দৃষ্টিতে লেখাটার দিকে চেয়ে আছে মোনা বিবশ হয়ে। ধীরে ধীরে রক্তশূন্য হয়ে যাচ্ছে মুখটা, 'সেই কথাগুলো না? ওহ্...জাহিদ! এটা কি?' মাথায় হাত দিয়ে চোখ বন্ধ করে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করল ও। পড়ে যেতে পারে ভেবে চট করে ধরে ফেলল ওকে জাহিদ।

'খারাপ লাগছে?'

'হ্যাঁ,' ফুঁপিয়ে উঠল মোনা, 'তোমার লাগছে না?'

'এখন আর ততটা নয়।' ধীরে ধীরে ওকে চেয়ারে বসিয়ে দিল জাহিদ। নিজেও মেঝেতে বসল দেয়ালে হেলান দিয়ে।

'তুমি ওটা লিখেছ শাহেদ সাহেব আসার আগে!' মোনার চোখে এখনও অবিশ্বাস।

ওপর-নিচ মাথা নাড়ল জাহিদ, 'এখন বুঝেছ কেন এতক্ষণ বলিনি?'

দু'হাতে মুখ ঢাকল মোনা, 'হ্যাঁ।'

'শাহেদ সাহেবকে বললে কি উনি বিশ্বাস করতেন? এমনিতেই উনি ভাবছেন আমি আমার যমজ ভাইয়ের সঙ্গে আঁতাত করে খুনের পর খুন করে চলেছি।'

BanglaBook.org

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল দু'জনে। মোনাই নীরবতা ভাঙল, 'বইপত্রে পড়েছি টেলিপ্যাথি, ই. এস. পি…'

'তুমি এসব বিশ্বাস কর?'

'এতদিন চিন্তা করিনি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে করি।' টেবিলের ওপর থেকে কাগজটা তুলে চোখের সামনে ধরল মোনা, 'ওটা তুমি রুস্তম শেরের পেন্সিলে লিখেছ।'

'তুমি এমনভাবে বলছ যেন রুস্তম শের অন্য কেউ!'

'জাহিদ, মনে করে দেখ আর কিছু ঘটেছিল কিনা।'

একটু চিন্তা করল জাহিদ। 'হ্যাঁ, বিড়বিড় করে কি যেন বলে উঠেছিলাম, মনে পড়ছে না ঠিক কি।'

পাথরের মূর্তির মত বসে রইল দু'জন। জানালার বাইরে অন্ধকার রাত। ধীরে ধীরে লাইট নেভানর জন্যে সুইচবোর্ডের দিকে এগুল মোনা, জাহিদকে ডাকল, 'চল, ঘুমোবে না?'

'আজ রাতে আমরা কি সত্যিই ঘুমোতে পারব?'

শোবার ঘরে ফিরে বাচ্চাদের কটের দিকে গেল মোনা। দেবশিশুর মত দেখাচ্ছে নিষ্পাপ ঘুমন্ত বাচ্চা দুটোকে। শিশির বিন্দুর মত ঘামের কুচি রূপকের গলার ভাঁজে। ফ্যানটা এক দাগ বাড়িয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল জাহিদের পাশে।

আশ্চর্য! দশ মিনিটের মধ্যেই গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল মোনা। তার পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল জাহিদও।

আবার সেই স্বপ্ন।

একই রাস্তা ধরে গাড়ি চালাচ্ছে জাহিদ, রুস্তম শের বসে আছে পেছনে, অদৃশ্য। নিজের বাড়ির সামনে গাড়ি থামাল জাহিদ, রুস্তম শের কাঁধের পেছনে থেকে বলল এটা ওর বাড়ি নয়, বাড়ির মালিক পরিবারের সবাইকে হত্যা করে নিজেও আত্মহত্যা করেছে। সবকিছু ঘটছে ঠিক আগের বারের মতই। শুধু রান্নাঘরে মোনার মৃতদেহের পাশে পড়ে আছে আমিন ইকবালের ছিন্নভিন্ন দেহের অংশবিশেষ। পেছন থেকে একঘেয়ে কণ্ঠে বলে চলেছে রুস্তম শের, 'বোকামি করলে এই অবস্থাই হয়! এক এক করে সব শালার বাচ্চার তেরোটা বাজাব আমি। সাবধান! তোকে যাতে শিক্ষা না দিতে হয়! মনে রাখবি…পাখিরা আবার উড়ছে…আবার উড়ছে পাখিরা!' আকাশ অন্ধকার করে নেমে আসছে চড়ুই পাখির ঝাঁক। জাহিদ জানালা দিয়ে পাখি ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না, গাছের ডাল, পথ-ঘাট, ঘাস বিছানো মাটি সবকিছু ঢেকে গেছে কোটি কোটি পাখিতে। 'আমি কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না!' চিৎকার করে উঠল জাহিদ। পেছন থেকে ফিসফিসে কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে, 'ওরা আবার উড়ছে, দোস্ত! কোন বোকামি নয়!'

BanglaBook.org

কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসল জাহিদ। স্বপ্ন এত বাস্তব হয়! ঘামে ভিজে গেছে সমস্ত

শরীর। ধীরে ধীরে আবার শুয়ে পড়ল ও। অন্ধকারে চোখ মেলে ভাবতে লাগল হঠাৎ এমন অদ্ভুত একটা কথা কেন মনে এল? রুস্তম শের আর গালকাটা জয়নালকে ও একই লোক হিসেবে চিন্তা করে এসেছে এতদিন, অথচ স্বপ্নটা দেখার আগে তা বুঝতে পারেনি। দু'জনেরই পাথরে কোঁদা উঁচু শরীর, বিশাল কাঁধ, টকটকে ফর্সা, লালচে চুল···আশ্চর্য! অসম্ভব! কাল্পনিক চরিত্র কোনদিন রক্তমাংসে পরিণত হয়? রূপকথাতেও তা অসম্ভব। মোনা শুনলেও হেসে উঠবে। বাইরের মানুষ হয়ত লুকিয়ে হাসবে, তবে নিঃসন্দেহে পাগল ঠাউরাবে। বিহ্বল হয়ে শুয়ে রইল জাহিদ সকালের সোনালী সূর্যের প্রতীক্ষায়।

পরদিন সকালে জাহিদ ডিপার্টমেন্টে গেলে মোনা ঢাকায় ফোন করে নিউরোলজিস্টের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে ফেলল। এমার্জেন্সি বলাতে একটু গাঁইগুঁই করে ভদ্রলোক দেখতে রাজি হলেন, যদি ওরা তিনটের মধ্যে পৌঁছতে পারে। জাহিদ ক্লাস নিয়ে ফিরতে তাড়াহুড়ো করে ভাত খেয়ে ওরা বেরিয়ে পড়ল হাসপাতালের উদ্দেশে।

হিস্ট্রি শুনে ডাক্তার গম্ভীর হয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে ক্রেনিয়াল এক্স-রে-র জন্যে দোতলায় পাঠালেন। আরও দুটো টেস্ট করা হল। দিন তিনেক পরে রেজাল্ট জানা যাবে।

বিকেলে জাহিদ স্টাডিতে বসে খাতা দেখছে। ছাত্র-ছাত্রীদের কথা দিয়েছে ঈদের আগেই মার্কস্ দিয়ে দেবে।

হঠাৎ করেই শুরু হল।

প্রথমে দুটো একটা পাখির ডাক, ধীরে ধীরে পাখির সংখ্যা বাড়তে থাকল। একসময় কোটি কোটি পাখির কিচিরমিচির ধ্বনিতে জাহিদের কানে তালা লেগে গেল। দু'হাতে দু'কান চেপে ধরে চেয়ার থেকে মেঝেতে গড়িয়ে পড়ল জাহিদ, মনে হচ্ছে পাগল হয়ে যাচ্ছে ও। ঘরবাড়ির ছাদ, গাছের ডাল আর ইলেকট্রিকের তারে বসে আছে অগুনতি পাখি।

চড়ুই পাখি।

ওপরে সাদাটে আকাশ। মনে হচ্ছে ওরা কারও আদেশের অপেক্ষা করছে। আদেশ পেলেই একসঙ্গে ডানা মেলবে। সাদাটে আকাশ ঢেকে যাবে পাখিতে।

জাহিদ জানে না কখন ও অন্ধের মত টেবিল হাতড়ে একটুকরো কাগজ আর এইচ-বি পেন্সিলটা মুঠো করে ধরেছে। আঙুলের চাপে পেন্সিলটা কাগজের ওপর আঁকিবুঁকি কাটছে।

একসঙ্গে পাখিগুলো ডানা মেলল। নিমেষে কালো হয়ে গেল সাদাটে আকাশ।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল জাহিদ। ঘামে ভিজে গেছে শরীর, জোরে নিঃশ্বাস বইছে, কিন্তু মাথাব্যথা হয়নি। বোকার মত চেয়ে আছে হাতে ধরা কাগজটার দিকে। ঢাকা থেকে ফেরার পথে গাউছিয়ার লীফায় থেমে কয়েকটা শাড়ি ড্রাই ক্লিন করতে দিয়েছে মোনা, তারই রসিদ। একটু

BanglaBook.org

আগেই পকেট থেকে বের করে টেবিলে রেখেছে জাহিদ। রসিদের উল্টোদিকটা দেখছে জাহিদ অবিশ্বাসের চোখে। এসব কি লিখেছে ও? কখন লিখেছে? আঁকাবাঁকা অসমান অক্ষরে লেখা, কিন্তু কয়েকটা শব্দ ঠিকই পড়া যাচ্ছে। সন্দেহ নেই, জাহিদের হাতের লেখা। শব্দগুলোর কোন মাথা মুণ্ডু বুঝতে পারল না ও। আপা…হাস…উড়ছে…পাখিরা…আপা…বোকা…চড়ুই…ক্ষুর…মৃত্যু…হাস… এখনই… কাটা…হাস…চিরদিনের জন্যে… । আশ্চর্য! এ সবের অর্থ কি? দু'হাতে কপাল চেপে ধরল। ভয় হচ্ছে যে-কোন সময় মাথাব্যথা শুরু হবে। না, মোনাকে কিছুতেই বলা যাবে না। চিন্তায় এমনিতেই অর্ধেক হয়ে গেছে ও একদিনেই। ভয়ঙ্কর স্বপ্নটার কথা যে কারণে গোপন করে গেছে, সেই একই কারণে এই ঘটনাটাও ওর কাছে গোপন করে যেতে হবে। কি হবে বেচারাকে ভয় পাইয়ে। তাছাড়া ক'টা অর্থহীন শব্দ বই তো নয়! প্রবল বিতৃষ্ণা নিয়ে রসিদটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল জাহিদ। টেবিলের নিচে রাখা ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে টুকরোগুলো ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হল।

লীফায় চেনাশোনা আছে, মোনার অসুবিধা হবে না।

আট

শেষ বিকেলের সোনা ঝরা রোদ ঝকঝক করছে চারদিকে। কিন্তু এই মুহূর্তে প্রকৃতির এই সৌন্দর্য উপভোগ করার মত সময় হাসনা তালুকদারের হাতে নেই। লম্বা একটা দিন তিনি কাটিয়েছেন অফিসে চরম ব্যস্ততায়। রিকশায় বেইলি রোডে নিজের ফ্ল্যাটে ফেরার এই সময়টুকুতে বিশ্রাম ছাড়া আর কিছুই মনে আসে না।

তবে ব্যস্ত জীবনের জন্যে কোন অনুশোচনা নেই তাঁর। ব্যস্ততা না থাকলে যে জীবনটা কাটানই কঠিন হয়ে পড়ত। বিশেষ করে বছর দুয়েক আগে ডিভোর্স হয়ে যাবার পর থেকেই বড় একা হয়ে পড়েছেন হাসনা তালুকদার। একমাত্র মেয়ে বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে রিয়াদ চলে গেছে তার কিছুদিন আগেই। ডিভোর্সের পরে হাতির পুলে একটা বাড়িতে ভাড়া থাকতেন, বছরখানেক আগে বেইলি রোডের এই ফ্ল্যাটটা কিনে নিয়ে উঠে আসেন। এলাকাটা ভদ্র, ফ্ল্যাটটাও মোটামুটি বিলাসবহুল। দামটা বেশি হলেও তাই কিনে নিতে দ্বিধা করেননি। তবে পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে আজও ঘনিষ্ঠতা হয়নি। একে ডিভোর্সি, তায় আবার নিজের ব্যবসা আছে। মহিলা হিসেবে এই দুটো ব্যাপারই সমাজে তাঁকে চিহ্নিত করে রেখেছে। তবে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে আজ আর ওসব তিনি গ্রাহ্য করেন না। ডিভোর্স হলেও স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কে তিক্ততা নেই। ব্যবসায়িক কাজে বলতে গেলে সারাদিনই একসঙ্গে কাটাতে হয়, তিক্ততার অবকাশ কই! বরঞ্চ ইদানীং বন্ধুত্বের সম্পর্কই গড়ে উঠেছে, যা বিশ বছরের বিবাহিত জীবনে হয়নি। আর্থিক

দিক থেকেও কোন অসুবিধা নেই। 'হীরক পাবলিশার্স' খুবই ভাল ব্যবসা করছে বছর দশেক ধরে। এই সাফল্যের কারণেই স্বামী-স্ত্রীর ডিভোর্স হয়ে গেলেও ব্যবসাটা টিকে গেছে, ভাগ হয়নি।

খুব ভোরে ঠিকে ঝি এসে ঘরদোর ঝেড়ে-মুছে, রান্নার আয়োজন করে দিয়ে যায়। হাসনা তালুকদার রান্না গোসল সেরে তাড়াহুড়ো করে নাস্তা করে নেন। দশটা সাড়ে দশটার মধ্যেই বেরিয়ে পড়তে হয় অফিসের উদ্দেশে। বাসায় ফিরতে কোন কোনদিন সন্ধে লেগে যায়। ছুটির দিনেও ঘরে বসে কাজ করেন তিনি। বন্ধু-বান্ধব আসে মাঝে মাঝে, গল্পগুজব হয়।

রিকশা থামলে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে নেমে এলেন হাসনা তালুকদার। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলেন দোতলায়। প্রতি ফ্লোরে চারটে করে ফ্ল্যাট। ওনার ফ্ল্যাটটা পেছন দিকে। তাতে সুবিধাই হয়েছে। রাস্তার হট্টগোল কানে যায় না বড় একটা।

হাত ব্যাগ থেকে চাবি বের করে তালায় ঢুকাতে গিয়েই চমকে উঠলেন তিনি। বড় ডায়মণ্ড তালাটা কড়া থেকে ঝুলছে, খোলা। চুরি হয়েছে! হায় আল্লাহ্! রাস্তায় চলাফেরা করা দুষ্কর হয়ে পড়েছে ঝাপটা পার্টির অত্যাচারে, বাড়িতে ফিরেও শান্তি নেই। দেশটার হল কি!

টিভি-ভিসিআর নিশ্চয়ই গেছে! ভারী গয়নাগাটি বহুদিন পরেন না, সবই রাখা আছে ব্যাঙ্কের ভল্টে। সবসময় পরার টুকটাক কানের দুল-চেন-আঙটি ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারেই আছে। জরুরি দরকারের জন্যে হাজার পাঁচেক ক্যাশ টাকা লুকিয়ে রেখেছিলেন লিভিংরুমের বুক শেলফে। সঞ্চয়িতার ভাঁজে। সবই কি গেল!

হ্যাণ্ডেলে চাপ দিয়ে দরজাটা খুলতে যেতেই কেমন ভয় ভয় করে উঠল। ভেতরে কি অবস্থা কে জানে! শেষ মুহূর্তে হঠাৎ করে মনে হল চোর যদি ভেতরেই থেকে থাকে! কিন্তু তখন আর কিছু করার ছিল না।

চকিতে ঘরের ভেতর থেকে একটা হাত সাপের মত ছোবল দিল। শক্তসমর্থ হাতটা সজোরে হাসনা তালুকদারের হ্যাণ্ডেলে চেপে বসা ডান হাতের কব্জি চেপে ধরেছে। কোন কিছু বুঝে ওঠার আগেই হ্যাঁচকা টান দিল সামনের দিকে। ভোঁতা আওয়াজ তুলে হাসনা তালুকদারের বিস্ময়ে হাঁ হয়ে যাওয়া মুখটা প্রচণ্ড জোরে আছড়ে পড়ল সেগুন কাঠের দরজায়। জ্ঞান হারাবার আগে এক পলকের জন্যে চোখে পড়ল দরজার আড়ালে দাঁড়ানো বিশাল আকৃতির ফর্সা সুদর্শন একটা মুখ, লালচে লম্বা ঢেউ খেলানো চুল।

লোকটা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছিল প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে, বন্ধ দরজার ঠিক ভেতরে। বাঁ হাতে দরজাটা শক্ত করে ধরে ছিল, যাতে আঘাতটা একটুও না ফস্কায়। ডান হাতে এখনও ধরে আছে হাসনা তালুকদারের ডান কব্জি, মহিলা জ্ঞান হারিয়েছেন। ঠিক এসময় উল্টোদিকের ফ্ল্যাটের বন্ধ দরজাটা খুলে যেতে শুরু করল। ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে। কেউ ভেতর থেকে চিৎকার করল, 'কে? কে ওখানে?' শব্দ শুনেছে কেউ!

হ্যাঁচকা টান মেরে হাসনা তালুকদারের হালকা পাতলা দেহটা ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিতে যেতেই বুড়ো মত এক লোকের মুখোমুখি হল

BanglaBook.org

লোকটা, সামনের ফ্ল্যাটের আংশিক খোলা দরজা দিয়ে গলা বাড়িয়েছে, চোখে সন্দেহ।

সুদর্শন চেহারায় চমৎকার হাসিটা মানিয়ে গেল, 'কিচ্ছু না, দরজাটা আটকে গিয়েছিল, ধাক্কা মেরে খুলতে হয়েছে।' খুব ধীরে ধীরে দরজাটা বন্ধ করল সে, যাতে লোকটার সন্দেহ না বাড়ে। হাসনা তালুকদারের ফ্ল্যাটে সবসময়ই লোকজন আসে, তাতে সন্দেহের কিছু নেই।

করিডরে নিঃসাড়ে শুয়ে আছেন হাসনা তালুকদার। মুখের ডান পাশটা ছিলে গেছে, মাড়ি থেকে ভেঙে গেছে দুটো দাঁত, কেটে দু'ফাঁক হয়ে গেছে নিচের ঠোঁট। নাক আর কশ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে মেঝেতে। মুখের ছিলে যাওয়া অংশগুলোতে রক্ত ভেসে উঠতে শুরু করেছে।

গুঙিয়ে উঠলেন তিনি ব্যথায়। চেতনা ফিরে আসতে শুরু করেছে। লোকটা পকেট থেকে একটা ক্ষুর বের করল। ঝাঁকি দিতেই লম্বা ব্লেডটা বের হয়ে এল। চোখ খুলতেই হাসনা তালুকদার ভয়ে বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেলেন। নিমেষে মনে পড়ে গেল কি ঘটেছে। নিজের অজান্তেই চেঁচিয়ে উঠলেন, সঙ্গে সঙ্গে ব্যথায় কুঁকড়ে উঠল শরীরের প্রতিটা নার্ভ।

'একটা শব্দ করবি তো কেটে দু'ভাগ করে দেব, সোহাগের আপামণি,' মুখের ওপর ক্ষুরটা নাচিয়ে ভয় দেখাল লোকটা, কণ্ঠে ব্যঙ্গ ঝরে পড়ছে।

চুলের মুঠি ধরে হেঁচড়ে নিয়ে চলল লিভিংরুমের দিকে। যন্ত্রণায় ফুঁপিয়ে উঠলেন তিনি। চুল ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিল লোকটা নিষ্ঠুরভাবে, 'চোপ্! খুন করে ফেলব একটা শব্দ বের হলে।'

সুন্দর রুচিসম্মত ভাবে সাজানো লিভিংরুম। বেতের সোফা, লাল কভারে মোড়া গদি, জয়পুরী কাজ করা কুশন, ছোট্ট দামি কার্পেট সেন্টার টেবিলের নিচে, বুক শেলফে সারি সারি বই, টবে পাতাবাহার, দেয়ালে বিখ্যাত শিল্পী আসিফ খোন্দকারের পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবি 'চিরদিনের জন্যে'-র রিপ্রিন্ট।

'লিভিংরুমের দোরগোড়ায় পৌঁছে চুলের মুঠি ছেড়ে দিল লোকটা। মাথাটা ঠুকে গেল মোজাইকের মেঝেতে, গুঙিয়ে উঠলেন হাসনা তালুকদার নিজের অজান্তেই। চোখ গরম করে চাইল লোকটা, 'আবার শব্দ! চুপচাপ সোফায় উঠে বসুন, আপামণি।' 'আপনি' এবং 'আপামণি' দুটো সম্বোধনই যে ব্যঙ্গাত্মক তা বুঝতে সময় লাগে না। 'ওই সোফাটায়,' তর্জনী তুলে ফোনের পাশের জায়গাটা দেখাল সে।

'প্লীজ,' একইভাবে মেঝেয় শুয়ে থেকে ফুঁপিয়ে উঠলেন হাসনা তালুকদার, নড়ার শক্তি নেই। চিন্তাভাবনার শক্তিও লোপ পেয়েছে। 'প্লীজ' শব্দটা শোনাল অনেকটা 'পি-রি-স'-এর মত। রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত মুখটা ফুলে উঠতে শুরু করেছে। 'বইয়ের ফাঁকে টাকা... গয়না আছে...' অর্ধেক কথাই বোঝা গেল না।

ডান হাতে ঝট করে ক্ষুরটা নিয়ে এল লোকটা হাসনা তালুকদারের নাকের সামনে, 'ওই সোফাটায়,' বাঁ হাতের তর্জনী সোফার দিকে তুলে ধরা।

টলতে টলতে কোনমতে সোফার কাছে পৌঁছে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন তিনি।

BanglaBook.org

চাখ দুটো আতঙ্কে বড় বড়, ডান হাতে মুখের রক্ত মুছে নেবার চেষ্টা করলেন। কি চান আপনি?' অস্পষ্ট হলেও বোঝা গেল শব্দ ক'টা, মনে হচ্ছে একগাদা াবার মুখে নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করছে কেউ। প্রতিবার কথা বলার সময় গাদা াদা রক্ত বের হচ্ছে মুখ থেকে, কালো কারুকাজ করা হালকা বেগুনি শাড়িটার ুকের কাছটা রক্তে ভিজে লাল হয়ে উঠেছে।

'আমি চাই জাহিদকে আপনি একটা ফোন করবেন, আপামণি,' ভিলেনের ত হাসছে লোকটা, 'আর কিছু না।' টেলিফোনের রিসিভারটা হাসনা তালুকদারের হাতে তুলে দিল, ভারী রিসিভারটার দিকে চেয়ে হেসে উঠল ঘর াঁপিয়ে, 'ওটা দিয়ে আমার মাথায় বাড়ি মারার ইচ্ছে হচ্ছে, না?' মুহূর্তে শক্ত হয়ে গল মুখের প্রতিটা মাংসপেশী, সরু হয়ে গেল কটা চোখ দুটো, হিসহিস করে ঠল ভয় দেখানো গলায়, 'আর একবার এরকম চিন্তা মাথায় এসেছে কি গলাটা ু'ফাঁক করে দেব!'

ঠাণ্ডা রূপালী ক্ষুরটা গলা স্পর্শ করতে থরথর করে কেঁপে উঠলেন হাসনা তালুকদার, 'জাহিদ!' চোখে ভয়ের সঙ্গে মিশে আছে বিস্ময়।

'হ্যাঁ, জাহিদ। বিখ্যাত লেখক ডক্টর জাহিদ হাসান, চিনতে পারছেন না মনে য়?' খিকখিক করে হেসে উঠল লোকটা।

'আমার ডায়ারি...' কেটে যাওয়া ঠোঁটটা ফুলে ওঠাতে মুখটা বন্ধ করতে ারছেন না হাসনা তালুকদার, থেঁতলে যাওয়া মুখটায় নীলচে দাগ ফুটে উঠছে ীরে ধীরে।

বুঝতে না পেরে কান খাড়া করল সে, 'কি বললেন?'

ধীরে ধীরে স্পষ্ট করে বলার চেষ্টা করলেন এবার, 'আমার ডায়ারিটায় লেখা াছে নাম্বারটা, মনে করতে পারছি না!'

দ্রুতগতিতে ক্ষুরটা নামিয়ে আনল লোকটা হাসনা তালুকদারের গলার একপাশে, সাঁই সাঁই বাতাস কাটার শব্দ কানে গেল দু'জনারই, সিঁটিয়ে উঠে সাফার গদির ভেতর ঢুকে যাবার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন তিনি।

'আমাকে বোকা বানাবার চেষ্টা করবেন না। জান খারাপ করে দেব! চুপচাপ ালমানুষের মত যা করতে বলছি করুন!' ধমকে উঠল যমদূতের মত দেখতে লাকটা।

'বিশ্বাস করুন...মনে নেই আমার,' কেঁদে উঠলেন হাসনা তালুকদার।

ক্ষুরটা বসিয়ে দিতে গিয়েও থামল শেষ পর্যন্ত। আতঙ্কের ঠ্যালায় ফোন াম্বার ভুলে যাওয়া এমন কিছু অবিশ্বাস্য ব্যাপার নয়। হয়ত মহিলা এ মুহূর্তে িজের বাসার ফোন নাম্বারও মনে করতে পারবে না।

'ঠিক আছে, আমি বুঝতে পারছি ভয়ে সব গুলে খেয়েছেন। আপনার ভাগ্য াল। নাম্বারটা আমার মুখস্থ আছে। আমিই ডায়াল করে দিচ্ছি। কেন, জানেন?' জোরে দু'পাশে মাথা নাড়লেন তিনি। থেঁতলে যাওয়া ফোলা নীলচে মুখটা ীভৎস দেখাচ্ছে।

'কারণ আপনাকে আমি বিশ্বাস করছি, আপামণি। যতক্ষণ আমি ডায়াল

BanglaBook.org

করব, মনোযোগ দিয়ে ক্ষুরটা দেখতে থাকুন।' ডায়াল করতে করতে যোগ কর 'যদি জাহিদের বউ ফোন ধরে, তবে জাহিদকে চাইবেন। কথা বলতে আপনা কষ্ট হচ্ছে জানি, চেষ্টা করবেন যাতে জাহিদ বুঝতে পারে।'

'কি...কি বলব ওকে?'

সুদর্শন চেহারায় হাসি ফুটে উঠল। বয়স একটু বেশি হলে কি হবে, মহি দেখতে বেশ সুন্দরী। লম্বা ঘন চুল, চোখ দুটো বড় বড়, পাতলা ঠোঁট—ঠোঁট অবশ্য এখন আর পাতলা নেই। হালকা বেগুনি শাড়িটাতে মানিয়েছে ভাল ওপাশে ফোনের রিঙ শোনা যাচ্ছে।

'কি বলতে হবে তা তো জানেনই, আপামণি!' ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপ ঝরে পড় প্রতিটা কথায়।

ক্লিক শব্দ তুলে কেউ রিসিভার তুলল, 'হ্যালো।' দু'জনেই পরিষ্কার শুন পেল জাহিদের কণ্ঠস্বর।

সঙ্গে সঙ্গে অস্বাভাবিক দ্রুততায় ক্ষুরটা আলতোভাবে নামিয়ে আনল হাসনা তালুকদারের ডান গালে, ডান হাতে রিসিভারটা চেপে ধরেছে মহিলার কানে। নারীকণ্ঠের বুকফাটা আর্তনাদ টেলিফোনের তার বেয়ে পৌঁছে গে সাভারে। হাসনা তালুকদারের ডান গালে লম্বা একটা ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। দু'ফাঁ হয়ে আছে ত্বক, গোলাপী মাংস বেরিয়ে পড়েছে। গভীর ক্ষতটা ধীরে ধীরে র লাল হয়ে গেল, গড়িয়ে পড়ছে চিবুক বেয়ে কোলে। মৃগী রোগীর মত কাঁপ গোটা শরীরটা।

'হ্যালো!' চিৎকার করে উঠল জাহিদ, 'হ্যালো, কে? কে বলছেন?'

নিজের শরীর দিয়ে চেপে রেখেছে মহিলার শরীরটা যাতে সোফা থে গড়িয়ে না পড়ে যায়। কানটা রিসিভারের কাছে থাকায় জাহিদের যান্ত্রিক কণ্ঠস্ব সে ঠিকই শুনতে পেল।

আমি রে, শুয়োরের বাচ্চা, আমি! তুই ঠিকই জানিস—আমি, জানিস ন আত্মপ্রসাদের সঙ্গে চিন্তা করল লোকটা। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে হাস তালুকদারের উদ্দেশ্যে বলল, 'জিজ্ঞেস করছে, উত্তর দিচ্ছেন না কেন? ক বলুন,' জোরে ঝাঁকুনি দিল চুল ধরে।

'কে? কি হচ্ছে এসব! হ্যালো!' উত্তেজনায় কাঁপছে জাহিদের কণ্ঠ।

হাসনা তালুকদার আবার চিৎকার করে উঠলেন। দরদর করে রক্ত পড় গালের ক্ষত থেকে, শাড়ি ব্লাউজ ভিজিয়ে জমা হচ্ছে সোফার গদিতে।

'কথা বল্, কুত্তী! নইলে এক্ষুণি মাথাটা নামিয়ে দেব,' হিসহিসিয়ে উঠ লোকটা। কানের কাছে।

'জাহিদ...একটা লোক...মেরে ফেলল...জাহিদ...' বিকারগ্রস্তের মত বিলা করতে লাগলেন হাসনা তালুকদার।

'তোর নাম বল্, শালী!' পাশ থেকে গর্জে উঠল লোকটা।

'কে? কে বলছেন?' হাসনা তালুকদারের কথা বুঝতে না পারলে পুরুষকণ্ঠের ধমকটা ঠিকই কানে গেল জাহিদের। তাতে আতঙ্কটা আরও বে

BanglaBook.org

গল।

'হাসনা!' চিৎকার করে উঠলেন তিনি, 'উহ্! জাহিদ, বাঁচাও আমাকে, ভাই! কটে ফেলছে লোকটা আমাকে...'

রুস্তম শের হেসে উঠল। ক্ষুর ঘুরিয়ে এক কোপে কেটে ফেলল টেলিফোনের ার। রিসিভারটা ছুঁড়ে ফেলে দিল সোফার পেছনে। ঠিক যেমনটি চেয়েছিল, বকিছুই ঘটছে ঠিক তেমনভাবেই।

হাসনা তালুকদার এখনও থরথর করে কাঁপছেন। রুস্তম শের আবার তাঁর লগুলো মুঠো করে ধরল। তারপর নিচের দিকে টানতে লাগল। হাসনা ালুকদার ছাদের দিকে চেয়ে আছেন, চেয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছেন বলাই ভাল, বে কিছু দেখছেন বলে মনে হয় না। পশুর মত দুর্বোধ্য ধ্বনি বের হচ্ছে গলা িয়ে। এক পোঁচে এক কান থেকে অন্য কান পর্যন্ত গলাটা ফাঁক করে দিল রুস্তম শের।

গলগল করে বেরিয়ে আসা রক্ত একসময় গতি হারাল, কাটা শ্বাসনালী থেকে া ঘড়ঘড় শব্দটা বেরোচ্ছিল, সেটাও বন্ধ হয়ে গেল। ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খল রুস্তম শের। তারপর হাসনা তালুকদারের প্রাণহীন খোলা চোখের পাতায় ত বুলিয়ে বন্ধ করে দিল।

রক্তে ভেজা ক্ষুরটা সোফার গদির শুকনো অংশে মুছে ভাঁজ করে পরম যত্নে কেটে ভরে রাখল রুস্তম শের। হাসনা তালুকদার নাটকের ছোট্ট একটা চরিত্র ত্র।

রশীদ তালুকদার বেঁচে আছে এখনও।

'শনিবারে' আর্টিকেলটা লিখেছেন—কি যেন নামটা—ওহ্, খান জয়নুল, ও াটাকেও একটু শিক্ষা দিতে হবে।

আর ফটোগ্রাফার ছেমরিটা, ঢং করে কবরের ছবি তুলেছে যে, কপালে রাবি আছে তারও।

সব ঝামেলা শেষ হলে জাহিদ হাসানের সঙ্গে বোঝাপড়ায় বসতে হবে। তার াগেই জাহিদ হাসান টের পেয়ে যাবে আসল ব্যাপারটা কি, নতুন করে বোঝাবার রকার পড়বে না। একান্তই যদি না বুঝতে চায়, সে ওষুধও রুস্তম শেরের জানা ছে।

শত হলেও জাহিদ হাসান দুটো নিষ্পাপ শিশুর পিতা, সুন্দরী স্ত্রীর স্বামী- াতে ওকে হবেই।

সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে। হাসনা তালুকদারের তাজা রক্তে আঙুল ডুবিয়ে দ্রুত খতে শুরু করল দেয়ালে। কাজ শেষ হলে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে এল ফ্ল্যাটের ইরে।

উল্টোদিকের ফ্ল্যাটের দরজা খুলে গেল সঙ্গে সঙ্গে। বৃদ্ধ ভদ্রলোক উঁকি লেন। আঁৎকে উঠলেন করিডরে দাঁড়ানো লম্বা সুদর্শন লোকটার উষ্কখুষ্ক লালচে । আর রক্তমাখা পোশাক দেখে। চোখের পলকে আবার বন্ধ হয়ে গেল জাটা। খুট করে তালা বন্ধ হবার শব্দ পাওয়া গেল।

BanglaBook.org

হেসে উঠল রুস্তম শের, দারুণ চালু লোক তো! আস্তে করে পেছনের দরজ টান দিয়ে বন্ধ করে নিচে নেমে এল রুস্তম শের।

হাতে একদম সময় নেই, রাতের মধ্যেই শেষ করতে হবে একটা জরুর কাজ।

নয়

কিছুক্ষণের জন্যে—কতক্ষণ তা বলতে পারবে না—আতঙ্কে পাথর হয়ে রই জাহিদ। চোদ্দ বছর বয়সে বন্ধুর সঙ্গে সমুদ্রে গোসল করতে নেমে ডুবে যে বসেছিল ও। পরে মনে হয়েছে সেদিনও সে এতটা ভয় পায়নি। মৃত্যুভয়ও এ অভিজ্ঞতার কাছে হেরে গেল।

চেয়ারে বসে—ঠিক বসে নয়, সামনের দিকে ঝুঁকে উপুড় হয়ে আছে জাহি রিসিভারটা দু'হাতে চেপে ধরে রেখেছে। মোনা দরজায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস কর কার ফোন, কি হয়েছে—সবই শুনতে পাচ্ছে ও, কিন্তু একচুল নড়তে পারছে ন কথা বলারও শক্তি নেই।

হঠাৎ করেই আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। বাতাসের জন্যে হাঁসফাঁস করে উঠ ফুসফুসটা। বুক ভরে অক্সিজেন টেনে নিল জাহিদ। হৃৎপিণ্ডটা বুকের খাঁচা থে বেরিয়ে আসবে বলে মনে হচ্ছে।

মোনা দৌড়ে এসে ওর হাত থেকে রিসিভারটা কেড়ে নিয়ে 'হ্যালো' 'হ্যা করছে। ওদিক থেকে কোন সাড়া পাচ্ছে না। জাহিদ জানে লাইনটা কেটে দে হয়েছে। ঠকাশ করে রিসিভারটা ক্রেডলে নামিয়ে রাখল মোনা।

উঃ! কি ভয়ঙ্কর আর্তনাদ!

'হাসনা আপা,' মোনার প্রশ্নবোধক চোখে চেয়ে কোনমতে বলতে পার জাহিদ, 'কি বলছিলেন ভালমত বুঝতে পারিনি, চিৎকার করছিলেন।'

'হাসনা আপা! কি বলছ তুমি? উনি কেন চিৎকার করবেন?'

'ও ছিল সেখানে। আমি জানি ও ছাড়া আর কেউ নয়। প্রথম থেকেই জানি আজ বিকেলে…এই একটু আগে…আবার পাখিদের শব্দ শুনেছি আমি, আগে বারের মত।'

'কি বলছ তুমি?' হাঁটু গেড়ে জাহিদের সামনে মেঝেতে বসে পড়ল মোনা।

'কিছুক্ষণের জন্যে চেতনা হারিয়েছিলাম, তখন আবোল-তাবোল কয়েক শব্দ লিখেছিলাম একটা কাগজে। ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি টুকরোগুলো ওয়েস্ট পেপ বাস্কেটে। মোনা, ওই শব্দগুলোর মধ্যে হাসনা আপার নামও ছিল…আর…আর…

'আর…আর কি?' জাহিদের দু'কাঁধ ধরে ঝাঁকাচ্ছে মোনা।

'হাসনা আপার বসার ঘরে একটা পেইন্টিং আছে, তোমার মনে পড়ে আসিফ খোন্দকারের "চিরদিনের জন্যে"। শেষবার যখন আমরা গিয়েছিলা

BanglaBook.org

তখনই লক্ষ করেছিলাম ছবিটা। কাগজে "চিরদিনের জন্যে" লেখাটাও ছিল। আমি ওটা লিখেছিলাম, কারণ তখন আমি...মানে আমার কিছু অংশ ওখানে ছিল...ওর চোখে আমিই দেখছিলাম ছবিটা...' জাহিদের বিস্ফারিত চোখ দুটো অস্থির, কালো মণির চারধারে সাদা অংশ বেরিয়ে পড়েছে। 'এটা টিউমার না, মোনা। অন্তত শরীরের ভেতরের কোন টিউমার না।'

'কি বলছ তুমি আমি যে কিচ্ছু বুঝতে পারছি না,' মোনা রীতিমত চিৎকার করে উঠল।

'রশিদ ভাইকে ফোন করতে হবে,' কোত্থেকে এত শক্তি পাচ্ছে নিজেই বুঝতে পারছে না জাহিদ, মনে হচ্ছে ওর হয়ে অন্য কেউ সবকিছু করে যাচ্ছে। 'রশিদ ভাইকে সাবধান করতে হবে, বিপদ ঝুলছে ওনার মাথায়।'

'তোমার কথাবার্তার কোন আগামাথাই যে পাচ্ছি না!'

হাসনা আপা কি বেঁচে আছেন? খোদা, চরম কোন ক্ষতি না হয়ে যায়! 'বাঁচাও আমাকে, ভাই! কেটে ফেলছে লোকটা আমাকে...' স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে জাহিদ এখনও। আর কি কি লিখেছিল ও লীফার রসিদের পেছনে? 'কাটা'...হ্যাঁ, 'কাটা'-ই লেখা ছিল। আর ছিল 'মৃত্যু'! হায় আল্লাহ্!

কিন্তু রশিদ ভাইকে ফোন করলে উনি তো সঙ্গে সঙ্গে ছুটবেন হাসনা আপার ফ্ল্যাটে। খুনী যদি ওখানেই ওঁৎ পেতে বসে থাকে! জাহিদ রশিদ ভাইকে ফোন করবে প্রথমে, এটাই হয়ত চাচ্ছে সে। না, কিছুতেই এ ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না।

'জাহিদ, প্লীজ...কি হয়েছে বল!' রক্ত সরে গেছে মোনার মুখ থেকে।

'এ সেই লোকটা যে শরীফ চাচা আর আমিন ইকবালকে খুন করেছে। হাসনা আপাকে...ভয় দেখাচ্ছিল। হাসনা আপা চিৎকার করছিলেন। লাইনটা কেটে দেয়া হয়েছে তখনই।'

'হায় খোদা! কি করি...কি করব...' থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে মোনা, মনে হচ্ছে এখুনি অজ্ঞান হয়ে যাবে।

'শান্ত হও, মোনা,' ওর ঠাণ্ডা শরীরটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরল জাহিদ, 'এখন ধৈর্য হারাবার সময় না। হাসনা আপার ফোন নাম্বারটা তোমার মুখস্থ আছে?'

উপর-নিচে মাথা ঝাঁকাল মোনা।

'ফোন কর তো ওখানে, রিসিভ করেন কিনা দেখি!' রিসিভারটা তুলে হাতে দিল জাহিদ।

দু'হাতে রিসিভারটা বুকে চেপে ধরে নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করছে মোনা, চোখ বন্ধ। তারপর কাঁপা হাতে ডায়াল ঘোরাবার চেষ্টা করল।

রশিদ ভাইকে ফোন করা এ মুহূর্তে বোকামি হবে। পুলিসে জানালে কেমন হয়? একশোটা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে, তাছাড়া যদি গুরুত্ব না দেয়? পুলিসী তৎপরতা সম্বন্ধে খুব অল্প ধারণাই আছে ওর।

ইন্সপেক্টর শাহেদ রহমান।

হ্যাঁ, ওনাকেই আগে ফোন করা উচিত। উনি যদি ঢাকার পুলিসকে ফোন

BanglaBook.org

করেন, তাহলেই ওরা ব্যাপারটাকে সিরিয়াসলি নেবে। সবকিছু খুলে বলা ছাড়া এ মুহূর্তে আর কোন পথ খোলা নেই। বিশ্বাস করুক বা না করুক সেটা আলাদা কথা। কিন্তু বলতেই হবে।

কিন্তু আগে হাসনা আপা।

'জাহিদ, বিজি টোন্ পাচ্ছি।' লাইনটা কেটে আবার ডায়াল ঘোরাল মোনা। এবারও এক ঘেয়ে বিপ্ বিপ্ আওয়াজ ভেসে এল।

জাহিদ ওর হাত থেকে রিসিভারটা নিয়ে ক্রেডলে রেখে দিল। হাসনা আপা কি কারও সঙ্গে কথা বলছেন? অথবা রিসিভারটা তুলে রেখেছেন? আর...আর না হলে রুস্তম শের টেলিফোনের তার কেটে দিয়েছে। হাসনা আপাকে যেভাবে কেটেছে, ঠিক সেইভাবে।

ক্ষুর। শিউরে উঠল জাহিদ। কাগজে ও 'ক্ষুর' কথাটাও লিখেছিল।

অনেক কষ্টে প্রায় দশ মিনিট পর পতেঙ্গা থানার লাইন পাওয়া গেল। এর মধ্যে তিনবার হাসনা আপার ফ্ল্যাটে ফোন করার চেষ্টা করেছে, প্রতিবারেই লাইন বিজি পেয়েছে। ইন্সপেক্টর শাহেদ রহমান আধ ঘণ্টা আগেই ডিউটি শেষ করে বাসায় চলে গেছেন। কনস্টেবল্ হাশেম মৃধা, যিনি ফোন ধরেছেন, শাহেদ রহমানের বাসার নাম্বার দিতে চাইছিলেন না।

'দেখুন, এটা একটা এমার্জেন্সি। আমি ঢাকা থেকে ফোন করছি, আমার নাম জাহিদ হাসান। গতকাল ইন্সপেক্টর শাহেদ আমাকে অ্যারেস্ট করতে এসেছিলেন,' বলার সঙ্গে সঙ্গে কর্মতৎপর হয়ে উঠলেন কনস্টেবল্। এরপর নাম্বার দিতে দ্বিধা করলেন না।

দুটো রিঙ হতেই ওদিক থেকে ফোন তুলল বাচ্চা একটা ছেলে, জাহিদ ইন্সপেক্টর শাহেদকে চাইতে চেঁচিয়ে ডাকল ছেলেটা, 'আব্বু, ফোন!'

সময় কেটে যাচ্ছে দ্রুত। হাসনা আপা কেমন আছেন, কে জানে!

'হ্যালো,' মনে হচ্ছে যেন অনন্তকাল পরে ফোন ধরল শাহেদ।

'আমি জাহিদ বলছি। ঢাকায় আমার এক পরিচিতা মহিলা ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে আছেন। গতকাল আমরা যে বিষয়ে কথা বলছিলাম, ঘটনাটা তার সঙ্গে জড়িত।'

'বলতে থাকুন,' নির্বিকার শোনাল শাহেদের কণ্ঠ।

'মহিলার নাম হাসনা...হাসনা তালুকদার। রশিদ তালুকদারের প্রাক্তন স্ত্রী, গতকাল ওনাদের কথা বলেছিলাম আপনাকে। একটু আগে হাসনা আপা ফোন করেছিলেন আমার বাসায়। চিৎকার করছিলেন, কাঁদছিলেন, সব কথা ভালমত বুঝতে পারিনি। পাশে একটা লোক ছিল, নিচু গলায় ধমকাচ্ছিল ওঁকে যাতে পরিষ্কার করে কথা বলে, কারণ তখনও আমি চিনতে পারিনি কে ফোন করেছে। তখন উনি যা বললেন...একটা লোক নাকি ওঁকে আক্রমণ করেছে...কেটে ফেলতে চাচ্ছে...ওই রকম কিছুই বলছিলেন,' ঢোক গিলল জাহিদ। 'হাসনা আপার গলা চিনতে পেরেছি আমি তখন। পরিষ্কার শুনতে পেলাম পাশ থেকে লোকটা ধমকে উঠল...মনে হয় বাজে গালি দিয়ে উঠেছিল। হাসনা আপা চিৎকার

BanglaBook.org

করে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ লাইনটা কেটে গেল। বার বার ফোন করেও লাইন পাচ্ছি না আর, বিজি টোন্ আসছে।'

শুনতে শুনতে সাদা হয়ে যাচ্ছে মোনা। হায় আল্লাহ্! ও না আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলে!

'ঠিকানাটা বলুন,' শাহেদ দরকারের বেশি কথা বলছে না।

ইন্সপেক্টরের প্রতি আস্থা বাড়ল জাহিদের। উত্তর দেবার আগে ভুরু কুঁচকে একটু চিন্তা করল, '২৩/৪, বেইলি রোড, দোতলায়। সাদা রঙের আটতলা ফ্ল্যাট বাড়ি।' মোনার দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠল জাহিদ, টলছে ও। ঝট করে হাত বাড়িয়ে ওকে ধরে সোফায় বসিয়ে দিল। 'মোনা, অ্যাই মোনা, শুয়ে পড়ো ওখানেই...'

'জাহিদ সাহেব?'

'সরি। আমার স্ত্রী একটু আপসেট হয়ে পড়েছে, মনে হচ্ছে অজ্ঞান হয়ে গেছে।'

'অস্বাভাবিক কিছু নয়। আপনি ঠিক আছেন তো?'

'হ্যাঁ,' অসহায় ভাবে বলল জাহিদ, টেলিফোন ছেড়ে মোনার কাছে যেতে পারছে না।

'গুড। ফোন নাম্বারটা কত?'

'ফোন তো বিজি পাচ্ছি!'

'তা-ও নাম্বারটা দরকার।'

'ও, হ্যাঁ,' নিজেকে বোকার মত মনে হল, 'সরি।' নাম্বারটা বলল ও, বার বার করতে গিয়ে মুখস্থ হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই।

'কতক্ষণ আগে ফোনটা এসেছিল?'

মনে হচ্ছে যেন কয়েক ঘণ্টা কেটে গেছে!

'জাহিদ সাহেব?'

চমক ভাঙল জাহিদের। 'আধ ঘণ্টার মত। পতেঙ্গার লাইন পেতেই দেরি হয়ে গেল।'

'ঠিক আছে। আমি এক্ষুণি ঢাকায় ফোন করছি। আপনি বাসাতেই থাকুন, কোথাও যাবেন না।'

'রশিদ ভাই...রশিদ ভাইকেও সাবধান করতে হবে। হাসনা আপার যদি কিছু হয়ে যায়, তবে উনিও বিপদের মধ্যে আছেন।'

'আপনার কি মনে হয় এই লোকই আমিন ইকবালকে খুন করেছে?'

'কোন সন্দেহ নেই আমার।' একটু ইতস্তত করে আবার বলল, 'আমি জানি ও কে।'

'ঠিক আছে। আমি আপনাকে ফোন করব একটু পরেই। রশিদ তালুকদারের ফোন নাম্বার আর ঠিকানাটা দিন।'

ফোন রেখে মোনার পাশে মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসল জাহিদ। ওর ঠাণ্ডা গালে আঙুল ছোঁয়াল। তিরতির করে কেঁপে উঠল ওর চোখের পাপড়ি।

BanglaBook.org

'ওটা কে, জাহিদ? রুস্তম শের, নাকি গালকাটা জয়নাল?'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল জাহিদ। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'ওদের মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে? তুমি এখানেই শুয়ে থাক, আমি চা করে আনছি।'

সময় আর কাটছে না।

নির্বাক হয়ে বসে রইল ওরা দু'জন পাশাপাশি। ফোনটাও নীরব। শুধু দোতলার শোবার ঘর থেকে রূপক-রুমকির হাসির শব্দ ভেসে আসছে মাঝে মাঝে। পিচ্চি ওদের সঙ্গে খেলা করছে।

জাহিদের প্রচণ্ড ইচ্ছে করতে লাগল হাসনা আপার বাসায় আর একবার চেষ্টা করে দেখতে, কিন্তু শাহেদ যদি ঠিক সেই সময় ফোন করে? অস্থির হয়ে উঠল জাহিদ, হাসনা আপা কি বেঁচে আছেন?

রুস্তম শের নিশ্চয়ই এতক্ষণে কেটে পড়েছে। জাহিদ জানে ও কতটা বুদ্ধিমান, ওরই তো সৃষ্টি! কিন্তু কোন বুদ্ধিমান লোক কি রুস্তম শেরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করবে? রুস্তম শের আর গালকাটা জয়নাল কাল্পনিক চরিত্র ছাড়া আর কিছু নয়। বাস্তবে এদের কোন অস্তিত্বই নেই। জর্জ ইলিয়ট, মার্ক টোয়েন, নীললোহিত, যাযাবর বা বনফুল নামে যেমন কেউ ছিল না, ছিল না বিদ্যুৎ মিত্র নামে কেউ। রুস্তম শের এদের চাইতে ভিন্ন কেউ নয়। ইন্সপেক্টর শাহেদ কি বিশ্বাস করবে? বিশ্বাস তো জাহিদও করেনি, কিন্তু এখন যে অবিশ্বাসের অবকাশ নেই।

'এখনও কেন ফোন করছে না?' মোনাও সমান অস্থির।

ঘড়ির দিকে তাকাল জাহিদ, 'মাত্র তো পাঁচ মিনিট হল।'

কেমন করে ঘটল ব্যাপারটা? কেমন করে কবর থেকে উঠে এল রুস্তম শের? ড্রাকুলা বা ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের গল্প তো আর বাস্তবে ঘটে না! ইন্সপেক্টর শাহেদ ওর জুতোর মাপ জানতে চেয়েছিল। কেন? কোথায় পেয়েছে ওরা পায়ের ছাপ? নিশ্চয়ই পতেঙ্গার আশেপাশে কোথাও। কবরস্থানে নয়ত? যেখানে সোহানা মল্লিক নকল কবর সাজিয়ে ওদের ছবি তুলেছিল?

'মন্দ এক লোক ছিল সে,' বিড়বিড় করে উঠল জাহিদ।

'কি বললে?'

ঠিক সেসময় ফোনটা বেজে উঠল প্রচণ্ড শব্দ তুলে। চমকে ওঠায় দু'জনের কাপ থেকেই ছলকে পড়ল চা।

সে নয় তো!

'জাহিদ সাহেব?'

'ওহ্! ইন্সপেক্টর শাহেদ, হাসনা আপা কেমন আছেন?'

'ঠিক জানি না। পুলিস রওনা হয়ে গেছে। রশিদ সাহেবের ওখানেও গেছে একদল। আমি ওদেরকে বলেছি উন্মাদ এক লোক "শনিবারে" ছাপা আর্টিকেলের সঙ্গে জড়িত লোকজনদের খুন করছে এক এক করে।'

BanglaBook.org

পাশ থেকে মোনা অনবরত জিজ্ঞেস করে যাচ্ছে কি হল। ওকে বুঝিয়ে বলে আবার ফোনে ফিরে এল জাহিদ, 'সবকিছুর জন্যে ধন্যবাদ, শাহেদ সাহেব।'

'এটা তো আমার পেশা। তবে এই মুহূর্তে না চাইলেও খুব তাড়াতাড়ি কর্তৃপক্ষ কৈফিয়ত চাইবে, তখন আমি কি বলব?'

'আপনি কি আজই একবার ঢাকা আসতে পারেন? সবকিছুই খুলে বলব।'

'জাহিদ সাহেব, আপনার কেসটা যদিও আমার আওতায় পড়ে, তবুও প্রতিদিন ঢাকা আসা যাওয়া করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এখানে প্রচুর কাজ পড়ে আছে। আপনি ফোনে বললেই ভাল হয়।'

'তাহলে আমি অপেক্ষা করব।'

'আপনার স্ত্রী কেমন আছেন?'

'সামলে নিয়েছে। আচ্ছা, আগামীকালও কি আসতে পারবেন না?'

'চেষ্টা করব, যদি ঘটনা খারাপের দিকে মোড় নেয়।'

'শাহেদ সাহেব, আপনি পায়ের ছাপের কথা বলেছিলেন না?'

'হ্যাঁ,' অবাক হল শাহেদ।

'ছাপগুলো পতেঙ্গা এলাকাতেই পাওয়া গেছে, তাই না?' পাশে বসা মোনার চেহারা আবার পাংশুটে হয়ে যাচ্ছে—বড় বড় দেখাচ্ছে চোখ দুটো।

'আপনি কেমন করে জানলেন?'

'শনিবারের লেখাটা পড়েছেন?'

'হ্যাঁ। বাড়ি ফিরেই ওটা পড়েছি।'

'রুস্তম শেরের কবরের ছবিটা দেখেছেন? ওটা তোলা হয়েছে পতেঙ্গা কবরস্থানে। পায়ের ছাপটা সম্ভবত ওখানেই পেয়েছেন আপনারা।'

'যাব্বাবা!'

'বুঝতে পারলেন কিছু?'

'কিছুটা। নিজেকে রুস্তম শের ভাবছে লোকটা। কবর থেকে উঠে আসার ভান করেছে ব্যাপারটাকে নাটকীয় করে তোলার জন্যে। আচ্ছা, ছবিটা কে তুলেছিল?'

'সোহানা মল্লিক নামে এক ফটোগ্রাফার।'

'ফ্রিল্যান্সার? ঢাকাতেই থাকেন?'

'আমি ঠিক জানি না। তবে ঢাকায় থাকেন বলেই মনে হয়।'

'তাহলে তো বিপদে আছেন ভদ্রমহিলা। আর লেখাটা যিনি লিখেছেন?'

'খান জয়নুল। শনিবারে যোগাযোগ করলেই ঠিকানা-ফোন নাম্বার পাওয়া যাবে।'

'পত্রিকার কোথাও উল্লেখ করা হয়নি ছবিটা কোথায় তোলা হয়েছে। এমনকি এত কাছে থেকে আমিও চিনতে পারিনি। কিন্তু লোকটা সেটা জানল কিভাবে?'

ইন্সপেক্টরের প্রতি শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল। এই লোকের উন্নতি কেউ ঠেকাতে পারবে না। একটু চিন্তা করে উত্তর দিল জাহিদ, 'ভেতরের সব খবরই ও রাখে, কিভাবে তা জানি না।'

BanglaBook.org

'জাহিদ সাহেব, কিছু গোপন না করে খুলে বলুন।'

চমকে উঠল জাহিদ। পুলিস সম্বন্ধে কত কম ধারণাই না ছিল! এ যে রীতিমত বিচক্ষণ! বিস্ময় গোপন করার চেষ্টা করল জাহিদ, 'কি বলছেন?'

'দেখুন, আপনি আমার চেয়ে অনেক বেশি জানেন। সেটুকুই শুধু জানতে চাচ্ছি। না জানলে আমি আমার কর্তব্য ঠিকভাবে করতে পারব না। কি গোপন করে যাচ্ছেন আপনি?'

'শাহেদ সাহেব, শুনলে আপনি হেসে ফেলবেন। না, ভুল বললাম, এখন আর হাসবেন না। তবে আমাকে হয় মিথ্যেবাদী ভাববেন নয়ত ভাববেন পাগল।'

'চেষ্টা করে দেখুন তো!'

মোনার দিকে চাইল জাহিদ, একটু ইতস্তত করল, তারপর নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'না, মুখোমুখি না হলে বলা ঠিক হবে না। তবে লোকটার চেহারার বর্ণনা দিতে পারি, পুলিসের যদি তাতে উপকার হয়।'

'বলুন।'

ঈশ্বরের দেয়া বাইরের চোখ দুটো বন্ধ করে ভেতরের তৃতীয় নয়নটা খুলল জাহিদ। ওর ভক্তরা ওকে দেখে সবসময়ই হতাশ হয়। সত্যি বলতে কি সাড়ে পাঁচ ফুট উচ্চতা, পাতলা হয়ে আসা চুল, ভারী দেহ আর অতি সাধারণ চেহারার পেছনে দুর্ধর্ষ লেখককে খুঁজে বের করা দুষ্কর। কিন্তু বাইরের জগতের কেউই ওর এই তৃতীয় নয়নের খবর রাখে না। এই তৃতীয় নয়নই ওকে মানুষ চিনতে সাহায্য করে, ঠিক সময়ে ঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। অন্ধকারে লুকানো এই তৃতীয় নয়নই ওর সাফল্যের চাবিকাঠি।

'ও বেশ লম্বা। ছ'ফিট তিন কি চার। লালচে লম্বা ঢেউ খেলানো চুল। কটা চোখ। লঙ ভিশন খুব ভাল। বছর পাঁচেক আগে চশমা নিয়েছে, শুধু পড়া আর লেখার সময় দরকার হয়। উচ্চতার জন্যে নয়, ওকে চোখে পড়ে প্রস্থের কারণে। একটুও মোটা নয়, কিন্তু চওড়া শরীর, বক্সারের মত। গলার মাপ সাড়ে আঠারো কি উনিশ। আমার বয়সীই হবে, কিন্তু এখনও তারুণ্যে দীপ্যমান। স্টিভেন সিগাল বা আর্নল্ড শোয়ার্জেনেগারের ব্যক্তিত্বে যেমন একটা শক্তি বিচ্ছুরিত হয়, ওরও তাই।

'খুলনায় জন্ম ওর। বাবা-মা মারা গেছেন ছেলেবেলায়। সারা দেশে ঘুরে বেড়ালেও স্থায়ী ঠিকানা এখনও খুলনাতেই। অত্যন্ত বিপজ্জনক চরিত্র, সত্যি বলতে কি উন্মাদ, ম্যানিয়াক। বাঁ গালে একটা লম্বা কাটা দাগ আছে। গায়ের রঙ অস্বাভাবিক ফর্সা বলে সেটা হালকা দেখায়।

'কালো রঙের ফোর্ড এসকর্ট চালায়। কোন্ বছরের তা ঠিক বলতে পারব না। সম্ভবত খুলনার নাম্বার প্লেট। ওহ্! আর একটা ব্যাপার। পেছনের বাম্পারে কার্টুনের একটা রঙিন স্টিকার লাগানো আছে, তাতে লেখা—'ওস্তাদের মাইর শেষ রাতে।'

চোখ খুলল জাহিদ।

আহত বিস্ময়ে চেয়ে আছে মোনা।

BanglaBook.org

লাইনের ওদিকটা পুরোপুরি নিঃশব্দ।

'শাহেদ সাহেব, হ্যালো…'

'এক মিনিট, আমি লিখছি,' আরও দশ সেকেণ্ড পর কথা বলল শাহেদ, 'ওকে, কিন্তু কিভাবে তাকে চেনেন আর নাম কি সেটা বলবেন না?'

'সেটা আগামীকালের জন্যে থাকুক। তাতে এমন কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। হয়ত এখন ছদ্মনাম ব্যবহার করছে।'

'রুস্তম শের।'

'গালকাটা জয়নালের চেয়ে রুস্তম শের নামটাই বেশি বাস্তব গ্রাহ্য।'

'আজ আর কিছুই বলবেন না?'

'না।'

'ঠিক আছে। পরে যোগাযোগ করব।' কোনরকম বিদায় সম্ভাষণ না করেই লাইন ছেড়ে দিল শাহেদ।

মোনা আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি ওনাকে সবকিছুই বলে দেবে?'

'হ্যাঁ। কর্তৃপক্ষকে কতটা জানাবেন ওটা তাঁর ব্যাপার।'

'এত কিছু! জাহিদ, ওর সম্পর্কে এত কিছু কেমন করে জানলে তুমি?'

সেটা নিজেও জানে না জাহিদ।

ঠিক পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর ফোন বেজে উঠল। রশিদ তালুকদার পুলিস প্রহরায় আছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী—এখন সত্যিকার অর্থেই যিনি চিরদিনের জন্যে প্রাক্তন স্ত্রী হয়ে গেলেন—তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছেন। হাসনা তালুকদারের মৃতদেহ মর্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সোহানা মল্লিককেও পুলিস প্রোটেকশনে রাখা হয়েছে। কিন্তু খান জয়নুলকে এখনও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

'হাসনা আপাকে কিভাবে হত্যা করা হয়েছে?' জানতে চাইল জাহিদ।

'ধারাল অস্ত্র দিয়ে গলা কেটেছে,' নিষ্ঠুর শোনাল শাহেদের কণ্ঠ, 'এখনও জেদ করে আছেন কিছু বলবেন না?'

'না। আগামীকাল হবে সব। যখন মুখোমুখি কথা হবে।'

'পুলিসকে রুস্তম শেরের চেহারার বর্ণনা জানিয়ে দিয়েছি।'

জাহিদ জানে ও নিজে ধরা না দিতে চাইলে পুলিসের বাপেরও সাধ্য নেই ওকে ধরে।

'জাহিদ সাহেব, কাল রাত ন'টার দিকে বাসায় থাকবেন।'

রাতে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমাল মোনা। পৌনে তিনটা পর্যন্ত বিছানায় এপাশ-ওপাশ করল জাহিদ। অবশেষে উঠে বাথরুমে এল। জলবিয়োগ করতে করতে হঠাৎ করে মনে হল চড়ুই পাখি ডাকছে, পরক্ষণেই বুঝল ওটা ঝিঁঝি পোকা। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই অন্ধকারে বাসার সামনে পার্ক করা পুলিসের গাড়িটাকে দেখতে পেল। ভেতরে দুটো লালচে আলোর বিন্দু, সিগারেট খাচ্ছে

BanglaBook.org

কেউ। পুলিস পাহারা? নাকি ও গৃহবন্দী? যাই হোক না কেন, অনেকটা নিশ্চিত হল জাহিদ।

বিছানায় ফিরেই ঘুমিয়ে পড়ল দ্রুত। সকাল আটটায় যখন ঘুম ভাঙল, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। আজ রাতে কোন দুঃস্বপ্ন দেখেনি। তবে সত্যিকারের দুঃস্বপ্ন ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছে। বাইরে কোথাও।

দশ

রুস্তম শের ভাবতেই পারেনি হিটলারী গোঁফওয়ালা জোকার মত চেহারার খান জয়নুল ওকে এতটা ভোগাবে।

খান জয়নুলের জন্যে অপেক্ষা করছিল সে সন্ধ্যার পর থেকেই। মালিবাগ এলাকার একটা গলির ভেতর তিনতলা এক বাড়ির ওপর তলায় থাকে লোকটা। তাই ভেবেচিন্তে গলির বাইরে অপেক্ষা করাই ভাল মনে হয়েছে। শুধু শুধু ঝামেলা পাকিয়ে লাভ কি!

রাত বারোটার কিছু পরে অবশেষে গলির মুখে এসে দাঁড়াল বেবী ট্যাক্সিটা। খান জয়নুলকে নামতে দেখে নিঃশব্দে রাস্তার উল্টোদিকের দোকানের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রুস্তম শের। অপেক্ষা করতে বিরক্ত লাগলেও এ মুহূর্তে তার জন্যে কোন অনুশোচনা নেই। রাত দশটার পর থেকেই রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে গেছে, এগারোটার পর কোন জানালায় আর আলো দেখা যাচ্ছে না। একেই বলে ভাগ্য।

খান জয়নুল বেবী ট্যাক্সির ভাড়া মিটাচ্ছে। দ্রুত রাস্তা পার হয়ে এপারে চলে এল রুস্তম শের। খান জয়নুল ওকে দেখেনি, গলির মধ্যে ঢুকে হাঁটতে শুরু করল। রুস্তম শের ওর পিছু নিল। লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে এল ঠিক ঘাড়ের পেছনে। ইচ্ছে করেই খুক খুক করে কাশল, যাতে খান জয়নুল পেছনে ফিরে তাকায়, এতে ওর কাজটা সহজ হয়ে পড়বে।

হিসাব মত ঠিকই ঘুরে তাকাতে গেল খান জয়নুল। তিলার্ধ দেরি না করে ক্ষুরটা অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরিয়ে নিয়ে কোপ মারল রুস্তম শের। আর ওকে অবাক করে দিয়ে চিতাবাঘের মত ক্ষিপ্রতায় মাথাটা সরিয়ে নিল মধ্যবয়সী লোকটা। অবশ্য আঘাতটা পুরোপুরি কাটাতে পারল না। কপালের এধার থেকে ওধার পর্যন্ত লম্বা একটা ক্ষত সৃষ্টি হল, সাদা হাড় বেরিয়ে পড়েছে। ভাঁজ করা কাগজের মত কপালের চামড়া ঝুলে পড়েছে ভুরুর ওপর।

'বাঁচাও!' গগনবিদারী চিৎকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল খান জয়নুল।

ধ্যাত্তেরিকা! ঘাপলা বাধবে না তো! কি আর করা যাবে, সবকিছু তো আর প্ল্যান মত হয় না। তবে কপাল থেকে নেমে আসা রক্তস্রোতে অন্ধ হয়ে গেছে লোকটা, সেটাই যা বাঁচোয়া।

BanglaBook.org

ক্ষুরটা স্যালুটের ভঙ্গিতে কপালের পাশে তুলল রুস্তম শের, তারপর ঝটিতি নামিয়ে আনল লোকটার গলা লক্ষ্য করে। আশ্চর্য! এবারেও ঠিক সময় মত গড়িয়ে সরে গেল সে। সেই সঙ্গে গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে। ক্ষুরটা ওর গলার চামড়া স্পর্শ করেছে মাত্র। সময় নষ্ট না করে আবার ছোবল মারল রুস্তম শের। কিন্তু খান জয়নুল ডান হাতে তা ঠেকাতে চেষ্টা করল। ক্ষুরটা আড়াআড়ি ভাবে আঘাত হানল ওর হাতের তালুতে। তিনটে আঙুল গোড়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঝুলতে থাকল, মধ্যমায় আঙটি পরা ছিল বলে সেটা অক্ষত রইল। আঙটিতে ঘষা লেগে ক্ষুরটা ধাতব শব্দ তুলল। সমানে চিৎকার করে চলেছে লোকটা। নাহ! এখুনি লোকজন বেরিয়ে আসবে।

বিরক্ত হল রুস্তম শের।

দু'একটা বাড়িতে আলো জ্বলে উঠেছে। ডানদিকের একতলা বাড়িটার দরজা খুলে বেরিয়ে এল এক যুবক, ঘুম ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'কে? কি হচ্ছে ওখানে?'

ঘাড় ঘুরিয়ে সেদিকে তাকাল রুস্তম শের, 'খুন-জখম হচ্ছে। আপনাকে কিছুটা দেব?'

নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল যুবক, সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

এদিকে সুযোগ পেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ছুটতে শুরু করেছে খান জয়নুল। জ্বালিয়ে মারল দেখছি! ধৈর্য হারিয়ে দৌড়াতে শুরু করল রুস্তম শের। পেছন থেকে আলতো করে ওর ঘাড়ে ক্ষুরটা ছোঁয়াল। আবারও ওকে অবাক করে দিয়ে কচ্ছপের মত ঘাড়টা ভেতরে ঢুকিয়ে কুঁজো হয়ে ছুটছে লোকটা, চামড়ায় শুধু একটু আঁচড় লাগল মাত্র। কি ব্যাপার! লোকটা টেলিপ্যাথিক নাকি? কেমন করে আঘাতগুলো কাটাচ্ছে? মেজাজ খারাপ হয়ে গেল ওর।

আশেপাশের বাড়িগুলোতে আলো জ্বলে উঠতে শুরু করেছে। জানালায় উঁকি দিচ্ছে কৌতূহলী মুখগুলো। সঙ্গে সঙ্গে ঝটাঝট বন্ধ হতে শুরু করল খোলা জানালাগুলো।

নিজের বাড়ির গেটে পৌঁছে গেছে লোকটা।

রাগে জ্বলে যাচ্ছে রুস্তম শের। পেছন থেকে ধমকে উঠল, 'হনুমানের বাচ্চা! থাম্, থাম্ বলছি!'

এর মধ্যেও অবাক হয়ে পিছনে ঘুরে তাকাল খান জয়নুল। কে এই লোক! পরক্ষণেই সিঁড়িতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। বিনা দ্বিধায় ওর তলপেটে লাথি কষাল রুস্তম শের।

'শেষ পর্যন্ত ব্যাটারি শেষ হয়েছে, তাই না?' ঝুঁকে পড়ে ওর চুল মুঠো করে ধরল সে।

সিঁড়ির গোড়ায় একতলার দরজাটা খুলে গেল। ম্যাক্সি পরা কম বয়েসী একটা মেয়ে মুখ বাড়াল। সঙ্গে সঙ্গে বাইরের দৃশ্য দেখে ভয়ে চিৎকার করে উঠে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

দেরি না করে দ্রুত কাজ সেরে নিল রুস্তম শের। ধড় থেকে মাথাটা প্রায়

BanglaBook.org

আলাদা হয়ে গেছে। বহুত ভুগিয়েছে ব্যাটা। পারলি শেষ পর্যন্ত?

দ্রুত গলিতে চলে এল রুস্তম শের। নষ্ট করার মত সময় একটুও নেই। রাস্তায় ওঠার মুহূর্তে ওকে পাশ কাটিয়ে একটা পুলিসের জীপ ঢুকল গলিতে। এত তাড়াতাড়ি পুলিস চলে এল? অসম্ভব। পুরো ব্যাপারটা ঘটতে মিনিট পাঁচেকের বেশি লাগেনি। কেউ যদি ফোন করেও থাকে, পুলিস এত তাড়াতাড়ি কিছুতেই পৌঁছাতে পারবে না। তাহলে হয়ত খান জয়নুলকে পাহারা দিতে এসেছে। যা ব্যাটারা, ভাল করে পাহারা দে।

সোহানা মল্লিক থাকে মগবাজারের নতুন তৈরি বিলাসবহুল একটা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিঙের আটতলায়। বলতে গেলে একরকম একাই থাকে। ষাট বছরের বৃদ্ধা হানিফা বিবি ওকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে এককালে, এখনও সে-ই দেখাশোনা করে। সোহানার বাবা-মা গত দশ বছর ধরে আবুধাবীতে আছেন, সোহানাও কিছুদিন সেখানেই ছিল। কিন্তু পড়াশুনার সুবিধার জন্যে এখন পাকাপাকি ভাবে দেশে চলে এসেছে। প্রথম প্রথম চাচার বাসায় থেকেই কলেজে পড়ত। কিন্তু ওর খামখেয়ালী, কেয়ার ফ্রি অতি-আধুনিক চালচলন ওঁরা ঠিক মেনে নিতে পারেননি, পদে পদে মন কষাকষি হত। তাই মেয়ের মন বুঝে ওর বাবা-মা মগবাজারের সেই অ্যাপার্টমেন্টটা কিনে নিয়েছেন। সোহানা একাই থাকে, গ্রাম থেকে হানিফা বিবিকে আনিয়ে নিয়েছেন ওর বাবা-মা, সে-ই রান্নাবান্না ঝাড়ামোছা করে। পঁচিশ বছর বয়সেও সোহানা মল্লিকের আচরণ কিশোরীর মত। আকর্ষণীয় চেহারা, বয় কাট্ চুল। লম্বা ঢোলা কুর্তা আর জিন্স পরে থাকে অধিকাংশ সময়। আর্ট কলেজে পড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে ফ্রি ল্যান্সার ফটোগ্রাফার হিসেবে বেশ নাম করে ফেলেছে ইতিমধ্যেই। ওর তোলা একটা ছবি গত বছর পুরস্কার পেয়েছে।

কনস্টেবল জলিল আহমেদ আর কামাল মিয়া সোহানা মল্লিকের বাসায় পৌঁছেছে রাত সাড়ে দশটায়। প্রথমে একটু অবাক হলেও ঘটনাটা জানার পর ভয় পাওয়ার বদলে সোহানা বাচ্চা মেয়ের মত খুশি হয়ে উঠল। কেউ ওকে খুন করতে চাইছে, আর ওকে পাহারা দেবার জন্যে পাঠানো হয়েছে দু'জন রক্তমাংসের পুলিসকে! এরকম দারুণ উত্তেজনাকর ঘটনা মানুষের জীবনে ক'বার ঘটে! জাহিদ হাসানের ছবিগুলো তোলার ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন করছিল কনস্টেবল দু'জন, ক্যামেরায় ফিল্ম ভরতে ভরতে জবাব দিচ্ছিল সোহানা। একটু অবাক হয়ে কনস্টেবল জলিল জানতে চায় ও কি করছে। এক গাল হেসে সোহানা বলল, 'কখন ছবি তোলার দরকার পড়বে কেউ কি জানে? রেডি থাকাই ভাল।' তারপর রান্নাঘরের দিকে ছুটতে ছুটতে চেঁচাতে লাগল, 'বুয়া, ভাল করে চা-নাস্তা বানান তো মেহমানদের জন্যে।'

জলিল বিস্মিত চোখে কামালের দিকে ফিরল, 'মেয়েটার মাথায় কি ছিট আছে নাকি?'

'কোন সন্দেহ নেই। ছিট না থাকলে কি আর কেউ ওরকম করে? একটুও

BanglaBook.org

ভয় নেই, যেন পিকনিকে যাচ্ছে! ওর কাছে ফটো তোলা ছাড়া আর কিছুই জরুরি না। মানুষ কোনদিন এত সরল হয়?'

চা-নাস্তা খেয়ে কনস্টেবল দু'জন দরজার বাইরে দুটো চেয়ার নিয়ে বসেছে। ভেতরে সোহানা মল্লিক ঘুমাচ্ছে, টেবিলের ওপর ক্যামেরা রেডি করে রাখা, শুধু শাটার টেপার অপেক্ষা। ওর খাটের পাশে মেঝেতে বিছানা করে শুয়েছে হানিফা বিবি।

ভোরের দিকে চোখ লেগে এসেছিল কনস্টেবল দু'জনের। করিডরের শেষপ্রান্তে কাঁচের জানালার ওপাশে এখনও ভোরের আলো ফোটেনি। এলিভেটরের শব্দে তন্দ্রা ছুটে গেল, সজাগ হয়ে উঠল ওরা। রাইফেল হাতে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে।

ওদের কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে খুলে গেল এলিভেটরের দরজা। ভেতর থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে বেরিয়ে এল আহত অন্ধ এক লোক। বিশাল লম্বা, বিদেশীদের মত ফর্সা, বয়স ত্রিশের ওপরে। চোখে কালো চশমা, অন্ধরা যেরকম পরে, ডান হাতে ছড়ি। জামাকাপড় ছেঁড়া, কালচে রক্তের দাগ এখানে সেখানে।

চিৎকার করছে লোকটা, 'পু-লি-স! পু-লি-স! বাঁচাও!' ছড়ি ঠুকঠুক করতে করতে ওদের সামনে চলে এল হোঁচট খেতে খেতে, যে-কোন মুহূর্তে উল্টে পড়বে। 'নিচের দারোয়ান বলল আটতলায় নাকি পুলিস আছে! কোথায়? পুলিস কোথায়?'

ওরা দৃষ্টিবিনিময় করল, কোত্থেকে এল এই ঝামেলা! মনে হচ্ছে কেউ মারধর করেছে। সাবধানী চোখ রাখল লোকটার ওপর কনস্টেবল জলিল, মুখে বলল, 'দাঁড়ান! দাঁড়ান বলছি! এক্ষুণি তো উল্টে পড়বেন! কি হয়েছে?'

শব্দ লক্ষ্য করে ঘাড়টা ঘোরাল লোকটা, কাঁদছে, 'আমার কুকুরটাকে…ওরা মেরে ফেলল…আমার ডেইজী…ই…ই…ই…!' বলতে বলতে বাঁ হাতটা পকেটে ভরল, নিমেষে বের করে আনল পয়েন্ট ফর্টিফাইভ রিভলভার। পরপর দু'বার ট্রিগার টানল। বদ্ধ করিডরে বোমা ফাটার মত আওয়াজ হল। নীল ধোঁয়ায় ভরে গেল করিডর। লুটিয়ে পড়ল কনস্টেবল জলিল।

বিস্ময়ে পাথর কামাল রাইফেল তোলার সুযোগ পেল না। চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'আল্লার কসম লাগে…না…না…' পরমুহূর্তেই বাতাসের ধাক্কা খেল হৃৎপিণ্ডে। আরও দু'বার গর্জে উঠল রিভলভারটা পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে। অন্ধ লোকের তুলনায় হাতের টিপ তুলনাহীন। আরও নীল ধোঁয়া ঘিরে এল চারদিক থেকে, বলতে গেলে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। একটা দরজা খুলতে গিয়েও সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। ভেতরে কেউ চেঁচাচ্ছে।

BanglaBook.org

দূরে, বহুদূরে ঘুমের মধ্যে জাহিদ এপাশ-ওপাশ করছে। 'নীল ধোঁয়া,' ঘুমের মধ্যেই বিড়বিড় করছে, 'নীল ধোঁয়া।'

জানালার বাইরে ইলেকট্রিক তারে নয়টা চড়ুই পাখি বসে আছে। আরও

ছয়টা উড়ে এসে বসল আগেরগুলোর পাশে। বসে রইল চুপচাপ, যেন কিছুর অপেক্ষা করছে। নিচের পুলিস দু'জন লক্ষ করল না।

'না…না…' চেঁচিয়ে উঠল জাহিদ।

চমকে উঠে বসল মোনা। 'জাহিদ! অ্যাই জাহিদ,' দুই হাতে ওর শরীর ঝাঁকিয়ে জাগাবার চেষ্টা করল, 'কি হয়েছে? এমন করছ কেন?'

জাহিদ ফুঁপিয়ে উঠল, কিন্তু জাগল না। জানালার বাইরে চড়ুইগুলি একসঙ্গে ডানা মেলল। উড়ে গেল রাতের অন্ধকারে, যদিও এখন ওড়ার সময় নয়।

মোনা বা পুলিস দু'জনের কেউই তা লক্ষ করল না।

রুস্তম শের কালো চশমা আর ছড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। করডাইটের গন্ধ আর ধোঁয়ায় শ্বাস নেয়া দুষ্কর হয়ে পড়েছে। সোহানা মল্লিকের দরজায় এসে দাঁড়াল ও। সোহানা গুলির শব্দে জেগে গেছে, দরজার ওপাশে এসে দাঁড়িয়েছে। হানিফা বিবির চিৎকার শোনা যাচ্ছে। সোহানা কথা বলতে শুরু করলে রুস্তম শের বুঝল মেয়েটাকে বোকা বানানো পানির মত সহজ।

'কি হয়েছে?' চিৎকার করে জানতে চাচ্ছে সোহানা, 'কিসের শব্দ হল?'

'ব্যাটাকে কব্জা করেছি আমরা, ম্যাডাম,' খুশি খুশি গলায় উত্তর দিল রুস্তম শের। 'যদি ছবি তুলতে চান তো এখুনি আসুন। পরে আবার আমাদেরকে দোষ দিতে পারবেন না।'

সেফটি চেনটা লাগানো অবস্থায় ছিটকিনি খুলল সোহানা, তাতে অবশ্য তেমন কোন অসুবিধা হল না। কৌতূহলী চোখটা দু'ইঞ্চি ফাঁকের ওধারে দেখা যেতেই ট্রিগার টানল রুস্তম শের চোখটা লক্ষ্য করে।

উল্টোদিকের দরজাটা আবার খুলতে শুরু করেছে। রিভলভার হাতে ঘুরে দাঁড়াতেই প্রচণ্ড শব্দ তুলে বন্ধ হয়ে গেল সেটা।

মৃদু হেসে লম্বা পা ফেলে এলিভেটরের দিকে এগুল রুস্তম শের।

টেলিফোনের শব্দে ঘুম ভাঙল রশিদ তালুকদারের। চোখ খুলে দেখলেন জানালায় সূর্য জ্বলছে। দুপুর হতে চলল প্রায়। বলতে গেলে সারারাত ঘুমাননি তিনি। গভীর রাতে মর্গ থেকে ফিরেছেন। হাসনার বীভৎস মৃতদেহ দেখার পর চিন্তাও করেননি চোখে ঘুম নামবে। অথচ সকালের দিকে ঠিকই তন্দ্রা লেগে এসেছিল। আত্মীয়-স্বজন যারা সমবেদনা জানাতে এসেছিল, রাতেই চলে গেছে সবাই। নিজেও বিপদের মধ্যে আছেন, তাই কাউকে থাকতে দিতে চাননি। দু'জন পুলিস পাহারায় মোতায়েন আছে, কাজের লোক তনু মিয়াও শক্তসমর্থ জোয়ান ছেলে, কিন্তু ভয় তাতে কমছে না।

হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলে নিলেন, 'হ্যালো?'

'আমিই আপনার স্ত্রীকে হত্যা করেছি, চিনতে পারছেন তো?'

চমকে উঠে বসলেন রশিদ তালুকদার, হৃৎপিণ্ডটা মনে হচ্ছে এক্ষুণি বেরিয়ে আসবে বুকের খাঁচা ছেড়ে। 'কে বলছেন?'

'জাহিদ হাসানকে জিজ্ঞেস করবেন আমি কে,' আকর্ষণীয় পুরুষালী কণ্ঠ, স্পষ্ট শুদ্ধ উচ্চারণ। 'উনি সবই জানেন। ওনাকে বলবেন উনি মৃতদেহের ওপর হাঁটছেন। আরও বলবেন আমার কাজ এখনও শেষ হয়নি।'

খুট করে লাইনটা কেটে গেল।

ঘামতে শুরু করলেন রশিদ তালুকদার। একটু সামলে উঠেই থানায় ফোন করলেন।

টেলিফোনের কথা শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন ডিউটি অফিসার। 'গার্ড দু'জনকে নিয়ে এক্ষুণি থানায় চলে আসুন। রিপোর্ট লিখতে হবে। আমি দু'জন টেকনিশিয়ান পাঠাচ্ছি, ওরা আপনার ফোনে টেপরেকর্ডার আর ট্রেসব্যাক ইকুইপমেন্ট ফিট করে দেবে। লোকটা আবার ফোন করতে পারে। আপনার বাড়িতে দরজা খোলার লোক আছে তো?'

'হ্যাঁ, কাজের লোক আছে। ওকে বলে যাব। কিন্তু জাহিদকে একটা ফোন করা দরকার। ও বিপদের মধ্যে আছে।'

'চিন্তা করবেন না, জাহিদ সাহেবের ওখানেও চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে আমরা পাহারা রেখেছি। এখন আবার ফোনের কথা শুনলে বরং আরও বেশি চিন্তা করবেন। ওনাকে এখনই ফোন করার দরকার নেই।'

থানায় কাজ সেরে পুলিসের জীপেই বাড়ি ফিরলেন রশিদ তালুকদার, গার্ড দু'জন সঙ্গেই আছে। একতলা বাড়িটা কবরের মত নিস্তব্ধ। দরজায় তালা ঝুলছে। অবাক হলেন তিনি। তনু মিয়া আবার কোথায় গেল? বিরক্তও হলেন কিছুটা, বার বার নিষেধ করে গেছেন যাতে বাইরে না যায়।

গার্ড দু'জনকেও চিন্তিত দেখাচ্ছে। একজন বলল, 'টেলিফোনের লোক কি আসেনি? এতক্ষণে কাজ সেরে ফেলার কথা। কিন্তু ওদের তো এখানেই অপেক্ষা করার কথা, কাজ হয়ে গেলেও তো চলে যাবার কথা না।' ইতস্তত করছে দু'জনেই।

কিন্তু ভেতরে না গেলে তো কিছু বোঝা যাচ্ছে না। ভাগ্যিস বেরোবার সময় চাবিটা নিয়ে গিয়েছিলেন। না হলে এখন বিপদে পড়তে হত। খোলা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকাও তো বিপজ্জনক।

তালা খুলে দরজাটা ঠেলতেই প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরিত হল বাড়িটা। ধোঁয়া আর আগুন ঘিরে ধরল চারদিক থেকে। মাংস পোড়া গন্ধে ভারী হয়ে উঠল বাতাস।

রশিদ তালুকদারের দেহটা সনাক্ত করার উপায় রইল না। তাঁর পিছনে দাঁড়ানো গার্ডও একই সঙ্গে মৃত্যুবরণ করেছে। বাকি জন প্রাণে বেঁচে গেছে, তবে ঝলসে গেছে মুখ আর হাতের চামড়া।

বাড়ির ভেতরে আরও তিনটে মৃতদেহ ছিল—টেকনিশিয়ান দু'জন আর তনু মিয়া। রিভলভারের গুলিতে মৃত্যু ঘটেছে তিনজনেরই।

BanglaBook.org

এগারো

মৃত্যুর মত নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে সারা ঘরে। বাচ্চারাও যেন বুঝতে পারছে সবকিছু, টুঁ শব্দটি করছে না। জাহিদ আর মোনা পাথরের মত বসে আছে। শাহেদের কাছ থেকে এইমাত্র শুনেছে গতরাতের তাণ্ডবলীলার পুরো বর্ণনা। খান জয়নুলকে ওর বাড়ির সামনে কুপিয়ে মারা হয়েছে, সোহানা মল্লিক আর তার দেহরক্ষী গার্ড দু'জন মারা গেছে গুলিতে, সোহানা মল্লিকের অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিঙের দারোয়ানকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে। শাহেদ গতরাতেই ঢাকা পৌঁছেছে, কিন্তু এখানে এসেছে সকালবেলা। জাহিদ তখন ক্লাসে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে, শাহেদের পরামর্শে যাওয়া স্থগিত করতে হয়েছে। ডিপার্টমেন্টে ফোন করে ক্লাস ক্যানসেল করতে হয়েছে যা সে সাধারণত করে না।

অনেকক্ষণ পর নীরবতা ভাঙল জাহিদ। 'রশিদ ভাই ঠিক আছেন তো?'

'উনি ভাল আছেন। চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দেয়া হচ্ছে ওনাকে, চিন্তার কিছু নেই।' শাহেদ জানে না দু'ঘণ্টা পর খুন হতে যাচ্ছেন রশিদ তালুকদার।

'সোহানা মল্লিকের ওখানেও পুলিস-পাহারা ছিল, তাতে কি কোন কাজ হয়েছে?' কঠিন শোনাল মোনার কণ্ঠ।

'ঠিকই বলেছেন, ভাবী। কিন্তু এর চেয়ে বেশি আর কিছু করার ছিল না এত অল্প সময়ের মধ্যে। তার জন্যে আমি নিজেও কম লজ্জিত নই। তবে খুনীকে অনেকেই দেখেছে। সেজন্যে তাকে একটুও বিচলিত মনে হয়নি।'

জাহিদ কৌতূহলী হল। 'আমার বর্ণনার সঙ্গে মিলেছে?'

'খাপে খাপে। এখন আমাকে শুধু নামটা দিন। এতগুলো মানুষ খুন হয়ে যাচ্ছে, আপনার তো একটা দায়িত্ব আছে।'

'নাম তো আগেই জানিয়েছি,' জাহিদের চেহারায় কোন ভাবান্তর নেই।

'কি বললেন?'

'ওর নাম রুস্তম শের।' কেমন করে এত শান্তভাবে কথা বলতে পারছে তা দেখে জাহিদ নিজেই চমৎকৃত।

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আপনি কি বলতে চাচ্ছেন,' শাহেদকে কিছুটা বিরক্ত দেখাচ্ছে।

এবার মোনা কথা বলে উঠল। 'আপনি ঠিকই বুঝতে পারছেন, শাহেদ সাহেব। জাহিদ বলতে চাচ্ছে রুস্তম শের ব্যাখ্যার অতীত কোন উপায়ে জ্যান্ত হয়ে উঠেছে। পত্রিকায় সাক্ষাৎকার দেবার সময় জাহিদ বলেছিল, রুস্তম শের মন্দ লোক ছিল।'

'কিন্তু...এটা তো অসম্ভব...' বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেছে শাহেদ।

'আগে সবটা শুনুন, তারপর মতামত দেবেন।' মোনা শক্ত গলায় বলল,

BanglaBook.org

'লেখাটা যারা পড়েছে, তারা ভেবেছে জাহিদ রসিকতা করে বলেছে কথাটা। তা নয়। সত্যি কথাই বলেছিল ও। রুস্তম শের নামে জঘন্য এক চরিত্রের সৃষ্টি করেছিল ও। ওই নামে প্রতিটা বই লেখার সময় জাহিদ অন্য এক মানুষে পরিণত হয়। বদরাগী, অমনোযোগী, অসামাজিক। অথচ এমনিতে ও মোটেই ওরকম নয়। যেদিন ও সিদ্ধান্ত নিল ছদ্মনামে আর লিখবে না, সেদিন বোধহয় আমিই সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছিলাম। আমিন ইকবাল সেদিক থেকে বিরাট একটা উপকার করেছিল।'

'ভাবী, আপনি নিশ্চয়ই মনে করেন না যে…'

'শাহেদ সাহেব, জাহিদ যা বলবে তা মন দিয়ে শুনুন, আর অন্তত বিশ্বাস করতে চেষ্টা করুন। তা না হলে আরও অনেক নির্দোষ লোকের প্রাণ যাবে। আর কিছু না হলেও এই মানুষগুলোর জীবনের কথা ভেবে দয়া করে বিশ্বাস করুন আমাদেরকে। না হলে আমি, আমার স্বামী, এই বাচ্চা দুটো সবাইকেই ও খুন করে ফেলবে।'

রুমকি মোনার কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে, রূপক ওর বাবার কোলে বসে বড় বড় হাই তুলছে। ওদেরকে দেখতে দেখতে নিজের উপরই রেগে উঠল শাহেদ। 'অতি সাধারণ দেখতে এই দম্পতি কি সব আবোল-তাবোল বকছে? দেখেশুনে তো মাথা খারাপের কোন লক্ষণ বোঝা যাচ্ছে না, তাহলে এই ভুতুড়ে কাহিনী শোনাবার অর্থটা কী? সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় যদি এরা এই গল্প বলে থাকে, তবে সন্দেহ নেই, এরা মিথ্যে কথা বলছে। কিন্তু কেন? কি স্বার্থ এদের? তাছাড়া এত বড় নামকরা একজন লেখক, বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানীয় শিক্ষক, কেন শুধু শুধু মিথ্যে গল্প বানাতে যাবেন? কিন্তু মিথ্যে যে বলছেন তাতে তো কোন সন্দেহ নেই!

'ঠিক আছে, জাহিদ সাহেব, কি বলবেন বলুন,' অবশেষে বলল শাহেদ।

নিঃশ্বাস ফেলে পেছনে মাথা হেলিয়ে চোখ বন্ধ করল জাহিদ। মোনা বাচ্চাদেরকে ওপরে নিয়ে গেল শুইয়ে দেবার জন্যে।

কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিল জাহিদ। 'এ ক'দিন ধরে যা ঘটছে, তা দুঃস্বপ্নের চেয়েও ভয়ঙ্কর। যত অসম্ভবই শোনাক না কেন, আমি যা বলব তার প্রতিটা শব্দ আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি। আমার যখন এগারো বছর বয়স, তখন এর শুরু।'

একে একে সবকিছুই বলল জাহিদ। পাখিদের শব্দ আর তার পরপরই মাথাব্যথার ব্যাপারটা, অপারেশনের পর সুস্থ হয়ে যাওয়া, তারপর এত বছর পর আবার পাখিদের ফিরে আসা। অচেতন অবস্থায় লেখা কাগজটা এনে শাহেদকে দেখাল, এইচ-বি পেন্সিলে লেখা শব্দ ক'টা এখনও জ্বলজ্বল করছে—'পাখিরা আবার উড়ছে'। দ্বিতীয় কাগজটা ছিঁড়ে ফেলায় দেখাতে পারল না, তবে সেটায় লেখা শব্দগুলোর কথা বলল।

শাহেদ অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। মোনা রান্নাঘরের তদারকি সেরে এসে বসেছে, অবশেষে মুখ তুলে ওর দিকে চাইল। 'আচ্ছা, ভাবী, সেদিন আমি চলে যাবার পর উনি আপনাকে এই কাগজটা দেখিয়ে ছিলেন, তাই না?' এইচ-বি

BanglaBook.org

পেন্সিলে লেখা কাগজটা মোনার দিকে ঠেলে দিল।

'হ্যাঁ।'

'আমি যাবার ঠিক পরপরই?'

'না—ওপরে গিয়ে শোবার জন্যে তৈরি হচ্ছিলাম, তখন ওকে জিজ্ঞেস করি কি লুকোচ্ছে ও আমার কাছ থেকে। তখন ও দেখায় ওটা।'

'আমি যাবার পর সর্বক্ষণ কি আপনারা একসঙ্গে ছিলেন?'

ভুরু কুঁচকে একটু চিন্তা করল মোনা। 'তাই তো মনে হয়, তবে নিশ্চিত করে বলতে পারব না। অবশ্য তাতে কি-ই বা এসে যায়?'

'মানে?'

'আপনি যদি ধরেই নেন আমরা মিথ্যে কথা বলছি, তাহলে আমাকে জিজ্ঞেস করার কোন মানেই হয় না। একটা কথা মনে রাখবেন, জাহিদ মিথ্যে কথা বলছে না। ও কখনোই মিথ্যে বলে না।'

সন্দেহ নেই মহিলা বুদ্ধিমতী। নিঃশ্বাস ফেলল শাহেদ। 'বাস্তব নিয়ে আমার কারবার। আপনি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবেন পুরো ব্যাপারটাই অবাস্তব, কোন যুক্তি নেই। তাছাড়া উনি যখন আচ্ছন্ন অবস্থায় কাগজে লিখেছেন, তখন তো সেটা কেউ দেখেনি। অর্থাৎ ঘটনার কোন সাক্ষী নেই। আমার কাছ থেকে শুনেও তো উনি লিখতে পারেন, আপনি তো মনে করতে পারছেন না আমি যাবার পর উনি সর্বক্ষণ আপনার সঙ্গে ছিলেন কিনা। তাছাড়া দ্বিতীয় যে কাগজটার কথা বললেন, সেটাও তিনি আপনাকে দেখাতে পারেননি। হাসনা তালুকদারের ফোন আসার পর আপনাকে উনি সেটার কথা বলেন। আগে কেন বলেননি?'

'তাহলে আমাকে বোঝান, জাহিদ কেন মিথ্যে বলবে? এতে ওর কি লাভ? তাছাড়া রুস্তম শের ছাড়া আর কে এই লোকগুলোকে এভাবে হত্যা করতে পারে? কেনই বা হত্যা করবে?'

'আমি জানি না। লোকটা হয়ত উন্মাদ, জানে না কি করছে।' চকিতে জাহিদের দিকে চাইল, 'জাহিদ সাহেব হয়ত জানেন না উনি মিথ্যে কথা বলছেন, পুরো ব্যাপারটাই তাঁর কল্পনা হতে পারে। আমি শুধু বোঝাতে চাচ্ছি, প্রমাণ ছাড়া কোন পুলিস অফিসার এই ব্যাখ্যা মেনে নেবে না।'

'কিন্তু আপনাকে বিশ্বাস করতেই হবে। আমি তো রুস্তম শেরের সঙ্গে থেকেছি, আমি জানি কি রকম ভয়ঙ্কর লোক সে। জাহিদ এই ঘটনার আগেও বহুবার চেয়েছে ওই নামে আর না লিখতে। কিন্তু কখনোই ও ছাড়তে পারেনি। এ যেন মদ বা ড্রাগের নেশা। ক্ষতি করছে জেনেও নিরুপায়। আমি জানি ওই পুরো সময়টা কি অস্থিরতার মধ্যে কাটিয়েছে ও।'

জাহিদ ওকে থামিয়ে দিল। 'শাহেদ সাহেব, আমি যা যা আপনাকে বলেছি, তা ভুলে যান। আপনি যদি দরকার মনে করেন, লণ্ডনে যে ডাক্তার আমার অপারেশন করেছিলেন, তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। তখন আমি এত ছোট ছিলাম যে অপারেশন সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানি না। ডাক্তার যদি আজ বেঁচে থাকেন, তবে নিশ্চয়ই উনি কিছু বলতে পারবেন। আমার কোন সন্দেহ নেই ওই

BanglaBook.org

টিউমারের সঙ্গেই পুরো ব্যাপারটা জড়িত।'

মাথা নাড়ল শাহেদ। 'দরকার হলে অবশ্যই ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করব। আপনারা আমাকে ভুল বুঝবেন না, আমি সরকারের চাকর, কর্তৃপক্ষের কাছে সব কাজের কৈফিয়ত দিতে হয়। আমি যদি আমার ওপরওয়ালাকে বলি একটা ভূত মানুষ খুন করে চলেছে, তাহলে উনি কি ভাবতে পারেন?'

জাহিদ নড়েচড়ে বসল। 'সবই বুঝলাম। আপনি প্রমাণের কথা বলছেন, ফিঙ্গারপ্রিন্টগুলোই তো সবচেয়ে বড় প্রমাণ। আমি আপনার সামনে বসে আছি, আমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট কেমন করে ঢাকায় গেল?'

শাহেদ নিজের ওপর রেগে গেল। মনে হচ্ছে এই দম্পতি ওকে ক্রমেই কোণঠাসা করে ফেলেছে। 'আমার মাথায় কিচ্ছু ঢুকছে না! আমাকে শুধু বলুন রুস্তম শের উদয় হল কোত্থেকে? আপনি কোন অদ্ভুত উপায়ে জন্ম দিয়েছেন নাকি পাখির ডিম ফুটে বেরিয়েছে!'

জাহিদও ধৈর্য হারাল। 'আমি জানি না। জানলে তো আগেই বলতাম। আমি নিজে কখনোই রুস্তম শেরকে আলাদা কোন ব্যক্তিত্ব হিসেবে চিন্তা করিনি। ও নিজেও আলাদা হতে চায়নি। কিন্তু যখন ওকে মেরে ফেলার চিন্তা করলাম, তখনই ও বেঁচে উঠল।' দু'হাতে মুখ ঢাকল জাহিদ।

পনেরো মিনিট পর একটা মাইক্রোবাস এসে থামল শাহেদের জীপের পেছনে। যন্ত্রপাতি নিয়ে দু'জন লোক ভেতরে এল জাহিদের টেলিফোনে আড়ি পাতার যন্ত্র ফিট করতে। একটা ফর্ম সই করতে হল জাহিদকে সম্মতি জানিয়ে। ব্যস্ত হয়ে পড়ল লোক দু'জন ওপর আর নিচের টেলিফোনের সেট দুটো নিয়ে।

আরও এক ঘণ্টা পর শাহেদের কাছ থেকেই ওরা রশিদ তালুকদারের মৃত্যু সংবাদ শুনল।

মোনা ভেঙে পড়েছে। 'রুস্তম শের কি চায়? কেন এমন করছে ও? প্রতিশোধ নিচ্ছে?'

'না, মোনা। প্রতিশোধ নয়। তুমি আমি আমরা সবাই যা চাই, সেও শুধু সেটুকুই চায়। বেঁচে থাকতে চায় রুস্তম শের, মরতে চায় না। একমাত্র আমিই পারি ওকে বাঁচিয়ে তুলতে। যদি আমি ওকে বাঁচিয়ে না তুলি, তবে ও মরার আগে নিশ্চিত হবে, যেন ও একা না মরে।'

অকারণেই শিউরে উঠল শাহেদ।

BanglaBook.org

বারো

শাহেদ চলে যাবার পর ওরা খেয়ে নিল, খাবার চেষ্টা করল বলাই ভাল। মোনা একটু পরপরই ফুঁপিয়ে উঠছে। এর মধ্যেই বাচ্চারা জেগে উঠেছে, ওদেরকেও খাইয়ে দিল। এর মধ্যে ইন্টেলিজেন্সের দুই ডিটেকটিভ এলেন জিজ্ঞাসাবাদ করতে। জাহিদ আর মোনা বসার ঘরে বসে একের পর এক প্রশ্নের জবাব দিয়ে চলেছে। বাচ্চারা মেঝেতে বসে খেলছে।

টেকনিশিয়ানরা ফোনে যন্ত্রপাতি ফিট করে মাত্র নেমে এসেছে, সবাইকে চমকে দিয়ে ফোনটা আর্তনাদ করে উঠল। কিছুক্ষণ সবাই পাথরের মূর্তির মত যে যার জায়গায় নিশ্চল হয়ে রইল। টেকনিশিয়ান দু'জনই প্রথমে লাফ দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে মাইক্রোবাসের দিকে ছুটল, একজন ছুটতে ছুটতেই বলে উঠল, 'যাক, টেস্ট কল করতে হল না!'

ফোন বেজে যাচ্ছে। ডিটেকটিভদের একজন ইশারা করল জাহিদকে ফোন রিসিভ করতে।

কে ফোন করেছে জাহিদ ভাল করেই জানে। রিসিভারটা তুলে গর্জে উঠল রাগে, 'কি চাস তুই, শুয়োরের বাচ্চা?'

বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে মোনা জাহিদের দিকে, বারো বছরে এই প্রথম শুনল ও কাউকে গালাগালি করছে। ডিটেকটিভ দু'জন উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়েছে।

'শান্ত হও, জাহিদ,' রুস্তম শেরের কণ্ঠে নির্ভেজাল আমোদ।

সত্যিই শান্ত হল জাহিদ। 'কি চাও তুমি?'

'কেন, তুমি জানো না?' বিস্ময় ফুটে উঠল রুস্তম শেরের কণ্ঠে। 'একটু আগে রশিদ তালুকদারের প্রেসের অ্যাকাউন্টেন্টকে শেষ করে এলাম। ব্যস্, আমার কাজ শেষ। এটা জানাতেই তোমাকে ফোন করলাম। ওই লোকটাই আমিন ইকবালকে সব বলে দিয়েছিল,' হাসল সে। 'ওর বাসাতেই আছে দেহটা, কিছুটা বসার ঘরে, কিছুটা রান্নাঘরে,' আবার হাসল রুস্তম শের। 'যা একটা ব্যস্ত সপ্তাহ কাটালাম! তুমি একটু নিশ্চিত হবে বলেই তোমাকে জানালাম।'

'কেমন করে ভাবলে আমি নিশ্চিত হব?'

'রিল্যাক্স কর, দোস্ত! সব ঠিক হয়ে যাবে। শহরের এই গ্যাঞ্জাম আমার ভাল লাগছে না। এবার একটু বাইরে যাব।'

মিথ্যুক! মনে মনে বলে উঠল জাহিদ। মিথ্যে কথা বলছে। ওর হাসির শব্দে জাহিদের গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেছে। রুস্তম শের জানে ফোনে আড়ি-পাতার যন্ত্র ফিট করা হয়েছে, শুধু সেজন্যেই ও ফোন করেছে। কাউকেই ও ভয় পায় না।

'মিথ্যে বলছিস, হারামজাদা!'

BanglaBook.org

রাগ সামলাতে পারছে না জাহিদ।

'ছি ছি, বাজে কথা বলছ কেন?' আহত কণ্ঠে অভিযোগ জানাল রুস্তম শের। 'তুমি কি ভাবছ তোমাকে আমি আক্রমণ করব? না না, তা করব না। আমি তো শুধু তোমার কাজগুলোই করে দিলাম। তুমি কি রকম ভীতু লোক তা তো আমি জানি। তুমি নিজে কখনোই করতে পারতে না।'

ডান হাতের তর্জনী দিয়ে কপালের সাদাটে কাটা দাগটা ঘষছে জাহিদ। প্রাণপণে নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করছে। বদমাশটা জানে যে জাহিদ বুঝতে পারছে ও মিথ্যে কথা বলছে। সে ভাল করেই জানে সব কথা রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে, টেকনিশিয়ান দু'জন শুনছে। সেজন্যেই ব্যাপারটা এত উপভোগ করছে সে। পুলিস যদি বোঝে যে সে উন্মাদ কোন লোক নয়, আর কিছু করবে না, তাহলে পাহারা ঢিলে হয়ে যাবে ধীরে ধীরে। ঠিক এটাই চাচ্ছে রুস্তম শের।

'তুমি কি জানো যে তোমাকে কবর দেবার আইডিয়াটা আমার মাথাতেই আসে?'

'কি বললে?' বিস্ময় ফুটে উঠল রুস্তম শেরের কণ্ঠে। 'কক্ষণও না! তোমাকে ভুল বোঝানো হয়েছিল, দোস্ত। আমি জানি।'

'এখনও মিথ্যে কথা বলছিস তুই!' রাগে চেঁচিয়ে উঠল জাহিদ।

'আচ্ছা, আমি আর তোমাকে বিরক্ত করব না।' দুঃখিত শোনাল ওর কণ্ঠ। 'তবে তুমি কেন ভাবছ আমি রুস্তম শের? জানোই তো আমি রুস্তম শের নই। হয়ত পাগলা গারদের ডাক্তাররা ঠিকই বলত, আমার মাথা খারাপ।'

জাহিদেরই মাথা খারাপ হবার জোগাড়। পুলিসকেও বোঝাতে চাচ্ছে ও পলাতক মানসিক রোগী। জাহিদকে এখন আর কেউ বিশ্বাস করবে না।

'তোমার বউ আর বাচ্চাদেরকে আমার ভালবাসা দিয়ো। আমি আর তোমাকে বিরক্ত করব না।'

'রুস্তম শের, তুমি কি পাখিদের শব্দ পাও?' হঠাৎ করেই প্রশ্নটা করল জাহিদ।

অনেকক্ষণ কোন উত্তর এল না। জাহিদ খুশি হয়ে উঠল, এই একটা ব্যাপার রুস্তম শেরের প্ল্যানের বাইরে ঘটছে, তাই সে উত্তর দিতে দেরি করছে। 'কি হল, জবাব দিচ্ছ না কেন? তুমি কি পাখিদের শব্দ শোন?'

'তুমি কি বলছ বুঝতে পারছি না, দোস্ত!' মিথ্যে বলছে না রুস্তম শের, জাহিদ বুঝতে পারল।

'না, তুমি জানো না আমি কি বলতে চাচ্ছি, তাই না?' হঠাৎ হেসে উঠল জাহিদ। 'মন দিয়ে শোন, রুস্তম শের, আমি পাখিদের শব্দ শুনি। এখনও জানি না এর অর্থ কি, কিন্তু খুব তাড়াতাড়িই জানব। তখন, তখন...' কি বলবে বুঝতে পারল না জাহিদ।

'তুমি কি বলছ বুঝতে পারছি না। তবে তাতে কিছু এসে যায় না। সবকিছু তো শেষই হয়ে গেল।'

খুট করে লাইনটা কেটে গেল। রিসিভারটা ছুঁড়ে ফেলে দিল জাহিদ।

BanglaBook.org

টেকনিশিয়ান দু'জন লাফাতে লাফাতে ঘরে এল, 'কাজ করছে! যন্ত্রটা কাজ করছে!' ডিটেকটিভ দু'জনকে নিয়ে ওরা বেরিয়ে গেল বাইরে, চারজনের মুখেই হাসি।

'আমি জানি ওটা রুস্তম শের। অস্বীকার করছিল, কিন্তু আমার কোন সন্দেহ নেই ওটাই রুস্তম শের,' মোনার দিকে চেয়ে বলল জাহিদ।

মোনা ওর ডান হাতটা চেপে ধরল, 'আমি জানি।'

এক ঘণ্টা পর শাহেদ ফোন করল। ফোনটা শেষ পর্যন্ত ট্রেস করা গেছে, কিন্তু লাভ হয়নি। শাহবাগ পোস্ট অফিসের কয়েন বক্স থেকে ফোনটা করা হয়েছিল। তবে সিঙ্গাপুরে যোগাযোগ করা হয়েছে পুরো কথোপকথনের ভয়েস-প্রিন্টের ব্যাপারে। ফিঙ্গারপ্রিন্টের মত ভয়েস-প্রিন্টও আজকাল অপরাধী সনাক্তকরণের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এশিয়ায় একমাত্র সিঙ্গাপুরেই আছে এই ডিভাইস। আজই সিঙ্গাপুরে পাঠানো হবে রেকর্ড করা কথোপকথন, আগামীকাল ফ্যাক্স করে জানানো হবে রেজাল্ট। এধরনের হত্যাকাণ্ড এর আগে বাংলাদেশে আর হয়নি, ফলে সরকার যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে। রেডিও-টেলিভিশনে প্রতিদিনই এই ঘটনার ওপর রিপোর্ট দিচ্ছে, খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠাতে এ ক'দিন একটাই শিরোনাম। সাধারণ মানুষ ভয় পেয়েছে, পুলিসের ওপর চাপ আসছে ওপর থেকে। পাগল হয়ে উঠেছে অপরাধ দমনকারী সব ক'টা সংস্থা।

পরদিন বিকেলে শাহেদ এল। হাতে একটা বাদামি খাম। ভেতর থেকে দুটো সাদা কাগজ বের হল, মাঝখানে একটা সরু রেখা এঁকেবেঁকে গেছে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত। দুটো কাগজে একই রকম রেখা।

'এগুলো কি?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করে মোনা।

'ভয়েস-প্রিন্টের ফটোকপি, একটু আগে সিঙ্গাপুর থেকে ফ্যাক্সে এসেছে।' একটু চুপ করে থেকে আবার বলল শাহেদ। 'রেকর্ড করা কণ্ঠ দুটো একই লোকের, অন্তত ভয়েস-প্রিন্ট তাই বলে। দুটো প্রিন্টের মধ্যে বলতে গেলে কোন পার্থক্যই নেই।'

মাথায় বাজ পড়লেও ওরা এতটা অবাক হত না।

'কিন্তু তা কি করে হয়? রুস্তম শেরের গলার স্বর, উচ্চারণের ভঙ্গি তো একদম ভিন্ন!' মোনা মাথায় হাত দিয়ে সোফায় বসে পড়ল।

ভুরু নাচাল শাহেদ। 'এর সঙ্গে গলার স্বরের কোন সম্পর্ক নেই। ভয়েস-প্রিন্ট হল একধরনের কম্পিউটার জেনারেটেড গ্র্যাফিক যা মানুষের গলার স্বরের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করে। এর সঙ্গে কথা বলার ভঙ্গি বা ভাষার কোন সম্পর্ক নেই। কম্পিউটার গলার স্বর থেকে "পিচ"আর "টোন"গুলো আলাদা করে নিয়ে সিন্থেসাইজ করে যাকে সাধারণ ভাষায় বলে "হেড ভয়েস"। তারপর একইভাবে "টিম্বার"আর "রেজোন্যান্স"গুলো আলাদা করে নেয়, যাকে বলা হয় "চেস্ট" বা "গাট ভয়েস"। ফিঙ্গারপ্রিন্টের মত ভয়েস-প্রিন্টও কখনও একজনের সঙ্গে অন্যজনেরটা মেলে না।' একটু হাসল ও। 'আমাকে আবার জ্ঞানী-গুণী কিছু ভেবে

BanglaBook.org

বসবেন না, এসব আজই বই পড়ে জেনেছি।'

মৃদু হাসল জাহিদ। 'আমি জানি আপনি কি ভাবছেন। আমিই রুস্তম শের সেজে গলা বিকৃত করে একটা ক্যাসেটে কথা টেপ করেছি মাঝখানে প্রয়োজনমত জায়গা খালি রেখে। তারপর কাউকে দিয়ে কয়েন বক্স থেকে ফোন করিয়ে ক্যাসেটটা চালিয়ে দিতে বলেছি। খালি জায়গাগুলোতে আমি কথা বলেছি, আগে থেকে প্র্যাকটিস করায় উল্টাপাল্টা হয়নি, তাই না?'

উত্তর দেবার বদলে স্থির চোখে চেয়ে রইল শাহেদ।

সেরাতেই পতেঙ্গায় ফিরে গেল শাহেদ। অফিসে গিয়ে প্রথমেই লণ্ডনের হসপিটালে ফোন করে জাহিদের ডাক্তারের খোঁজ লাগাল, হসপিটালের ফোন নাম্বার বের করতেই ঘণ্টাখানেক লেগে গেল। অবশেষে রিসেপশনিস্টের গলা ভেসে এল ওপার থেকে। ভাগ্য ভাল ডাক্তারের নাম শুনেই সে চিনতে পেরেছে, কিন্তু তিনি রিটায়ার করেছেন বহু বছর আগে এবং বহাল তবিয়তে বেঁচে আছেন। ডাক্তারের বাসার ফোন নাম্বার সে জানে না, জানলেও সেটা কাউকে বলা নিয়ম বিরুদ্ধ। শাহেদ তখন ওকে বলল ও নিজে একজন পুলিস অফিসার, তদন্তের কারণে ডাক্তারের সাথে কথা বলা খুবই দরকার। রিসেপশনিস্ট একটু ভেবে নিয়ে আধ ঘণ্টা পরে আবার ফোন করতে বলল।

আধ ঘণ্টা পর রিসেপশনিস্টের মাধ্যমে জানা গেল ডাক্তার ম্যাকলিন লণ্ডনের বাইরে কোথাও বেড়াতে গেছেন, কবে ফিরবেন তা কেউ জানে না।

দু'দিন পর আবার ফোন করল রুস্তম শের। জাহিদ হাসান তখন বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার ঠিক বাইরে একটা ফার্মেসিতে গেছে মাথাব্যথার ওষুধ কিনতে। হাঁটতে গেলে বেশ দূর হয়ে যায়, তাই ড্রাইভ করে গেল ও। পাহারারত গার্ড দু'জনের একজন ওর সঙ্গে গাড়িতে উঠল, বাকি জন বাড়ির সামনে পার্ক করা জীপে বসে রইল। জুন মাসের আট তারিখ। সন্ধে সাড়ে ছ'টা।

দোকানের কাউন্টারে রাখা টেলিফোনটা বেজে উঠতেই চমকে উঠল জাহিদ, ও জানে কে ফোন করেছে। দোকানের মালিক চশমা পরা বয়স্ক ভদ্রলোকের সঙ্গে জাহিদের পরিচয় আছে। তিনিই ফোন রিসিভ করলেন, তারপর একটু অবাক হয়ে জাহিদের দিকে তাকালেন, 'জাহিদ সাহেব, আপনার ফোন।'

কেন যেন আগেরবারের মত ভয় করল না জাহিদের। রিসিভারটা তুলে নিয়ে খুব স্বাভাবিক ভাবেই বলল, 'রুস্তম শের?'

'হ্যালো, জাহিদ।'

'আবার কি চাও?'

'তুমি তো জানো কি চাই। জানো না? লুকোচুরি খেলার সময় নেই, স্বীকার কর তুমি জানো।'

'তা-ও তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই আমি।'

দোকানের মালিক এবং দু'একজন খদ্দের উঁকিঝুঁকি মারছে, কান খাড়া করে

BanglaBook.org

রেখেছে এদিকে। কাউকে ফোনে কথা বলতে দেখলে সাধারণ মানুষ যা করে। জাহিদকে সবাই চেনে, ছোট্ট এই শহরটাতে ক'দিন ধরে নানারকম গুজব শোনা যাচ্ছে জাহিদকে ঘিরে—ওর প্রতি আলাদা কৌতূহল সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু জাহিদ কারও দিকে মনোযোগ দিচ্ছে না, পুরো মনোযোগ ওর টেলিফোনে। সমস্ত ইচ্ছেশক্তি ব্যবহার করছে কোনভাবে তারের ওপাশে রুস্তম শেরের কাছে পৌঁছাবার।

শব্দ করে হাসল রুস্তম শের। 'নতুন একটা বই লেখার সময় হয়েছে। রুস্তম শেরের নামে।'

'তা আর হয় না,' দাঁতে দাঁত চাপল জাহিদ।

'খবরদার!' ধমকে উঠল রুস্তম শের।

'ভয় দেখিয়ো না, রুস্তম শের। তুমি এখন মৃত।' সমান তালে গলা উঁচু করছে জাহিদ, খেয়াল নেই আশেপাশের লোকজন পরস্পর দৃষ্টিবিনিময় করছে।

'শাট আপ! বাজে কথা বলবে না!' রুস্তম শেরের গলায় আগের মত জোর নেই, কিছুটা ক্লান্ত শোনাচ্ছে যেন!

'কি ব্যাপার, রুস্তম শের, আত্মবিশ্বাসে ফাটল ধরেছে মনে হচ্ছে?'

কিছুক্ষণ কোন উত্তর ভেসে এল না। জাহিদ খুশি হয়ে উঠল। কোন কারণে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে রুস্তম শের, জবাব দিতে ইতস্তত করছে। কি এমন বলেছে ও?

অনেকক্ষণ পর রুস্তম শের আস্তে আস্তে বলল, 'মন দিয়ে শোন, দোস্ত, তোমাকে এক সপ্তাহ সময় দিচ্ছি। চালাকি করার চেষ্টা কোরো না, তুমি জানো তাতে তোমার কোন লাভ হবে না।' ছাড়া ছাড়া অনিশ্চিত কণ্ঠস্বর।

হ্যাঁ, কোন সন্দেহ নেই রুস্তম শের কোন কারণে চিন্তিত।

'আমি তোমার সঙ্গে কোন চালাকি করিনি,' খুশি চেপে রাখতে পারছে না জাহিদ। কখনও কখনও রুস্তম শেরও তাহলে অসহায় হতে পারে!

'ঠিক এক সপ্তাহ,' অস্থির ভাবে বলল রুস্তম শের। 'এর মধ্যে অন্তত ত্রিশ পৃষ্ঠা লিখে রাখবে। নাহলে কি হবে তা তো জানোই।' চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে লাগল, 'প্রথমে যাবে তোমার বাচ্চা দুটো। এরপর তোমার বউ। তারপর তোমার পালা, দোস্ত।'

'তুমি পাখিদের কথা কিছু জানো না, তাই না?' ধীরে ধীরে নরম স্বরে প্রশ্ন করল জাহিদ।

'কি আবোল-তাবোল বকছ! এক সপ্তাহ, মনে থাকে যেন!'

'আমিন ইকবাল আর হাসনা তালুকদারের ঘরের দেয়ালে কি লিখেছিলে, মনে আছে?'

'কি বলছ কিছু বুঝতে পারছি না,' ধৈর্য হারাল রুস্তম শের।

'কিন্তু আমি বুঝতে পারছি,' পাশবিক এক ধরনের আনন্দ বোধ করছে জাহিদ কথাগুলো ওকে বলতে পেরে। 'কারণ দেয়ালের ওই লেখাগুলো তুমি লেখনি, লিখেছি আমি। আমার কোন অংশ তখন সেখানেই ছিল, তোমাকে পাহারা

BanglaBook.org

দিচ্ছিল। আমার মনে হয় চড়ুই পাখিরা শুধুই আমার, তুমি ওদের কথা কিছুই জানো না। কিছু করার আগে চিন্তা কোরো, রুস্তম শের, ভাল করে চিন্তা কোরো।'

'বাচ্চা আর বউয়ের কথা চিন্তা করো তুমি। একটা সপ্তাহ্ আছে তোমার হাতে।' কিছুক্ষণ চিন্তা করে আবার বলল, 'আমি মরতে চাই না, দোস্ত।'

লাইনটা কেটে গেল।

রিসিভারটা ক্রেডলের ওপর রেখে দিতে দিতে জাহিদ বিড়বিড় করে উঠল, 'শা-লা।'

তেরো

বাড়ির সামনে দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা পুলিসী পাহারা। প্রতিবেশীরা কানাকানি করছে। ইদানীংকার হত্যাকাণ্ডগুলির সঙ্গে জাহিদকে জড়িয়ে খবরের কাগজে প্রতিদিন নতুন নতুন গুজবের জন্ম হচ্ছে। প্রথম দু'একদিন পরিচিত বন্ধুবান্ধবরা ফোনে কৌতূহল প্রকাশ করেছে, আজকাল জাহিদের বাসায় কোন ফোন আসে না, ভুলেও ওর বাসার দিকে কেউ পা বাড়ায় না। ঈদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস বন্ধ, তাই জাহিদের সুবিধাই হয়েছে। ডিপার্টমেন্টে গিয়ে সহকর্মীদের অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলার দরকার পড়ছে না। প্রতিবেশীরা অনেকে ঈদ উপলক্ষে ঢাকা বা দেশের বাড়ি চলে গেছে, রাস্তাঘাটেও তাই কারও সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনা কম।

ঘরের কাজ সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে মোনা। দু'দিন আগে পিচ্চির বাবা এসে পিচ্চিকে ফরিদপুরে দেশের বাড়ি নিয়ে গেছে ঈদ করতে। যমজ দুই বাচ্চা সামলে রান্না-বান্না আর ঘরের কাজ করা চাট্টিখানি কথা নয়। ঈদে ওদেরও যশোর যাবার কথা ছিল। যাওয়া হল না বলে তো পিচ্চির ঈদ মাটি করা যায় না, ওকে যেতে দিতেই হয়েছে। জাহিদ বাইরে বের হয় না বলে রক্ষা, ও যথেষ্ট সাহায্য করছে মোনাকে এ ক'দিন।

জাহিদ বড় অস্থির হয়ে আছে। রূপক আর রুমকির দিকে তাকালেই বুকটা মুচড়ে ওঠে। কোনভাবেই ওদের কোন ক্ষতি হতে দিতে পারে না ও। এতগুলো বছরের সঙ্গিনী মোনা, বড় বড় বাঙ্ময় চোখ, হালকা বাদামি মসৃণ ত্বক, লম্বা চুলের রাশি, ছিপছিপে আকর্ষণীয় দেহ—জাহিদের প্রিয়তমা স্ত্রী। স্বপ্নে দেখা ওর পচন ধরা মৃতদেহের কথা মনে হলে শরীরের রক্তস্রোত যেন থেমে আসে। নিজের অজ্ঞাতে পেন্সিল নিয়ে লিখতে বসে গিয়েছিল একদিন, অনেক কষ্টে নিজেকে সামলেছে। কিছুতেই তা হয় না, আত্মহত্যা করা হবে তাহলে। কিন্তু না লিখলেও মরতে হবে। আর মাত্র ক'টা দিন!

ক'দিন হল রূপক আর রুমকি দেয়াল ধরে ধরে হাঁটতে শিখেছে। তাই সবসময় কড়া নজর রাখতে হয়। ওদের দু'জনকে বসার ঘরে মেঝেতে খেলতে বসিয়ে দিয়ে মোনা রান্নাঘরে কাজ করছে। জাহিদ সোফায় বসে পেপার পড়তে

BanglaBook.org

পড়তে ওদেরকে পাহারা দিচ্ছে। বাচ্চা দুটো সবসময়ই হাসিখুশি, তবে একটুও চঞ্চল নয়। নিজেদের নিয়েই মেতে আছে, আশেপাশের কারও প্রতি কোন কৌতূহল দেখায় না। অবোধ্য এক ভাষায় প্রায়ই নিজেদের মধ্যে ওরা কথা বলে, জাহিদের মাঝে মাঝে মনে হয় সত্যিই ওরা পরস্পরের কথা বুঝতে পারে। শুধু যমজ বলেই কি ওদের মধ্যে এই নৈকট্য গড়ে উঠেছে?

মোনা এক কাপ চা হাতে নিয়ে আর নিজের কাপে চুমুক দিতে দিতে এসে বসল, চুলায় রান্না চাপিয়ে এসেছে। রূপক মায়ের হাঁটু ধরে উঠে দাঁড়িয়েছে খেলনা ভালুকটাকে বাঁ হাতে নিয়ে। রুমকি কৌতূহলী চোখে চেয়ে আছে ভাইয়ের দিকে, ডান হাতের বুড়ো আঙুল মুখে পুরে চুষছে।

মোনা কিছু বুঝে উঠতে পারার আগেই হঠাৎ করে রূপক ডান হাতে ওর চায়ের কাপ আঁকড়ে ধরল। চা ছলকে পড়ে ভিজিয়ে দিল রূপকের পোশাক। ভাগ্য ভাল চা'টা খুব একটা গরম ছিল না। কিন্তু মোনা আর্তনাদ করে আঁৎকে ওঠায় রূপক ভয় পেয়ে কাঁদতে শুরু করেছে। সঙ্গে সঙ্গে রুমকিও তান ধরল।

রূপককে কোলে তুলে ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখল মোনা। না, কোথাও লাগেনি। চোখ ঘুরিয়ে হতাশার ভঙ্গি করে জাহিদের উদ্দেশ্যে বলল, 'রুমকির দিকে নজর রাখ, ওর কাপড় বদলে দিচ্ছি এক মিনিটে।' বলে রূপককে নিয়ে ওপরে চলে গেল মোনা।

রুমকি জলভরা চোখে ওদের গমনপথের দিকে চেয়ে আছে। যাক, বাবা, কান্না বন্ধ করেছে। জাহিদ নিশ্চিন্তে পেপারটা আবার টেনে নিল।

রুমকি লাল গাড়িটা নিয়ে খেলছে, মুখে দ্রাম-দ্রাম শব্দ করছে। জাহিদ উঠে বুক শেলফ থেকে একটা বই নিল, পরমুহূর্তে ঘুরে দাঁড়িয়েই দেখল রুমকি দোতলায় যাবার সিঁড়ি বেয়ে উঠছে। ইতিমধ্যেই দুটো সিঁড়ি পার হয়ে গেছে, বাঁ হাতে রেলিং ধরে আছে, ডান হাত ওপরের সিঁড়িতে।'

জাহিদ চেঁচিয়ে উঠল, 'রুমকি!'

পাশ ফিরে জাহিদকে দেখে দু'হাত বাড়িয়ে দিল রুমকি, হাসছে। ডান পা'টা চতুর্থ ধাপে, বাঁ পা তৃতীয় ধাপে, রেলিং ছেড়ে দেয়াতে একটু একটু কাঁপছে পা দুটো।

প্রাণপণে ছুটল জাহিদ, কিন্তু ইতিমধ্যেই গড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে রুমকি। শেষ মুহূর্তে লাফ দিয়ে ওকে ধরার চেষ্টা করল জাহিদ, কিন্তু পারল না।

'খোদা!' ছোঁ মেরে ওকে তুলে নিল জাহিদ। 'লাগেনি তো, বাবু সোনা!'

গগনবিদারী চিৎকার করে উঠল রুমকি, তারপর কেমন যেন লাল হয়ে গেল ওর ফুলের মত নিষ্পাপ মুখটা। প্রাণপণে কাঁদতে চেষ্টা করছে, কিন্তু কোন আওয়াজ বের হচ্ছে না। প্রথমবার ভয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল, এখন কাঁদতে চেষ্টা করছে ব্যথায়।

'জাহিদ!' রূপককে কোলে করে ছুটতে ছুটতে নেমে আসছে মোনা। 'কি হয়েছে?'

লালচে মুখটা বেগুনি হয়ে গেছে, চোখ দুটো বন্ধ, এখনও শব্দ করতে পারছে

BanglaBook.org

না রুমকি। হাত-পাগুলো টান টান হয়ে আছে, দু'হাত মুঠো করা।

ও কি অজ্ঞান হয়ে গেছে? ভয়ে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল জাহিদের। দু'হাতে রুমকির দেহটা ঝাঁকাচ্ছে আর চিৎকার করছে, 'এই তো, বাবু সোনা! কথা বল, মা মণি আমার!'

হঠাৎ করে রুমকির দেহটা কাঁপতে শুরু করল, তারপর আগের বারের চেয়েও জোরাল কণ্ঠে কেঁদে উঠল রুমকি। নিঃশ্বাস ফেলে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরল জাহিদ। পিঠ চাপড়ে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল, প্রচণ্ড ব্যথা পেয়েছে সন্দেহ নেই। কয়েক সেকেণ্ড মাত্র, অথচ মনে হচ্ছে যেন লম্বা সময় কেটে গেছে।

মোনা পাশে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে। 'ব্যথা পায়নি তো?'

'ঠিক হয়ে যাবে। উহ্! যা ভয় পেয়েছিলাম!' জাহিদ চোখ বন্ধ করল, বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা এখনও লাফাচ্ছে।

রুমকিকে জাহিদের কোল থেকে নিয়ে রূপককে তুলে দিয়েছে ওর কোলে মোনা। 'তোমাকে না বললাম ওর দিকে নজর রাখতে!' মোনার কণ্ঠে বিরক্তি ঝরে পড়ছে, রুমকির কান্না থামাবার জন্যে শরীরটা এপাশ-ওপাশ দোলাচ্ছে। রূপকও কান্না শুরু করেছে।

'বই নেবার জন্যে যেই শেলফের কাছে গেছি…কখন যেন ও সিঁড়ির দিকে রওনা হয়েছে।' একটু রাগ হল জাহিদের, ও কি জানত রুমকি এমন করবে? 'রূপক যেমন তোমার চায়ের কাপে ঝাপটা দিয়েছে, রুমকিও দু'সেকেণ্ডের মধ্যেই কেমন করে যেন সিঁড়িতে চলে গেছে। ওর মাথাটা ভাল করে দেখ তো!'

দু'জনে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল, মাথায় লাগেনি। শুধু ডান উরুতে লালচে অর্ধবৃত্তাকার একটা দাগ, পড়ার সময় সিঁড়ির ধারাল প্রান্তে লেগেছে। গুরুতর কিছু হয়নি, খোদার কাছে হাজার শোকর।

রুমকির কান্না আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেল, রূপকও ওর দেখাদেখি কান্না বন্ধ করেছে। রূপক গোল গোল হাত বাড়িয়ে বোনের ফ্রক চেপে ধরল। রুমকি ওর দিকে চাইল। রূপক কি যেন বলল, রুমকি আবার তার উত্তর দিল। চোখে জল নিয়ে দু'ভাইবোন হাসতে লাগল দেবশিশুর মত।

ঝুঁকে পড়ে রুমকির নাকে চুমু খেল জাহিদ।

সেরাতে ওরা ঘুমিয়ে পরার পর কটে শুইয়ে দিল মোনা। রুমকির ডান পায়ের লালচে দাগটা গাঢ় বেগুনিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

'জাহিদ?' মোনা ডাকল, 'একটু এদিকে এস তো!'

শুয়ে শুয়ে পড়ছিল জাহিদ। বই বন্ধ করে উঠে এল। মোনা ইশারায় বাচ্চাদের ঘুমন্ত দেহ দুটি দেখাল। একবার চাইতেই জাহিদ বুঝতে পারল মোনা কি দেখাতে চাইছে। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে বাচ্চারা। রূপকের ডান পায়ের একই জায়গায় ঠিক রুমকির মত একটা দাগ, বেগুনী, অর্ধবৃত্তাকার। অথচ রূপক আজ কোথাও ব্যথা পায়নি।

BanglaBook.org

'কি অদ্ভুত, তাই না?' ফিসফিস করে বলল মোনা।

'হ্যাঁ,- অদ্ভুত। তবে অসাধারণ কিছু না।' কেমন যেন আচ্ছন্নের মত উত্তর দিল জাহিদ।

চকিতে ওর দিকে তাকাল মোনা, 'তোমার আবার কি হল?'

'কই? কিচ্ছু না তো!' কিভাবে শান্ত হয়ে কথা বলছে ও ভাবতে গিয়ে নিজেই অবাক হয়ে গেল জাহিদ। হঠাৎ করে ওর মগজের ভেতর তৃতীয় নয়নটা জেগে উঠেছে, দিনের আলোর মত পরিষ্কার দেখাচ্ছে চারদিক। হ্যাঁ, পাখিদের আবির্ভাবের কারণ কিছুটা হলেও বুঝতে পারছে ও। রূপকের ডান পায়ের চিহ্নটা ওর চোখ খুলে দিয়েছে। ব্যথা পেয়েছে রুমকি, অথচ রূপকের পায়েও সেই আঘাতের চিহ্ন। 'ব্যথা পর্যন্ত ওরা ভাগাভাগি করে ভোগ করে। কি আশ্চর্য, তাই না?' অস্ফুটে বলল জাহিদ।

মোনা ঘুমিয়ে পড়লে বিছানা ছেড়ে স্টাডিতে চলে এল জাহিদ। কিছুতেই ঘুম আসছে না। যমজ ভাইবোনদের মধ্যে আলাদা একধরনের বন্ধন থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। একজন আরেকজনের আনন্দ বা ব্যথা অনুভব করে—এমন ঘটনা মোটেই অসাধারণ নয়। লাইফ ম্যাগাজিনে এর ওপরে লেখা একটা প্রবন্ধ পড়েছিল জাহিদ, তাতে অদ্ভুত সব রিসার্চের কথা আছে। আমেরিকার শিকাগোর দুই যমজ বোনের একজন পড়ে গিয়ে পা ভেঙে ফেলে, অন্যজন তখন হাইওয়েতে গাড়ি চালাচ্ছে। হঠাৎ ওই একই সময়ে পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা করতে শুরু করায় গাড়ি থামাতে বাধ্য হয় সে, অথচ বোনের পা ভেঙেছে তা কোনভাবেই ওর জানার কথা নয়। যমজ দুই ভাই জন্মের পরপরই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। প্রাপ্তবয়েসে দু'জন মিলিত হলে দেখা গেল তারা দু'জন একই বছর একই দিনে বিয়ে করেছে, একই নামের দুই মহিলাকে। দুই ভাই-ই তাদের প্রথম সন্তানের নাম রেখেছে রবার্ট যারা একই বছরের একই মাসে জন্মেছে। অদ্ভুত নয়? অথচ এর পেছনে যুক্তিগ্রাহ্য কোন কারণ নেই।

রূপক নিশ্চয়ই ওর পায়ের দাগটার কথা জানে না। কিন্তু ওখানে ব্যথা করছে ঠিকই। অনেকটা ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা ভয়েস-প্রিন্টের মত নয়? রুস্তম শের পাখিদের কথা জানে না, কিন্তু জাহিদ জানে। রুস্তম শের পাখিদের কথা জানে না, কিন্তু জানে ওর একটা দুর্বল জায়গা আছে। ঠিক রূপক যেমন দাগটার কথা জানে না, শুধু ব্যথাটা টের পাচ্ছে। জাহিদ ওর দাগটায় আলতো করে আঙুল বুলিয়েছিল, ঘুমের মধ্যেই রূপক কেঁপে উঠেছিল। রুমকির চেয়ে ওর ব্যথা কম নয়। পাখিগুলো যদি শুধু জাহিদেরই হয়, তাহলে আমিন ইকবাল আর হাসনা আপার বাসার দেয়ালে লেখা কথাগুলি রুস্তম শের নয়, জাহিদই লিখেছে—রুস্তম শেরের হাতে। ঠিক যেভাবে জাহিদের হাতে রুস্তম শের লীফার রশিদের উল্টোদিকে লিখেছিল। কিন্তু রুস্তম শের কি ওর উপস্থিতি টের পায়? নিশ্চয়ই পায়। টেকনিশিয়ানরা টেলিফোনে আড়ি-পাতা যন্ত্র বসানর কাজ শেষ করা মাত্র ফোন করেছিল ও, সে তো জেনেশুনেই। আবার যখন নিভৃতে কথা বলতে চেয়েছে,

তখন ফার্মেসিতে ফোন করেছে। ও জানত জাহিদ ফার্মেসিতে গেছে, আর ওখানে ফোন আছে। প্রথমবার ও ফোন করেছিল পুলিসকে বোঝাতে যে ও জাহিদকে খুন করতে চায় না। তাহলে ওরা পাহারায় ঢিল দেবে।

টাইপ রাইটারে খটাখট শব্দ তুলে জাহিদ লিখল, 'পাখিরা আবার উড়ছে'। কিন্তু কেমন করে ও পাখিদের ওড়াবে? কোন সন্দেহ নেই, পাখিরা উড়তে চায় বলেই ওর কাছে বার বার ফিরে আসছে। কিন্তু কিভাবে ওদের ওড়াতে হয়?

মুখ তুলে অন্ধকার জানালার দিকে তাকাল জাহিদ। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল। জানালার ডিজাইন করা গ্রিলে একটা চড়ুই পাখি বসে আছে। কালো পুঁতির মত জ্বলজ্বলে চোখ দুটো একদৃষ্টে চেয়ে আছে জাহিদের দিকে। আর একটা চড়ুই এসে বসল তার ঠিক পাশে, জাহিদের দিকে চেয়ে আছে এটাও। উড়ে এল আরও একটা। ভাল করে তাকাতে জাহিদ দেখতে পেল ছোট্ট বাগানের প্রান্তে দেয়ালের ওপর বসে আছে এক সারি চড়ুই পাখি। কাপড় শুকাবার দড়িতেও সার বেঁধে বসে আছে গোটা দশেক। ধীরে ধীরে বাড়ছে ওদের সংখ্যা।

'হায় আল্লাহ্! এ যে সত্যিকারের পাখি!' বিড়বিড় করে উঠল জাহিদ নিজের অজান্তেই, 'আমার কল্পনা নয় ওরা সত্যিকারের পাখি!'

স্বপ্নেও ও যা কল্পনা করেনি, তাই ঘটছে। পাখিরা ওর মনের গহনে নয়, বাস্তবে বিচরণ করছে। সত্যিকারের চড়ুই পাখি! একে একে জড়ো হচ্ছে। একদৃষ্টে চেয়ে আছে জাহিদের দিকে। আদেশের প্রতীক্ষায়?

কোথায় তুমি, রুস্তম শের? কেন তোমাকে আমি অনুভব করতে পারছি না!

হঠাৎ অদৃশ্য কোন সঙ্কেত পেয়ে একসঙ্গে পাখা মেলল সবগুলো পাখি, পাখা ঝাপটানর খসখসে শব্দ তুলে মিলিয়ে গেল রাতের তারাজ্বলা আকাশে।

একাগ্রমনে রুস্তম শেরকে খুঁজতে লাগল জাহিদ। শুনেছে সাদা কাগজে পেন্সিল ধরে প্ল্যানচেট করে বিশ্বাসী লোকেরা, পরলোকের আত্মার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে। একবার চেষ্টা করে দেখলে হয় না? একটা পেন্সিল তুলে নিয়ে সাদা কাগজ বিছাল সামনের টেবিলে, তারপর দু'চোখ বন্ধ করে খুলল ওর তৃতীয় নয়ন। কোথায় তুমি, রুস্তম শের?

হঠাৎ করে পেন্সিল ধরা হাতটা ওপরে উঠে গেল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ছুরির মত নেমে এল সেটা টেবিলে বিছানো ডান হাতের পিঠ লক্ষ্য করে। রুস্তম শের!

বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর মাঝে চামড়া ভেদ করে মাংসে ঢুকে গেল পেন্সিলটা। তারপর নিশ্চল হয়ে গেল।

পেছনে মাথা হেলিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বেরিয়ে আসা আর্তনাদটাকে অনেক কষ্টে ভেতরে পাঠিয়ে দিল জাহিদ। একটু সামলে নিয়ে দম বন্ধ করে টান দিয়ে পেন্সিলটাকে বের করে আনল। ব্যথায় ফুঁপিয়ে উঠছে নিজের অজান্তেই।

শোবার ঘরের বাথরুমে গেলে মোনার ঘুম ভেঙে যেতে পারে, তাই দৌড়ে নিচের বাথরুমে এল জাহিদ। বেসিনের কল খুলে আহত হাতটা পানির নিচে ধরে রাখল। আগুনের মত জ্বলছে ক্ষতটা। তাজা রক্ত মিশে যাচ্ছে পানির ধারায়। পাঁচ

BanglaBook.org

মিনিট পর তাকের ওপর থেকে ডেটল নামিয়ে বহুকষ্টে এক হাতে বোতলের মুখ খুলল। তুলো ওপরের বাথরুমে, এখানে নেই। বোতলটা কাত করে ঢেলে দিল ক্ষতের ওপর, ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্বলে উঠল। তারপর বাঁ হাতে ক্ষতটা চেপে ধরে থাকল কিছুক্ষণ যাতে রক্ত বন্ধ হয়ে যায়। কি প্রচণ্ড ব্যথা!

কি হয়ে গেল এটা? কোন সন্দেহ নেই রুস্তম শের টের পেয়ে গেছে জাহিদ ওকে খুঁজছে। নাক গলানো পছন্দ করে না সে, তাই সাবধান করে দিয়েছে যাতে দ্বিতীয়বার চেষ্টা না করে।

ধীরে ধীরে ব্যথাটা সহ্য হয়ে এল। ভয়টাও কেটে গেল। বাথরুম থেকে বেরিয়ে বসার ঘরের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। অন্ধকারে পুলিসের জীপটাকে চিনতে ভুল হয় না, ভেতরে নড়াচড়া করছে গার্ড দু'জন। ওরা কি পাখিগুলোকে দেখেছে? অবশ্য এখান থেকে বাড়ির পিছন দিকটা দেখা যাবার কথা নয়। তবুও ওরা ওড়ার সময় দেখা যাবার কথা।

দরজা খুলে বেরিয়ে এল জাহিদ। গার্ড দু'জন জীপ থেকে বেরিয়ে দৌড়ে আসছে।

'ও ব্যাটা কি আবার ফোন করেছে, স্যার?' ছুটতে ছুটতেই প্রশ্ন করল লম্বা জন।

'না না, সেসব কিছু নয়,' একটু অপ্রস্তুত হল শাহেদ। 'স্টাডিতে বসে কাজ করছিলাম, হঠাৎ করে দেখলাম ওপাশের মাঠের ওপর এক ঝাঁক পাখি উড়ে যাচ্ছে। আপনারা কি দেখেছেন?'

সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে হাঁপাচ্ছে, জ্বলন্ত সিগারেট সমেত হাতটা পিছনে লুকিয়ে সহাস্যে বলল সে, 'হ্যাঁ, স্যার। দেখেছি, শব্দও শুনেছি।' ডান হাত তুলে পেছন দিকটা দেখাল, 'ওই দিকে উড়ে গেছে, অনেকগুলো হবে—প্রায় হাজার খানেক। তাই না?' বলে সমর্থনের আশায় সঙ্গীর দিকে তাকাল।

ওর সঙ্গী ওপর-নিচ মাথা ঝাঁকাল। 'রাতের বেলা তো কখনও এভাবে ঝাঁক বেঁধে পাখি ওড়ে না। আমরাও এই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম। আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমান, স্যার, কোন ভয় নেই। আমরা আছি।'

ঘরে চলে এল জাহিদ।

যাক, স্বপ্ন নয়। সত্যিই পাখিগুলো এসেছিল।

যদি কোনভাবে রুস্তম শেরের চিন্তাপথে ঢুকে পড়া যেত! ও যেভাবে ঢুকে পড়ে জাহিদের মধ্যে। ও যেভাবে জাহিদকে প্রভাবিত করে, ঠিক সেভাবে যদি জাহিদ প্রভাব খাটিয়ে ওকে কব্জা করতে পারত। অবশ্য একবার চেষ্টা করে যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, দ্বিতীয়বার পেন্সিলের চেয়েও কার্যকরী কোন অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে রুস্তম শের। কিন্তু জাহিদকে কি সত্যিই ও খুন করবে? ওকে যে রুস্তম শেরের খুব দরকার!

রান্নাঘরের দরজা খুলে পিছনের এক ফালি বাগানে বেরিয়ে এল জাহিদ। কম পাওয়ারের আলো জ্বলছে। তবে একটু খুঁজতেই পেয়ে গেল যা খুঁজছিল তা। কাপড় শুকাবার তারের নিচে, আর দেয়ালের গায়ে পাখির বিষ্ঠা, এখনও

BanglaBook.org

শুকোয়নি। ঘাসের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে দুটো চড়ুই পাখির প্রাণহীন দেহ, পাগুলো আকাশের দিকে টানটান।

আর কোন সন্দেহ নেই, চোখের ভুল নয়, পাখিগুলো সত্যিকারের পাখি। হঠাৎ ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল জাহিদের। কেন এসেছে ওরা? কোনভাবে অতিপ্রাকৃত একটা শক্তি পেয়েছে সে, কিন্তু সেটা নিয়ন্ত্রণের কোন ক্ষমতাই জাহিদের নেই। কেন এসব ঘটছে তা-ও বুঝতে পারছে না ও। ছোট ছেলের মত ভয়ে শিউরে উঠছে জাহিদ ক্ষণে ক্ষণে।

চোদ্দ

একরাশ ক্লান্তি নিয়ে ঘুম ভেঙে উঠে বসল রুস্তম শের। দুঃস্বপ্নের মত কেটেছে রাতটা। মনে হচ্ছে ঘুমায়নি, পরিশ্রম করেছে সারারাত।

মাত্র ঘুমটা এসেছিল, হঠাৎ করে ও স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। জাহিদ যেন ওর সাথে একই বিছানায় শুয়ে আছে, গল্প করছে দু'জন বিভোর হয়ে। আলো বন্ধ করে ঘুমাবার আগে দু'ভাই যেমন রোজকারমত কথাবার্তা বলে, ঠিক তেমন। আস্তে আস্তে ঘুমটা ভাঙতে শুরু করে, জাহিদ কেন বার বার ওকে পাখিদের কথা জিজ্ঞেস করছে? মনে হচ্ছিল কেউ যেন ওকে বন্দী করে ফেলতে চাইছে। আধো জাগরণেই প্রতিরোধের ব্যূহ তুলে দিল ও, জাহিদ! জাহিদ ঢুকে পড়েছে ওর মধ্যে! নিশিতে পাওয়া মানুষের মত বিছানা ছেড়ে টেবিলের কাছে এগিয়ে গেল রুস্তম শের, ঘুমটা তখনও পুরোপুরি ভাঙেনি। কিন্তু মর্মে মর্মে ঠিকই অনুভব করছে জাহিদকে থামাতে হবে, যে করেই হোক থামাতে হবে। বাদামি রঙের ইকোনো পেনটা বাঁ হাতে তুলে নিয়ে প্রচণ্ড শক্তিতে নামিয়ে আনল ডান হাতের পিঠে। অসম্ভব ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল, ঘুমটা ভেঙে গেছে পুরোপুরি। এতদূর থেকেও স্পষ্ট অনুভব করতে পারছে ও জাহিদের কষ্ট, আঘাতটা সামলে নেবার জন্যে ওর অমানুষিক প্রচেষ্টা। না, জাহিদকে এখন হত্যা করা যাবে না। জাহিদ ওকে বেঁচে থাকার পথগুলি শিখিয়ে না দেয়া পর্যন্ত কিছুতেই ওর মৃত্যু হতে পারে না।

আস্তে আস্তে জাহিদের আর্তনাদ মিলিয়ে গেল। হাঁপাচ্ছে রুস্তম শের। এরপর বাকি রাতটা ঘুম ছিঁড়ে ছিঁড়ে গেছে। ভয়ে, আশঙ্কায়।

সেগুন বাগিচার এই ছোট্ট একতলা বাড়িটা ভাড়া করেছে রুস্তম শের। একটা চৌকি আর টেবিল-চেয়ার কিনে এনেছে, এছাড়া সারা বাড়িতে আর কোন আসবাব নেই। প্রথমদিনেই মোড়ের স্টেশনারি দোকান থেকে এক দিস্তা সাদা কাগজ আর ছ'টা ইকোনো পেন কিনে এনেছিল। ইচ্ছে করেই এইচ-বি পেন্সিল কেনেনি। ওটা জাহিদের উপহার। রুস্তম শের এখন নতুনভাবে শুরু করতে চায়। তাই এই ছোট্ট বৈচিত্র্য।

BanglaBook.org

প্রতিদিনই ও কাগজ-কলম নিয়ে লেখার চেষ্টা করে। ঠিক যেভাবে জাহিদ লেখে। কিন্তু আজ পর্যন্ত নিজের নামটা ছাড়া আর কিছু লিখতে পারেনি, নিজে থেকে লেখার ক্ষমতা ওর নেই। এই হতাশাই প্রতিদিন ওকে তিলে তিলে শেষ করে দিচ্ছে। জাহিদের কাছ থেকে যে করেই হোক শিখে নিতে হবে লেখার নিয়মগুলি, অন্তত নিজের অস্তিত্ব রক্ষার খাতিরে।

বিছানা ছেড়ে বাথরুমের দিকে এগুল রুস্তম শের, ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়েছে। বেসিনের ওপর টাঙানো চৌকো আয়নার মুখোমুখি দাঁড়াল। ক'দিন আগে পর্যন্তও আয়নায় তারুণ্যে ভরপুর সুদর্শন একটা মুখ দেখত ও। হাজার মানুষের ভিড়ে চোখে পড়ার মত পৌরুষদীপ্ত আকর্ষণীয় চেহারা ছিল ওর। এই চেহারার সঙ্গে বলতে গেলে কোন মিলই নেই। মাত্র ক'দিনেই কি অদ্ভুত পরিবর্তন!

আয়নায় যে মুখটা দেখা যাচ্ছে, তার চোখের চারপাশে বুড়ো শরীরের মত অসংখ্য বলিরেখা, মুখের চামড়া ঢিলে আর খসখসে। অর্ধেক চুল পড়ে গেছে, তালুতে ঈষৎ টাকের আভাস। হাওয়া ছাড়া বেলুনের মত কুঁচকে গেছে সমস্ত শরীরের ত্বক। আজ মনে হচ্ছে দাঁতগুলোও নড়ছে, জ্বালা করছে মাড়ি। হাঁ করে দেখল মাড়িতে ঘা হয়েছে, লাল হয়ে আছে, মাঝে মাঝে হলুদ পুঁজের আভাস।

গত পরশুদিন ডান হাতের কনুইতে লালচে দগদগে একটা ঘা আবিষ্কার করেছে, নতুন টাকার মত আকৃতি, চারপাশে সাদা মরা চামড়া। আজ সকালে অনেকটা বড় হয়ে গেছে ঘা-টা। ঘাড়ের পাশে আরও একটা ঘা দেখা যাচ্ছে ঠিক একই রকম। ডান গালের চিক বোনের ওপর লালচে আভা ফুটে উঠেছে, চুলকাচ্ছে সমানে। অর্থাৎ আরও একটা ঘা, যেটা ঢাকার কোন উপায় নেই। শরীরের বিভিন্ন জায়গায় একই রকম চুলকানি, দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে ঘা। কনুইতে চুলকাতে যেতেই রক্ত মেশানো হলুদ পুঁজ বেরিয়ে পড়ল, সঙ্গে বাজে একটা গন্ধ।

পচে যাচ্ছে ওর শরীরটা। দ্রুত সময় ফুরিয়ে আসছে। খুব তাড়াতাড়ি লিখতে শুরু না করলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ওর শরীরটা, সত্যিকারের মৃত্যু ঘটবে রুস্তম শেরের।

না। কিছুতেই তা হতে পারে না। 'লিখতে তোমাকে হবেই, জাহিদ,' বিড়বিড় করে বলে উঠল সে, 'তবে ভাগ্য ভাল, বেশিদিন তোমাকে এই অত্যাচার সহ্য করতে হবে না।'

তাকের ওপর থেকে লিকুইড মেকআপের শিশিটা তুলে নিয়ে মুখের ঘা-টা ঢেকে দেবার কাজে লেগে পড়ল রুস্তম শের।

সেদিন সন্ধ্যায় স্টেশনারি দোকানের কর্মচারী বিশাল শরীরের অধিকারী এক খদ্দেরের কাছে এক বাক্স এইচ-বি পেন্সিল বিক্রি করল। সস্তা ডিওডোর‍্যান্টের গন্ধ ছাপিয়ে কেমন একটা বদগন্ধ বেরিয়ে আসছে লোকটার শরীর থেকে। দোকানদারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ল লোকটা মুখে মেয়েদের মত মেকআপ ব্যবহার করেছে। কিছু একটা ভজকট আছে, নিশ্চিত হল সে। কিন্তু পয়সা দিয়ে

BanglaBook.org

জিনিস কিনছে, তাতে তো আপত্তির কিছু নেই। কি দরকার ঝামেলা বাড়িয়ে!

দোকান থেকে বাসায় ফিরে তালা খুলে ভেতরে ঢুকল রুস্তম শের। লক্ষ করল না সদর দরজার সিঁড়িতে তিনটে চড়ুই পাখি মরে পড়ে আছে।

দ্রুত হাতে দু'একটা জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল কাঁধে ঝোলানো কালো সাইড ব্যাগটায়। বেরিয়ে পড়তে হবে ওকে।

পনেরো

সকাল থেকেই মোনার মুখ ভার। জাহিদ ডিপার্টমেন্টে যেতে চাচ্ছে, মোনার তাতে আপত্তি। পাহারা দু'ভাগে ভাগ করে ফেলতে হয় বলে পুলিসও চায় না ও বাসার বাইরে যাক। কিন্তু জাহিদ খুবই অস্থিরতায় ভুগছে। বাসা থেকে বের হতেই হবে। রুস্তম শেরের দেয়া সময়সীমা পেরিয়ে গেছে তিন দিন আগে। এক লাইনও লেখেনি জাহিদ। রুস্তম শের বাসায় ফোন করবে না, আড়ি-পাতা যন্ত্র আছে এখানে তা সে জানে। কিন্তু ওর সঙ্গে যোগাযোগ করতেই হবে। ডিপার্টমেন্টে ওর অফিসে ফোন আছে, ওখানে যাওয়াই ভাল। মোনাকে মিথ্যে করে বলল কয়েকটা টিউটোরিয়াল খাতা দেখা হয়নি, পরীক্ষা শুরু হবার আগে ওগুলো দেখে শেষ করতে হবে। খাতাগুলো আনার জন্যে ওকে ডিপার্টমেন্টে যেতেই হবে। জাহিদ সাধারণত মিথ্যে কথা বলে না, অথচ কত সহজভাবে আজ কাঁচা মিথ্যে কথাগুলো বেরিয়ে এল, মনে হচ্ছিল কেউ যেন ওকে শিখিয়ে দিচ্ছে। শরীরে আর মনে প্রচণ্ড অস্থিরতা। রুস্তম শের ওকে ডাকছে।

দু'সপ্তাহ পরে পরীক্ষা আরম্ভ হবে, তাই ঈদের ছুটির পর আর ক্লাস হচ্ছে না। তারপরেও পুলিস বিভাগের অনুরোধে জাহিদ এক মাসের ছুটি নিয়ে নিয়েছে, ব্যাপারটার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে না হয়। দরকার হলে ছুটি বাড়িয়ে নিতে হবে। এরপরেও জোর করে ডিপার্টমেন্টে যেতে চাচ্ছে বলেই মোনা রেগে আছে।

বাইরের গার্ড দু'জনকে বলতে ওরা থানা থেকে আরও দু'জন গার্ড আনিয়ে নিল। দু'জন জাহিদের সঙ্গে যাবে, দু'জন থাকবে।

কয়েকদিন চালানো হয়নি, জাহিদের পাবলিকা স্টার্ট নিতে একটু দেরি করল। হেঁটে গেলে ডিপার্টমেন্ট বিশ/পঁচিশ মিনিটের রাস্তা। তবে গাড়ি নিলে বেশ কিছুটা ঘুরে যেতে হয় বলে পনেরো মিনিটের আগে পৌঁছানো যায় না। এক হাতে ড্রাইভ করতে হচ্ছে বলে একটু অসুবিধা হচ্ছে। মোনাকে আসল ঘটনাটা খুলে বলতে হয়েছে, তবে প্রতিজ্ঞা করতে হয়েছে আর কখনও সেই চেষ্টা করবে না জাহিদ। মোনা হাতে একটা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছে। পেইন কিলার খাচ্ছে, তবে এখনও প্রচণ্ড ব্যথা।

BanglaBook.org

পাবলিকার পেছন পেছন নিজেদের জীপে ওকে অনুসরণ করে আসছে কনস্টেবল হাবিব আর জসিম। কর্তব্যপরায়ণ প্রাণবন্ত ছেলে দুটো। ইন্সপেক্টর শাহেদকে বলে জীপের ব্যবস্থা করে দিয়েছে জাহিদই। নিজের গাড়িতে দেহরক্ষী বয়ে নিয়ে বেড়াতে জাহিদের আত্মসম্মানে লাগে।

গাড়ি পার্ক করে নেমে দাঁড়াল জাহিদ। হাবির আর জসিম ওর পাশেই পার্ক করেছে।

'আমি এক্ষুণি ফিরে আসব, আপনারা ইচ্ছে করলে এখানেই অপেক্ষা করতে পারেন।' ওদেরকে খসাতে চাইল জাহিদ।

'থেকে আর কি করব। আপনার সঙ্গেই যাই,' একগাল হেসে হাবিব ওর পরিকল্পনাটা উড়িয়ে দিল।

'দোতলাতেই আমার অফিস, চিন্তার কিছু নেই,' শেষ চেষ্টা করল ও।

'আপনাকে একা ছাড়ার অর্ডার নেই,' কঠোর দেখাচ্ছে এক মুহূর্ত আগের হাসিখুশি মুখটা। 'আমরা নাহয় বাইরেই দাঁড়াব, আপনি কাজ সেরে আসুন।'

মেজাজ খিঁচড়ে গেল জাহিদের। কথা না বাড়িয়ে সিঁড়ির দিকে এগুল ও, জসিম আর হাবিব অনুসরণ করল।

ক্লাস হচ্ছে না, তাই দু'একজন ছাত্র-ছাত্রী ছাড়া ফ্যাকাল্টি বলতে গেলে ফাঁকা। দূর থেকে জাহিদ আর তার ইউনিফর্মধারী দুই সঙ্গীকে দেখে আড়চোখে তাকাচ্ছে সবাই, হাবভাবে স্পষ্ট কৌতূহল। কোনদিকে না তাকাবার ভান করে দোতলায় উঠে এল জাহিদ।

দু'একটা ছাড়া প্রায় সব দরজাই বন্ধ। ডিপার্টমেন্টের অফিস থেকে বেরিয়ে আসছেন ডক্টর আবুল হাশেম ভুঁইয়া। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনি ছিলেন জাহিদের দু'বছরের সিনিয়র। এখন তিনি সহকর্মী হলেও জাহিদ তাঁকে 'আপনি' করে সম্বোধন করে, উনি অবশ্য জাহিদকে 'তুমি' করেই বলেন। বলতে গেলে প্রায় সর্বক্ষণই ডক্টর ভুঁইয়া বহু পুরানো স্টাইলে বানানো কালো একটা সুট পরে থাকেন—হঠাৎ করে দেখলে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের কোন উপন্যাসের চরিত্রে অভিনয় করার জন্যে মেকআপ নিয়েছেন। ব্যাকব্রাশ করা লম্বা চুল, কোঁকড়ানো দাড়ি। পণ্ডিত লোক, জাহিদ সবসময়ই তাঁকে শ্রদ্ধা করে, যদিও আজকাল সম্পর্কটা প্রায় বন্ধুত্বের পর্যায়ে এসে গেছে।

'স্লামালেকুম, হাশেম ভাই, কেমন আছেন?' অফিসের তালা খুলতে খুলতে ভদ্রতা করল জাহিদ।

'কি খবর, জাহিদ, হঠাৎ এদিকে?' নাটুকে ভঙ্গিতে জোরাল কণ্ঠে জানতে চাইলেন ডক্টর ভুঁইয়া। 'বহুদিন তো তোমাকে এদিকে দেখা যায়নি!'

'কয়েকটা খাতা নিতে এসেছি, বেশিক্ষণ থাকব না।' হাসি হাসি মুখে কাটাতে চাইল জাহিদ।

'আরে, তোমার হাতে কি হয়েছে?' চোখ সরু করে চেয়ে আছেন ভদ্রলোক ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাতটার দিকে।

'এই, মানে···' অপ্রস্তুত হয়ে গেল জাহিদ, গল্প বানাতে হবে। 'দরজায় চাপা

BanglaBook.org

খেয়েছি।'

'দরজায়?' বিস্মিত দেখাচ্ছে তাঁকে, 'চমৎকার! বউয়ের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছিলে নাকি হে?' হাসছেন মিটিমিটি।

হেসে ফেলল জাহিদ। 'কি যে বলেন! সে বয়েস কি আর আছে? হঠাৎ করে দরজাটা বাতাসে...'

'হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি। আর বলতে হবে না,' ওকে থামিয়ে দিয়ে চোখ টিপলেন তিনি। জাহিদের ব্যাখ্যা গ্রহণ করেননি। জাহিদ কি ভেবেছে ডক্টর ভুঁইয়াকে ও বোকা বানাতে পারবে?

হঠাৎ করে জাহিদের একটা কথা মনে পড়ল। 'আচ্ছা, হাশেম ভাই, আপনি কি এ বছর লোক সাহিত্য পড়াচ্ছেন?'

'দশ বছর ধরে ওই একটা বিষয় পড়িয়ে যাচ্ছি, আর তুমি কিনা এখন জিজ্ঞেস করছ! হঠাৎ কেন জানতে চাইছ?'

এই প্রশ্নের বিশ্বাসযোগ্য উত্তর তৈরি করা কঠিন কিছু না। 'একটা পেপার লিখছিলাম, রিসার্চের জন্যে দরকার।'

'ঠিক কোন্ ব্যাপারে তোমার সাহায্য দরকার?'

'কুসংস্কার বা কোন পৌরাণিক কাহিনীতে কি আপনি কখনও চড়ুই পাখির উল্লেখ পেয়েছেন?'

ভুরু কুঁচকে ছাদের দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন ডক্টর ভুঁইয়া। 'হুঁ...এ মুহূর্তে তেমন কিছু মনে পড়ছে না।' তারপর স্থির চোখে ওর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আসল ব্যাপারটা কি বল তো? কেন তুমি জানতে চাইছ?'

আবুল হাশেম ভুঁইয়াকে বোকা বানানো সহজ কাজ নয়। গম্ভীর হয়ে গেল জাহিদ। 'এই...মানে...এখন বলতে পারছি না। পরে সময় করে একদিন বলব। আমি ঠিক...ইয়ে...একটু চিন্তায় আছি।'

হাসির ভঙ্গিতে ঠোঁট দুটো একটু বেঁকে গেল। 'ঠিক আছে, আই আণ্ডারস্ট্যাণ্ড। চড়ুই পাখি, না? খুব সাধারণ পাখি। মনে হয় না কুসংস্কার বা পৌরাণিক কাহিনীতে এর গভীর কোন তাৎপর্য আছে। দাঁড়কাক বা শকুন হলে এক্ষুণি বলে দিতে পারতাম। আচ্ছা, দাঁড়াও,' ডান হাতের তর্জনী দিয়ে কপালে আস্তে আস্তে টোকা মারছেন তিনি, 'কোথায় যেন চড়ুই পাখির কথা পড়েছি! একটু বইপত্র ঘেঁটে দেখতে হবে। তুমি আছ তো কিছুক্ষণ?'

'আধ ঘণ্টার বেশি না।'

'দেখি তাহলে। ব্যারিনজারের "ফোক্‌লোর অভ আমেরিকা" হল রাজ্যের সব কুসংস্কারের বাইবেল। আমার অফিসেই আছে। এক্ষুণি দেখে এসে বলছি। ওতে কিছু না পেলে লাইব্রেরিতে গিয়ে দেখে পরে তোমাকে নাহয় ফোন করব।'

কৃতজ্ঞ বোধ করল জাহিদ। 'ধন্যবাদ, হাশেম ভাই। অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'ও কিছু না,' হাত নেড়ে উড়িয়ে দেবার ভঙ্গি করলেন। 'বাই দ্য ওয়ে, সেদিন তোমার বউ দারুণ রান্না করেছিল, হে। এত ভাল মোরগ পোলাও আগে কোথাও খাইনি। যেমন দেখতে তেমন গুণ। যাই বল না কেন, অত সুন্দরী একটা

BanglaBook.org

মেয়েকে তোমার স্ত্রী হিসেবে কিছুতেই মানায় না।'

হেসে ফেলল জাহিদ। এটা ওনার প্রিয় রসিকতা। মোনার সামনে কিন্তু মুখে তালা এঁটে থাকেন।

'যাই দেখি তোমার চড়ুই পাখির হদিস করতে পারি কিনা।' দূরে দাঁড়ানো কনস্টেবল জসিম আর হাবিবের উদ্দেশে হাত নেড়ে উঁচু গলায় বললেন, 'খোদা হাফেজ, ভাই সাহেবরা।'

হকচকিয়ে ঘুরে তাকাল ওরা, ডক্টর ভুঁইয়া ততক্ষণে নিজের অফিসের দিকে হাঁটতে শুরু করেছেন।

হাবিব এগিয়ে এসে জাহিদকে জিজ্ঞেস করল, 'ইনি কে?'

'ডক্টর আবুল হাশেম ভুঁইয়া। এই ডিপার্টমেন্টের টিচার।'

'ভদ্রলোকের মাথায় কি একটু ছিট আছে?'

হাসল জাহিদ। 'আমাদের অনেকের চাইতে বেশি সুস্থ উনি। বাংলাদেশে ওনার মত পণ্ডিত লোক কমই আছে,' বলতে বলতে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে গেল জাহিদ।

হাবিব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভেতরটা জরিপ করে নিল। জাহিদ সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিতে উজ্জ্বল দেখাল চারদিক। শূন্য ঘর, কেউ লুকিয়ে নেই। হাবিব রেলিঙের কাছে দাঁড়ানো ওর সঙ্গীর কাছে চলে গেল।

অনেকদিন অফিসে আসেনি জাহিদ, কেমন একটা ভাপসা গন্ধ উঠছে। তা-ও জানালা খুলতে ইচ্ছে করল না। হঠাৎ নিজেকে প্রচণ্ড একা মনে হল। মন কেঁদে উঠল মোনা-রূপক-রুমকির জন্যে। কেন যেন মনে হচ্ছে এখানে কাউকে বিদায় জানাবার জন্যে এসেছে ও।

জোর করেই নিজেকে টেনে বাইরে বের করে নিয়ে এল জাহিদ। হাবিব আর জসিমকে ডাকল, 'চা খাবেন নাকি? লাউঞ্জে গিয়ে তাহলে নিয়ে আসি।'

ওরা খুশি হয়ে মাথা নাড়ল। করিডরের শেষ প্রান্তে লাউঞ্জ। তিন কাপ চা কিনে নিয়ে এল জাহিদ।

হাবিব আর জসিম বারান্দার রেলিঙে বসে চা খাচ্ছে। জাহিদ চেয়ারে বসে একদৃষ্টে চেয়ে আছে সামনে টেবিলের ওপরে রাখা কালো টেলিফোন সেটটার দিকে।

কিন্তু টেলিফোনটা নীরব, বসে আছে জড়পদার্থের মত। ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে মূল্যবান সময়গুলো, অথচ বেজে উঠছে না।

উঠে গিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে বাইরে উঁকি দিল জাহিদ। হাবিব আর জসিম এদিকে মুখ করে নিজেদের মধ্যে গল্প করছে। বাঁ হাতের আঙুলগুলো উঁচিয়ে ওদের উদ্দেশে বলল, 'আর পাঁচ মিনিট।' ওরা হাত তুলে সমর্থন জানাল।

ফিরে এসে আবার চেয়ারটা টেনে বসল জাহিদ। রুস্তম শের কি অফিসের নাম্বার জানে না? কি আবোল-তাবোল ভাবছে ও, রুস্তম শের নাম্বার জানবে না তা-ও কি হয়? মনে হল দূরে কোথাও ফোন বেজে উঠল। কান পেতে থেকেও আর কিছু শুনতে পেল না। গালে হাত দিয়ে বন্ধ জানালার কাঁচের বাইরে চেয়ে

BanglaBook.org

রইল একদৃষ্টে।

'জাহিদ?'

চমকে উঠল জাহিদ। হাতের ধাক্কা লেগে টেবিলে রাখা কাপ থেকে ঠাণ্ডা চা ছলকে পড়ে ভিজিয়ে দিল একটা খাতার কোনা। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল আবুল হাশেম ভুঁইয়া দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন।

'সরি,' লজ্জা পেল জাহিদ, 'একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম।'

'তোমার ফোন এসেছে। মনে হয় ভুলে আমার অফিসের নাম্বারে করেছে। ভাগ্যিস, আমি ছিলাম।'

বুকের ভেতর দামামা বাজতে শুরু করেছে। অনেক কষ্টে নিজেকে শান্ত রাখতে পারল জাহিদ। বেশ স্বাভাবিকভাবেই বলল, 'আসলেই ভাগ্যটা ভাল, আর একটু পরই আমি চলে যেতাম।'

ডক্টর ভুঁইয়ার চোখে কৌতূহল আর বিস্ময়। 'ব্যাপার কি, জাহিদ? সব ঠিকঠাক আছে তো?'

না, হাশেম ভাই, কিছুই ঠিকঠাক নেই। এক বদ্ধ উন্মাদ আমাকে আর আমার বউ-বাচ্চাকে খুন করতে চাচ্ছে, যে কিনা এমন এক লোকের ভূত যার কোন অস্তিত্বই কোনদিন ছিল না। প্রাণপণে এই কথাগুলোই বলার চেষ্টা করল জাহিদ, অথচ মুখ থেকে বের হল, 'কেন? ঠিকঠাক না থাকার কি কারণ?' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জাহিদ। ড্রয়ার থেকে একটা ছোট্ট টাওয়েল বের করে ছলকে পড়া চা-টুকু মুছে নেবার ভান করে মুখটা নিচু করল।

'তোমাকে কেমন যেন দেখাচ্ছে! তুমি কি অসুস্থ?'

'না না!' সজোরে দু'দিকে মাথা নাড়ল জাহিদ।

'যাই হোক, যে লোকটা ফোন করেছে তাকে কখনও তোমার বাসায় ঢুকতে দিয়ো না। গলা শুনে সুবিধের লোক মনে হল না।'

পাশ কাটিয়ে বের হতে হতে সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল জাহিদ। করিডরে পা রাখতেই হাবিব লাফ দিয়ে রেলিঙ থেকে নেমে দাঁড়াল, 'কোথায় যাচ্ছেন, স্যার?'

'ভুঁইয়া সাহেবের অফিসে আমার ফোন এসেছে। মনে হয় আমাকে করতে গিয়ে ভুলে ওনার নাম্বার ঘুরিয়েছে।'

'আর কি ভাগ্য, আপনি ছাড়া একমাত্র ভুঁইয়া সাহেবই অফিসে এসেছেন!' ব্যঙ্গের ভঙ্গিতে বলল হাবিব।

পাত্তা দিল না জাহিদ, কাঁধ ঝাঁকিয়ে এগিয়ে গেল আবুল হাশেম ভুঁইয়ার অফিসের দিকে।

এই ব্লকের সব অফিসই আকারে সমান। তবে ডক্টর ভুঁইয়ার ঘরে এত জিনিসপত্র যে ঘরটাকে অপেক্ষাকৃত ছোট মনে হয়। মাটির তৈরি ছোটবড় বিষ্ণুমূর্তি, বাঁশের তৈরি পুতুল, পুরানো একটা আলমারি দিয়ে সাজিয়েছেন তিনি ঘরটাকে। যামিনী রায়ের ছবির পাশাপাশি দেয়ালে ঝুলছে মাছ ধরা জাল আর একটা ব্যবহার করা হুঁকো। ব্যারিনজারের 'ফোকলোর অভ আমেরিকা' খোলা

BanglaBook.org

অবস্থায় টেবিলে রাখা আছে। তারই খোলা পৃষ্ঠার ওপর টেলিফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রেখেছেন তিনি। জাহিদের সঙ্গে ঘরে ঢোকেননি উনি, বাইরে দাঁড়িয়ে হাবিব আর জসিমের সঙ্গে কথা বলছেন। কৃতজ্ঞ বোধ করল জাহিদ।

রিসিভারটা তুলে নিল, 'হ্যালো, রুস্তম শের?'

'তোমার সময় শেষ।' সন্দেহ নেই রুস্তম শেরই, কিন্তু একি অদ্ভুত পরিবর্তন ওর কণ্ঠস্বরের! কর্কশ, খসখসে—মনে হচ্ছে সারাদিন মিছিলে শ্লোগান দিয়ে ঘরে ফিরে চোটপাট করছে বিপক্ষদলীয় নেতা। 'এক সপ্তায় এক লাইনও লেখনি তুমি।'

'ঠিকই বলেছ, লিখিনি আমি,' হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে, কিন্তু রুস্তম শেরকে নিজের দুর্বলতা দেখাতে চায় না জাহিদ। সমান তেজে বলল, 'আমি কোনদিনই ওই লেখা লিখব না আর, দশ বছর সময় দিলেও না। তুমি মরে গেছ, কোনদিনই বেঁচে উঠতে পারবে না।'

'ভুল করছ, দোস্ত।' বিশ্রী অস্বস্তিকর ঘড়ঘড়ে কণ্ঠে বলে যেতে লাগল রুস্তম শের, 'মরতে চাইলে অবশ্য আমার কিছু করার নেই।'

'তুমি কি জানো তোমার কণ্ঠস্বর কেমন শোনাচ্ছে?' আত্মপ্রসাদের সঙ্গে বলল জাহিদ, 'শুনে মনে হচ্ছে তোমার অবস্থা কেরোসিন। সেজন্যেই তাড়াতাড়ি আমাকে দিয়ে লেখাতে চাও, না? লাভ নেই, রুস্তম শের। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে তুমি খুব শীঘ্রি, মাটিতে মিলিয়ে যাবে।'

'তাতে তোমার কিচ্ছু যায় আসে না, তাই না?' কর্কশ কণ্ঠটাকে কি একটু দুঃখিত মনে হচ্ছে? উত্তেজিত হয়ে কথা বলে যাচ্ছে রুস্তম শের, ফ্যাঁসফেঁসে রক্ত হিম করা আবহ, 'আমার কোন ব্যাপারেই তোমার কোন উৎসাহ নেই, তাই না? খাল কেটে তুমিই কুমির ডেকে এনেছ। সন্ধ্যা নামার আগেই সিদ্ধান্ত নাও, নাহলে তুমি শুধু একাই মরবে না, আরও কয়েকজনকে নিয়ে মরবে।'

'আমি···'

খট করে লাইনটা কেটে গেল। রিসিভার রেখে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখল দরজায় দাঁড়িয়ে আছে হাবিব আর জসিম।

'কে ফোন করেছিল?' হাবিব জিজ্ঞেস করল গম্ভীর ভাবে।

'আমার এক ছাত্র।'

'আপনি এখানে এসেছেন কেমন করে সে জানল?'

রেগে গেল জাহিদ। শ্লেষ মাখা কণ্ঠে বলে উঠল, 'আসলে আমি ভারতের এজেন্ট, খবর পাচার করছিলাম। কি করবেন করুন।'

কঠোর হয়ে এল হাবিবের দৃষ্টি। 'দেখুন, স্যার, আমরা আপনাকে আর আপনার পরিবারকে সাহায্য করতে এসেছি। জানি দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা নজরবন্দী হয়ে থাকতে আপনার ভাল লাগছে না, কিন্তু আমাদেরকে শত্রু ভাবার কোন কারণ নেই। আমরা আপনাকে সাহায্য করার চেষ্টা করছি, আর কিছু না।'

লজ্জা পেল জাহিদ। হঠাৎ করে রেগে ওঠা উচিত হয়নি। কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে। মনে হচ্ছে চামড়ার নিচে কেউ সুড়সুড়ি দিচ্ছে, গরম হয়ে উঠছে শরীরের

BanglaBook.org

রক্ত। রুস্তম শের! ওর সঙ্গেই আছে, দেখছে সব, শুনছে। সাহায্য চাওয়ার কোন উপায় নেই।

'সরি,' ক্ষমা চাইল জাহিদ। ওদের দু'জনের পেছন থেকে আবুল হাশেম ভুঁইয়া উঁকি মারছেন। 'আসলে ছেলেটা আমাকে নিচে গাড়ি পার্ক করতে দেখেছে। ফোন করতে গিয়ে ভুঁইয়া সাহেবের নাম্বার ঘুরিয়েছে। প্রায় একই নাম্বার আমাদের, শুধু শেষের ডিজিটটা ভিন্ন।'

হাবিব একটু তাকিয়ে থেকে বলল, 'আপনার কাজ কি শেষ হয়েছে?'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল জাহিদ। 'এই তো, কয়েকটা খাতা বেছে নিতে হবে, বাসায় গিয়ে দেখব। (কেরানিকে একটা নোট লিখতে হবে) আর, হ্যাঁ, ডিপার্টমেন্টের কেরানি আলম সাহেবকে একটা নোট লিখতে হবে।' আশ্চর্য হয়ে গেল জাহিদ, কেন যে এই মিথ্যে কথাটা বলল তা নিজেই জানে না। মনে হচ্ছে ওকে দিয়ে কেউ যেন বলিয়ে নিচ্ছে। আলম সাহেবকে নোট লিখবে! হাশেম ভাই নিশ্চয়ই হাসতে হাসতে শেষ হয়ে যাচ্ছেন ভেতরে ভেতরে।

ওনাকে পাশ কাটিয়ে বের হতে যেতেই বললেন, 'জাহিদ, এক মিনিট দাঁড়াও তো, কথা আছে।'

নিরুপায় ভঙ্গিতে থামল জাহিদ, হাবিব আর জসিম একটু দূরে সরে গিয়ে কথা বলার সুযোগ করে দিল।

'ব্যাপার কি, জাহিদ? পরকীয়া প্রেম-ট্রেম চালাচ্ছ নাকি? যা একখানা গল্প বানালে!' রসিকতা করছেন, কিন্তু হাসছেন না ডক্টর ভুঁইয়া।

বোকার মত হাসতে চেষ্টা করল জাহিদ।

'যাও, তোমাকে আটকে রাখব না। আলম সাহেবকে নাকি কি একটা নোট লিখবে!'

জাহিদের মুখে রক্ত উঠে এল। কি লজ্জা! আলম সাহেব পাঁচ বছর ক্যানসারে ভুগে বছর দুয়েক আগে ইন্তেকাল করেছেন। সেই আলম সাহেবকে নোট লেখার কথা ভাবছে জাহিদ।

'অবশ্য এসব বলার জন্যে তোমাকে আটকাইনি আমি। তুমি চড়ুই পাখির ব্যাপারে জানতে চেয়েছিলে, ব্যারিনজারে সেটা খুঁজে পেয়েছি।'

হার্টবিট বেড়ে গেল। 'কি পেয়েছেন?' সন্তর্পণে জিজ্ঞেস করল জাহিদ।

ভেতরে ঢুকে টেবিল থেকে বইটা তুলে নিলেন তিনি, 'চড়ুই আর লুন নামের একধরনের হাঁস হল "সাইকোপম্প",' খুশি-খুশি কণ্ঠে বললেন তিনি।

'সাইকোপম্প? সেটা আবার কি?' অবাক হল জাহিদ।

'গ্রীক ভাষায় এর মানে হল কর্মী—যারা কোন বিশেষ কাজ সম্পন্ন করে। এক্ষেত্রে সাইকোপম্প হল তারা যারা ইহলোক আর পরলোকের মধ্যে মানুষের আত্মা আনা-নেয়া করে। ব্যারিনজার লিখেছেন, যেখানে মৃত্যু আসন্ন, লুন সেখানে দেখা দেয়। ওদের কাজ হল সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত মানবাত্মাকে পথ দেখিয়ে পরলোকে নিয়ে যাওয়া। চড়ুই পাখির কাজ কিন্তু, ব্যারিনজারের মতে, আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এরা হারিয়ে যাওয়া আত্মাকে পথ দেখিয়ে ইহলোকে নিয়ে আসে।

অন্য কথায়, চড়ুই পাখিরা হল জীবন্মৃতের পথপ্রদর্শক।' জাহিদের বিস্মিত চোখের দিকে তাকিয়ে আরও যোগ করলেন, 'তোমার অবস্থাটা কি তা আমি জানি না। তবে বড় ভাই হিসেবে শুধু এটুকু বলব, সাবধানে থেক। খুব সাবধান। দেখে মনে হচ্ছে খুবই বিপদের মধ্যে আছ তুমি। যদি কোন সাহায্য দরকার হয়, নির্দ্বিধায় আমাকে বলতে পার।'

'ধন্যবাদ, হাশেম ভাই। এমনিতেই অনেক বড় একটা উপকার করেছেন। দয়া করে আর কারও সঙ্গে যদি ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা না করেন, তাহলেই সবচেয়ে বড় উপকার হবে আমার।'

মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন তিনি। 'অবশ্যই। আমাকে বিশ্বাস করতে পার। নিজের দিকে লক্ষ রেখ, জাহিদ। আর এই ছেলে দুটোকে শত্রু ভেব না, ওদেরকে কাছে কাছে রাখলেই বুদ্ধিমানের কাজ করবে।'

অনেক কথাই বলতে চাইল জাহিদ, কিন্তু চামড়ার নিচের এই অস্বস্তিকর অনুভূতি দূর না হলে মুখ খোলা একান্তই বোকামি হবে।

'ধন্যবাদ, হাশেম ভাই, আপনার কথা মনে থাকবে।' ধীর গতিতে নিজের অফিসের দিকে রওনা হল জাহিদ।

আলম সাহেবকে নোট লিখতে হবে। কেন বার বার এই অর্থহীন কথাটা মনে পড়ছে! ব্যাণ্ডেজের নিচে ক্ষতটা অসম্ভব চুলকাচ্ছে, সঙ্গে চিনচিনে ব্যথা। হাতটা জোরে জোরে উরুতে ঘষল, কোন লাভ হল না। আরও বেশি করে চুলকাচ্ছে যেন। অফিসে ঢুকে পর্দাহীন কাঁচের জানালায় চোখ চলে গেল আপনা আপনি।

জানালার ওপাশে ইলেকট্রিক তারে সার বেঁধে বসে আছে কয়েকশো চড়ুই পাখি। সামনের বিল্ডিঙের ছাদ আর কার্নিস ঢেকে গেছে চড়ুই পাখিতে। এইমাত্র এক ঝাঁক এসে নামল নিচের টেনিস কোর্টে।

কোন শব্দ করছে না, প্রত্যেকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে জাহিদের দিকে।

সাইকোপম্প। জীবন্মৃতের পথপ্রদর্শক।

'না!' অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল জাহিদ। দূরে আকাশ কালো করে আরও এক ঝাঁক পাখি উড়ে আসছে এদিকেই। জাহিদের দু'হাতের রোম দাঁড়িয়ে গেছে, হাতের ক্ষতে অস্বস্তিকর চুলকানি। আলম সাহেবকে নোট লিখতে হবে। সন্ধ্যা নামার আগেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

জাহিদের চোখের সামনে পাখিরা একসঙ্গে ডানা মেলল। কালো হয়ে গেল আকাশ। ডানা ঝাপটানর শব্দে মুহূর্তের জন্যে বধির হয়ে গেল জাহিদ। রাস্তায় পথচারীরা অবাক হয়ে চেয়ে আছে আকাশের দিকে।

আলম সাহেবকে নোট লিখতে হবে। চেয়ারে বসে কাগজ কলম টেনে নিতেই চামড়ার নিচের অস্বস্তিকর অনুভূতি কমে এল। লিখতে শুরু করল জাহিদ, কি লিখতে যাচ্ছে সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই।

'আমি এখন কোথায়, বল তো?'

ভয়ে শামুকের মত গুটিয়ে গেল জাহিদ, কেঁপে উঠেছে অন্তরাত্মা। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে লেখাটার দিকে। অর্থটা দিনের আলোর মত পরিষ্কার।

BanglaBook.org

বেজন্মাটা জাহিদের বাসায়! ওখান থেকেই ফোন করেছে! রূপক-রুমকি আর মোনা! হায় আল্লাহ্!

চেয়ার ছেড়ে ওঠার চেষ্টা করল জাহিদ, কোথায় যেতে চাইছে নিজেই জানে না। কিন্তু এক চুল নড়তে পারল না। সম্মোহিতের মত চেয়ে আছে কলম ধরা হাতের দিকে, আবার লিখতে শুরু করেছে।

'মুখ খুললে মরবে!'

শেষ অক্ষরটা লেখা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতের ব্যথা আর চুলকানি, চামড়ার নিচের অস্বস্তিকর সুড়সুড়ি—সব নিমেষে ভাল হয়ে গেল। মনে হল কেউ যেন প্লাগটা খুলে দিয়েছে।

পাখিরা চলে গেছে। রুস্তম শেরও নেই।

বাসার বাইরের গার্ড দু'জনের কি অবস্থা কে জানে! রুস্তম শের জাহিদের অনুপস্থিতিতে গৃহকর্তার কাজ করছে। কেমন করে জাহিদ এই বোকামিটা করল? দু'জন কেন, পুরো সেনাবাহিনী এলেও ওদেরকে কেউ রক্ষা করতে পারত না।

'স্যার, হয়েছে?'

চমকে উঠে ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসল জাহিদ। কনস্টেবল হাবিব দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। 'এই তো, এক্ষুণি উঠছি,' বলতে বলতে কাগজটা মুঠো পাকিয়ে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ছুঁড়ে দিল।

দরজার দিকে রওনা হতেই হাবিব ডাকল, 'কি যেন খাতা নেবার কথা ছিল না?'

অপ্রস্তুত হল জাহিদ। 'এই যাহ্! যার জন্যে আসা সে কাজটাই ভুলে গিয়েছিলাম। ভাগ্যিস মনে করিয়ে দিয়েছেন!' আবার ঘুরে গিয়ে টেবিলের ওপর থেকে তিন-চারটে খাতা তুলে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল জাহিদ। 'মুখ খুললেই মরবে!'

নিচে নেমে গাড়ির দরজা খুলতে খুলতে জাহিদ হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল। 'সামনের দোকানে থেমে আমার ওয়াইফকে একটা ফোন করব, যদি কিছু কেনাকাটা করার থাকে।'

অবাক হল হাবিব, 'ওপর থেকেই ফোনটা সেরে এলেন না কেন?'

'মনে ছিল না। এখন আর সিঁড়ি ভাঙতে ইচ্ছে করছে না।'

হাবিব আর কথা বাড়াল না।

গেটের মুখের স্টেশনারি দোকানে থামল জাহিদ। হাত নেড়ে হাবিব আর জসিমকে জীপ থেকে নামতে নিষেধ করল। দোকানে ঢুকে ফোন করতে চাইলে দোকানদার একগাল হেসে কাউন্টারের তলা থেকে টেলিফোন সেটটা বের করে তালা খুলে দিল। জাহিদকে সে অনেক বছর ধরে চেনে।

'ভাইসাব, যদি কিছু মনে না করেন একটু প্রাইভেট কথা বলতে চাই,' ওপাশে রিঙ হচ্ছে, অন্য কোনদিকে জাহিদের মনোযোগ নেই।

'বলেন বলেন, কুনো অসুবিধা নাই,' বলতে বলতে কাউন্টার থেকে বেরিয়ে দোকানদার একটু দূরে শেলফের জিনিসপত্র সাজাতে লেগে গেল। হাবিব আর

BanglaBook.org

জসিম কাঁচের জানালা দিয়ে বাইরে থেকে জাহিদের দিকে চেয়ে আছে।

রুস্তম শের ফোন তুলল, 'জাহিদ?'

'ওরা কই? কি করছিস তুই...' চাপা কণ্ঠে গড়গড়িয়ে উঠল জাহিদ, রাগে ফেটে পড়ছে। রূপক-রুমকি একযোগে কাঁদছে, পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে ও। মোনা? মোনা কোথায়?

'কিচ্ছু না,' ওকে থামিয়ে দিল রুস্তম শের। 'শুনতেই তো পাচ্ছ, বাচ্চারা ভালই আছে, ওদের কোন ক্ষতি করিনি।'

'মোনা?' আঁতকে উঠল জাহিদ। তারপর চেঁচিয়ে উঠল, 'যদি ওদের কোন ক্ষতি হয় তোর নামে একটা অক্ষরও আমি লিখব না, হারামখোর!' দোকানদার অবাক হয়ে ঘুরে তাকাল। নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করল জাহিদ।

পরমুহূর্তে ওপাশ থেকে মোনার উৎসুক কণ্ঠ ভেসে এল, 'জাহিদ, তুমি ঠিক আছ তো?' ওর গলা চিন্তিত শোনাচ্ছে, ভীত নয়।

'তোমরা...বাচ্চারা...ঠিক আছ তো?' ফুঁপিয়ে উঠল জাহিদ।

'আমরা ভাল আছি। আমি...' চুপ করে গেল মোনা, রুস্তম শের পাশ থেকে কি যেন বলছে। তারপর কান্নাকান্না গলায় বলল, 'জাহিদ, ও যা চাইছে তা করতে হবে তোমাকে। কিন্তু ও বলছে এখানে তা করা যাবে না। জাহিদ...ও পুলিস দু'জনকে খুন করেছে!' কাঁদছে মোনা।

চোখ বন্ধ করল জাহিদ। প্রাণপণে নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছে। ওপাশে মাউথপিসে হাত চেপে ধরে রুস্তম শের মোনাকে কিছু বলছে।

একটু পর আবার মোনার গলা শোনা গেল। 'ও আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে। ও বলছে তুমি জানো কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। পাতালপুরীর কথা মনে আছে? ও বলছে তোমার সঙ্গের পুলিস দু'জনকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যেতে। সন্ধ্যার মধ্যে ওখানে পৌঁছুতে হবে তোমাকে।' আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল মোনা। 'যা বলছে তাই কর, জাহিদ!'

জাহিদের হাত নিশপিশ করতে লাগল রুস্তম শেরের গলা টিপে ধরার জন্যে, নখ বিঁধিয়ে ছিঁড়ে নিয়ে আসতে ইচ্ছে করছে ওর শরীরের চামড়া।

মোনার হাত থেকে রিসিভার নিয়ে নিয়েছে রুস্তম শের, হাসছে। 'একটু এদিক-ওদিক হবে তো তোমার বউ-বাচ্চা নেই হয়ে যাবে, বুঝেছ?' হাসি বন্ধ করে হঠাৎ ধমকে উঠল, 'পাতালপুরীটা আবার কি জিনিস? কোন কোড নাকি?'

'টেলিফোনের সঙ্গে রেকর্ডিং ইকুইপমেন্টস ফিট করা ছিল, ওগুলো নিশ্চয়ই এখন কাজ করছে না?' জাহিদ প্রশ্ন করল।

'এসেই প্রথমে ওগুলো ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি। কি ভাব তুমি আমাকে, জাহিদ?'

'মোনা হয়ত তা জানে না। পুলিস যাতে না বুঝতে পারে তাই পতেঙ্গার বাড়িটাকে পাতালপুরী বলে উল্লেখ করেছে ও। ও বাড়ির পেছনে জঙ্গলমত একটা জায়গাকে আমরা পাতালপুরী নাম দিয়েছিলাম। সন্দেহ করার কোন কারণ নেই, মোনা তোমাকে সাহায্য করতেই চাচ্ছে।'

Bangla-Book.org

রুস্তম শের বিশ্বাস করছে তো? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামতে থাকল জাহিদ। অবশেষে ওদিক থেকে রুস্তম শেরের গলা শোনা গেল, 'ঠিক আছে, হাতে সময় বেশি নেই।' হাঁফ ছেড়ে বাঁচল জাহিদ। মনে মনে ঠিক করল প্রথম সুযোগেই মোনাকে বুঝিয়ে দিতে হবে এত বড় ঝুঁকি নিয়ে কি বোকামিটা করেছে সে।

'ওদের কোন ক্ষতি কোরো না। তুমি যা বলবে তাই করব আমি।'

হেসে উঠল রুস্তম শের, 'জানি, করতে তোমাকে হবেই। এখন সময় নষ্ট না করে বেরিয়ে পড়। তাড়াহুড়ো করতে যেয়ো না। গাড়িটা বদলে নিলেই ভাল হয়। তবে তোমাকে কিছু বলতে যাচ্ছি না, কিভাবে কি করতে হবে তা তুমিই ভাল জান। সন্ধ্যার মধ্যেই চলে এস, যদি এদেরকে জীবিত দেখতে চাও। কোন চালাকি করতে যেয়ো না যেন।'

লাইনটা কেটে গেল।

মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল জাহিদ। প্রচণ্ড ইচ্ছে করছে এক ছুটে বাসায় চলে যেতে। মাত্র কয়েক মাইল দূর, অথচ কখনোই পার হওয়া যাবে না এই স্বল্প দূরত্বটুকু। এই মুহূর্তে আবেগের বশে কিছু করা মানে মোনা আর বাচ্চাদের মৃত্যু ত্বরান্বিত করা। আর যাই হোক রুস্তম শের এখন পর্যন্ত ওদের কোন ক্ষতি করেনি।

চিন্তা করার জন্যে সময় দরকার। জাহিদ অকারণেই ঘুরে ঘুরে শেলফ থেকে জিনিসপত্র নামাতে লাগল, যেন জিনিসগুলি এই মুহূর্তে না কিনলেই নয়। হাবিব আর জসিম একটু পরপরই জানালা দিয়ে ওর দিকে তাকাচ্ছে। ওরা যদি ওদের দুই সহকর্মীর অবস্থা বিন্দুমাত্রও আঁচ করতে পারত! এই মুহূর্তে এই দু'জনের জীবনও জাহিদের হাতের মুঠোয়। ওদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, ওদের নিজেদের নিরাপত্তার খাতিরেই। কিন্তু কিভাবে? বিদ্যুৎচমকের মতই প্ল্যানটা মাথায় খেলে গেল। মাইল দুয়েক দূরে হাইওয়ের একটা অংশ সমকোণে বাঁক নিয়েছে, তার ঠিক পরপরই ডানদিকে জঙ্গলের মধ্যে যাবার জন্যে সরু একটা সাইড রোড। আগে থেকে না চিনলে সাইড রোডটা খুঁজে পাওয়া মুশকিল, পার হয়ে যাবার আগে রাস্তাটা হাইওয়ে থেকে দেখা যায় না। যদি পুলিসের জীপ থেকে জাহিদ বেশ কিছুটা এগিয়ে যেতে পারে, তবে ওদেরকে ফাঁকি দেয়া খুব একটা কঠিন কাজ হবে না।

রুস্তম শের কি ওদেরকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে এতক্ষণে? নিশ্চয়ই ঢাকা থেকে গাড়ি চুরি করে নিয়ে এসেছে সে। সেটাই স্বাভাবিক। পাতালপুরীর উল্লেখ করে মোনা বিরাট ঝুঁকি নিয়েছে। জাহিদ ঠিকই বুঝতে পেরেছে ইঙ্গিতে ও কি বোঝাতে চাইছিল।

পতেঙ্গার বাড়ির পেছনে কয়েক একর জুড়ে পাহাড়ি জঙ্গুলে এলাকা। ওদের সীমানার ভেতরেই। মোনা ওখানে বেড়াতে ভালবাসে। মোনাই নাম দিয়েছে পাতালপুরী। বছর দুয়েক আগে এক বিকেলে ওরা দু'জন বেড়াচ্ছিল, একটা সাপ কোত্থেকে যেন বেরিয়ে এসে মোনাকে তাড়া করতে শুরু করে। জাহিদ এমন কোন সাহসী পুরুষ নয়, তবুও একটা গাছের ডাল কুড়িয়ে নিয়ে সাপটাকে মারতে মারতে মেরেই ফেলেছিল। এরপরে মোনা আর কোনদিন পাতালপুরীতে বেড়াতে

যায়নি। একটু আগে মোনা সেই সাপ মারার ঘটনাটাই ওকে মনে করিয়ে দিতে চেয়েছে। সেদিনের মত জাহিদ যেন আজও ওকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসে। সাপটাকে যেভাবে মেরেছিল, রুস্তম শেরকেও যেন ওভাবেই জাহিদ মেরে ফেলে। মোনার কাছে এখন দুটো রাস্তাই খোলা আছে—হয় রুস্তম শেরের মৃত্যু—নাহয় ওর সন্তান ও স্বামীর মৃত্যু। ওদের কথা মনে করে জাহিদের হৃদয়ের গভীরে ক্ষরণ হতে লাগল নিঃশব্দে। কি করবে জাহিদ?

ষোলো

বায়তুল মোকাররমের সামনে থেকে নীল রঙের হোনডা সিভিকটা চুরি করেছে রুস্তম শের। সেটা ড্রাইভ করেই এতদূর এসেছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার কাছাকাছি এসে গাড়িটা রাস্তার পাশে রেখে দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। আগে কখনোই এই এলাকায় আসেনি কিন্তু চিনতে একটুও অসুবিধা হচ্ছে না। জাহিদের কোয়ার্টার বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার সীমান্ত ঘেঁসে। আধ ঘণ্টা হাঁটলেই পৌঁছে যাবে।

এই গরমেও রুস্তম শের চাদর মুড়ি দিয়ে আছে, হাতে গ্লাভ্‌স্‌। বলতে গেলে ওর শরীরের কোন অংশই দেখা যাচ্ছে না, দেখা যাক তা সে চায়ও না। পচন ধরেছে সারা শরীরে, যে-কেউ এ চেহারা দেখলে মূর্ছা যাবে। চাদর মুড়ি দিয়ে কাউকে হাঁটতে দেখলে পথচারীরা বড় জোর কৌতূহলী চোখে তাকাবে।

সকাল সাড়ে দশটা। রুস্তম শের জানে জাহিদ বাসায় নেই। ভালই হয়েছে। কম ঝামেলায় কাজ সারা যাবে। রাস্তাঘাটে লোকজনও কম। উদ্ভট বেশবাস দেখে কেউ কেউ সকৌতুকে তাকাচ্ছে।

মাথার চুল সব পড়ে গেছে, বিশাল টাকে শুধু দগদগে কাঁচা ঘা। সাদা রঙের একটা ক্রিকেট ক্যাপ পরে নিয়েছে রুস্তম শের। মুখের চারপাশে ব্যাণ্ডেজ বেঁধেছে। ব্যাণ্ডেজের কাপড় শক্ত হয়ে গেছে রক্ত মেশানো হলুদ পুঁজ লেগে, কিছু কিছু জায়গা ভেজা—এখনও পুঁজ বের হচ্ছে। কালো গ্লাভ্‌স্‌ পরা হাতের পিঠে মাঝে মাঝে গালের ভেজা ক্ষত মুছে নিচ্ছে, চটচটে পদার্থ লেগে থাকায় গ্লাভ্‌স্‌ পরা আঙুলগুলো বার বার পরস্পরের সঙ্গে আটকে যাচ্ছে। ব্যাণ্ডেজের নিচে চামড়া বলতে কিছু নেই, দগদগে ঘা। বিশ্রী উৎকট একধরনের গন্ধ বের হচ্ছে রুস্তম শেরের গা থেকে। পাশ কাটিয়ে যাবার সময় পথচারীরা নাকে কাপড় দিচ্ছে। যদিও চাদরে ঢাকা থাকায় ওর শরীরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

জাহিদের বাসার সামনের রাস্তার মাথায় একটা আমগাছের তলায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। ওদিক থেকে দিনমজুর মত দেখতে দু'জন লোক আসছে। জাহিদের বাসার সামনে দাঁড়ানো পুলিস দু'জনের কাছে পৌঁছতে থেমে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলতে শুরু করল। এই রাস্তায় আর মাত্র দুটো পরিবার থাকে।

BanglaBook.org

জাহিদের পাশের বাসার ভদ্রলোক ছুটিতে সপরিবারে কোলকাতায় বেড়াতে গেছেন। উল্টোদিকের পরিবার ঢাকায় ঈদ করছে। রুস্তম শের জানে জাহিদরা ছাড়া আর কেউ বাসায় নেই। অবশ্য থাকলেও তার কোন অসুবিধা হত না। শুধু একটু বেশি সাবধানতা অবলম্বন করতে হত।

লোক দু'জন আবার হাঁটতে শুরু করেছে। রুস্তম শেরকে পাশ কাটিয়ে গেল, তবে লক্ষ করেনি। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারপাশ জরিপ করে নিল। না, আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। আগামী কয়েক মিনিটের মধ্যে কেউ না এলেই হল।

চাদরটা গা থেকে খুলে ফেলে দিল রুস্তম শের। তারপর টেনে টেনে ব্যাণ্ডেজগুলো খুলল, শুকিয়ে থাকা পুঁজে টান পড়াতে আবার নতুন করে ক্ষরণ শুরু হল। ক্রিকেট ক্যাপটাও ছুঁড়ে ফেলে দিল। মূর্তিমান বিভীষিকার মত গাছের ছায়ায় ছায়ায় হাঁটতে হাঁটতে জাহিদের বাসার সামনের গেটে পৌঁছে গেল রুস্তম শের।

কনস্টেবল দু'জন গেটের ভেতর গাড়ি-বারান্দার ছায়ায় বসে ছিল। চোখের সামনে দুঃস্বপ্নের মত ভয়ঙ্কর চেহারাটা দেখে দু'জনেরই হার্ট অ্যাটাক হবার মত অবস্থা হল।

বাক্শক্তি ফিরে পেতে একজন বিড়বিড় করে উঠল, 'সোবহান আল্লাহ্!'

সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে অন্ধের মত হোঁচট খেতে খেতে গেটের ভেতর ঢুকে পড়ছে রুস্তম শের, কর্কশ কণ্ঠে অসহায়ের মত বলছে, 'কে আছেন···আমাকে একটু সাহায্য করুন···আহ্!'

দেখে মনে হচ্ছে কেউ অ্যাসিড ছুঁড়ে মেরেছে, অথবা আগুনে পুড়ে গেছে। রাস্তায় গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টও হতে পারে। যাই হোক না কেন, লোকটা সাংঘাতিক আহত হয়েছে। হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছে দেখে কাছের জন ছুটে এল, 'আরে আরে! পড়ে যাবেন তো···' বলতে বলতে হাত বাড়িয়ে ধরতে গেল বিশাল শরীরটা। ডান হাতে লোকটার গলা জড়িয়ে ধরে বাঁ হাতে পকেট থেকে দ্রুত ক্ষুরটা বের করে আনল রুস্তম শের। কিছু বুঝে ওঠার আগেই কনস্টেবলের ডান চোখ বিদ্ধ করে ক্ষুরটা ঢুকে গেল আরও অনেক গভীরে।

'কি হল?' অস্ফুট গোঙানি শুনে দু'ফুট পেছনে দাঁড়ানো দ্বিতীয়জন হকচকিয়ে প্রশ্ন করল, সঙ্গীর পেছন পেছন সে-ও ছুটে এসেছে। এক হাতে কাঁধে ঝোলানো রাইফেলটা নামিয়ে নিচ্ছে নিজের অজান্তেই।

'এই যে, ইনাকে একটু ধরুন তো!' বলতে বলতে প্রাণহীন দেহটা কনস্টেবলের দিকে ঠেলে দিল রুস্তম শের। ভারসাম্য হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেল সে সহকর্মীর মৃতদেহ দু'হাতে জড়িয়ে ধরে। বিদ্যুৎগতিতে এগিয়ে গেল রুস্তম শের। চুলের মুঠি ধরে মাথাটা সামান্য ওপরে তুলে নিয়ে ক্ষুর চালাল। কলজে কাঁপানো চিৎকারটা মাঝপথেই থেমে গেল, দু'ফাঁক হয়ে যাওয়া গলা থেকে ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। সেই অবস্থাতেই রুস্তম শের দু'হাতে দেহ দুটোকে টানতে টানতে সাইডের দেয়াল আর কোয়ার্টারের মাঝের সরু গলিতে নিয়ে গেল। ব্যস, রাস্তা থেকে আর দেখা যাবে না। গাড়ি-বারান্দার সামনের ইঁটের রাস্তার অনেকটা রক্তে ভিজে আছে, তবে রাস্তা থেকে দেখা যাবার সম্ভাবনা

BanglaBook.org

কম। সবকিছু ঘটে যেতে পনেরো সেকেণ্ডের বেশি সময় লাগল না।

মোনা রান্নাঘরে ছিল। বাচ্চারা দোতলায় ঘুমাচ্ছে। প্রতিদিন সকালেই এই সময়টায় ওরা ঘন্টা দুয়েক ঘুমিয়ে নেয়। ভোর পাঁচটার আগেই ওরা জেগে ওঠে. এই সময়টায় দুধ খাইয়ে ওদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দেয় মোনা। এতে কাজেরও সুবিধা হয়। আজ তো জাহিদও বাসায় নেই। বাচ্চারা জেগে ওঠার আগেই রান্নার কাজ শেষ করতে হবে। ডালে ফোড়ন দিতে দিতে একবার মনে হল বাইরে কেউ চিৎকার করছে। পরমুহূর্তেই আর কিছু শুনতে পেল না। ভুল শুনেছে মনে করে ওদিকে মনোযোগ দিল না আর।

কলিং বেল বেজে উঠতে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল মোনা। জাহিদ এত তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছে! দরজাটা খুলেই পাথর হয়ে গেল।

মোনা চিৎকার করল না। চিৎকারটা ভেতর থেকে উঠে আসছিল, কিন্তু বের হবার আগেই জমে গেল। ক্ষতবিক্ষত কদাকার মুখটার দিকে চেয়ে মোনা বাস্তবকে অস্বীকার করতে চাইল, নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইল, চিরজীবনের জন্যে ভুলে যেতে চাইল। রুস্তম শেরকে কখনও দেখেনি ও, কিন্তু চিনতে একটুও দেরি হল না।

'এই যে, মেমসাহেব, কেমন আছ?' হাসছে রুস্তম শের। বেশিরভাগ দাঁত পড়ে গেছে, যে ক'টা আছে তা কালচে হয়ে এসেছে, বুঝতে অসুবিধা হয় না দাঁতগুলো মরে গেছে। চিবুক বেয়ে টপটপ করে পুঁজ মেশানো রক্ত পড়ে ভিজিয়ে দিচ্ছে শার্টের কলার। চোখের পাপড়ি আর ভুরুর চুলও ঝরে গেছে। সারা শরীরের মধ্যে শুধু চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে পূর্ণ জীবনীশক্তি নিয়ে।

সচেতন ভাবে নয়, আত্মরক্ষার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিতে দরজাটা বন্ধ করে দিতে চাইল মোনা। বাঁ হাতে দরজার কপাট ঠেলে ধরে ঘরে ঢুকে পড়ল রুস্তম শের। পিছু হটতে গিয়ে পেছন দিকে উল্টে পড়ে গেল মোনা। রুস্তম শের আস্তে করে দরজাটা বন্ধ করে দিল। চেষ্টা করেও এক বিন্দু আওয়াজ করতে পারল না মোনা. কেউ যেন মুখ চেপে ধরেছে।

জ্যান্ত হয়ে ওঠা কাকতাড়ুয়ার মত আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে ডান হাতটা মোনার দিকে বাড়িয়ে দিল রুস্তম শের, 'আমি রুস্তম শের, চিনতে পারছ?' ঘড়ঘড়ে কর্কশ কণ্ঠস্বর, দুর্গন্ধ বের হচ্ছে গা থেকে।

মাটিতে আধশোয়া অবস্থাতেই পিছু হটতে চেষ্টা করল মোনা। গ্লাভস্ খুলে ফেলেছে রুস্তম শের, ডান হাতের পচন ধরা নখহীন তর্জনী দিয়ে মোনার বাঁ গাল স্পর্শ করল। ঠিক তক্ষুণি মোনার মনে পড়ে গেল দোতলার শোবার ঘরে ঘুমিয়ে থাকা রূপক আর রুমকির কথা। চোখের পলকে উঠে দাঁড়িয়ে রান্নাঘরের দিকে দৌড়াল মোনা, অবচেতন মনে হয়ত মাছ কাটার বঁটিটার কথা ভাবছিল সে। কিন্তু মাঝপথে সাইড টেবিলের পায়ায় হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতে থাকল। রুস্তম শের পেছন থেকে খোলা চুলের মুঠি ধরে ওকে টেনে দাঁড় করাল। দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে দু'হাতে ওর মুখটা খামচে দিতে চাইল মোনা, হাসতে হাসতে ডান হাতে ওর

BanglaBook.org

হাত দুটো ধরে ফেলল রুস্তম শের, বাঁ হাতে এখনও শক্ত করে ধরে আছে চুলের গোড়া। সমস্ত শক্তি ব্যয় করেও এক চুল নড়তে পারল না মোনা। দেখে মনে হচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যেই পচেগলে মাটির সঙ্গে মিলিয়ে যাবে, অথচ কোত্থেকে এত শক্তি পাচ্ছে লোকটা?

'ব্যস, অনেক হয়েছে। আর নয়,' ফোঁস ফোঁস করে দুর্গন্ধযুক্ত নিঃশ্বাস ছাড়ছে রুস্তম শের, 'এরপর বীরত্ব দেখানর আগে বাইরের পুলিস দুটোর মরা মুখের কথা চিন্তা কর। তাছাড়া ওপরে তোমার বাচ্চারা আছে, ওদেরকে ভুলে গেলে চলবে কেন? বুঝতে পারছ?'

পুতুলের মত ওপর-নিচে মাথা নাড়ল মোনা। পচতে থাকা শরীরটার দিকে চেয়ে মোনা বুঝতে পারল কেন সে জাহিদকে দিয়ে বই লেখাতে এত জোরাজুরি করছে। এটা ওর অস্তিত্ব রক্ষার ব্যাপার।

ভয়ের প্রথম ধাক্কা কেটে গেছে। বাক্‌শক্তি ফিরে পেতেই চেঁচিয়ে উঠল মোনা, 'খবরদার! আমার বাচ্চাদের গায়ে হাত দেবে না!'

মোনাকে ছেড়ে দিল রুস্তম শের। আবার হাসতে শুরু করেছে, গা গোলানো ঘিনঘিনে হাসি। 'কারও গায়েই হাত তুলব না যদি আমার কথামত চল।'

'তুমি একটা উ...'

'উন্মাদ। তাই না? তোমাকে কেউ মেরে ফেলতে চাইলে তুমি কি করবে?'

'আমাদের সঙ্গে...'

'চুপ কর। একদম চুপ।' হঠাৎ কান খাড়া করে কিছু শোনার চেষ্টা করতে থাকল রুস্তম শের।

কান পেতেও মোনা প্রথমে কিছু শুনতে পেল না। তারপর হঠাৎ করে মনে হল যেন দূর থেকে অসংখ্য পাখির ডানা ঝাপটানর শব্দ ভেসে আসছে।

'তুমি তো জানো যখন তখন আমি জাহিদের চিন্তার মধ্যে ঢুকে পড়তে পারি। কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে আমি তা পারি না। তুমি কি ভাবছ আমি নিশ্চিত করে বলতে পারব না। কিন্তু আশা করব বাচ্চাদের কথা ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করবে না তুমি কথা কানে যাচ্ছে তো?' তারপর উত্তরের অপেক্ষা না করেই বলতে থাকল, 'এখন আমি জাহিদকে ফোন করব। কিন্তু ওর অফিসে নয়। ওই ফোনটাও হয়ত ট্যাপ করা হয়েছে। জাহিদের অজান্তে যদি পুলিস তা করে থাকে তবে আমার জানার কোন সম্ভাবনা নেই। রিস্ক নিয়ে লাভ কি?' আবার কান খাড়া করে কিছু শোনার চেষ্টা করল রুস্তম শের। তারপর বলল, 'জাহিদ একটা লোকের সাথে কথা বলছে ওর অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে। ছোটখাট, তেল দেয়া চুল ব্যাকব্রাশ করে আঁচড়ানো, লম্বা কোঁকড়ানো দাড়ি, এই গরমেও কালো একটা সুট পরে আছে...'

'ভুঁইয়া সাহেব। ডক্টর আবুল হাশেম ভুঁইয়া। জাহিদের পাশেই ওনার অফিস।' অবাক হল মোনা, কেমন করে লোকটা এমন নির্ভুল বর্ণনা দিচ্ছে?

'টেলিফোন গাইড কোথায়?'

'সেন্টার টেবিলের নিচের তাকে।'

রুস্তম শের ওদিকে পা বাড়াতেই চকিতে মোনা হাত বাড়াল টেবিলের ওপর

BanglaBook.org

সাজানো পিতলের ফুলদানিটার দিকে। মুহূর্তে ঘুরে তাকিয়ে হো হো করে হেসে উঠল রুস্তম শের, 'এখনও তেজ কমেনি? এটা কি চিনতে পারছ?' ওর হাতে রক্ত লেগে থাকা রূপালী ক্ষুর। বমি পেল মোনার। মনে পড়ল বাইরে শুয়ে আছে দুটো মৃতদেহ। মোনাকে ধাক্কা দিয়ে সোফায় বসিয়ে দিল রুস্তম শের। 'আমি এখন জাহিদের সঙ্গে কথা বলব। তুমি ওপরে গিয়ে জামাকাপড় গুছিয়ে নাও একটা সুটকেসে। বাচ্চাদের যা যা দরকার হবে সবই প্যাক করে নাও। একটু পরেই আমরা বেরিয়ে পড়ব। চালাকি করতে গেলে কি হবে জানো তো?'

'তুমি আমাদেরকে চিটাগাং নিয়ে যেতে চাচ্ছ?'

'এই তো বুদ্ধি খুলেছে এতক্ষণে। এখন ওপরে যাও। দশ মিনিটের চেয়ে বেশি দেরি যেন না হয়। ক্ষুরটা ছাড়াও একটা রিভলভার আর একটা ব্লো টর্চ আছে আমার কাছে। জানালা দিয়ে লাফ দেবার চেষ্টা কোরো না যেন। ঠিক আছে?' রুস্তম শের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সময় গুনতে শুরু করলে মোনা দোতলার সিঁড়ির দিকে ছুটল।

সুটকেসে কাপড়চোপড় গোছাতে গোছাতে নিচে রুস্তম শেরের গলা শুনতে পাচ্ছে মোনা, তবে কথাগুলো স্পষ্ট নয়। দ্রুত হাতে বাচ্চাদের ক্রিম, পাউডার, হ্যাণ্ড টাওয়েল, জামাকাপড় ভরছে সুটকেসে। একা হলে সত্যিই জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়তে দ্বিধা করত না মোনা, কিন্তু বাচ্চা দুটো নিয়ে তা সম্ভব নয়। রুস্তম শেরও তা জানে। সেলাই-বাক্সে রাখা কাঁচিটা দেখে আশা জাগল মনে। দ্রুত হাতে দুটো সেফটিপিন দিয়ে শাড়ির নিচে পেটিকোটের সঙ্গে আটকে নিল কাঁচিটা।

ঠিক তক্ষুণি রুস্তম শের ডাকল, 'হয়েছে?'

'এই তো আসছি,' চেঁচিয়ে জবাব দিল মোনা। রূপককে কট থেকে তুলে নিতেই ঘুমের মধ্যে কাঁদতে শুরু করল। রুমকিও নড়াচড়া করতে শুরু করেছে। দু'জনকে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে নিচে নেমে এল মোনা। রুস্তম শের আনমনে টেলিফোন গাইডের ওপর পেন্সিল ঠুকছে। হলুদ রঙের এইচ-বি পেন্সিল। জাহিদের স্টাডিতে ঠিক এই পেন্সিলই আছে। কোথায় পেল রুস্তম শের? স্টাডিতে তো যায়নি। বাচ্চাদেরকে সোফায় বসিয়ে দিতে দিতে টেলিফোন গাইডের ওপরে লেখা বাক্য দুটো পড়ল মোনা। 'আমি এখন কোথায়, বল তো?' আর তার নিচে, 'মুখ খুললে মরবে!'

মোনার বিস্মিত চোখের দিকে তাকিয়ে রুস্তম শের চোখ টিপল, 'এক্ষুণি একটা ফোন আসবে।'

সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ করে উঠল টেলিফোন সেটটা।

জাহিদের সঙ্গে কথা বলার পর মোনা একটু আশ্বস্ত হল। জাহিদ নিশ্চয়ই কিছু একটা উপায় বের করবে। জঘন্য মূর্তিটার দিকে চেয়ে এখন ভয়ের চেয়ে ঘৃণা আর রাগই বেশি হচ্ছে।

'মেয়েটাকে আমার কাছে দাও, বাইরে একটু কাজ আছে। একটা বাচ্চা

BanglaBook.org

আমার কাছে থাকলে তোমার মাথায় আজেবাজে চিন্তা ঢুকবে না।' হাত বাড়িয়ে দিল রুস্তম শের।

'খবরদার! আমার বাচ্চাদের গায়ে হাত দেবে না!' দু'হাতে ওদেরকে শান্ত করে বুকে জড়িয়ে ধরেছে মোনা।

দাঁতহীন মুখের ভেতর ফুলে ওঠা কালচে জিভটা কাঁপিয়ে নিঃশব্দে হাসল রুস্তম শের। 'কি আশ্চর্য! কেমন করে ভাবলে ওদের কোন ক্ষতি করব আমি! শত হলেও আমি ওদের জন্মদাতা।'

'শাট্ আপ! কক্ষণও একথা উচ্চারণ করবে না বলছি!' রাগে দুঃখে চেঁচিয়ে উঠল মোনা।

'তোমার মেয়ের দিকে তাকিয়ে দেখ,' এখনও হাসছে রুস্তম শের।

রুমকির দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল মোনা। দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছে মেয়েটা রুস্তম শেরের দিকে, বীভৎস চেহারা দেখে একটুও ভয় পাচ্ছে না।

'দেখলে? বাবার কোলে আসতে চাইছে মেয়েটা।' মোনার কোল থেকে রুমকিকে তুলে নিল রুস্তম শের। কাঁদতে শুরু করল মোনা, রূপককে জড়িয়ে ধরেও মনে হচ্ছে ওর কোল ফাঁকা হয়ে গেছে।

'ওর কোন ক্ষতি হলে খুন করে ফেলব তোমাকে,' মোনার চোখে শুধু আক্রোশ।

'তুমি কোন বোকামি করে না বসলে ওদের কোন ভয় নেই।' রুস্তম শেরের কোলে শব্দ করে হাসছে রুমকি, একদৃষ্টে চেয়ে আছে বিকৃত কুৎসিত মুখটার দিকে। প্রত্যুত্তরে রুস্তম শেরও হাসল। 'পাশের বাড়িটা তো সুনীল দত্তের, তাই না?'

অবাক হতে ভুলে গেল মোনা। 'ওরা তো এখানে নেই। এক মাসের জন্যে কোলকাতায় বেড়াতে গেছে, মিসেস দত্তের বাড়ি কোলকাতাতেই।'

'জানি। কিন্তু ওদের গাড়িটা তো গ্যারেজেই রেখে গেছে। আমি গিয়ে গাড়িটা নিয়ে আসছি। তুমি মালপত্র নামিয়ে নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াও। আরে, তোমার ছেলেও দেখি আমাকে পছন্দ করে ফেলেছে!'

রূপক মোনার কোল থেকে মন্ত্রমুগ্ধের মত হাত বাড়িয়ে দিয়েছে রুস্তম শেরের দিকে, খলখল করে হাসছে। অসুস্থ বোধ করল মোনা, লোকটা কি জাদু জানে? রূপকের দিকে হাত নেড়ে ওয়েভ করে বেরিয়ে গেল রুস্তম শের। কোয়ার্টারের গ্যারেজগুলো পেছন দিকে এক সারিতে বানানো, যাদের গাড়ি নেই তারা স্টোর রুম হিসেবে ব্যবহার করে। সুনীল দত্ত গত বছর ডক্টরেট করে ফেরার সময় বিদেশ থেকে গাড়ি নিয়ে এসেছে। বড় শখের গাড়ি, বেচারা জানবে যখন না জানি কি করবে!

সুটকেস নিয়ে বাইরে এসে মিনিট দুয়েক দাঁড়াতেই গাড়ি নিয়ে চলে এল রুস্তম শের। মোনা নিজেই দরজা খুলে পেছনের সিটে উঠে বসল রূপককে কোলে নিয়ে। সুটকেসটা পায়ের কাছে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। রুস্তম শের সামনে থেকে রুমকিকে ওর কাছে ফিরিয়ে দিল। রুমকি অনিচ্ছার সঙ্গে মায়ের কোলে ফিরে

BanglaBook.org

এল, এখনও তাকিয়ে আছে রুস্তম শেরের দিকে। রূপকও হাত বাড়িয়ে ওকে ওয়েভ করছে।

বাঁ হাতে শাড়ির নিচে লুকানো কাঁচিটা স্পর্শ করল মোনা। প্রথম সুযোগেই ব্যবহার করতে হবে এটা।

সতেরো

ডেইরি ফার্ম আর শহরের কাছাকাছি বলে এই সময়টাতে হাইওয়েতে ভিড় লেগেই থাকে। ট্রাক আর প্যাসেঞ্জার বাসের আধিক্য দেখে জাহিদ আশ্বস্ত হল। রাস্তা খালি থাকলে প্ল্যানটা কাজে লাগানো কঠিন হত। পুলিসের জীপ আর ওর পাবলিকার মাঝখানে একটা ট্রাক আছে। হাইওয়েটা যেখানে সমকোণে বাঁক নিয়েছে, তার কাছাকাছি এসে খুব ধীরে ধীরে জাহিদ স্পিড বাড়িয়ে দিয়ে একটা প্যাসেঞ্জার বাসকে ওভারটেক করল। এখন ওদের মাঝে ট্রাক ছাড়াও একটা বাস। হাবিব আর জসিম কিছু সন্দেহ করেনি। ওরা হয়ত স্বপ্নেও চিন্তা করতে পারবে না জাহিদ কেটে পড়ার তালে আছে।

বাঁকটা ঘুরেই দ্রুতগতিতে ডান দিকের সাইড রোডে নেমে গেল জাহিদ, কাঁচা রাস্তা ধরে মিলিয়ে গেল গাছগাছালির ভেতর। ট্রাক আর বাসের জন্যে আগে থেকেই ওদের দৃষ্টির আড়ালে ছিল জাহিদ, অনেকটা এগিয়ে যাবার আগে টেরই পাবে না হাবিব আর জসিম কখন সে অদৃশ্য হয়েছে। টের পেলেও উল্টোদিক থেকে আসা ট্রাফিকের জন্যে হঠাৎ করে গাড়ি ঘোরাতে পারবে না।

কিছুটা এগিয়ে আবার হাইওয়েতে উঠল জাহিদ। এবার উল্টোদিকে যাচ্ছে। গলা শুকিয়ে গেছে, মনে হল পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে নিজের হার্টবিটের শব্দ। স্পীডোমিটারের কাঁটা সত্তরের ঘর ছুঁইছুঁই করছে। আশেপাশের যানবাহন ছিটকে দূরে সরে যাচ্ছে গালাগাল দিতে দিতে। ওদিকে নজর দিচ্ছে না জাহিদ। মাইল পাঁচেক দূরে হাইওয়ে থেকে একটু ভেতরে একটা ওয়ার্কশপের সামনে থেমে স্টার্ট বন্ধ করল। এখনও বিশ্বাস হতে চাচ্ছে না এইমাত্র বেআইনী একটা কাজ করে এসেছে ও।

ওয়ার্কশপের মালিক ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। 'স্লামালাইকুম, স্যার, কেমন আছেন? ঈদ মোবারক!' বছর ত্রিশেক বয়স, জাহিদের এক ছাত্রের বড় ভাই। গাড়ির যাবতীয় কাজ এখানেই করায় জাহিদ।

কোলাকুলি সেরে জাহিদ খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলল, 'গাড়িটা রেখে যাচ্ছি। ব্রেকটা গণ্ডগোল করছে,' ডাহা মিথ্যে কথা, 'আর স্পেয়ার টায়ারটা রিপিয়ার করে রেখ। তাড়াহুড়ার দরকার নেই, দু'পাঁচদিন দেরি হলেও আমার কিছু অসুবিধে হবে না।' জাহিদ জানে এই গাড়ি নিয়ে চিটাগাং যাওয়া যাবে না, পুলিস অতি সহজে ধরে ফেলবে। এখানে রেখে গেলে গাড়িটার নিরাপত্তা সম্বন্ধে অন্তত নিশ্চিন্ত থাকা

BanglaBook.org

যাবে। তাছাড়া আর একটা গাড়ি দরকার, সেজন্যে ফোন করতে হবে। রাস্তা থেকে গাড়ি চুরি করার মত হিম্মত এখনও ওর হয়নি। তাছাড়া এই গেঁয়ো বাজার এলাকায় রাস্তায় গাড়ি দেখা যায় কদাচিৎ। বাস বা টেম্পো ধরে কিছুতেই সন্ধ্যার আগে চিটাগাং পৌঁছানো যাবে না। কার কাছে গাড়ি চাইবে, তা-ও ঠিক করে রেখেছে মনে মনে। একটু ইতস্তত করে জাহিদ বলল, 'কামাল, তোমার ফোনটা ঠিক আছে তো? একটা ফোন করতে হবে।'

'হ্যাঁ, স্যার। ভেতরে আসেন।'

ঘড়ি দেখল জাহিদ। ডিপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়েছে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট হয়ে গেল। আবুল হাশেম ভুঁইয়া কি এখনও অফিসে আছেন?

চার নাম্বার রিঙের পর ওদিক থেকে রিসিভার ওঠাল কেউ, 'হ্যালো?'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল জাহিদ, 'হাশেম ভাই, আমি জাহিদ বলছি।'

'কি ব্যাপার? কিছু ফেলে গেছ নাকি?'

'না না, ওসব কিছু না। হাশেম ভাই, আমি একটা বিপদে পড়েছি।' ওদিক থেকে কোন উত্তর না আসাতে আবার বলল, 'আমার বডিগার্ডদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এসেছি।'

'হুঁ।' আর কিছু বললেন না ডক্টর ভুঁইয়া।

'আমার একটা গাড়ি দরকার। আপনি বলেছিলেন সাহায্যের দরকার পড়লে বলতে।'

'হ্যাঁ, মনে আছে। কিন্তু আরও বলেছিলাম পুলিসের ওপর বিশ্বাস রাখতে,' আস্তে ভাবলেশহীন কণ্ঠে বললেন তিনি।

ভয়ে দমবন্ধ হয়ে এল জাহিদের। গাড়ি না পেলে আবার নতুন করে প্ল্যান করতে হবে। সন্ধের আগে পৌঁছাতে না পারলে কি হবে খোদাই জানে! 'হাশেম ভাই…'

'ঠিক আছে,' ওকে থামিয়ে দিলেন ডক্টর ভুঁইয়া। 'আমার গাড়িটা নিতে পার, তবে ক্ষয়ক্ষতি হলে খরচপাতি তোমার।'

কাঁধের ওপর থেকে বিরাট বোঝা নেমে গেল। 'কি বলে যে ধন্যবাদ জানাব…'

'দাঁড়াও। আর একটা শর্ত আছে। ফিরে এসে সবকিছু খুলে বলতে হবে আমাকে। চড়ুই পাখির কথা কেন জানতে চেয়েছিলে, সাইকোপম্পের উল্লেখ করায় কেন তোমার চেহারা সাদা হয়ে গিয়েছিল, সব খুলে বলতে হবে।'

হাসল জাহিদ। 'সব বলব, হাশেম ভাই, সব বলব। আবার ভাগ্য ভাল হলে আপনি হয়ত বিশ্বাস করেও ফেলতে পারেন।'

'তুমি কি গাড়ি নিতে আসবে?'

'যদি আপনার অসুবিধা না হয় গাড়িটা নিয়ে চৌরাস্তায় চলে আসুন। আমি চা দোকানটার কাছে থাকব।'

ফোন ছেড়ে কামালের কাছে বিদায় নিয়ে মোড়ের দিকে হাঁটতে শুরু করল জাহিদ। পায়জামা পাঞ্জাবী পরে আছে ও। সাধারণ পথচারীদের ভিড়ে মিশে যেতে

BanglaBook.org

অসুবিধা হল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে ওর পরিচিত পরিমণ্ডলের পরিধি খুবই ছোট, চেনা কারও সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনা কম। ছাত্ররা কেউ না দেখলেই হল। ডক্টর ভুঁইয়ার গাড়ি ধার করার ব্যাপারটা গোপন রাখতেই হবে।

চা দোকানের সামনে অস্থির ভাবে পায়চারি করছে জাহিদ। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হাইওয়ের দিকে নজর রাখছে পুলিসের গাড়ি দেখা যায় কিনা। প্রায় বিশ মিনিট পর দেখা গেল ডক্টর ভুঁইয়ার মেরুন রঙের ফোক্সওয়াগেনটাকে। দোকানের ছাউনির তলা থেকে বেরিয়ে এল জাহিদ।

গাড়ি থেকে নেমে এক হাতে চাবি আর এক হাতে একটা পলিথিনের ব্যাগ বাড়িয়ে ধরলেন ডক্টর ভুঁইয়া। 'তোমার দরকার হতে পারে ভেবে দু'একটা জিনিস নিয়ে এসেছি।'

পলিথিনের ব্যাগটা খুলে কৃতজ্ঞতায় জাহিদের দু'চোখ জলে ভরে গেল। একটা বড় ফ্রেমের সানগ্লাস, সাদা রঙের একটা স্পোর্টস্ ক্যাপ–পুরোপুরি ছদ্মবেশ না হলেও এ দুটো পরা অবস্থায় জাহিদকে চেনা কষ্ট হবে—আর তিনটে চকোলেট-বার বের হল ব্যাগটা থেকে। খাবার কথা ও ভুলেই গেছিল, অথচ ডক্টর ভুঁইয়া ভোলেননি।

'ট্যাঙ্কে তেল নেই। আসার পথে পেট্রল পাম্প পড়েনি, তাই কিনতে পারিনি। কতদূর যাবে তুমি তা তো জানি না। তবে যা তেল আছে তাতে বড় জোর আর মাইল দশেক চলবে।' পকেট থেকে কাঠের তৈরি ইঞ্চি তিনেক লম্বা ফাঁপা একটা দণ্ড বের করে জাহিদের হাতে দিলেন তিনি, বললেন, 'এটা হল "বার্ড-কলার-হুইসল্"। গত বছর যখন ব্রেজিলে গিয়েছিলাম, এক রেড ইণ্ডিয়ান আদিবাসী এটা উপহার দিয়েছিল আমাকে। হঠাৎ করে মনে হল তোমার কাজে লাগতে পারে, তাই নিয়ে এলাম। এটায় ফুঁ দিয়ে পাখিদের ডাকতে হয়।'

কি বলবে বুঝতে পারল না জাহিদ, অনেক কষ্টে আবেগ দমন করার চেষ্টা করছে।

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন ডক্টর ভুঁইয়া, 'জাহিদ, বাঁশিটা আর বোধহয় তোমার দরকার হবে না। ওই দেখ!'

ওনার দৃষ্টি অনুসরণ করে রোমাঞ্চিত হল জাহিদ। কয়েকশো চড়ুই পাখি বসে আছে ওর পেছনে দোকানের ছাদে, গাছের ডালে। আরও অগুনতি নেমে আসছে পেছনের গ্রামের ওপর দিয়ে। নিঃশব্দে। শিউরে উঠল জাহিদ। আশেপাশের দু'একজন লোক কৌতূহলী চোখে দেখছে। পাখিগুলো একদৃষ্টে চেয়ে আছে জাহিদের দিকে কালো পুঁতির মত পলকহীন চোখে, অন্য কোনদিকে মনোযোগ নেই। ওপরের সব জায়গা ভর্তি হয়ে গেলে মাটিতে এসে বসতে লাগল চড়ুই পাখির ঝাঁক—ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে বৃত্তটা জাহিদকে মাঝে রেখে।

'মাই গড!' কাঁপা গলায় বলে উঠলেন ডক্টর ভুঁইয়া, 'সাইকোপম্প! এসব কি ঘটছে?'

চারপাশের লোকজনও বিমূঢ় হয়ে বোঝার চেষ্টা করছে ব্যাপারটা। এগিয়ে গিয়ে মাটিতে পা ঠুকল জাহিদ, একটুও ভয় পেল না পাখিগুলো, ডানা ঝাপটে

BanglaBook.org

কয়েক পা পিছিয়ে গেল শুধু।

'যাহ্!' ফিসফিস করে বলে উঠল জাহিদ, 'রুস্তম শেরের কাছে উড়ে যা!'

মুহূর্তে সবগুলো পাখি একসঙ্গে ডানা মেলল, নিমেষে কালো হয়ে গেল আকাশ। বাজারের লোকজন জটলা পাকিয়ে তামাশা দেখছে। দক্ষিণ দিকে উড়ে চলেছে বিশাল কালো চাদরের মত ঝাঁকটা।

জাহিদের হাত চেপে ধরলেন ডক্টর ভুঁইয়া। 'জাহিদ, পাখিগুলো কোথায় যাচ্ছে তুমি জানো, তাই না?'

'হ্যাঁ। জানি। আমাকেও যেতে হবে, হাশেম ভাই। অনেক উপকার করেছেন, কিভাবে প্রতিদান দেব জানি না। দোয়া করবেন, আমার স্ত্রী আর বাচ্চাদের জন্যে।'

ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন ডক্টর ভুঁইয়া। 'সাবধানে থেক, জাহিদ, খুব সাবধান! আমি সবসময় চিন্তায় থাকব, বিপদ কেটে গেলে একটা খবর দিয়ো।'

জাহিদের বন্ধ চোখের কোল বেয়ে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে নেমে ভিজিয়ে দিল ডক্টর ভুঁইয়ার কোটের আস্তিন।

আঠারো

অবশেষে লণ্ডনে ডক্টর জে. ম্যাকলিনকে ফোনে পাওয়া গেল। এরমধ্যে ইন্সপেক্টর শাহেদ রহমান আরও তিন দিন চেষ্টা করেছে, তখনও তিনি লণ্ডনে ফেরেননি। দুপুর সাড়ে তিনটে, জাহিদ তখন ডক্টর ভুঁইয়ার ফোক্সওয়াগেন নিয়ে কুমিল্লা পেরিয়ে গেছে।

অপারেটরের যান্ত্রিক কণ্ঠস্বরের পর ডক্টর ম্যাকলিনের গলা ভেসে এল, 'হ্যালো, জেরেমি স্পিকিং।' লোকাল কলের চেয়েও পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে।

'আমি বাংলাদেশ থেকে একজন পুলিস অফিসার বলছি, ইন্সপেক্টর শাহেদ রহমান। একটা হত্যাকাণ্ডের তদন্তের ব্যাপারে আপনাকে খুঁজছি বেশ ক'দিন ধরে।'

'হত্যাকাণ্ড! বলেন কি! অপারেশন টেবিল ছাড়া কোথাও কাউকে আমি খুন করিনি, ইন্সপেক্টর। রিটায়ার করেছি তা-ও প্রায় পনেরো বছর হয়ে গেল।' হা হা করে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন ডাক্তার, কণ্ঠস্বর শুনে মনেই হয় না ভদ্রলোকের বয়স সত্তর পেরিয়ে গেছে।

লজ্জা পেল শাহেদ। 'না না, আপনাকে অভিযুক্ত করার ইচ্ছা বা অধিকার কোনটাই আমার নেই। আসলে তদন্তের সাথে জড়িত এক লোকের ব্যাপারে আপনাকে এতদূর থেকে ফোন করেছি। প্রায় ত্রিশ বছর আগে আপনি ভদ্রলোকের মগজ থেকে একটা টিউমার অপসারণ করেছিলেন। তখন অবশ্য তিনি এগারো-বারো বছরের কিশোর, তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান থেকে...'

BanglaBook.org

'জাহিদ হাসান, ১৯৬০ সালে। আমার মনে আছে, কি হয়েছে ওর? কি করছে সে আজকাল?'

বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল শাহেদ। চিন্তাই করতে পারেনি এত বছর পরেও বৃদ্ধ এই ভদ্রলোক ঘটনাটা মনে রাখবেন। বরং মনে করাবার জন্যে নানা রকম কসরত করতে হবে বলেই ধরে নিয়েছিল ও। 'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। পেশায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, তবে লেখক হিসেবেও খুব নাম করেছেন।'

'বাহ্! যতদূর মনে পড়ে ওর বাবা বলেছিলেন ছেলেটা ভবিষ্যতের শেক্সপিয়ার। আমি সাধারণত প্রাক্তন রোগীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখি, অবশ্য প্রয়োজন বিশেষে। একমাত্র জাহিদ হাসানের সঙ্গেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় দূরত্বের কারণে। পরবর্তী জীবনে এজন্যে সবসময় নিজেকে দোষারোপ করেছি। ঠিক কি জানতে চান আপনি?'

'এতবছর পর ভদ্রলোক আবার মাথাব্যথায় ভুগছেন, ঠিক মাথাব্যথা নয়। আমি ঠিক বোঝাতে পারব না। উনি বলছেন টিউমার অপারেশনের আগে ঠিক ওরকমই হত।'

'স্ট্যাণ্ডার্ড টেস্টগুলো করা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, সবই নেগেটিভ।'

'যাই হয়ে থাকুক না কেন, আমার মনে হয় না আগের টিউমারের সঙ্গে এর কোন যোগাযোগ আছে। আচ্ছা, এই ছেলেটা কি খুনের সাক্ষী? নাকি তাকে খুনী বলে সন্দেহ করছেন?'

অপ্রস্তুত হয়ে গেল শাহেদ। 'মানে…আমি…'

'ব্রেন টিউমারের রোগীরা অনেক সময়ই অদ্ভুত আচরণ করে থাকে। তবে ছেলেটার মগজে আসলে কোন টিউমার ছিল না, অন্তত স্বাভাবিক কোন টিউমার নয়। এই ধরনের ঘটনা পৃথিবীতে আর মাত্র তিনবার দেখা গেছে।'

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়, নিজের অজান্তেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে শাহেদ। 'আমি জানি আপনারা রোগীর যাবতীয় তথ্য কনফিডেনশিয়াল হিসেবে গণ্য করেন। কিন্তু এই মুহূর্তে…'

'না না, জানাতে আমার কোন আপত্তি নেই। বরং আজকাল আমার মনে হয় ছেলেটার বাবাকে ব্যাপারটা খুলে বললেই আমি ভাল করতাম। ঘটনাটা এতই অসাধারণ ছিল যে জাহিদ হাসানকে এতদিন পরেও ভুলিনি আমি।'

সময় বয়ে যাচ্ছে, কোন্ মুহূর্তে লাইন কেটে যায় কে জানে! শাহেদ একটু তাড়া দিল, 'ডক্টর, ঠিক কি হয়েছিল জাহিদের?'

'প্রচণ্ড মাথাব্যথায় ভুগছিল ছেলেটা, সঙ্গে ফ্যানটম সাউণ্ড…'

'ফ্যানটম সাউণ্ড…সেটা আবার কি?'

'মগজে টিউমার থাকলে রোগী অনেকসময় নানা ধরনের শব্দ শুনতে পায়। জাহিদ শুনত চড়ুই পাখির চেঁচামেচি। এরপরই মাথাব্যথা দেখা দিত। ধীরে ধীরে জ্ঞান হারিয়ে ফেলত। টিউমার ভেবেই অপারেট করি আমি, কিন্তু দেখা গেল সেটা ছেলেটার যমজ ভাই।'

BanglaBook.org

'হোয়াট?' শাহেদের ঘাড়ের পেছনের চুল সড়সড় করে দাঁড়িয়ে গেল।

'হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন। তবে খুব একটা অবাক হবার কিছু নেই। যমজ ভ্রূণ বেশিরভাগ সময় বেড়ে ওঠার আগেই এককে রূপান্তরিত হয় জরায়ুর ভেতরে থেকেই। তবে অনেকসময় এই রূপান্তর সম্পূর্ণ হয় না। জাহিদের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। সহজ ভাষায় বলতে গেলে ভ্রূণ অবস্থায় জাহিদ ওর যমজ ভাইকে খেয়ে ফেলেছিল। বোনও হতে পারে, তবে আমার ধারণা সেটা ভাই-ই ছিল। ফ্র্যাটারনাল টুইন্সের ক্ষেত্রে এ ধরনের রূপান্তরের ঘটনা অপেক্ষাকৃত কম দেখা যায়, পরিসংখ্যান তাই বলে। অসম্পূর্ণ ভ্রূণের ভগ্নাংশ আশ্রয় নেয় জাহিদের মগজে। আমার ধারণা ওর কৈশোরোদ্‌গমের (পিউবার্টি) সঙ্গে সঙ্গে টিস্যুগুলো বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। তাতেই ছেলেটা অসুস্থ হয়ে পড়ে। তবে আমার ধারণা ফরেন টিস্যু সবটুকুই আমি কেটে-বাদ দিতে পেরেছি।'

গলা শুকিয়ে গেছে শাহেদের, মনে হচ্ছে এতক্ষণ ধরে ভৌতিক বা সায়েন্স ফিকশন মুভি দেখেছে। কোনমতে ঢোক গিলে বলল, 'অদ্ভুত! অবিশ্বাস্য! আপনি বলছেন জাহিদ ব্যাপারটা জানে না?'

'না, কাউকেই বলিনি আমি। ওর বাবা শুনলে শুধু শুধু ভয় পেতেন। তবে অপারেশনের পর এমন একটা রহস্যময় ঘটনা ঘটে যার সঙ্গে এর কোন তুলনাই হয় না।'

নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল শাহেদের। 'কি হয়েছিল?'

চুপ করে একটু দম নিয়ে নিলেন বৃদ্ধ ডাক্তার। তারপর বললেন, 'জাহিদের অপারেশনের পরও স্টেব্‌ল্ আছে দেখে আমি টেনিস খেলতে চলে যাই। তাই ঘটনার সময় আমি হাসপাতালে উপস্থিত ছিলাম না। ছেলেটাকে ও. টি. থেকে বের করে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে নিয়ে যাবার পরপরই লক্ষ লক্ষ চড়ুই পাখি লণ্ডন জেনারেল হসপিটাল আক্রমণ করে।'

'মানে? ঠিক কি…'

'শুনতে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে, তাই না? লাইব্রেরিতে গিয়ে খুঁজে দেখলে ওই সময়ের স্থানীয় খবরের কাগজে ঘটনাটার বিবরণ পেয়ে যাবেন। পূর্ব দিক থেকে বিশাল এক ঝাঁক চড়ুই পাখি উড়ে এসে সরাসরি হাসপাতালের দক্ষিণ দিকে আঘাত হানে, ওখানেই ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট, যেখানে জাহিদকে রাখা হয়েছিল। ওদিকের বেশিরভাগ কাঁচের জানালা ভেঙে পড়েছিল, পরে প্রায় তিনশো চড়ুই পাখির মৃতদেহ সরানো হয়। ওদিকের দেয়াল প্রায় পুরোটাই কাঁচের তৈরি। খবরের কাগজে বলা হয়েছিল সূর্যের আলো কাঁচের দেয়ালে প্রতিফলন ঘটালে চড়ুই পাখির ঝাঁক দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ওদিকে ধেয়ে যায়।'

'ব্যাখ্যাটা খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য শোনাচ্ছে না।'

'ঠিক তাই। জাহিদ হাসান মাথাব্যথার আগে চড়ুই পাখির শব্দ শুনত। আমি ডাক্তার, অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস করি না। কিন্তু মনে হয় জাহিদের অপারেশনের সঙ্গে এই ঘটনার সম্পর্ক আছে।'

'পাখিরা আবার উড়ছে!' বিড়বিড় করে উঠল শাহেদ।

BanglaBook.org

'কি বললেন?'

'না না, কিছু না। বলে যান।'

'আর তেমন কিছু বলার নেই। আমি কি আপনার কৌতূহল মেটাতে পেরেছি?'

'নিশ্চয়ই, ডক্টর। অসংখ্য ধন্যবাদ,' কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে শাহেদের, ঠোঁট দুটো মনে হচ্ছে ঠাণ্ডায় জমে গেছে।

'জাহিদকে আমার শুভেচ্ছা জানাবেন, গুডবাই।'

'গুডবাই, ডক্টর।'

মাথায় হাত দিয়ে নির্বাক হয়ে বসে রইল শাহেদ। স্বপ্নেও কল্পনা করেনি সব ঘটনার পেছনে এ ধরনের একটা ব্যাখ্যা থাকতে পারে। ব্যাখ্যাটা যে ঠিক কি, এখনও তা পরিষ্কার নয়। জাহিদ একক কোন ব্যক্তিত্ব নয়, সবসময় ওর মধ্যে অন্য একটা লোক বাস করে এসেছে—এটুকু মেনে নিতেই হবে। যুক্তিগ্রাহ্য না হলেও ফিঙ্গারপ্রিন্ট আর ভয়েস-প্রিন্টও এই ব্যাখ্যাকে সমর্থন করছে। ডক্টর ম্যাকলিনের ধারণা কৈশোরোদ্‌গমের সাথে সাথে জাহিদের মগজে চেপে বসা ওর যমজ ভ্রূণের অবশিষ্টাংশ বাড়তে শুরু করে। শাহেদের ধারণা অন্যরকম। ওই সময়েই জাহিদ লিখতে শুরু করেছিল, আর ওর অজান্তেই ওর ভেতরে বাড়তে থাকে সম্পূর্ণ আলাদা একটা সত্তা। শিউরে উঠল শাহেদ। আর যাই হোক, জাহিদের মুখ থেকে শোনা গল্প হেসে উড়িয়ে দিতে পারছে না।

ডিউটি শেষ করে বের হবার ঠিক আগের মুহূর্তে ফোনটা বেজে উঠল। বিরক্ত হল শাহেদ। রিসিভার উঠাতে হল নেহায়েত অনিচ্ছাসত্ত্বেও, 'পতেঙ্গা থানা।'

'হ্যালো, ইন্সপেক্টর সাহেব, আমি ওসমান সদাগর খতা বলচি।'

বিরক্তি চরমে উঠল। শাহেদের ধারণা লোকটা স্মাগলার। প্রচুর টাকা পয়সার মালিক, শাহেদকে নানাসময়ে বিভিন্ন মূল্যবান ভেট গছাবার চেষ্টা করেছে। 'কি ব্যাপার, বলেন?' সংক্ষেপে সারতে চাইল শাহেদ।

'এই মানে···আমার একানে একটু ঝামেলা হয়েচে আর কি। আমার বাড়ির পেছনে যে গোয়ালঘরটা আছে, আমার মনে হয় কোন গাড়ি চোর ওকানে গাড়ি লুকিয়ে রেকেছিল,' প্রাণপণে শুদ্ধ কথা বলার চেষ্টা করছে ওসমান সওদাগর। থানা থেকে মাইল দুয়েক দূরে ওর বাড়ি। কিছুদিন আগে ডেইরি ফার্ম খোলার চেষ্টা করেছিল, মাস ছয়েকের মধ্যেই লাটে ওঠে। ওর বাড়ির পেছনে কয়েক বিঘা খালি জমিতে চালাঘরগুলো এখন রোদে পুড়ছে আর বৃষ্টিতে ভিজছে। শাহেদের ধারণা জাহাজ থেকে নামানো চোরাই মালের গোডাউন হিসেবে ব্যবহার করছে সে জায়গাটাকে।

'কেমন করে বুঝলেন ওখানে চোরাই গাড়ি ছিল?'

'একটু আগে জানালা দিয়ে দেকলাম আৎকা একটা বিরাট গাড়ি গোয়ালঘর থেকে বাইরে চলি আইসল। আমাকে না বলি কেউ তো ওকানে গাড়ি রাকবে না।'

'কি গাড়ি ছিল ওটা, দেখেছেন?' কাগজ কলম নিয়ে তৈরি হল শাহেদ।

'কালা রঙের ফোর্ড এসকর্ট। আমার চোক তো আল্লার রহমতে একনও বেশ

BanglaBook.org

ভাল, নাম্বারটাও লিকে রাকছি। খুলনার নাম্বার প্লেট। ড্রাইবারের মুখ দেকি নাই। বিরাট শরীল, চওড়া কাঁধ।'

লিখতে লিখতে শাহেদ হঠাৎ চমকে উঠল। কোথায় যেন কে কালো ফোর্ড এসকর্টের কথা বলেছিল, খুলনার নাম্বার প্লেট! হ্যাঁ, মনে পড়েছে। জাহিদ খুনীর বর্ণনা দিচ্ছিল, কালো ফোর্ড এসকর্ট চালায়, খুলনার নাম্বার প্লেট!

'নাম্বারটা লিকেছেন তো, ইন্সপেক্টর সাহেব?'

'অ্যাঁ…হ্যাঁ,' প্রাণপণে নিজেকে ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করছে জাহিদ। 'আচ্ছা, ওসমান সাহেব, গাড়িটার বাম্পারে কি কোন স্টিকার লাগানো ছিল?'

'আপনি জানলেন ক্যামনে?' অবাক হয়ে গেল ওসমান সওদাগর। 'ওই একই ইস্টিকার লাগানো আছে আমার চেলের ঘরের দরজায়। এতদূর থেকে পড়তে না পারলে কি হবে, দেকেই চিনছি। ওটাতে লেখা আছে "ওস্তাদের মাইর শেষ রাতে"।'

ভদ্রলোককে ধন্যবাদ জানিয়ে ফোন রেখে দিল জাহিদ। ঘটনার আগামাথা কিছুই বুঝতে পারছে না। জাহিদের সঙ্গে কথা বলা দরকার।

একবার রিঙ বাজতেই ওদিক থেকে অচেনা কোন লোক ফোন ধরল, 'হ্যালো, কে বলছেন?'

'আমি চট্টগ্রাম থেকে বলছি, পতেঙ্গা থানার ইন্সপেক্টর। জাহিদ সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'ওহ্! আমাদেরই উচিত ছিল আপনাকে জানানো, এদিকে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। আমি সাভার থানার ও. সি. বলছি।'

শাহেদের হার্টবিট বেড়ে গেল। জাহিদের বাসায় পুলিস! 'কি হয়েছে? জাহিদ সাহেব ঠিক আছেন তো?'

'উনি ঠিকই আছেন। ওনাকে যে দু'জন কনস্টেবল গার্ড দিচ্ছিল তাদেরকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে বাড়ি এসে বউ-বাচ্চা নিয়ে কোথায় উধাও হয়ে গেছেন। বাড়িতে যে দু'জন পাহারা দিচ্ছিল, তাদের লাশ পাওয়া গেছে, যতদূর মনে হচ্ছে জাহিদ হাসানই খুন দুটো করেছেন।'

ঘামতে শুরু করেছে শাহেদ, নিজের কানকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না, 'কিভাবে পালিয়েছে ওরা?'

'ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। জাহিদ হাসানের গাড়িতেই, যতদূর মনে হচ্ছে। সকাল সাড়ে এগারোটা থেকে ওনাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা ভাবছিলাম আপনাকে খবর দেব, কিন্তু এদিককার ঝামেলায় সময় করে উঠতে পারছিলাম না। পতেঙ্গায় তো জাহিদ হাসানের বাড়ি, আপনি একটু ওদিকে লক্ষ রাখবেন। অবশ্য মনে হয় না ওখানে যাবেন, তিনি ভাল করেই জানেন পুলিস প্রথমেই ওনার বাড়িতে যাবে।'

ফোন রেখে দিয়ে বসে বসে ঘামতে লাগল শাহেদ। কেমন করে তা হয়? জাহিদ হাসান কি মানসিক রোগী? পুরো ব্যাপারটাই নিজে নিজে কল্পনা করে নিয়ে সত্যি বলে ভাবতে শুরু করেছে? ফোর্ড এসকর্ট গাড়িটাও হয়ত ওরই, রুস্তম

BanglaBook.org

শেরের বলে চালাতে চাচ্ছে। লুকিয়ে রেখেছিল ওসমান সওদাগরের গোয়ালঘরে, যাতে কেউ না দেখে। কিন্তু ওসমান সওদাগর কেন এতদিন দেখেনি? শাহেদ জানে গোয়ালঘরটা চোরাই মালের গোডাউন হিসেবে ব্যবহার করে সে, সেখানে একটা গাড়ি ক'দিন লুকিয়ে রাখা যাবে? হয়ত সত্যিই রুস্তম শের বেঁচে উঠেছে! হয়ত জাহিদ সত্যি কথাই বলছে। অন্তত ও যা বলেছে তা ও নিজে বিশ্বাস করে। কিন্তু শাহেদ কি এত সহজে বিশ্বাস করবে?

আনমনে থানা থেকে বেরিয়ে এল শাহেদ। ইচ্ছে করেই কাউকে কিছু জানাল না। ও জানে গায়ের জোর এখানে কাজে দেবে না, কাউকে সঙ্গে নেয়া মানে তার মৃত্যু ডেকে আনা। আগে রহস্যের জট খুলতে হবে। জানতে হবে পাখিরা কেন উড়ছে।

উনিশ

পুরো রাস্তা নতুন লেখার পরিকল্পনা নিয়ে বকবক করে গেল রুস্তম শের যেটা ও আর জাহিদ মিলে লিখবে। গল্পটা সে জানে, জাহিদকে শুধু লিখে দিতে হবে। মোনা আর বাচ্চাদের সঙ্গে খুবই ভদ্র ব্যবহার করছে। পথে দু'বার নির্জন রাস্তার পাশে থেমে বাচ্চাদের জামাকাপড় বদলাতে হয়েছে, দু'বারই রুস্তম শের মোনাকে সাহায্য করেছে, তবে ওর একটা হাত সবসময় অবসর ছিল। কোন ঝুঁকি নিতে চায়নি রুস্তম শের। দুধ খেয়ে বাচ্চারা বেশিরভাগ সময় ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিয়েছে। বাজার এলাকা বা ফেরিঘাটে লোকজন ভয় আর কৌতূহল মেশানো চোখে চাদরে ঢাকা রুস্তম শেরকে দেখার চেষ্টা করেছে, তবে কেউ কোন প্রশ্ন করেনি।

পতেঙ্গার কাছাকাছি এসে গাড়ি বদলে নিয়েছে রুস্তম শের। মোনা টের পেয়েছে রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ওসমান সওদাগরের বাড়ির পেছনে চলে এসেছে ওরা। এখান থেকে ওদের বাড়ি আরও মাইল ছয়েকের রাস্তা। রূপককে জিম্মি হিসেবে সঙ্গে করে নিয়ে গাছপালার আড়ালে হারিয়ে গেল রুস্তম শের। একটু পরেই কালো রঙের ফোর্ড এসকর্টটা চালিয়ে ফিরে এল। চমকে উঠল মোনা। গাড়িটা চিনতে একটুও অসুবিধা হয়নি, অথচ কোনদিন দেখেনি ও গাড়িটাকে। তবে চমকটা ভেঙে যেতে সময় লাগল না। রুস্তম শের যখন স্বয়ং রক্তমাংসের শরীর নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে, এ তো নেহাতই একটা জড়পদার্থ! কিন্তু এখানে কিভাবে এল গাড়িটা? জাহিদ রুস্তম শেরকে গোর দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু জ্যান্ত অবস্থায়। মন থেকে ওকে মেরে ফেলতে পারেনি। তাই কবর খুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে সে। গাড়িটাকেও কি জাহিদ মনে মনে এখানেই লুকিয়ে রেখেছিল? রুস্তম শেরের সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব হয়ে উঠেছে গাড়িটাও! রুস্তম শের জানত গাড়িটা এখানেই আছে, তাই অতিরিক্ত সাবধানতা বজায় রাখতে সুনীল দত্তর গাড়িটা জঙ্গলে লুকিয়ে রেখে গেল। পুলিস যদি ভাঙা গ্যারেজের নিখোঁজ গাড়িটা খুঁজতে শুরু

BanglaBook.org

করে; তবে এই গাড়িতে থানার আশেপাশে যাওয়া বোকামি। রুস্তম শের জানে পুলিস একসময় পৌঁছে যাবে, তাতে ওর তেমন কোন ভয় নেই। শুধু একটু সময় দরকার ওর। লেখাটা শেষ করার মত সময়। এরপরে কোন ঝামেলাকেই ও কেয়ার করবে না। রুস্তম শেরের চারটে বই-ই জাহিদ পতেঙ্গার এই বাড়িতে বসে লিখেছে, সেজন্যেই কি যে-কোন মূল্যে এখানে আসার ঝুঁকি নিয়েছে রুস্তম শের?

ফোর্ড এসকর্ট কারও সন্দেহ না জাগিয়ে বিনা বাধায় লাল ইঁটের দোতলা বাড়িটার গাড়ি-বারান্দায় এসে দাঁড়াল। রুস্তম শেরের হাতে লাগেজ, মোনা বাচ্চাদের কোলে নিয়ে দরজার তালা খুলে ভেতরে ঢুকল।

'আমি একটু বাথরুমে যাব,' ঘোষণা করল মোনা।

'ঠিক আছে,' রুস্তম শের সানগ্লাস আর চাদর খুলে ফেলেছে, মোনা ওর দিকে সরাসরি তাকাতে পারছে না, 'আমিও যাব তোমার সঙ্গে।'

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? বাথরুমের ভেতর তুমি কিভাবে থাকবে?' রাগে সাতখানা হয়ে ফেটে পড়ল মোনা।

'অত রাগের কি আছে, মেমসাহেব?' খলখল করে শূন্য দাঁতে প্রেতের মত হাসল রুস্তম শের। 'আমি দরজার পাশে বাইরে দাঁড়াব, দরজাটা খোলা থাকবে।'

আপত্তি করে কোন লাভ নেই। দোতলায় উঠে এল ওরা। রুস্তম শের হাত বাড়াতেই খুশির শব্দ করতে করতে মোনার কোল থেকে লাফিয়ে ওর কোলে চলে গেল রূপক আর রুমকি। দুঃখে চোখে জল এল মোনার, বাচ্চা দুটো অচেনা লোক দেখলেই সিঁটিয়ে যায়। কোলে যাওয়া দূরের কথা। অথচ রাক্ষসের মত দেখতে এই লোকটাকে কেন ওরা এত পছন্দ করছে? কিচ্ছু করার নেই, বাথরুমের দরজা খোলা রেখেই কাজ সারল মোনা। ওর দিকে পিঠ দিয়ে বাচ্চাদের কোলে নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে রইল রুস্তম শের।

শাড়িটা ঠিকঠাক করছে, হঠাৎ এই সময় লাফিয়ে উঠে ঘুরে দাঁড়াল রুস্তম শের। 'বেরিয়ে এস! এক্ষুণি বেরিয়ে এস!' বাচ্চাদেরকে শোবার ঘরের মেঝেতে ছেড়ে দিয়ে মোনার হাত ধরে টানতে টানতে খাটের পাশে নিয়ে এল। 'কে যেন এদিকে আসছে! জাহিদ নয়। জাহিদ হলে আমি জানতাম!'

'আমি তো কিছু...'

'গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ। তুমি শুনতে পাচ্ছ না?'

'না তো!' সত্যিই মোনা কিছু শুনতে পাচ্ছে না।

'শোনার দরকার নেই। আমি পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি। হাত দুটো পেছনে আন,' পকেট থেকে একটা অ্যাডহেসিভ টেপ বের করে খুলতে শুরু করেছে রুস্তম শের।

'বাচ্চারা...'

'কোন ভয় নেই। ওরা খেলা করুক। আমি দরজা বন্ধ করে দিয়ে যাব।' মোনার হাত দুটো টেপ দিয়ে পেঁচিয়ে শক্ত করে বেঁধে ফেলেছে। হঠাৎ এক ঝটকায় ওর পেটিকোট তুলে ধরে সেফটিপিন দিয়ে আটকানো কাঁচিটা নিপুণ হাতে খুলে নিয়ে এল রুস্তম শের। 'কিছু মনে কোরো না, ভদ্রতার সময় নেই

BanglaBook.org

এখন।' কাঁচি দিয়ে রোল থেকে টেপটা কেটে নিল।

বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেছে মোনা। 'তুমি জানতে!'

'কাঁচিটা নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে যখন নামছিলে, তখনই তোমার চোখে ফুটে উঠেছিল। ওই মুহূর্ত থেকেই আমি এটার অস্তিত্ব জানি।' হেসে উঠল রুস্তম শের। 'আর বোকামি করতে যেয়ো না যেন। যাই হোক, আমি বাইরে যাচ্ছি। দরজা বন্ধ করে দিচ্ছি, বাচ্চারা সিঁড়ি বেয়ে গড়িয়ে পড়ার ভয় নেই। বড় জোর মাটিতে পড়ে থাকা ধুলোবালি মুখে পুরবে, তাতে তেমন কোন ক্ষতি হবে না।'

বাইরে থেকে দরজায় হুড়কো দিয়ে বেড়ালের মত নিঃশব্দে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল রুস্তম শের, মিলিয়ে গেল ঘন গাছপালার আড়ালে।

শাহেদ ওসমান সওদাগরের বাড়ির আশেপাশের রাস্তায় কোন মালিকহীন গাড়ি দেখতে পেল না। ফোর্ড এসকর্ট যে নিতে এসেছে, সে নিশ্চয়ই পায়ে হেঁটে এতদূর আসেনি। তাছাড়া সঙ্গে বাচ্চা রয়েছে, যদি জাহিদ হয়ে থাকে, তবে যে গাড়িতে এসেছে সেটা আশেপাশেই কোথাও থাকবে। পেছনের জঙ্গলটাও দেখা দরকার।

রাস্তা ছেড়ে মেঠো পথ ধরে ধুলো উড়িয়ে গাছপালার ভেতর দিয়ে জীপ চালাল শাহেদ। একটু খুঁজতেই নীল রঙের একটা গাড়ি পেয়ে গেল। নাহ্! জাহিদের পাবলিকা নয়। আশেপাশে লোকজন থাকে, তাদের কারও হতে পারে। গাড়িটা লুকিয়ে রাখা হয়নি, মেটে রাস্তার একপাশে যত্ন করে পার্ক করা। হয়ত পিকনিকে এসেছে ছেলেপিলে নিয়ে। তবু পরীক্ষা করে দেখা দরকার।

জীপ ছেড়ে নেমে গাড়িটার চারপাশে ঘুরল শাহেদ। সন্দেহজনক কিছুই দেখা যাচ্ছে না। পেছনের দরজার হাতলে চাপ দিতেই দরজাটা খুলে গেল। লক করা হয়নি। কেন? সিটের ওপর হাঁটু গেড়ে উবু হয়ে ভেতরে উঁকি দিল শাহেদ। সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ডটা লাফ দিল। বাচ্চাদের পায়ের ছোট্ট এক পাটি জুতো পড়ে আছে সিটের নিচে। অবশ্য এতে কিছুই প্রমাণ হয় না। ঢাকার নাম্বার প্লেটওয়ালা যে-কোন গাড়িতে বাচ্চা থাকতেই পারে, এখানে গাড়ি পার্ক করার কোন বিধিনিষেধও নেই। তন্নতন্ন করে খুঁজেও গাড়িতে আর কিছুই পেল না শাহেদ, তবু মনটা খুঁতখুঁত করছে। মাথা নিচু করে গাড়ি থেকে বের হতে যেতেই বরফের মত জমে গেল।

ইগনিশনের তারগুলো ঝুলছে। বুঝতে অসুবিধা হয় না চাবি দিয়ে নয়, তার ছিঁড়ে গাড়ি স্টার্ট দেয়া হয়েছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে অভ্যস্ত হাতের কাজ।

দু'এক মুহূর্ত ইতস্তত করল শাহেদ। থানায় খবর দেয়া দরকার। কিন্তু তাহলে একা যাওয়া হবে না ওর। এতগুলো নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের নায়ক যদি জাহিদের বাড়িটায় আশ্রয় নিয়ে থাকে, তবে সহকর্মীদের বিপদের মধ্যে ফেলার কোন মানে হয় না। ভেতরের রহস্যের কিনারা করাও অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। হাজারটা প্রশ্ন ঘুরছে ওর মাথায় চরকির মত। একদিকে কর্তব্য, অন্যদিকে কৌতূহল। সত্যিই যদি ওটা রুস্তম শের হয়ে থাকে? জাহিদ যদি সত্যি কথাই

BanglaBook.org

বলে থাকে? জাহিদ নয়, হয়ত রুস্তম শেরই খুন করেছে গার্ডদের, কিডন্যাপ করেছে মোনা আর বাচ্চাদেরকে। তারপর জাহিদকে বাধ্য করেছে আসতে। যদি তাই হয়ে থাকে তবে সেনাবাহিনী এলেও ওর কিছু করতে পারবে না। একা যাওয়াই স্থির করল শাহেদ, ওর সন্দেহের কথা কাউকে বলে বোকা বনার কোন মানে হয় না।

জাহিদের বাড়িটা মেইন রোড থেকে বেশ অনেকটা ভেতরে। কাঁচা রাস্তা ধরে যেতে প্রায় মাইল দুয়েক। কাঁটাতারের বেড়া দেখা যেতেই জিপ থামিয়ে নেমে এল শাহেদ। এখান থেকেই জাহিদের ভূসম্পত্তির শুরু। ইঞ্জিনের শব্দে বাড়ির অতিথিদের চমকে দিতে চায় না শাহেদ। তাই জীপটা এখানেই রেখে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। লোহার গেট খোলাই আছে, ঠেলে ঢুকে পড়ল ভেতরে। আধ মাইলটাক হাঁটলেই বাড়িটা দেখা যাবে। সুরকি বিছানো রাস্তা ধরে নয়, জঙ্গলের ভেতর দিয়ে কোনাকুনি রওনা হল শাহেদ।

মাত্র সূর্য ডুবতে শুরু করেছে, কিন্তু ঘন গাছপালার ভেতর দিনের আলোর কিছুই অবশিষ্ট নেই। অসময়ে আঁধার নেমে এসেছে চারধারে। ডালপালা সরিয়ে হাঁটতে রীতিমত অসুবিধা হচ্ছে।

হঠাৎ উপরে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল শাহেদ। আশেপাশের প্রতিটা গাছের ডালে সার বেঁধে বসে আছে অসংখ্য চড়ুই পাখি! পাখির ভিড়ে গাছের পাতা দেখা যাচ্ছে না, যতদূর চোখ যায় শুধু পাখি আর পাখি!

'মাই গড!' ফিসফিস করে নিজের অজান্তেই বলে উঠল শাহেদ। চারপাশের নির্জনতায় ঢেউ তুলল এই অস্পষ্ট শব্দটুকু। কিন্তু পাখিরা একটুও নড়ল না। একদৃষ্টে চেয়ে আছে শাহেদের দিকে, মনে হচ্ছে যেন কারও দেহে প্রাণ নেই। কান পেতেও কোন শব্দ শুনতে পেল না শাহেদ, ঝিঁঝি পোকারা পর্যন্ত আজ ডাকছে না। চারধারে মৃত্যুর নীরবতা।

হোলস্টার থেকে রিভলভারটা খুলে হাতে নিয়ে কুঁজো হয়ে দ্রুতগতিতে এগুতে থাকল শাহেদ। জানতে হবে কালো ফোর্ড এসকর্ট গাড়িটা সত্যিই এখানে এসেছে কি না। যদি এসে থাকে, তবে কে চালিয়ে এসেছে? জাহিদ, নাকি অন্য কেউ? জাহিদের স্ত্রী আর বাচ্চাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই শাহেদের প্রধান দায়িত্ব। কিন্তু এত পাখি এল কোত্থেকে?

কিছুক্ষণ পর উঁচু মত একটা খোলা জায়গায় পৌঁছল শাহেদ। এখান থেকে বাড়ির একটা পাশ দেখা যাচ্ছে, কিন্তু সামনেটা গাছের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে। মুখ তুলে আশেপাশে কোথাও চড়ুই পাখি দেখতে পেল না, ওকে অনুসরণ করেনি পাখিগুলো। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে একটু ডান দিকে সরে যাবার চেষ্টা করল শাহেদ, যাতে বাড়ির সামনেটা দেখা যায়।

বাঁ হাতে সেগুনগাছের একটা ডাল ধরে নিচে নামতে যেতেই বরফের মত জমে গেল শাহেদ।

ডান কানের পেছনে ধাতব কোন কিছুর শীতল স্পর্শ পেল, বিরক্তিকর কর্কশ

BanglaBook.org

কণ্ঠে পেছন থেকে কেউ বলে উঠল, 'একটু নড়েছ তো ঘিলু উড়িয়ে দেব।'

খুব ধীরে ধীরে ঘাড় ঘোরাল শাহেদ।

দেখার পর মনে হল এর চেয়ে অন্ধ হয়ে যাওয়াও ভাল ছিল। দুঃস্বপ্নেও কেউ এমন ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে না।

'উৎসবে যোগদানের জন্য আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি,' হো হো করে হেসে উঠল রুস্তম শের। হ্যাঁ, রুস্তম শের—শাহেদ ওর সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছে এক মুহূর্তের মধ্যে। হাসতে থাকা মুখের ভেতর কালচে লাল বিরাট জিভটা জ্যান্ত সাপের মত নড়ছে, সাদা হয়ে ফুলে আছে দাঁত-শূন্য মাড়ি, অবশিষ্ট দু'একটা দাঁত কোনমতে লেগে আছে পচধরা মাড়ির সঙ্গে। মনে হচ্ছে কেউ যেন জ্যান্ত অবস্থায় লোকটার গায়ের চামড়া খুলে নিয়েছে। ফোসকার মত তাজা ক্ষত মুখ আর হাতের দৃশ্যমান অংশে, রক্ত মেশানো পুঁজ ভেসে উঠছে। এমনকি চুলহীন মাথাটাও ঢেকে গেছে ভেজা ভেজা ঘা'তে। মানুষ নয়, যেন অশরীরী আত্মা! এর কোন অস্তিত্ব পৃথিবীতে ছিল না, থাকতে পারে না!

'দারুণ জোরে ছুটতে পারেন কিন্তু আপনি, আমাকেই একটু হলে ধোঁকা দিয়ে দিচ্ছিলেন। অথচ আপনাকেই খুঁজতে এসেছি আমি। যাই হোক, বাচ্চা দুটো আমার হাতে আছে, জানেন তো? কোন গোলমাল করবেন না। রিভলভারটা ছুঁড়ে ওই জামগাছটার তলায় ফেলে দিন।' খুব আন্তরিক কণ্ঠে বলল রুস্তম শের, খুব খুশি-খুশি দেখাচ্ছে ওকে।

কথামত রিভলভারটা ছুঁড়ে ফেলে দিল শাহেদ। এই লোকের সঙ্গে চালাকি করার মানে হয় না। শাহেদের পেছন পেছন বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল রুস্তম শের।

এখনও বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে এই লোকটাই রুস্তম শের। উচ্চতা আর দৈহিক গঠন মিলে যাচ্ছে খাপে খাপে, কিন্তু এই অবস্থা হল কেমন করে? আর একবার শিউরে উঠল শাহেদ। স্ত্রী আর ছেলের কথা মনে করে মনটা কেঁদে উঠল, ওদেরকে আর দেখতে পাবে না ও। ওরা কি কোনদিন জানতে পারবে কিভাবে মৃত্যুবরণ করেছে শাহেদ? কেউ কি বিশ্বাস করবে?

বাড়ির সামনে কালো ফোর্ড এসকর্টটা পার্ক করা। কাছে আসতে পেছনের বাম্পারে লাগানো স্টিকারটা পড়ল শাহেদ, 'ওস্তাদের মাইর শেষ রাতে,' হঠাৎ করেই কেন যেন ভয়টা কমে গেল, মনে হচ্ছে যেন স্বপ্নের মধ্যে ঘটে যাচ্ছে সবকিছু। কোনকিছুই গায়ে লাগছে না।

'গাড়িটা কেমন? দারুণ না?' রুস্তম শের পেছন থেকে জানতে চাইল।

'চট্টগ্রামের সব পুলিস এই মুহূর্তে গাড়িটা খুঁজছে।'

উঁচু গলায় হেসে উঠল রুস্তম শের, 'এখনও আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছেন? আপনি তো মশাই সুবিধার লোক নন! যাই হোক, আজেবাজে কথা রাখুন। আমরা এখন জাহিদ হাসানের জন্যে অপেক্ষা করব।' রিভলভারের নল শাহেদের পিঠে ঠেকিয়ে সামনের দিকে ছোট্ট একটা ধাক্কা দিল, 'ঘরে ঢুকুন, দরজা

BanglaBook.org

খোলাই আছে।'

পাশ ফিরে সামনের দিকে বাড়ানো রুস্তম শেরের বাঁ হাতের তালুর দিকে চোখ যেতে অদ্ভুত একটা ব্যাপার লক্ষ করল শাহেদ। ওপরের চামড়ায় ঘিনঘিনে ক্ষত, কিন্তু তালুর সাদাটে ফ্যাকাসে জমি নিষ্কলুষ নিভাঁজ—এমনকি একটা রেখা পর্যন্ত নেই!

দোতলায় শোবার ঘরে উঠে এল ওরা।

'ঠিক আছেন তো, শাহেদ সাহেব?' ওকে দেখে মোনা উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল, রূপক আর রুমকি মোনার দু'কাঁধ ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

'আমি অকারণে কাউকে ব্যথা দিই না,' রুস্তম শের ইঙ্গিতে কাবার্ডের ওপর বাচ্চাদের নাগালের বাইরে রেখে যাওয়া কাঁচিটা দেখাল, 'মেমসাহেবের হাতের বাঁধনটা কেটে দিন তো, শাহেদ সাহেব! আপনিই তাহলে ইন্সপেক্টর শাহেদ রহমান! হুঁঃ।'

লোকটা ওকে চেনে! কারণ জাহিদ ওকে চেনে। কেন যেন আবার মৃত্যুর কথা মনে এল। রুস্তম শের কি বাইরের চড়ুইদের উপস্থিতি টের পেয়েছে? মনে হয় না। চড়ুইদের সঙ্গে ওর সম্পর্কই বা কি?

ধীরে ধীরে মোনার হাতের বাঁধন কেটে দিল শাহেদ, কেমন যেন নির্লিপ্ত নিস্পৃহ একটা ভাব ঘিরে ধরেছে ওকে। ভয়ের একটা সীমা আছে, সেটা পেরিয়ে এসেছে ও। চারদিকে কি ঘটছে কেন ঘটছে সে সম্বন্ধে যেন কোন উৎসাহই নেই ওর।

শক্ত করে বাঁধার কারণে লাল হয়ে ফুলে উঠেছে মোনার হাতের কব্জি, দু'হাতে ডলতে ডলতে উঠে দাঁড়াল। 'বাচ্চাদের খাবার সময় হয়েছে। ওদেরকে নিচে নিয়ে যাই?' সারা রাস্তা ঘুমিয়ে এসে রূপক আর রুমকি এখন প্রাণশক্তিতে উচ্ছল, চারদিকে ছোটাছুটি করে খেলা করছে।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিয়ে যাও,' রুস্তম শেরকে খুব খুশি-খুশি দেখাচ্ছে। ডান হাতে রিভলভার, পাপড়িহীন মাছের মত চোখের দৃষ্টি শাহেদ আর মোনার ওপর ঘুরছে অনবরত। 'আমরাও যাচ্ছি তোমার সঙ্গে। ইন্সপেক্টরের সঙ্গে আমার কথা আছে।'

সবাই মিলে নিচের কিচেনে নেমে এল। মোনা সঙ্গে করে বাচ্চাদের জন্যে আনা আতপ চাল আর সব্জি দিয়ে পিশ্‌প্যাশ্‌ রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কিচেনটা বিশাল। একপাশে চার চেয়ারের একটা ডাইনিং টেবিল। রুস্তম শের রিভলভার হাতে একটা চেয়ার টেনে বসল। শাহেদ দেয়ালে হেলান দিয়ে মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে বাচ্চাদের ওপর নজর রাখতে লাগল যাতে টেবিলের কোনা মাথায় না লাগে বা চেয়ার উল্টে তলায় চাপা না পড়ে। রুস্তম শের একনাগাড়ে বকবক করে চলেছে।

'আপনি ভাবছেন আমি আপনাকে মেরে ফেলব, তাই না? অস্বীকার করে লাভ নেই, আপনার চোখে আমি সেটা দেখতে পাচ্ছি। এই ধরনের দৃষ্টির সঙ্গে আমি খুব পরিচিত। অবশ্য আমি বলতে পারি যে, না, আমি খুন করব না। কিন্তু আমার

BanglaBook.org

মনে হয় আপনি আমার কথা বিশ্বাস করবেন না।' পকেট থেকে ভেজা একটা ন্যাকড়া বের করে মুখের পুঁজরক্ত মুছে নিল রুস্তম শের, আবার সেটা পকেটে পুরে রাখল, ডান হাতের রিভলভার এক চুল নড়ল না। 'আপনার তো পুলিসী অভিজ্ঞতাও আছে।'

'ঠিকই বলেছেন,' শীতল ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে শাহেদ দানবটার বিকৃত চেহারার দিকে। 'অবশ্য এ ধরনের অভিজ্ঞতা কোন পুলিসের আছে কিনা তাতে আমার সন্দেহ আছে।'

পেছনে মাথা হেলিয়ে হো হো করে ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠল রুস্তম শের। বাচ্চারা চমকে উঠে খেলা থামিয়ে ওর দিকে তাকাল, পরমুহূর্তে ওরাও হাসতে শুরু করল রুস্তম শেরের অনুকরণে। শাহেদ চকিতে মোনার দিকে চাইল, কাজ থামিয়ে শক্ত হয়ে মোনা একদৃষ্টে চেয়ে আছে রুস্তম শেরের দিকে। ওর চোখে ঘৃণা আর ভয় ছাড়াও আর একটা জিনিস দেখতে পেল শাহেদ—ঈর্ষা। রুস্তম শের কি জানে এই মহিলা ওর জন্যে কতটা ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়াতে পারে?

হঠাৎ করে হাসি থামিয়ে শাহেদের দিকে ঝুঁকে এল রুস্তম শের, ভক্ করে পচা একটা গন্ধ ধাক্কা খেল ওর নাকে। 'ঠিক বলেছেন আপনি। তবে যদি ইচ্ছে হয় নাও মারতে পারি আপনাকে, কিছুই বলা যায় না। পরে সিদ্ধান্ত নেব। আজ রাতটা বড় ব্যস্ত আছি আমি। জাহিদ লেখার ব্যাপারে সাহায্য করবে আমাকে। সকালের আগেই আশা করি আমরা শেষ করে ফেলতে পারব।'

'ও চায় জাহিদ ওকে শিখিয়ে দিক কিভাবে লিখতে হয়,' মোনা বলল, 'ওরা নাকি একসঙ্গে একটা বই লিখবে।'

'ঠিক তা নয়,' আপত্তি জানাল রুস্তম শের। একটু যেন রেগেও উঠল। 'জাহিদ আমার কাছে ঋণী, তুমি তা ভাল করেই জানো, মেমসাহেব। কিভাবে লিখতে হয় তা হয়ত জাহিদ আগে থেকেই জানত। কিন্তু আমিই ওকে শিখিয়েছি কিভাবে লিখলে মানুষ সেটা পড়তে চাইবে। কেউ যদি পড়তে না চায়, তবে লিখে কি লাভ?'

'তুমি তার কি বুঝবে!' অবজ্ঞাভরে বলল মোনা।

মোনাকে পাত্তা না দিয়ে শাহেদকে বোঝাতে থাকল রুস্তম শের, 'জাহিদের কাছ থেকে আমি যা চাই, তা…কি বলে…এক ধরনের ট্রান্সফিউশান বলতে পারেন। লেখার ক্ষমতাটা আমার মধ্যে আছে, কিন্তু কিভাবে সেটাকে কাজে লাগাতে হয়, তা শুধু জাহিদই জানে। ও শুধু আমাকে সাহায্য করবে ক্ষমতাটা ফিরে পেতে। জানেন তো, আমার দরকারী জিনিসপত্র সবই জাহিদ তৈরি করে দিয়েছে।'

না, কখনোই না, ভাবল শাহেদ। না জেনেই হয়ত মিথ্যে কথা বলছ তুমি জাহিদ একা নয়, দু'জনে মিলেই তোমরা সব অঘটন ঘটিয়েছ। কারণ প্রথম থেকেই তুমি ওর সঙ্গে ছিলে। জন্মের আগেই জাহিদ তোমাকে নিকেশ করার চেষ্টা করেছিল, পুরোপুরি সফল হয়নি সে। তারপর, এগারো বছর পর ডাক্তার ম্যাকলিন সমর্থ হন, কিন্তু সাময়িক সময়ের জন্যে মাত্র। অবশেষে জাহিদ

BanglaBook.org

তোমাকে আমন্ত্রণ জানাল নিজের অজান্তেই। কারণ তোমার অস্তিত্বের কথা ও কিছুই জানত না। ডাক্তার ম্যাকলিন ওকে বলেননি। সুযোগ বুঝে তুমি এসে হাজির হলে। আসলে তুমি জাহিদের মৃত যমজ ভাইয়ের প্রেতাত্মা···পুরোপুরি প্রেতাত্মা নও···অথবা প্রেতাত্মার চেয়েও বেশি কিছু।

মিটসেফের দরজা খুলে তার ভেতরে ঢোকার পাঁয়তারা কষতে যেতে রূপককে ধরে ফেলল শাহেদ, এক হাতে মিটসেফের দরজার ছিটকিনি আটকে দিল। সেদিকে তাকিয়ে ভাবুকের মত রুস্তম শের বলল, 'আসলে সব প্রকৃতির খেয়াল।'

'খেয়াল নয়, পাগলামি,' ফোড়ন কাটল শাহেদ।

আবার হেসে উঠল রুস্তম শের, 'আপনার সঙ্গে আমি একমত। তবে ঘটনাটা ঘটেছে। কিভাবে ঘটেছে তা না জানলে আমার ক্ষতি নেই, কিন্তু এখন আমি বাস্তব—সেটাই আমার কাছে সবচেয়ে জরুরি ব্যাপার।'

না, তুমি ভুল বলছ, ভাবল শাহেদ। কিভাবে ঘটনাটা ঘটেছে সেটাই এই মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরি ব্যাপার। তোমার কাছে না হলেও আমাদের জন্যে তো বটেই। কারণ একমাত্র সেটাই আমাদেরকে রক্ষা করতে পারে।

'আমি নিজেকেই নিজে সৃষ্টি করেছি,' বলতে থাকল রুস্তম শের, 'কিন্তু লেখা ব্যাপারটা বড় সোজা কাজ না, কি বলেন? প্রচুর খাটুনির দরকার। এরকম তো আর প্রতিদিন ঘটে না!'

'আল্লাহ্ না করুন!' মোনা বলে উঠল।

ঝট করে ওর দিকে ঘুরে তাকাল রুস্তম শের, সাপের মত ফুঁসে উঠল, 'খবরদার! বড় বেশি কথা বলছ তুমি! বাচ্চাদের কথা ভুলে গেছ নাকি?'

মুখ নিচু করে চুলায় চড়ানো ছোট্ট হাঁড়িতে চামচ নাড়তে থাকল মোনা, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা। 'শাহেদ সাহেব, বাচ্চাদেরকে টেবিলের ওপর একটু বসিয়ে দেবেন? খাওয়া রেডি।'

ছোট্ট দুটো বাটিতে পিশ্‌প্যাশ্‌ ঢেলে নিয়ে টেবিলের ওপর রাখল মোনা। চেয়ারে বসে রুমকিকে খাওয়াতে শুরু করল। শাহেদ অন্য বাটিটা টেনে নিয়ে রূপকের ভার নিল। মোনা নীরবে চোখের ভাষায় কৃতজ্ঞতা জানাল।

রুস্তম শের উঠে দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে, আনমনে রিভলভারের নল দিয়ে আঁচড় কাটছে শার্টের বুকে। বোতামে লেগে অস্বস্তিকর খস্‌খসে শব্দ উঠছে। 'আপনাকে কাজে লাগাতে হবে। আচ্ছা, এখানে আসার কথা কাউকে বলে এসেছেন নাকি?'

শাহেদের মনে হল সত্যি কথা বলাই ভাল, লোকটা স্বয়ংক্রিয় লাইডিটেক্টর। মিথ্যে বললে নিমেষে ধরে ফেলবে।

'না,' অবশেষে ঘাড় নেড়ে বলল শাহেদ, মনোযোগ দিয়ে চামচে করে রূপককে খাওয়াচ্ছে। ওসমান সওদাগরের ফোনের কথা খুলে বলল।

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল রুস্তম শের। 'এই সব গেঁয়ো লোকের স্বভাবই পরের ব্যাপারে নাক গলানো। তারপর ফোন পাওয়ার পর কি করলেন আপনি?'

BanglaBook.org

শাহেদ বুঝল এটা একটা ফাঁদ। রুস্তম শের ভাল করেই জানে কি ঘটেছে, শুধু দেখতে চাইছে শাহেদ সত্যি কথা বলে কি না। শাহেদকে একা দেখেই যা বোঝার বুঝে নিয়েছে সে। এখন শুধু জানতে চাইছে ও কতটা বোকা। বোকামি করল না শাহেদ, অক্ষরে অক্ষরে সত্যি কথাই বলে গেল।

'আপনার আয়ু একদিনের জন্যে বাড়িয়ে দেয়া হল। বাচ্চাদের খাওয়া হয়ে গেলে কি করতে হবে মন দিয়ে শুনুন।'

'কি বলতে হবে জানেন তো?' দোতলার বারান্দা মত খোলা জায়গাটায় টেলিফোনের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ওরা।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকিয়ে উত্তর দিল শাহেদ।

'চালাকি করতে গেলে কি হবে তা তো জানেনেই,' ইঙ্গিতে রূপককে দেখাল রুস্তম শের। কিচেন থেকে বের হবার সময় বীমা হিসেবে বাচ্চাটাকে কোলে করে নিয়ে এসেছে।

'ভয় দেখানর কোন দরকার নেই,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল শাহেদ। টেলিফোন সেটটা বিশাল কাঁচের জানালার পাশে উঁচু একটা টেবিলের ওপর রাখা। রিসিভার তুলতে তুলতে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল শাহেদ। দেয়াল বেয়ে মানিপ্ল্যান্টের লতা উঠে এসেছে দোতলার জানালার গ্রিলে। অন্ধকার নেমে আসায় বেশিদূর দৃষ্টি গেল না, কিন্তু আশেপাশে চড়ুই পাখির কোন চিহ্ন নেই।

'কি দেখছেন আপনি?'

চমকে উঠল শাহেদ, রুস্তম শেরের ভয়াল চোখে চোখ রাখল, 'না…কিছু না।'

রুস্তম শের এগিয়ে এসে জানালা দিয়ে বাইরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলাল। 'এমনি এমনি বাইরে তাকাননি আপনি, কিছু একটা দেখার চেষ্টা করছিলেন।'

পিঠে রুস্তম শেরের শীতল দৃষ্টি অনুভব করল শাহেদ। 'জাহিদ সাহেবের কথা ভাবছিলাম, এতক্ষণে পৌঁছে যাবার কথা,' যথাসম্ভব শান্ত থাকার চেষ্টা করল।

'আশা করি সত্যি কথা বলছেন।' রিভলভারের ডগা দিয়ে রূপকের পায়ের তলায় খোঁচা দিতে সুড়সুড়ি লেগে হেসে উঠল সে, রুস্তম শেরও হাসছে, 'তাহলে শুরু করা যাক।'

মোনা দেখতে পেলে খেপে উঠবে, ভাবল শাহেদ।

ডায়াল ঘুরিয়ে রিসিভারটা কানে চেপে ধরল শাহেদ, ওপাশে রিঙ হচ্ছে। রুস্তম শের ওর পিঠের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, গন্ধে বত্রিশ নাড়ি পাক দিয়ে উঠল।

ওদিক থেকে সাব-ইন্সপেক্টর জানে আলমের কণ্ঠ ভেসে এল, 'পতেঙ্গা থানা, হ্যালো?'

'হ্যালো, আলম, আমি শাহেদ। জাহিদ হাসানের বাড়ি থেকে বলছি। ঢাকা থেকে বলেছিল চেক করে দেখতে। এখানে কেউ নেই। তুমি একটু ঢাকায় খবরটা দিয়ে দিতে পারবে?'

BanglaBook.org

'জী, স্যার, এক্ষুণি খবর দেবার ব্যবস্থা করছি। আপনি কি এখন থানায় ফিরবেন?'

'না। গাড়িটা গোলমাল করছে। কারবুরেটারে গণ্ডগোল। স্টার্ট নিচ্ছে না। আজ আর কিছু করা যাবে না। ভাবছি হেঁটে বড় রাস্তা পর্যন্ত যাব, ওখান থেকে রিকশা নিয়ে বাড়ি ফিরব।'

'ঠিক আছে, স্যার।'

ফোন রেখে রুস্তম শেরের দিকে ফিরল শাহেদ, 'সন্তুষ্ট?'

'দারুণ!' হাসছে রুস্তম শের। 'ব্যাটা কিছুই সন্দেহ করবে না।' রিভলভারের ডগা দিয়ে আবার রূপককে সুড়সুড়ি দিতে শুরু করেছে। হেসে গড়িয়ে পড়ছে বাচ্চাটা, মাঝে মাঝে ছোট্ট হাত বাড়িয়ে রুস্তম শেরের ঘা ভরা মুখটা ঠেলে দিচ্ছে খেলাচ্ছলে। 'বাচ্চাটা কি সুন্দর, তাই না?' ইস্পাতের নলটা দিয়ে রূপকের বগলে আবার খোঁচা দিল রুস্তম শের। হাসতে হাসতে খুন হয়ে যাচ্ছে রূপক।

ঢোক গিলল শাহেদ, 'ওরকম করছেন কেন? যে-কোন মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।'

'দুর্ঘটনা? হাহ্! আপনাদের ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, আমার ক্ষেত্রে কখনোই নয়।' রূপককে উপরে ছুঁড়ে আবার লুফে নিল রুস্তম শের। 'এখন নিচে চলুন, দেখি কিছু খাবার-দাবার পাওয়া যায় কিনা।' এক টানে ফোনের তারটা ছিঁড়ে ফেলল সে।

কিচেন থেকে ওরা বেরিয়ে যেতেই মোনা মিটসেফের ড্রয়ার খুলে ফেলল। কাঠের হাতলওয়ালা স্টেইনলেস স্টিলের ছুরিটা তুলে নিয়ে দরজায় চলে এল। নাহ্, ওরা দোতলায় উঠে গেছে। এক হাতে রুমকিকে তুলে নিয়ে দ্রুত বসার ঘরে ঢুকল মোনা, শব্দ হবার ভয়ে পা থেকে স্যাণ্ডেল খুলে ফেলেছে। এদিক-ওদিক চেয়ে সোফাটাকেই পছন্দ হল। বেড়ালের মত নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে গিয়ে ছুরিটা সোফার গদির ভাঁজে ঢুকিয়ে দিল সে। বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু সোফায় বসা অবস্থায় নিমেষে ছুরিটা তুলে নেয়া যাবে। যদি কোনভাবে রুস্তম শেরকে সোফায় ওর পাশাপাশি বসানো যায়! কাজটা খুব একটা কঠিন হবে না। মেয়ে হয়ে জন্মেছে মোনা, পুরুষের চোখের দৃষ্টি বুঝতে অসুবিধা হয় না। রুস্তম শের ওর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, ছলেবলে সোফায় ওর পাশে বসানো এমন কোন কঠিন কাজ হবে না। ভাবতে গিয়ে বমি পেল মোনার, কিন্তু এটাই বাঁচার একমাত্র উপায়।

জাহিদ আসার আগেই রুস্তম শেরকে খুন করতে হবে। কিছুতেই ওদের দু'জনকে মুখোমুখি হতে দেয়া যাবে না। রুস্তম শের যদি নিজ থেকে লিখতে শুরু করে, জাহিদ কি তারপরেও বেঁচে থাকবে? ওরা দু'জনে একসঙ্গে কিছুতেই বেঁচে থাকতে পারে না। লিখতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে রুস্তম শেরের দেহের ঘা শুকিয়ে আসতে শুরু করবে, পূর্ণ জীবনীশক্তি ফিরে পেতে শুরু করবে সে। কিন্তু জাহিদের ভাগ্যে কি ঘটবে? কোন সন্দেহ নেই জাহিদের শরীরে পচন ধরতে শুরু করবে।

BanglaBook.org

মোনা বেঁচে থাকতে কিছুতেই তা হতে পারে না। এত সহজে কিছুতেই হারবে না মোনা।

রুমকিকে বুকে জড়িয়ে ধরে আবার রান্নাঘরে ফিরে এল, স্যাণ্ডেল জোড়া পরে নিল পায়ে। রুমকি ওকে দরজার দিকে ঠেলছে, নালিশের ভঙ্গিতে অস্ফুটে কিছু বলার চেষ্টা করছে। এক মুহূর্তের জন্যেও রূপককে ছেড়ে থাকতে চায় না মেয়েটা, ভাইয়ের কাছে যেতে চাইছে। ওকে মেঝেতে নামিয়ে দিয়ে কল ছেড়ে থালা বাসন ধুতে বসল মোনা। দাঁতে দাঁত চেপে মনে মনে বলল, তোমার সময় ঘনিয়ে এসেছে রুস্তম শের।

শাহেদ ঢুকল রান্নাঘরে, পেছনে রূপককে কোলে নিয়ে রুস্তম শের। রুমকিকে দেখে ছটফট করে উঠল রূপক। রুস্তম শের ওকে মেঝেতে নামিয়ে দিতেই মুখে দুর্বোধ্য খুশির শব্দ তুলে হামাগুড়ি দিয়ে দু'ভাইবোন পরস্পরের দিকে ছুটে গেল।

'কিছু খেতে দাও তো, মেমসাহেব। খিদে পেয়েছে,' রুস্তম শের বলল।

বছরের চার মাসই জাহিদ আর মোনা এ বাড়িতে থাকে। বসবাসের সব ব্যবস্থাই এখানে আছে, সাভার থেকে বলতে গেলে কিছুই বয়ে আনতে হয় না ওদেরকে। একটু খুঁজতেই কয়েকটা ফুজি নুডল্‌সের প্যাকেট পেয়ে গেল মোনা। দ্রুত হাতে দু'বাটি সুপ বানাল, নিজের জন্যে নিল না। খাবার মুখে তুলতে পারবে না, তা ভাল করেই জানে সে।

সুপ শেষ হবার আগেই পৌঁছে গেল জাহিদ।

বিশ

পাহাড়তলীর একটা স্টেশনারি দোকানে থেমেছিল জাহিদ। এক ডজন এইচ-বি পেন্সিল আর একটা পেন্সিল শার্পনার কিনল। দাম মিটিয়ে গাড়িতে ফিরে শার্পনারে পেন্সিলগুলো ধারাল করে কেটে পাঞ্জাবীর পকেটে রেখে দিল। রুস্তম শের কি আন্দাজ করতে পারবে কেন জাহিদ কিনেছে পেন্সিলগুলো? মনে হয় না। বরং উল্টো খুশিই হবে। রুস্তম শেরের প্রতিটা বই জাহিদ পড়েছে। ও বাড়িতে বসেই লিখেছে, ও বাড়িতে বেশ কিছু পেন্সিল এখনও রয়ে গেছে। তবু জাহিদ সাহস করে পেন্সিলগুলো কিনে ফেলল।

আবুল হাশেম ভুঁইয়ার ফোক্সওয়াগেন রাস্তায় বেশ ঝামেলা করেছে। সাইলেন্সার কোন কাজ করছে না, উৎকট শব্দ হচ্ছে। বেশ ক'বার চামড়ার নিচে অস্বস্তিকর অনুভূতি হয়েছে, জাহিদ এখন জানে ওটা রুস্তম শেরের উপস্থিতির চিহ্ন। রুস্তম শের ওর ভেতর ঢুকে পড়ার চেষ্টা করছে। ফলে যতবার শরীরের ভেতর অস্বস্তিকর অনুভূতি হয়েছে, ততবার গলা ছেড়ে জাহিদ গাইতে শুরু করেছে 'আল্লাহ্ মেঘ দে পানি দে ছায়া দে রে তুই' অথবা 'আমরা দু'জনা স্বর্গ খেলনা গড়িব না ধরণীতে'—যখন যা মুখে এসেছে। রুস্তম শেরকে কিছুতেই বুঝতে দেবে

BanglaBook.org

না ওর পরিকল্পনা।

খোলা জানালায় কর্ণফুলির ভেজা বাতাস আছড়ে পড়ল। জাহিদের গলা শুকিয়ে গেছে। শরীফ চাচার বাড়ির রাস্তাটা পার হতে আরও নার্ভাস হয়ে গেল—কেমন আছে মোনা আর বাচ্চারা? রুস্তম শের ওদের কোন ক্ষতি করেনি তো? সন্ধের পর রাস্তায় লোকজন কমে গেছে, গাড়ির উৎকট শব্দে আকৃষ্ট হয়ে পথচারীরা উৎসুক চোখে তাকাচ্ছে। বড় ইচ্ছে করল গাড়ি থেকে নেমে ওদের কাছে দৌড়ে যেতে, ভাই, আমাকে সাহায্য করুন, নিষ্ঠুর হিংস্র এক খুনী আমার বউ-বাচ্চাকে আটকে রেখেছে!

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডান দিকের কাঁচা রাস্তায় মোড় নিল। কিছুদূর যেতেই ভূত দেখার মত চমকে উঠল। চড়ুই পাখি! হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ চড়ুই পাখি! যেদিকে চোখ যায় পাখি ছাড়া কিছু নেই! গাছপালা-রাস্তা সবকিছু ঢাকা পড়ে গেছে পাখিতে! আশ্চর্য!

কতদূর গেছে ওরা? বাড়ি পর্যন্ত? রুস্তম শের যদি ওদের দেখে ফেলে! কিন্তু রাস্তা ঢাকা পড়েছে পাখিতে, কেমন করে গাড়ি চালাবে জাহিদ? হেঁটে যাওয়া সম্ভব নয়, একে অন্ধকার—তার উপর মাইল দুয়েক রাস্তা। গাড়ি নিয়েই যেতে হবে ওকে, চাকার নিচে ওরা পিষে গেলে করার কিছু নেই। জাহিদকে যেতেই হবে।

ব্রেক থেকে পা তুলে আলতো করে গ্যাস দাবাল। মৃদু আর্তনাদ করে ফোক্সওয়াগেন গুবরে পোকার মত সামনে এগুল। শিউরে উঠে চোখ বন্ধ করে ফেলল জাহিদ, কল্পনায় দেখতে পেল চাকার নিচে ভর্তা হয়ে যাচ্ছে চড়ুইরা, রক্ত আর পালকে মাখামাখি হয়ে গেছে টায়ার চারটে! কিন্তু না, তেমন কিছু তো ঘটল না! চোখ খুলতেই অবাক হয়ে গেল জাহিদ। হেডলাইটের আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে টায়ারের সামনে বেশ কিছুটা জায়গায় সরু দুটো ফিতের মত রাস্তা বেরিয়ে পড়েছে, টায়ার চারটে যেখান দিয়ে যাবার কথা ঠিক সেই জায়গা বরাবর।

দাঁতের ফাঁক দিয়ে চেপে রাখা নিঃশ্বাস শিস কেটে বেরিয়ে এল। দু'ফোঁটা ঘাম গড়িয়ে পড়ল কানের পাশ দিয়ে। 'খোদা!' বিড়বিড় করে উঠল জাহিদ। 'জীবন্মৃতের জগতে চলে এসেছি, খোদা, তুমি আমাকে রক্ষা কর।'

কার্পেটের মত বিছিয়ে থাকা পাখির রাজ্যে মৃদু আলোড়ন দেখা যাচ্ছে। গাড়িটা যতই সামনে এগুচ্ছে ওরা নড়েচড়ে জায়গা করে দিচ্ছে, লম্বা দুটো সরু রেখার মত রাস্তা খুলে যাচ্ছে জাহিদের সামনে। রিয়ার ভিউ মিররে দেখল গাড়িটা এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে নড়েচড়ে পেছনের রাস্তা আবার ঢেকে দিচ্ছে ওরা। মাথার ওপর ঠুকঠুক শব্দ শুনে বোঝা যাচ্ছে গাড়ির ছাদে এসে বসেছে বেশ কিছু চড়ুই। আঁষটে গন্ধে ভারী হয়ে উঠেছে বাতাস। হেডলাইটের আলোয় যতদূর চোখ যায় শুধু পাখি আর পাখি, একদৃষ্টে চেয়ে আছে জাহিদের দিকে।

ভয়ে জাহিদের হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল। হাশেম ভাইয়ের কথা মনে পড়ল, 'সাবধানে থেক, খুব সাবধানে!' পরলোকের ওপর মানুষের কোন ক্ষমতা নেই! ভীষণ ইচ্ছে করল গাড়ি ঘুরিয়ে এখান থেকে বহুদূরে কোথাও পালিয়ে যেতে। চড়ুইরা ওর সামনে রাস্তা খুলে দিচ্ছে, ঠিক একইভাবে বন্ধ করে দিচ্ছে ফেরার

BanglaBook.org

রাস্তা। জাহিদ জানে এই মুহূর্তে ফিরে যাবার কথা চিন্তা করা বাতুলতা।

রাস্তার পাশে পার্ক করা শাহেদের জীপটাও দেখতে পেল না। চাদরের মত ওটাকে ঢেকে আছে চড়ুই পাখিরা। জাহিদ শুধু দেখল কিছুটা জায়গা ঢিবির মত উঁচু হয়ে আছে। ওদিকে মন দেবার মত সময় নেই, খোলা গেট দিয়ে বাড়ির সীমানায় ঢুকে পড়ল জাহিদ। চড়ুই পাখিরা এখনও সামনে খুলে দিচ্ছে রাস্তা।

বাড়ির কাছাকাছি এসে পাখিদের তৈরি কার্পেটটা হঠাৎ শেষ হয়ে গেল। এরপর থেকে সবকিছু স্বাভাবিক, একটা পাখিও দেখা যাচ্ছে না আশেপাশে। অদৃশ্য একটা দেয়াল যেন ওদেরকে বাধা দিচ্ছে। দেয়ালের ওপার থেকে চেয়ে আছে ওরা জাহিদের দিকে।

খালি জায়গায় বেরিয়ে এসে পেছনে তাকাল জাহিদ। একরাশ অন্ধকার উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করছে নিঃশব্দে। প্রাণপণে নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করছে জাহিদ। এটা ধৈর্য হারাবার সময় নয়।

গাড়ি-বারান্দায় পার্ক করা কালো ফোর্ড এসকর্ট অন্ধকারে মিশে দাঁড়িয়ে আছে। এক নজরেই চিনতে পারল জাহিদ। মৃদু একটা গর্জন তুলে ফোক্সওয়াগেনের ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল, দরজা খুলে নেমে এল জাহিদ।

দোতলা বাড়ির প্রতিটি জানালায় আলো জ্বলছে।

সদর দরজায় দাঁড়িয়ে আছে রুস্তম শের। কোলে রুমকি। সূক্ষ্ম এক ধরনের ঈর্ষা বোধ করল জাহিদ। অস্বীকার করতে পারছে না এই লোকটাকে একসময় আদর্শ পুরুষ হিসেবে পুজো করত ও। নিজে যা নয়, চেষ্টা করেও কোনদিন যা হতে পারবে না, রুস্তম শেরকে ঠিক তেমনিভাবে সৃষ্টি করেছিল জাহিদ। ওর স্বপ্নের নায়ক আজ দুঃস্বপ্ন হয়ে বাস্তবে আবির্ভূত হয়েছে, অথচ কেন ওকে সহ্য করতে পারছে না ও?

জাহিদের প্রতি একই সঙ্গে প্রচণ্ড আকর্ষণ আর আক্রোশ অনুভব করছে রুস্তম শের। এই লোকটাই বড় যত্নে ওকে সৃষ্টি করেছে, ওর সব ক্ষমতাই জাহিদের কাছ থেকে পাওয়া। বিনিময়ে জাহিদকে কি কিছুই সে দেয়নি? বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ চাকরি করেও জাহিদ আজ অগাধ টাকার মালিক। সে তো রুস্তম শেরের জন্যেই সম্ভব হয়েছে। অথচ কত সহজে অকৃতজ্ঞ লোকটা ওকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইছে, ঠিক যখন প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

'কেমন আছ, জাহিদ?' রুস্তম শের এত আস্তে কথা বলল যে কান পেতে শুনতে হয়।

'রূপক-রুমকি-মোনা ওরা ঠিক আছে তো?' খুব স্বাভাবিক কণ্ঠে পাল্টা প্রশ্ন করল জাহিদ।

হাসল রুস্তম শের, 'সবাই ভাল আছে, তুমি যতক্ষণ কথা শুনবে কেউ ওদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। লেখার জন্যে তৈরি তো?'

'হ্যাঁ,' জাহিদ লক্ষ করল মুখের ঘায়ের কারণে রুস্তম শেরের গালের লম্বা কাটা দাগটা বোঝা যাচ্ছে না।

'তোমাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে।' তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে আছে রুস্তম শের।

BanglaBook.org

'তোমাকেও তো সুবিধের দেখাচ্ছে না। আয়নায় নিজেকে দেখেছ?'

পেছনে মাথা হেলিয়ে হেসে উঠল রুস্তম শের, 'জানি।'

'তোমার কথামত কাজ করলে ওদেরকে ছেড়ে দেবে তো?' রুস্তম শেরের পেছনে রূপককে কোলে করে মোনা এসে দাঁড়িয়েছে, এই ক'ঘণ্টার মধ্যেই মুখটা শুকিয়ে গেছে, ঘরে যে শাড়ি পরে ছিল সেটাই পরে আছে এখনও। ওর পাশে দাঁড়ানো শাহেদকে চিনতে পেরে বিস্মিত হল জাহিদ।

'হ্যাঁ,' বাঁ হাতে নাকের কাছ থেকে পুঁজ মুছতে মুছতে জবাব দিল রুস্তম শের।

'প্রতিজ্ঞা কর।'

'ঠিক আছে, প্রতিজ্ঞা করলাম। জানো তো প্রতিজ্ঞা ভাঙি না আমি।'

জাহিদ নিঃসন্দেহ হল চড়ুই পাখির উপস্থিতির কথা জানে না রুস্তম শের। ওরা একান্তই জাহিদের।

ওদের দু'জনকে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল মোনা। দু'জনের চেহারায় কোন মিল নেই, অথচ মনে হচ্ছে যেন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মিলটা ঠিক কোথায়, তা বোঝা যাচ্ছে না বলেই কেমন যেন খাপছাড়া দেখাচ্ছে দৃশ্যটা। জাহিদ বেঁটে, শ্যামলা, অতি সাধারণ চেহারা। রুস্তম শের মাথায় ওর চেয়ে কম করেও ফুটখানেক উঁচু, তেমনি প্রস্থ—তার ওপর শরীরময় বিশ্রী ঘা। অথচ মনে হচ্ছে যেন ওরা একই লোক! শিউরে উঠল মোনা।

ওদেরকে কথা বলতে দেখে হঠাৎ মনে হল সোফার গদির ভাঁজে লুকানো ছুরিটার কথা শাহেদকে বলার এটাই সুবর্ণ সুযোগ।

শাহেদের দিকে তাকিয়ে ইশারা করার ঠিক আগের মুহূর্তে জাহিদ কঠিন গলায় ডাকল, 'মোনা!'

জাহিদের কণ্ঠে পরিষ্কার আদেশের সুর, যেন টের পেয়েছে মোনা কি করতে যাচ্ছে, ও চাচ্ছে না মোনা তা করে। অসম্ভব! জাহিদ কিভাবে জানবে মোনার মনের খবর? চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে রইল মোনা, কেমন করে বুঝল জাহিদ!

রুস্তম শের রুমকিকে জাহিদের কোলে তুলে দিল। যেমন করে রুস্তম শেরের গলা জড়িয়ে ধরে খেলা করছিল, জাহিদের কোলে গিয়েও ঠিক তেমনি গলা জড়িয়ে ধরল রুমকি, এতক্ষণ পর বাবাকে দেখে তেমন কোন উচ্ছ্বাস দেখাল না। রুমকি কি দু'জনের মধ্যে কোন পার্থক্য অনুভব করছে না? বুক টিপটিপ করতে লাগল মোনার।

রুমকিকে কোলে করে মোনার পাশ কেটে ঘরে ঢুকল জাহিদ। ওর চোখের ভাষা পরিষ্কার পড়তে পারল মোনা, 'বোকার মত কিছু করে বোসো না, আমার ওপর ভরসা রাখ।' তারপর এক হাতে মোনার কাঁধ জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমি খুব দুঃখিত, মোনা। এরকম কিছু ঘটবে তা আমি চিন্তা করিনি। তোমরা ঠিক আছ তো?'

রুদ্ধ কণ্ঠে ওপর-নিচ মাথা ঝাঁকিয়ে জাহিদের বুকের মধ্যে মুখ লুকাল মোনা,

BanglaBook.org

নিজেকে ছোট্ট মেয়ের মত অসহায় মনে হচ্ছে।

শাহেদের দিকে চেয়ে হাসির ভঙ্গি করল জাহিদ, 'কি, ইন্সপেক্টর সাহেব, এখন বিশ্বাস হচ্ছে তো?'

প্রত্যুত্তরে শাহেদ হাসতে পারল না, শুধু বলল, 'আপনার বহুদিনের পুরানো এক বন্ধুর সঙ্গে আজ কথা হল,' তারপর রুস্তম শেরের দিকে চেয়ে বলল, 'আপনাকেও চেনেন ভদ্রলোক।'

অবাক হল রুস্তম শের। 'আমার তো মনে হয় না জাহিদের কোন বন্ধু আমাকে চেনে,' বলতে বলতে হাঁ করে বাঁ হাতে টান দিয়ে মাড়ি থেকে কালচে একটা দাঁত খুলে নিয়ে এল, দাঁতের গোড়ায় লালচে মাংস লেগে আছে। ঘৃণায় চোখ বন্ধ করে ফেলল মোনা। দাঁতটা বাইরে অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলে দিল রুস্তম শের।

বহুকষ্টে চোখ ফেরাল জাহিদ শাহেদের দিকে, 'কার কথা বলছেন?'

'ডক্টর ম্যাকলিন, লণ্ডন জেনারেল হসপিটালের ভূতপূর্ব সার্জন। আপনাদের দু'জনের কথাই মনে রেখেছেন ভদ্রলোক। কারণ অপারেশনটা খুব স্বাভাবিক ধরনের ছিল না। টিউমার নয়, আপনার মগজ থেকে ইনাকে কেটে বাদ দিয়েছিলেন তিনি,' ইঙ্গিতে রুস্তম শেরকে দেখাল শাহেদ।

'কি বলছেন আপনি?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল মোনা।

ডাক্তারের সঙ্গে ওর কথোপকথনের পুরোটাই খুলে বলল শাহেদ, শুধু হসপিটালে পাখিদের সমবেত আক্রমণের ব্যাপারটা চেপে গেল। কেন যেন মনে হচ্ছে জাহিদ পাখিদের উপস্থিতির কথা রুস্তম শেরের কাছ থেকে গোপন করতে চাইছে। আসার সময় জাহিদ নিশ্চয়ই গেটের কাছে পাখিদের জটলা দেখে এসেছে, অথচ একবারও তা মুখে উচ্চারণ করেনি। অবশ্য ও আসার আগে ওরা উড়েও যেতে পারে। তবে ভেবেচিন্তে চেপে যাওয়াই সাব্যস্ত করল।

শুনতে শুনতে মোনার চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে গেল, জাহিদ ওপর-নিচে মৃদু মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'ধন্যবাদ, শাহেদ সাহেব। অনেক কিছুই পরিষ্কার হয়ে গেল।' তারপর রুস্তম শেরের উদ্দেশ্যে হাসল, 'তুমি একটা ভূত, রুস্তম শের। অদ্ভুত, তবে ভূত।'

'তাতে কিছু যায় আসে না। এখন চল কাজে লেগে পড়ি।' খুব স্বাভাবিক ভাবে সিঁড়ির দিকে ইঙ্গিত করল রুস্তম শের। শাহেদ ওর কাছ থেকেই তীব্র প্রতিক্রিয়া আশা করছিল, অথচ ওকে একটুও উত্তেজিত মনে হচ্ছে না।

চোখের কোণে কিছু একটা নড়ে উঠতে দেখে দ্রুত পাশ ফিরল শাহেদ। জানালার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে ও, আবছা আঁধার ছাপিয়ে পরিষ্কার দেখতে পেল দুটো চড়ুই পাখি উড়ে এসে বসল জানালার ঠিক বাইরে গন্ধরাজ গাছের ডালে। পেছন পেছন উড়ে এল আর একটা। জাহিদের দিকে তাকাতেই ওর চোখের মণি নড়ে উঠতে দেখল শাহেদ। জাহিদও দেখেছে! তারমানে ওর ধারণাই ঠিক, জাহিদ রুস্তম শেরকে জানতে দিতে চায় না।

'কি হল? চল!' তাড়া দিল রুস্তম শের।

BanglaBook.org

হঠাৎ মোনার মুখোমুখি ঘুরে দাঁড়াল জাহিদ। 'মোনা, তোমার কিছু একটা প্ল্যান আছে, তাই না?'

ফ্যাকাসে মুখে চেয়ে রইল মোনা, মুখে উত্তর জোগাল না।

'বলে ফেল, মোনা, সত্যি কথা বল। আমাদের সবার নিরাপত্তা এর সঙ্গে জড়িত,' ধমকে উঠল জাহিদ।

হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গিতে অসহায়ের মত এদিক-ওদিক তাকাল মোনা, তারপর অস্ফুটে বলল, 'সোফার গদির ফাঁকে একটা ছুরি লুকিয়ে রেখেছি। ওরা দু'জন যখন দোতলায় ফোনে কথা বলছিল তখন রান্নাঘর থেকে ছুরিটা নিয়ে ওখানে লুকিয়ে রেখেছিলাম।' মোনা এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না জাহিদ হঠাৎ এভাবে ওকে অপ্রস্তুত করে দেবে, মনে হচ্ছে শেষ ভরসাটুকুও চলে গেল।

'আশ্চর্য!' রাগে চেঁচিয়ে উঠল জাহিদ, রূপক আর রুমকি হঠাৎ চমকে গিয়ে কেঁপে উঠল।

রুস্তম শেরের পচধরা মুখে লম্বা হাসি, যেন খুব উপভোগ করছে স্বামী-স্ত্রীর মতান্তর। শাহেদও জাহিদের এই বোকামিতে বিরক্ত হয়েছে, মোনার প্ল্যানটা কাজে লেগে যেতেও পারত। শাহেদের অস্ত্র আগেই কেড়ে নিয়েছে রুস্তম শের, খালি হাতে এই দানবকে মোকাবেলা করার চিন্তা পাগলামি ছাড়া কিছু নয়।

'শাহেদ সাহেব, আমি ঠিক কাজটাই করেছি,' জাহিদ শক্ত কণ্ঠে বলে উঠল, যেন শাহেদের প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট টের পাচ্ছে সে। তারপর মোনার উদ্দেশ্যে বলল, 'আমার ওপর বিশ্বাস রাখ, লক্ষ্মীটি। ছুরিটা বাইরে ফেলে দিয়ে এস।'

'আপনি কি মনে করছেন কথা শুনলেই আমাদের সবাইকে ছেড়ে দেবে ও?' রাগ চেপে রাখতে পারছে না শাহেদ।

'কখন কি করতে হবে আমি ভাল করেই তা জানি,' মোনার দিকে ফিরল জাহিদ, 'কি হল? যাও!'

রাগে অন্যদিকে ঘুরে দাঁড়াল শাহেদ।

মোনা রূপককে মেঝেতে নামিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে সোফার কাছে এগিয়ে গেল। যেন স্বপ্নের ঘোরে ছুরিটা তুলে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

'সাবধান!' সতর্ক করে দেবার ভঙ্গিতে বলে উঠল রুস্তম শের, হাতের রিভলভার মেঝেতে বসা রূপকের দিকে তাক করা।

সম্মোহিতের মত সেদিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল মোনা। তারপর ধীর পায়ে দরজা পেরিয়ে বাইরে চলে এল। ওকে বেরিয়ে আসতে দেখে ডজন তিনেক চড়ুই পাখি দরজার কাছ থেকে পায়ে পায়ে পিছিয়ে গেল পেছনের অন্ধকারে। কিন্তু উড়ে গেল না।

দু'হাতে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে আছে ছুরিটা, চোখ দুটো দূরের অরণ্য দেখছে—মোনা কি মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে? জাহিদ উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল। কি ভাবছে মোনা? সময় যে বড় কম! উদ্বিগ্ন চোখে রুস্তম শেরকে দেখল জাহিদ। না, ওকে শান্ত দেখাচ্ছে। মনোযোগ দিয়ে দেখছে মোনাকে। ও কি চড়ুই পাখিগুলোকে দেখতে পায়নি?

BanglaBook.org

ছুরিটা অন্ধকারে ছুঁড়ে দিল মোনা, তারপর দু'হাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

'এবার তবে ওপরে যাওয়া যাক!' রুস্তম শেরের কণ্ঠে খুশি চুইয়ে পড়ছে, 'তোমার টাইপ রাইটার তো এখানে নেই, তাই না জাহিদ?'

'এখন টাইপ রাইটার দরকার হবে না, তা তো তুমি ভাল করেই জানো।' পাঞ্জাবীর পকেট থেকে এইচ-বি পেন্সিলগুলো বের করে উঁচু করে ধরল জাহিদ।

হো হো করে হেসে উঠল রুস্তম শের, 'কিছুই দেখছি ভোলনি! আমিও প্রচুর পেন্সিল নিয়ে এসেছি আমার জন্যে। ইন্সপেক্টর সাহেব, যদি কিছু মনে না করেন গাড়ি থেকে পেন্সিলের বাক্সটা একটু নিয়ে আসবেন? সামনের প্যাসেঞ্জার সিটে আছে।' জাহিদের দিকে তাকিয়ে পরিতৃপ্তির হাসি হাসল, 'বেশ বুঝতে পারছি লেখার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছ তুমি, তাই না, বস্?'

'ঠিক ধরেছ।' অস্বাভাবিক রকম উজ্জ্বল দেখাচ্ছে জাহিদের চোখ দুটো, যেন উত্তেজনা চেপে রাখতে পারছে না।

দু'জনে একসঙ্গে হেসে উঠল।

শিউরে উঠে চোখ বন্ধ করে ফেলল মোনা। দু'জনের মধ্য থেকে জাহিদকে আলাদা করে চিনতে কষ্ট হচ্ছে ওর। মুখোমুখি দেখা হবার পর থেকেই ওরা দু'জন যেন একটা ব্যক্তিত্বে পরিণত হতে শুরু করেছে। মোনা আর সহ্য করতে পারছে না। মনে হচ্ছে যেন ওরা সবাই উঁচু পাহাড়ের একেবারে কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে—শুধু গড়িয়ে পড়ার অপেক্ষা।

পেন্সিলের বাক্স আনতে বাইরে এল শাহেদ। ফোর্ড এসকর্টের দরজা খুলে ভেতরে মাথা গলাতেই ভক্ করে পচা দুর্গন্ধ ধাক্কা দিল নাকে। পেন্সিলের বাক্স তুলে নিয়ে মুহূর্তে বেরিয়ে এসে তাজা বাতাসে বুক ভরে শ্বাস নিল।

চড়ুই পাখিরা এসে গেছে! চারদিকে থেকে উড়ে আসছে ওরা, ধীরে ধীরে চাদরের মত ঢেকে দিচ্ছে ঘাস-জমি-গাছপালা! কেউ কোন শব্দ করছে না, মাটিতে নেমেই নিশ্চল হয়ে কোন কিছুর অপেক্ষা করছে। কি চায় ওরা?

একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকেও শাহেদ রহস্য ভেদ করতে পারল না।

'ইন্সপেক্টর সাহেব, দোতলায় উঠে ডান দিকে ছোট্ট একটা ঘর পাবেন। ওটাই জাহিদের লেখার ঘর। ঘরের ডান দিকের কোণে একটা গোল টেবিল আছে, কাঁচের তৈরি একটা পরি সাজানো আছে ওতে। দয়া করে পেন্সিলের বাক্সটা ওই টেবিলটার ওপরে রেখে আসুন।' রুস্তম শের শাহেদের পিঠে রিভলভারের খোঁচা দিল।

শাহেদ প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে জাহিদের দিকে চাইতে সে সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল। অবাক হয়ে রুস্তম শেরের দিকে তাকাল শাহেদ, 'এ বাড়িতে কখনোই আসেননি আপনি। এত কিছু জানলেন কেমন করে?'

BanglaBook.org

'এ বাড়ি আমার বহুদিনের পরিচিত। সশরীরে না হলেও স্বপ্নের মধ্যে বহুবার এখানে এসেছি আমি,' আত্মতৃপ্তির হাসি হাসল রুস্তম শের।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে সবাই জাহিদের লেখার ঘরে একত্রিত হল। ঘরটা ছোট্ট। চারদিকের দেয়াল ঢাকা পড়েছে থরে থরে সাজিয়ে রাখা বই ভর্তি শেলফে। একদিকে একটা জানালা ছিল, কিন্তু জাহিদ বইয়ের আলমারি দিয়ে সেটা বহুদিন আগেই ঢেকে দিয়েছে লেখার সময় বার বার বাইরে চোখ চলে যায় বলে। ফলে দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা আলো জ্বালিয়ে রাখতে হয়। কোণে রাখা ছোট্ট গোল টেবিলটা ছাড়াও ঘরে আছে একটা বিশাল লেখার টেবিল। এতদিন একটা চেয়ার থাকত, আজ টেবিলের দু'পাশে মুখোমুখি দুটো চেয়ার সাজানো।

জাহিদ আর রুস্তম শের বসে আছে চেয়ার দুটোয়। জাহিদের কোলে রুমকি, রুস্তম শের কোলে নিয়েছে রূপককে।

'কতটা সময় আছে আমাদের হাতে, শাহেদ সাহেব?' প্রশ্ন করল জাহিদ। 'পুলিস সন্দেহ করে এখানে চেক করতে কতটা সময় নেবে? ভেবেচিন্তে সত্যি কথা বলবেন, এছাড়া বাঁচার কোন পথ নেই।'

ধৈর্য হারাল মোনা। 'জাহিদ, তুমি কি পাগল হয়ে গেলে? তাকিয়ে দেখ ওর দিক, পচে-গলে মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে! লেখার ব্যাপারে তোমার সাহায্য চায় না সে, তোমার জীবন চুরি করে নিচ্ছে, তোমাকে নিঃশেষ করে দেবে—তুমি বুঝতে পারছ না?'

'শ্-শ্-শ্,' ওকে থামিয়ে দিল জাহিদ, 'আমি জানি ও কি চায়। এছাড়া অন্য কোন পথ খোলা নেই।' মোনার পাশে দাঁড়ানো শাহেদের দিকে তাকাল, 'হ্যাঁ, কতক্ষণ লাগবে বলুন তো?'

একটু চিন্তা করে উত্তর দিল শাহেদ। থানায় ওর ফেরার কথা নয়, ফোন করে সেটা আরও নিশ্চিত করেছে। 'আমার স্ত্রী আমার খোঁজে থানায় ফোন করলে হয়ত ওরা কিছু একটা সন্দেহ করবে। এমনিতে কেউ এখানে আসবে না। তবে রাত বারোটার আগে আমার স্ত্রী বিচলিত হবে না। বহুদিন ধরে পুলিস অফিসারের ঘর করছে, ওর অভ্যাস আছে। অন্তত চার-পাঁচ ঘণ্টার আগে কেউ কিছু সন্দেহ করবে না।'

রুস্তম শের অন্যমনস্কভাবে এক হাতে পেপার ওয়েট লোফালুফি করছে, এদিকে মনোযোগ নেই। জাহিদ জিজ্ঞেস করল, 'পাঁচ ঘণ্টা কি যথেষ্ট সময়?'

চকচক করে উঠল রুস্তম শেরের চোখজোড়া, 'তুমিই ভাল জান।'

জাহিদ হঠাৎ অনুভব করল শুধু লেখা নয়, আরও অনেক কিছু ভাগাভাগি করে নিতে বসেছে ওরা। লেখাটা একটা আনুষ্ঠানিকতা মাত্র, ওর মধ্য দিয়ে এক ধরনের ক্ষমতা বদলাবদলি করবে ওরা, খুব শক্তিশালী এক ক্ষমতা। স্ত্রী আর সন্তানদের জীবনের বিনিময়ে জাহিদকে কিছু একটা দিতে হবে। তৃতীয় নয়ন! রুস্তম শের ওর তৃতীয় নয়নটা চায়!

একদৃষ্টে চেয়ে আছে রুস্তম শের। জাহিদের চামড়ার নিচে আবার সেই

BanglaBook.org

অস্বস্তিকর সুড়সুড়ি। না! রুস্তম শের, যথেষ্ট হয়েছে, আর না! প্রাণপণে প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করল জাহিদ।

'কি লুকাচ্ছ তুমি, জাহিদ?' কঠোর হয়ে উঠতে শুরু করেছে কোটর ছেড়ে কিছুটা বাইরে বেরিয়ে থাকা রুস্তম শেরের কটা দুই চোখ।

'আমিও তোমাকে একই প্রশ্ন করতে পারি,' সমান তেজে জবাব দিল জাহিদ। 'সময় নষ্ট না করে শুরু কর।'

এই প্রথমবারের মত রুস্তম শেরের চোখে অনিশ্চয়তার আভাস দেখতে পেল মোনা। কিছুটা ভয়ও কি ছিল? দু'এক মুহূর্ত মাত্র, তারপরই স্বাভাবিক মূর্তি ধরল রুস্তম শের। 'এখানে ঘাস কাটতে আসিনি আমি। শুরু কর। মেমসাহেব, ইন্সপেক্টর সাহেবকে নিয়ে নিচে চলে যাও। তোমাদেরকে এখানে দরকার নেই। বাচ্চারা এখানে রইল, কোনরকম বাঁদরামি করবে না।'

'কিন্তু...' আপত্তি জানাতে গেল মোনা।

'কোন ভয় নেই,' জাহিদ ওকে থামিয়ে দিল। 'আমি আছি। তাছাড়া তুমি লক্ষ করনি বাচ্চারা ওকে কি রকম পছন্দ করছে?'

'খুব ভালভাবেই লক্ষ করেছি,' প্রচণ্ড ঘৃণা নিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল মোনা। রুস্তম শের, নাকি জাহিদ—কার প্রতি বেশি ঘৃণা হচ্ছে তা বুঝতে পারল না সে।

'ইন্সপেক্টর সাহেব, আপনিও চালাকি করতে যাবেন না যেন। আমার ক্ষমতা সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কোন সন্দেহ নেই!' খিকখিক করে হাসল রুস্তম শের, 'দরজাটা বাইরে থেকে টেনে দিয়ে নিচের ঘরে গিয়ে বসুন আপনারা।'

হলুদ রঙের পেন্সিল তুলে নিল রুস্তম শের, জাহিদও হাত বাড়াল পেন্সিলের উদ্দেশে।

সিঁড়ি বেয়ে নামতে গিয়ে আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ল মোনা, ওর পিঠে ধাক্কা খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে শেষ মুহূর্তে সামলে নিল শাহেদ। মোনা একদৃষ্টে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে।

বাইরে চড়ুইদের রাজত্ব। অন্ধকার ছাপিয়ে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে জানালার কার্নিস থেকে শুরু করে বাইরের সবকিছু ঢাকা পড়েছে কার্পেটের মত বিছিয়ে থাকা চড়ুই পাখিতে।

দৌড়ে এসে জানালায় দাঁড়াল শাহেদ। যতদূর চোখ যায় ঘাস-মাটি-গাছপালা ঢেকে ধূসর মোজাইকের মত নেমে এসেছে চড়ুই বাহিনী! রাতের আকাশ ঢাকা পড়েছে উড়ে আসা চড়ুই পাখিতে।

'হায় আল্লাহ্!' হাঁটু ভেঙে পড়ে যেতে নিল মোনা।

দ্রুত ওকে ধরে ফেলল শাহেদ, 'চুপ! ওপরে ওরা শুনতে পাবে!'

বসার ঘরটা বিশাল, কথা বললে মৃদু প্রতিধ্বনি ওঠে। ঝুঁকি না নিয়ে মোনাকে ধরে ধরে কিচেনে নিয়ে এসে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল শাহেদ তারপর ডক্টর ম্যাকলিনের কাছে শোনা কাহিনীর বাকি অংশ খুলে বলল।

'এর অর্থ কি? ভীষণ ভয় করছে আমার,' মুঠো করা হাত কামড়ে ধরে

BanglaBook.org

নিঃশব্দে কাঁদতে শুরু করল মোনা।

ভীষণ মায়া হল শাহেদের। মনে পড়ে গেল নিজের স্ত্রী-পুত্রের কথা। ওরা এই মুহূর্তে কি করছে?

'আমি জানি না, ভাবী, কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। শুধু এটুকু আন্দাজ করছি, ওদের দু'জনের কেউ পাখিগুলোকে ডেকে এনেছে। যতদূর মনে হয় জাহিদই ডেকেছে। পাখিগুলোকে দেখেও কথাটা চেপে গেছে সে রুস্তম শেরের কাছে।'

'শাহেদ ভাই, জাহিদ কেমন যেন বদলে গেছে।'

'জানি। বুঝতে পেরেছি।'

'জাহিদ রুস্তম শেরকে পুরোপুরি ঘৃণা করে না, বরং মনে হল যেন পছন্দই করে।'

মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল শাহেদ।

একটু পরে উত্তেজনা চাপতে না পেরে আবার ওরা বসার ঘরে ফিরে এল। জানালায় দাঁড়িয়ে বাইরের অত্যাশ্চর্য দৃশ্য দেখতে থাকল।

গাড়ি-বারান্দা, সুরকি বিছানো রাস্তা, ঘাসে ঢাকা খালি জমির এক ইঞ্চিও বাদ নেই, শুধু পাখি আর পাখি। ফোক্সওয়াগেনটা পাখিদের নিচে হারিয়ে গেছে, উঁচু ঢিবিটার নিচে একটা গাড়ি রয়েছে তা বোঝার সাধ্য নেই। কিন্তু আশ্চর্য, রুস্তম শেরের কালো ফোর্ড এসকর্ট সম্পূর্ণ মুক্ত, একটা পাখিও বসেনি গাড়িটার গায়ে। গাড়িটার চারপাশ থেকে ঘিরে আছে ওরা, কিন্তু একটা অদৃশ্য সীমারেখার বাইরে থেকে। ফোর্ড এসকর্টের চারধারে ফুটখানেক জায়গা একদম খালি।

'স্বপ্ন দেখছি না তো! হয়ত জেগে উঠে দেখব সবকিছু আগের মতই আছে!' অস্ফুটে অভিযোগ জানানর ভঙ্গিতে বলে উঠল মোনা। একটা চড়ুই পাখি উড়ে এসে জানালার কাঁচে ধাক্কা খেলে চমকে উঠে পিছিয়ে এল। শাহেদের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'কি করব এখন আমরা?'

'সবচেয়ে কঠিন কাজটা,' আস্তে আস্তে বলল শাহেদ, 'আমরা অপেক্ষা করব।'

সময় যেন আর কাটছে না। রাত্রির অন্ধকার শুধু ঘন থেকে আরও ঘন হয়ে উঠল। বাইরে চড়ুইদের শেষ ঝাঁকটা এসে পৌঁছেছে। মোনা আর শাহেদ স্পষ্ট টের পাচ্ছে বাড়ির ছাদে এসে বসেছে ওরা। অথচ কেউ টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করছে না। ভৌতিক অপার্থিব নীরবতা বিরাজ করছে পুরো এলাকায়। মোনা অবাক হল, কোটি কোটি পাখি এসে জমায়েত হচ্ছে অথচ আশেপাশের কেউ লক্ষ করছে না! বাঁ পাশের টিলাটার ওপারেই শরীফ চাচার বাড়ি, অবশ্য রাস্তা দিয়ে যেতে হলে অনেকটা ঘুরে মেইন রোড ধরে যেতে হয়। ওরাও কি কিছু দেখতে পাচ্ছে না? শরীফ চাচার মৃত্যুর পর চাচী কি অন্য কোথাও গিয়ে থাকছেন, নাকি রাতের অন্ধকারে কেউ কিছু লক্ষ করছে না?

মোনার মন পড়ে আছে দোতলার ছোট্ট ঘরটায়। ওখান থেকে কোন শব্দ ভেসে আসছে না। এমনকি বাচ্চাদের কান্না বা হাসির শব্দ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে

BanglaBook.org

না। ওরা কি ঘুমিয়ে পড়েছে? নাকি রুস্তম শের খুন করেছে ওদের সবাইকে! বার বার চেষ্টা করেও মোনা রুস্তম শেরের পকেটে রাখা রূপালী রঙের চকচকে ক্ষুরটার কথা ভুলতে পারছে না।

দু'কাপ চা বানিয়ে নিয়ে এল মোনা। অন্তত একটা কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকা যাবে কিছুক্ষণ। মুখোমুখি দুটো সোফায় বসে কাপে চুমুক দিল ওরা।

শাহেদ হঠাৎ বলে উঠল, 'যত সময় যাবে রুস্তম শের সুস্থ হয়ে উঠতে থাকবে, আর জাহিদ অসুস্থ হতে শুরু করবে, তাই না?'

চমকে ওঠায় মোনার কাপ থেকে চা ছলকে পড়ল। আশ্চর্য, বাচ্চাদের চিন্তায় মগ্ন থেকে এমন জরুরি ব্যাপারটাই ভুলতে বসেছিল সে!

বাইরে পাখিরা নিঃশব্দে অপেক্ষা করছে।

পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে—অসহায়ের মত ভাবল মোনা—আর কোন আশা নেই। সব শেষ!

ঠিক সেই মুহূর্তে বাইরে কোথায় যেন শক্তিশালী বাতাস পাক খেতে শুরু করল। বাতাসের শোঁ শোঁ গর্জনে চমকে উঠে দাঁড়াল ওরা। ঝড় উঠল নাকি! জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই চেঁচিয়ে উঠল মোনা, 'শাহেদ ভাই…!' চোখ দুটো কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে, পেছন দিকে উল্টে পড়ে যাচ্ছে ও, দু'হাতে নিজের গলা চেপে ধরেছে!

ভাঙা বাঁশির কর্কশ সুরের মত শিস শোনা যাচ্ছে উপরতলায়। পরমুহূর্তেই গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল রুস্তম শের, 'জাহিদ! কি করছ তুমি, জাহিদ? কি করছ তুমি?' ধাতব শব্দ শোনা গেল। তারপর একসঙ্গে কেঁদে উঠল বাচ্চারা।

বাইরে তখন রাতের আঁধার কেটে মাটি ছেড়ে একসঙ্গে শূন্যে ডানা মেলেছে লক্ষ লক্ষ চড়ুই।

একুশ

শাহেদ আর মোনা দরজা টেনে বেরিয়ে যেতেই নোটপ্যাড টেনে নিল জাহিদ, হাতে পেন্সিল।

'বিয়ে-বাড়ির দৃশ্যটা দিয়ে শুরু করব,' রুস্তম শেরের উদ্দেশ্যে বলল সে।

'হ্যাঁ, ওখান থেকেই শুরু হবার কথা,' আগ্রহ ফুটে উঠেছে রুস্তম শেরের কণ্ঠে।

সাদা কাগজের গায়ে পেন্সিলটা বসাবার আগে একটু অপেক্ষা করল জাহিদ। প্রথম আঁচড় কাটার ঠিক আগের এই মুহূর্তটুকু সবসময়ই উপভোগ করে ও।

তারপর ঝুঁকে পড়ে লিখতে শুরু করল। ধীরে ধীরে লেখার গতি বাড়তে থাকল। পুরো চল্লিশ মিনিট পর থামল জাহিদ। মানসপটে পরিষ্কার ফুটে উঠেছে বিয়ে-বাড়ির দৃশ্যটা। বঙ্গভবনে মহামান্য প্রেসিডেন্টের মেয়ের বিয়ের আসর।

BanglaBook.org

গালকাটা জয়নাল মিশে গেছে সুবেশী অতিথি-অভ্যাগতদের ভিড়ে। রোস্ট করা আস্ত খাসীর পেটে লুকানো আছে মেশিন পিস্তল। মাইল দুয়েক দূরে হেলিকপ্টারে অপেক্ষা করছে সেনাবাহিনীর বিদ্রোহী মেজর জেনারেল এবং তার অনুগত তিনজন উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার। সিগন্যালের জন্যে অপেক্ষা করছে সবাই, একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়বে প্রেসিডেন্ট এবং বিয়ে উপলক্ষে হাজির তাঁর সব সাঙ্গপাঙ্গদের ওপর।

'একটা ফাইভ ফাইভ দাও তো,' পেন্সিল নামিয়ে রেখে রুস্তম শেরের দিকে হাত বাড়াল জাহিদ।

একটু অবাক হলেও পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল, এক আঙুলে মুখটা খুলে একটু ঝাঁকি দিতেই দুটো সিগারেট বেরিয়ে এল। 'তুমি তো সিগারেট ছেড়ে দিয়েছ বহুদিন,' বিস্ময় প্রকাশ করল রুস্তম শের।

'কেন যেন ইচ্ছে করল হঠাৎ।' রুস্তম শেরের বাড়িয়ে ধরা হাত থেকে ম্যাচ নিয়ে সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করল জাহিদ। প্রথমবার টান দিতেই বিশ্রী স্বাদে ভরে গেল মুখের ভেতরটা, খুকখুক করে কেশে উঠল।

নোটপ্যাডটা রুস্তম শেরের দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, 'এবার তোমার পালা।'

রুস্তম শের গল্পটা জানে, পুরোটা পড়ার দরকার নেই। তাই শুধু জাহিদের লেখা শেষ প্যারাগ্রাফটা পড়ল সে। একটা সিগারেট ধরিয়ে ভীরু চোখে জাহিদের দিকে চাইল রুস্তম শের।

'আমার ভয় করছে, বস্!' একদম অন্যরকম দেখাচ্ছে ওকে। একটুও ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে না, দু'চোখে নিখাদ শঙ্কা।

হৃদয়ের গভীরে কোথায় যেন ওর জন্যে স্নেহ জেগে উঠল। জাহিদের কোন ভাই-বোন নেই, ও জানে না ভাই-বোনের মায়া কি রকম। হঠাৎ করে মনে হল এটাই কি ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের ভালবাসা?

না। শক্ত হাতে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করল জাহিদ। এ হতে পারে না।

'কোন ভয় নেই। চেষ্টা কর, পারবে।' ওকে অভয় দেবার ভঙ্গিতে বলল জাহিদ।

মনোযোগ দিয়ে আরও দু'বার শেষ প্যারাগ্রাফটা পড়ল রুস্তম শের। তারপর ধীরে ধীরে লিখতে শুরু করল।

'জয়নাল খাবার টেবিলের আশেপাশে...' একটু থেমে আবার লিখল। 'ঘোরাঘুরি করছে।' আবার কিছুক্ষণ বিরতি, তারপর লিখল 'সময় ঘনিয়ে আসছে, এক্ষুণি অতিথিদের ডাক পড়বে খাবার টেবিলে। খাসীর রোস্টের কাছাকাছি থাকতে হবে ওকে।'

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সদ্য লেখা বাক্য তিনটে পড়ল রুস্তম শের। তারপর নোটপ্যাডটা জাহিদের দিকে ঠেলে দিল, দু'চোখে নববধূর লজ্জা।

BanglaBook.org

চোখ বুলিয়ে মাথা নাড়ল জাহিদ, 'এই তো, হচ্ছে।' নিজের অজান্তেই ডান হাতটা ঠোঁটের বাঁ কোণে উঠে এল, জ্বালা করছে জায়গাটা। আঙুল বুলাতে টের পেল তাজা একটা ঘা দেখা দিয়েছে ঠোঁটের কোণে। একটু লক্ষ করতেই দেখল একই জায়গায় রুস্তম শেরের যে ঘা'টা ছিল, তা অদৃশ্য হয়েছে।

ঘটতে শুরু করেছে! পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে!

শিউরে উঠল জাহিদ।

উপুড় হয়ে মনোযোগ দিয়ে লিখছে রুস্তম শের।

আধঘণ্টা পর থামল। পিঠ টান করে জ্বলজ্বলে চোখে জাহিদের দিকে তাকাল, 'আশ্চর্য! আমি লিখতে পারছি! তোমার চেয়ে কোন অংশেই খারাপ হচ্ছে না।'

নোটপ্যাডটা টেনে নিয়ে পড়তে শুরু করল জাহিদ। নয় পৃষ্ঠা লিখেছে রুস্তম শের। তিন পৃষ্ঠা পড়ার পর যা খুঁজছিল তা পেয়ে গেল জাহিদ।

'খসখসে শব্দ শুনে চড়ুই শক্ত হয়ে মেশিন পিস্তলে চেপে চড়ুই বসল জয়নালের দু'হাতের আঙুল। টেবিলের চারপাশ থেকে চড়ুই সবাই ছিটকে সরে যাচ্ছে চড়ুই দূরে। জরি আর মহার্ঘ্য সিল্কের চড়ুই পোশাকে ঘষা লেগে চড়ুই অদ্ভুত খসখসে শব্দ উঠছে। বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কেটে যেতে চড়ুই চিৎকার করে উঠল মহিলারা।'

রুস্তম শের টের পায়নি! বার বার অকারণে 'চড়ুই' শব্দটা লিখে যাচ্ছে অথচ একটুও টের পাচ্ছে না সে!

উড়ে এসে ছাদের ওপর বসছে চড়ুইরা, খসখসে শব্দ হচ্ছে। রূপক আর রুমকি ঘুমিয়ে পড়ার আগে বার বার ছাদের দিকে তাকাচ্ছিল। ওরাও বুঝতে পারছে অথচ রুস্তম শের কিচ্ছু টের পাচ্ছে না!

রুস্তম শেরের কাছে পাখিদের কোন অস্তিত্ব নেই।

নিঃশ্বাস বন্ধ করে পড়ে যেতে থাকল জাহিদ। শেষ প্যারাগ্রাফে ঘটনা রূপ নিতে শুরু করেছে।

'গালকাটা জয়নালের চারপাশে শুধু পাখি আর পাখি। ওদের জন্যেই অপেক্ষা করছিল সে। দশ বছর ধরে ওদের সঙ্গে উড়ছে সে। আবার উড়তে শুরু করেছে পাখিরা।'

জাহিদ মুখ তুলে চাইতে রুস্তম শের আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন হয়েছে?'

'খুব ভাল। দারুণ। তুমি তো সেটা জানোই।'

'তা-ও তোমার মুখ থেকে শুনতে ভাল লাগে।'

'শুধু লেখা নয়, তোমার চেহারাও অনেক ভাল দেখাচ্ছে,' জাহিদ শান্তভাবে বলল।

কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি।

BanglaBook.org

রুস্তম শেরের শরীরের ক্ষতগুলো মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে। পাতলা গোলাপী চামড়া জোড়া নিতে শুরু করেছে ঘাগুলোকে হটিয়ে দিয়ে। পচে যাওয়া ত্বকের তলা থেকে ভেসে উঠেছে ভুরুর চুল। শার্টের কলারে গড়িয়ে পড়া পুঁজ শুকিয়ে শক্ত হয়ে উঠেছে।

আঙুলের ডগায় নিজের গালে সদ্য গজানো ঘা দুটো স্পর্শ করল জাহিদ। তারপর চোখের সামনে ধরল আঙুলটা। ভেজা। রস বের হতে শুরু করেছে। কপালের কাটা জায়গাটা স্পর্শ করল জাহিদ। আশ্চর্য! নিখুঁত নিভাঁজ ত্বক—অদৃশ্য হয়েছে কাটা দাগটা।

হাতে ঘড়ি নেই, ক'টা বাজে বুঝতে পারল না জাহিদ। মধ্যরাতের এখনও অনেক দেরি। তবে তাতে কিছু আসে যায় না।

জাহিদের ভাবান্তর লক্ষ করল রুস্তম শের, 'তুমি কি ক্লান্ত? একটু বিশ্রাম নিতে পার ইচ্ছে করলে।'

'তাই ভাবছি।' উঠে দাঁড়াল জাহিদ, 'তুমি লিখতে থাক।'

নবউদ্যমে লিখতে শুরু করল রুস্তম শের, জীবনীশক্তির অভাব নেই। জাহিদের দিকে খেয়াল নেই, সব আগ্রহ কাগজ আর পেন্সিলের দিকে। জাহিদ পেন্সিলের বাক্স রাখা টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেল। শার্পনার বের করে মনোযোগ দিয়ে পেন্সিল কাটল। তারপর ফিরে আসতে আসতে পকেট থেকে আবুল হাশেম ভুঁইয়ার দেয়া বাঁশিটা আলগোছে তুলে নিয়ে মুঠোর মধ্যে লুকিয়ে ফেলল। চেয়ারে বসতে বসতে তীক্ষ্ণ চোখে রুস্তম শেরকে লক্ষ করল। কিছু সন্দেহ করেনি সে। আপনমনে লিখে চলেছে!

সময় হয়ে গেছে! কোন সন্দেহ নেই এটাই উপযুক্ত সময়! শুধু ভয় হচ্ছে সাহসে কুলোবে কিনা।

হৃদয়ের গহনে কোথায় যেন এক ধরনের প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে। লেখাটা শেষ করার জন্যে আকুলি-বিকুলি করছে ভেতরটা। কিন্তু একই সঙ্গে বিচ্ছেদের বেদনা অনুভব করছে জাহিদ। ধীরে ধীরে বিযুক্ত হয়ে যাচ্ছে আলাদা দুটো সত্তা। ও আর রুস্তম শের নয়।

শক্ত করে বাঁশিটা মুঠোয় চেপে ধরে সামনে ঝুঁকে লিখতে শুরু করল জাহিদ।

'আমিই আবাহনকারী।'

মাথার ওপর ছাদে পাখিদের নড়াচড়া থেমে গেল।

'আমিই ওদের চালিকাশক্তি।'

বাইরে মৃত্যুর মত নীরবতা। মেঝেতে শুইয়ে রাখা ঘুমন্ত রূপক আর রুমকির নিষ্পাপ মুখের দিকে চেয়ে শক্তি সংগ্রহ করার চেষ্টা করল জাহিদ। আর মাত্র তিনটে শব্দ! তারপরেই বহু আকাঙ্ক্ষিত মুক্তি! রুস্তম শের, মন দিয়ে লিখে যাও তুমি, মুখ তুলে দেখ না! খোদা, ওকে আর কিছুক্ষণের জন্যে ব্যস্ত রাখ তুমি!

কাঁপা কাঁপা হাতে বড় বড় অক্ষরে লিখল:

'পাখিরা আবার উড়ছে!'

বাইরে ঝড়ের মত শব্দ উঠল। লক্ষ লক্ষ চড়ুই পাখি ডানা ঝাপটে শূন্যে

BanglaBook.org

উড়াল দিল। ঠিক সেই মুহূর্তে খুলে গেল জাহিদের তৃতীয় নয়ন। চড়ুই পাখি ছাড়া ওর জগতে আর কিছুর অস্তিত্ব নেই।

ঝট করে মুখ তুলে তাকাল রুস্তম শের, দু'চোখে সন্দেহ আর সতর্কতা।

লম্বা শ্বাস নিয়ে বাঁশিতে ফুঁ দিল জাহিদ।

'জাহিদ! কি করছ তুমি, জাহিদ? কি করছ তুমি?'

হাহাকার করে উঠল রুস্তম শের। থাবা দিয়ে কেড়ে নিতে চাইল বাঁশিটা। জাহিদের ঠোঁট কেটে দিয়ে ফটাশ করে ভেঙে গেল কাঠের তৈরি বাঁশি। ঘুম ভেঙে যাওয়ায় চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করল রুমকি, রূপকও অবিলম্বে যোগ দিল।

বাইরে চড়ুইদের ডানা ঝাপটানর শব্দ গর্জনে পরিণত হয়েছে।

পাখিরা উড়তে শুরু করেছে।

বাচ্চাদের কান্না শুনে পাগলের মত সিঁড়ির দিকে দৌড়াতে শুরু করেছে মোনা। জানালার দৃশ্য দেখে কিছুক্ষণের জন্যে চলৎশক্তি হারিয়ে ফেলল শাহেদ। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ পাখি উড়ে আসছে এদিকে, কাঁচ ঢাকা জানালার ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত চড়ুই পাখি ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না—যেন কেউ চড়ুই পাখির তৈরি একটা চাদর ছুঁড়ে দিয়েছে জানালাগুলো লক্ষ্য করে। সশব্দে আছড়ে পড়ছে কাঁচের ওপর ছোট্ট ছোট্ট পালকঢাকা নরম শরীরগুলো। ভোঁতা শব্দ উঠছে কাঁচের ধাক্কা খেয়ে।

'ভাবী!' চিৎকার করে উঠল শাহেদ, 'মাথা নিচু করে বসে পড়ুন! ভাবী!'

মোনা থামল না, ওর বাচ্চারা কাঁদছে! কার সাধ্য মোনাকে থামায়? হোঁচট খেতে খেতে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করেছে। ফাটল ধরতে শুরু করেছে জানালার কাঁচে। প্রাণপণে দৌড় দিল শাহেদ। কাঁচ ভেঙে কয়েক হাজার চড়ুই ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতর। ঠিক তক্ষুণি মোনাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে লাফিয়ে মেঝেতে শুয়ে গড়িয়ে যাবার চেষ্টা করল শাহেদ। ঘরময় উড়ে বেড়াচ্ছে কয়েক হাজার চড়ুই, আরও কয়েক হাজার জানালা গলে ঢুকে পড়েছে। মুহূর্তের মধ্যে পাখির ভিড়ে ঘরে তিল ধারণের জায়গা রইল না।

উপুড় হয়ে মোনার পিঠের ওপর শুয়ে পড়ে ওর শরীরটা ঢেকে দিল শাহেদ। একই সঙ্গে ওকে টানতে টানতে সোফার নিচে ঠেলে দিল, নিজেও শুয়ে পড়ল ওর পাশাপাশি। পাখা ঝাপটানর খসখসে শব্দ আর কিচিরমিচির ধ্বনিতে কানে তালা লাগার উপক্রম হল। ঘরের অন্যান্য জানালার কাঁচও ভেঙে পড়ছে ঝনঝন শব্দ তুলে। সোফার তলা থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখার চেষ্টা করল শাহেদ—সাদা আর বাদামি পালকে ঢাকা শরীরগুলোর নড়াচড়া ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না।

ডানার ধাক্কা লেগে টেবিল আর শেলফের ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ছে পিতলের ফুলদানি, শো পিস, অ্যাশট্রে। ঝনঝন শব্দ তুলে ভেঙে যাচ্ছে কাঁচের জিনিসপত্র। দেয়ালে ঝোলানো ক্যালেণ্ডার আর ফ্রেম করা ছবিগুলো খসে পড়ছে। ঘরময় উড়ছে ম্যাগাজিন আর বইয়ের ছেঁড়া পৃষ্ঠা। রান্নাঘর থেকে ভেসে আসছে কাঁচের প্লেট-গ্লাস ভাঙার শব্দ, মেঝেয় গড়াগড়ি খাচ্ছে হাঁড়ি-পাতিল।

BanglaBook.org

ওপরে কেঁদে খুন হয়ে যাচ্ছে বাচ্চারা, চিৎকার করছে মোনা, 'ছেড়ে দিন আমাকে!' শাহেদের হাতের বাঁধন ছাড়াবার জন্যে ছটফট করছে, 'আমার বাবু সোনারা! আমাকে যেতে দিন! আমি ওদের কাছে যাব! ছেড়ে দিন আমাকে!'

প্রাণপণে মোনাকে মেঝের সঙ্গে চেপে ধরে রাখার চেষ্টা করছে শাহেদ। আঁচড়ে-কামড়ে ওকে ক্ষতবিক্ষত করে দেবার চেষ্টা করছে মোনা, চেঁচাচ্ছে গলা ফাটিয়ে।

'উঃ!' আর্তনাদ করে উঠল শাহেদ, ওর হাতে দাঁত বসিয়ে দিয়েছে মোনা। বাঁধন শিথিল হতেই গড়িয়ে সোফার নিচ থেকে বেরিয়ে যেতে চাইল মোনা। মুহূর্তে ওর ওপর একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ল কয়েকশো চড়ুই। শাড়ির ভাঁজে, চুলের ভেতর ডানা ঝাপটাচ্ছে বিপুল বেগে। পাগলের মত দু'হাতে ঝাপটা মেরে পাখিগুলোকে তাড়ানর বৃথা চেষ্টা করল মোনা। শাহেদ ওর কোমর জড়িয়ে ধরে আবার টেনে নিয়ে এল সোফার তলায়। এক পলকের জন্যে চোখে পড়ল সিঁড়ির ওপর কালো মেঘের মত উড়ে চলেছে চড়ুই পাখির ঝাঁক, পৌঁছে গেছে দোতলায়।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে রুস্তম শের, চঞ্চল চোখে চারদিকে তাকাচ্ছে। গলা ফাটিয়ে কেঁদে চলেছে রূপক আর রুমকি। বুক শেলফ দিয়ে ঢাকা জানালাটার কাঁচ ভেঙে পড়ল, দেয়ালের ওপারে ধপ্‌ধপ্‌ করে কিছু আছড়ে পড়ছে। নিচ থেকে জিনিসপত্র ভাঙার শব্দ ভেসে আসছে, মনে হল যেন চিৎকার করে উঠল মোনা। চড়ুইদের পাখা ঝাপটানর শব্দ আর কিচিরমিচির ধ্বনি স্পষ্ট হয়ে উঠছে প্রতিমুহূর্তে।

'বন্ধ কর, জাহিদ!' আর্তনাদ করে উঠল রুস্তম শের। 'বন্ধ কর! যা-ই শুরু করে থাক না কেন, বন্ধ কর! দোহাই লাগে বন্ধ কর!'

টেবিলের ওপর থেকে রিভলভারটা তুলে নেবার জন্যে হাত বাড়াল রুস্তম শের, ঠিক সেই মুহূর্তে সদ্য কাটা পেন্সিলের তীক্ষ্ণ ডগা ছুরির মত ওর গলায় বসিয়ে দিল জাহিদ।

জন্তুর মত চিৎকার করে উঠল রুস্তম শের, ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। বাঁ হাতে একটানে পেন্সিলটা গলা থেকে খুলে নিয়ে এল সে, নদীর মত রক্ত বইছে। 'কি হচ্ছে এসব? কি করছ তুমি?' পাখিদের শব্দ শুনতে পাচ্ছে রুস্তম শের, ভীত বালকের মত বার বার বন্ধ দরজার দিকে দেখছে। জাহিদ এই প্রথম ওর চোখে ভয়ের চিহ্ন দেখতে পেল। উল্টে গেছে দাবার ছক।

'গল্পের শেষ দৃশ্যে চলে এসেছি আমরা, রুস্তম শের,' ধীরে ধীরে বলল জাহিদ, 'শেষ লাইনটা লিখে ফেলেছি।'

'ঠিক আছে,' উদ্‌ভ্রান্তের মত এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে রুস্তম শের, 'শেষটা তবে সবার জন্যেই হোক!'

এক হাতে পয়েন্ট ফোর ফাইভ আর অন্য হাতে তীক্ষ্ণধার পেন্সিল তুলে বাচ্চাদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল রুস্তম শের।

BanglaBook.org

পুরানো কম্বল দিয়ে ঢাকা ছিল সোফাটা যাতে ধুলো পড়ে নষ্ট না হয়ে যায়। বাড়িতে ঢুকে মোনা কম্বলটা ভাঁজ করে একদিকের হাতলের উপর রেখে দিয়েছিল। সোফার নিচ থেকে হাত বাড়িয়ে শাহেদ কম্বলটা খোঁজার চেষ্টা করল। সঙ্গে সঙ্গে 'ধ্যাত্তেরিকা' বলে অস্ফুটে গুঙিয়ে উঠে টেনে নিল হাতটা, লক্ষ লক্ষ সুঁই ফোটার অনুভূতি হাতের চামড়ায়।

এদিকে মোনা এখনও ধস্তাধস্তি করছে সোফার নিচ থেকে বেরিয়ে পড়ার জন্যে। চড়ুইদের কিচিরমিচির আর পাখা ঝাপটানর শব্দে কানে তালা লাগার উপক্রম হয়েছে, প্রচণ্ড গোলমাল ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না। বাচ্চাদের কান্নার শব্দও চাপা পড়ে গেছে। হাঁচড়ে পাঁচড়ে সোফার তলা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে মোনা।

'ভাবী! দাঁড়ান!' শাহেদ ওকে টেনে ধরার চেষ্টা করল। কিন্তু কে শোনে কার কথা! মোনার বাচ্চারা কাঁদছে, পৃথিবীতে এমন কেউ নেই ওকে এ মুহূর্তে আটকায়। ডান হাতে মোনার কোমর জড়িয়ে ধরে থাকল শাহেদ, দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করার চেষ্টা করছে হাতের পিঠে সুঁই ফোটানর মত যন্ত্রণা। বাইরে বেরিয়ে আসতেই ঝাঁপিয়ে পড়েছে চড়ুইরা। রান্নাঘরে প্রচণ্ড শব্দ তুলে উল্টে পড়ল কোন ফার্নিচার, সম্ভবত ছোট মিটসেফটা। কাণ্ডটা ঘটাতে কতগুলো চড়ুই পাখির দরকার হয়েছে ভাবতে গিয়ে মাথাটা ঘুরে উঠল।

সোফার নিচ থেকে বেরিয়ে পড়তে বাধ্য হল শাহেদ, মোনা আসুরিক শক্তিতে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে—একই সঙ্গে পাগলের মত চিৎকার করতে করতে দু'হাতে মাথা ঢেকে চড়ুইদের ছুঁচাল শক্ত ঠোঁটের আক্রমণ থেকে বাঁচার চেষ্টা করছে। এক হাতে ওকে শক্ত করে ধরে থেকে অন্য হাতে কম্বলটা টেনে নিল শাহেদ। ভাঁজ খুলে দ্রুত কম্বলের নিচে ঢুকে পড়ল, মোনাকেও জোর করে কম্বলের নিচে ধরে রাখল। গোটা ছয়েক চড়ুইও ঢুকে পড়েছে ওদের সাথে। পাখার ঝাপটা লেগে শাহেদের ডান গাল জ্বলে উঠল। মাথার তালুতে ঠোক্কর বসিয়েছে আর একটা। বাঁ হাতে ঝাপটা মারতেই একটা পাখি লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে। মোনার শাড়ির ভেতর ঢুকে পড়েছে গোটাকতক, পাগলের মত লাফাচ্ছে সে।

মোনাকে শক্ত করে ধরে থেকে ওর কানের কাছে চিৎকার করল শাহেদ, 'ভাবী! আমরা হাঁটব। কম্বল মাথায় দিয়ে হেঁটে যাব আমরা! দৌড়াবার চেষ্টা করবেন না। দৌড়ালে আমি কিন্তু ল্যাঙ মেরে ফেলে দেব!' মোনার চুলের ভেতর ঢুকে পড়েছে একটা চড়ুই, আঁচড়ে-খামচে মেরে ফেলার চেষ্টা করছে ও পাখিটাকে। শাহেদের কথা শুনতে পেল কিনা বোঝা গেল না। মৃগী রোগীর মত কাঁপছে ওর শরীর, পশুর মত গোঙাচ্ছে। শাহেদ মোনার দু'কাঁধ ধরে ঝাঁকাল, 'ভাবী, আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? শুনতে পেলে মাথা ঝাঁকান, প্লীজ!'

হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল মোনা, মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল। শিথিল হয়ে গেছে শরীরের মাংসপেশী।

BanglaBook.org

ভালভাবে কম্বল ঢাকা দিয়ে সোফার নিচ থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে এল ওরা। মোনাকে ধরে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল শাহেদ, তারপর হাঁটতে শুরু করল। দু'হাতে শক্ত করে মোনাকে নিজের শরীরের সঙ্গে চেপে ধরে আছে, বলা যায় না যে-কোন মুহূর্তে ছুট লাগাতে পারে। আন্দাজে সিঁড়ির দিকে এগোল।

এ বাড়িতে বসার ঘরটাই সবচেয়ে বড় আর খোলামেলা। পুরানো দিনের স্থাপত্য, উঁচু কড়িবরগা। অথচ মনে হচ্ছে শ্বাস নেবার মত এক বিন্দু বাতাসও নেই কোথাও। পাখিদের দুর্গন্ধে টেকা দায়। দম বন্ধ হয়ে এল কম্বলের নিচে।

মনে হল যেন অনন্তকাল পরে সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছল ওরা। ধীরে ধীরে সাবধানে ওপরে উঠতে শুরু করল। মাথার ওপরের কম্বল আর সিঁড়ির ধাপগুলো সাদা হয়ে গেছে পাখির বিষ্ঠা আর খসে পড়া পালকে। সিঁড়ির মাঝামাঝি আসতেই গুলির শব্দ হল দোতলায়, শাহেদ এখন শুনতে পাচ্ছে বাচ্চাদের বুকফাটা কান্না।

রুস্তম শের রূপকের দিকে রিভলভার তাক করতেই জাহিদ চোখের পলকে ভারী কাঁচের পেপার ওয়েটটা তুলে নিয়ে ওর কব্জি লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারল। বন্ধ ঘরে বাজ পড়ার মত শব্দ তুলে গুলি বেরিয়ে এল, রূপকের বাঁ পায়ের ঠিক আধ ইঞ্চি দূরে মেঝের চল্টা উঠে ছিটকে পড়ল। ফুসফুস ফাটিয়ে কাঁদছে বাচ্চারা, আত্মরক্ষার স্বাভাবিক প্রবণতায় জড়িয়ে ধরে আছে ওরা পরস্পরকে।

পরমুহূর্তেই জাহিদের বাঁ বাহুতে বিদ্ধ হল রুস্তম শেরের চোখা পেন্সিল। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠে ওকে ঠেলে দিল জাহিদ। চেয়ারে পা বেধে হোঁচট খেতে খেতে দেয়ালে পিঠ দিয়ে সামলে নেবার চেষ্টা করল রুস্তম শের, বাঁ হাত থেকে রিভলভারটা ডান হাতে নিতে যেতেই হাত ফস্কে মাটিতে পড়ে গেল সেটা।

দরজার ওপারে সমুদ্রের গর্জন, বন্ধ দরজায় আছড়ে পড়েছে হাজারটা ঢেউ। এক চিলতে ফাঁক পেতেই তীরের মত ঢুকে পড়ল একটা চড়ুই, ছুঁড়ে দেয়া ঢিলের মত গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে।

প্যান্টের ব্যাকপকেট থেকে এক ঝটকায় ক্ষুর বের করল রুস্তম শের। আলো পড়ে একই সঙ্গে ঝিক করে জ্বলে উঠল ক্ষুরের রুপোলী ফলা আর জিঘাংসা ভরা দু'চোখ।

এদিকে সিঁড়িতে থেমে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছে শাহেদ আর মোনা। সামনে চড়ুই পাখিদের তৈরি করা দেয়াল। হাজার হাজার চড়ুই একসঙ্গে তালগোল পাকিয়ে থমকে গেছে সিঁড়ির ওপরের দিকটায়, কার সাধ্য সেই ব্যূহ ভেদ করে এগোয়! মোনা ভয় পেয়ে আবার চিৎকার শুরু করেছে। যদিও পাখিরা ওদের দিকে মনোযোগ দিচ্ছে না, আগের মত ওদের ওপর ঝাঁপিয়েও পড়ছে না। কম্বলের নিচে নিরাপদেই আছে ওরা। কিন্তু সামনে এগোনো মুশকিল হয়ে পড়েছে।

'বসে পড়ুন, ভাবী!' মোনার কানের কাছে চিৎকার করল শাহেদ, 'বসে পড়ুন! ওদের নিচ দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে যাওয়া যায় কিনা দেখি!'

হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মোনা আর শাহেদ। কয়েক ইঞ্চি পুরু খসে পড়া

BanglaBook.org

পালক আর অসংখ্য রক্তাক্ত পাখির মৃতদেহের ওপর দিয়ে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে আবার থেমে পড়তে হল। কম্বলটা তুলে বাইরে এক ঝলক তাকিয়েই শিউরে উঠল শাহেদ। হাজার হাজার চড়ুই প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে যাচ্ছে দোতলার দিকে, সিঁড়ির ওপরের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে রক্তাক্ত শরীরে গড়িয়ে পড়ছে নিচে। মৃতদেহের পাহাড় গড়ে উঠেছে সামনে।

পুরুষ কণ্ঠের আর্তনাদ ভেসে এল।

শাহেদের শার্টের কলার ধরে ঝাঁকাতে শুরু করল মোনা, কান্নায় ভেঙে পড়েছে, 'কি করব আমরা, শাহেদ ভাই?'

শাহেদ কোন উত্তর দিল না। দেবার মত উত্তর ওর জানা নেই।

মূর্তিমান দুঃস্বপ্নের মত ক্ষুর হাতে এগিয়ে আসছে রুস্তম শের। ঝট করে আর একটা পেন্সিল তুলে নিয়ে দ্রুত পিছিয়ে গেল জাহিদ। এরমধ্যেও লক্ষ্য করল রুস্তম শেরের ত্বকের শুকিয়ে আসা ঘাগুলো আবার তাজা হতে শুরু করেছে।

'ওই পেন্সিল দিয়ে তুমি আমার কি করবে, বস্?' বলতে বলতে দরজার দিকে তাকাল রুস্তম শের, বিস্ময় আর আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে গেল চোখ দুটো। আধাআধি খুলে গেছে দরজার পাল্লা। নদীর স্রোতের মত ঢুকছে ঝাঁকে ঝাঁকে চড়ুই পাখি, এগিয়ে যাচ্ছে রুস্তম শেরের দিকে।

'না!' চিৎকার করে উঠল রুস্তম শের, এলোমেলো ক্ষুর চালাচ্ছে চড়ুই পাখির অরণ্যে, 'না! আমি যাব না! কেউ আমাকে নিয়ে যেতে পারবে না!'

ক্ষুরের আঘাতে দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল ছোট্ট একটা চড়ুই, কিন্তু বাকিগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ল একযোগে।

মুহূর্তে দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে গেল সবকিছু। চড়ুই বাহিনী রুস্তম শেরকে নিয়ে যেতে এসেছে! ওরা তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে মৃতের জগতে, যেখান থেকে ও এসেছে।

পেন্সিলটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রূপক আর রুমকিকে কোলে তুলে নিল জাহিদ। পাখিতে ভর্তি হয়ে গেছে ছোট্ট ঘরটা। দরজাটা পুরোপুরি খুলে গেছে, পাখির স্রোত পরিণত হয়েছে বন্যায়।

দু'হাতে পাখিদের তাড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে রুস্তম শের। বৃষ্টির মত করে পড়ছে আক্রান্ত পাখিদের খসে পড়া পালক। কিন্তু ক'জনকে রুখবে সে? তীক্ষ্ণ ঠোঁট, ধারাল নখ আর শক্তিশালী পাখা নিয়ে হামলে পড়েছে শত শত চড়ুই। হাত থেকে খসে পড়ে মেঝেতে জমে ওঠা পুরু পালক আর অসংখ্য প্রাণহীন দেহের নিচে হারিয়ে গেল ক্ষুরটা।

রূপক আর রুমকিকে দু'হাতে যতটা সম্ভব আড়াল করার চেষ্টা করল জাহিদ। যদিও পাখিরা ওদের দিকে মনোযোগ দিচ্ছে না। বাচ্চারা কান্না থামিয়ে অবাক হয়ে দেখছে—জানালায় হাত বাড়িয়ে বৃষ্টি পরীক্ষা করে দেখার ভঙ্গিতে সামনে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ওরা—জলভরা চোখে নির্ভেজাল খুশি। খুলে ধরা ছোট্ট ছোট্ট চারটে হাতের পাঞ্জায় চারটে চড়ুই এসে বসল, কিন্তু ঠোকরাবার চেষ্টা করল না।

BanglaBook.org

অথচ রুস্তম শেরকে অবিরাম ঠুকরে যাচ্ছে ওরা।

রুস্তম শেরের সারা শরীর ভেসে যাচ্ছে রক্তে। একটা চড়ুই ওর ঘাড়ে বসে ঠোঁট ঢুকিয়ে দিল গলায় জাহিদের পেন্সিলের আঘাতে তৈরি গোল ছিদ্রে। সেলাই মেশিনের মত উঠছে আর নামছে ঠোঁটটা। অসহ্য যন্ত্রণায় জন্তুর মত গোঙাচ্ছে রুস্তম শের। গলার ওপর থেকে এক ঝটকায় পাখিটাকে তুলে নিয়ে চটকাতে শুরু করল, সঙ্গে সঙ্গে আর একটা তার জায়গা নিল।

জাহিদের কাঁধে এসে বসেছে একটা, কিন্তু আক্রমণের কোন চেষ্টা করল না। একদৃষ্টে চেয়ে আছে রুস্তম শেরের দিকে।

অদৃশ্য হয়ে গেছে রুস্তম শের পাখিদের আড়ালে। ওকে এখন চড়ুই পাখিতে তৈরি বিমূর্ত শিল্পকর্মের মত দেখাচ্ছে।

'ওরা তোমাকে নিতে এসেছে, রুস্তম শের,' বিড়বিড় করে বলল জাহিদ, 'ফিরে যাও তুমি।'

ধীরে ধীরে পাখিদের দেয়ালটা হালকা হতে শুরু করেছে, অনুভব করল শাহেদ। একটু আগে নিচে বসা ঘরের বাল্ব দুটো বিস্ফোরিত হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে নিভে গেছে আলো। ওপর থেকে অল্প আলোর রেখা এসে পড়েছে সিঁড়িতে, কিন্তু কম্বলের নিচে জমাট অন্ধকার। শাহেদ অনুমান করল পথ পেয়ে গেছে পাখিরা, উড়ে চলে যাচ্ছে একযোগে।

'ভাবী!' মোনার হাত ধরে টানল শাহেদ, 'আস্তে আস্তে এগোতে থাকেন।' হাঁটু সমান উঁচু পালক আর মৃত পাখির ভিড় ঠেলে বহুকষ্টে এগোতে থাকল ওরা।

সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছতেই জাহিদের চিৎকার কানে এল, 'নিয়ে যা! নিয়ে যা ওকে, যেখানে ওর থাকার কথা সেখানে নিয়ে যা!'

শেষ চেষ্টা করল রুস্তম শের। পালাবার কোন রাস্তা নেই, তবুও চেষ্টা করল সে। কারণ সেটাই ওর প্রকৃতি।

অবশিষ্ট সমস্ত শক্তি এক করে ঝাঁকুনি দিয়ে নিজেকে মুক্ত করতে চাইল রুস্তম শের। কাপড়ের মত ওর গায়ে সেঁটে থাকা চড়ুইয়ের স্তরটা মুহূর্তের জন্যে একটু দূরে সরে এল, পরমুহূর্তেই আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে আগাগোড়া মুড়ে ফেলল। বিভীষিকার মত ওই একমুহূর্তে জাহিদ যা দেখল তা সারা জীবন ধরে দুঃস্বপ্ন হয়ে তাড়া করে বেড়াবে ওকে।

চড়ুইরা রুস্তম শেরকে জ্যান্ত খেয়ে ফেলছে। চোখের কোন চিহ্ন নেই, শূন্য কোটরে শুধু অন্ধকার। নাকের জায়গায় বড় একটা ফুটো, গলগল করে রক্ত বেরুচ্ছে। মাথার খুলিতে চামড়া নেই, সাদা হাড় বেরিয়ে পড়েছে। শার্টের কলারটা এখনও গলায় লটকে আছে, শরীরে কাপড়ের আর কোন চিহ্ন নেই। পাঁজরের হাড়গুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পেটটা ফুটো করে দিয়েছে চড়ুইরা, ফুটো দিয়ে নাড়িভুঁড়ি গড়িয়ে পড়েছে বাইরে।

আরও একটা ব্যাপার লক্ষ করল জাহিদ।

BanglaBook.org

চড়ুইরা রুস্তম শেরকে শূন্যে তুলে ফেলার চেষ্টা করছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই চেষ্টাটা সফল হবে, কারণ প্রতিমুহূর্তেই ওজন হারাচ্ছে রুস্তম শের।

প্রচণ্ড ঘৃণায় চেঁচিয়ে উঠল জাহিদ, 'নিয়ে যা! নিয়ে যা ওকে! যেখানে ওর থাকার কথা সেখানে নিয়ে যা!'

ধীরে ধীরে থেমে গেল রুস্তম শেরের অন্তিম আর্তনাদ। দু'পাশে ছড়িয়ে থাকা দু'হাতের নিচে ভিড় করেছে চড়ুইরা। মাটি ছেড়ে উঠে যাচ্ছে পা দুটো। টুপটাপ করে ঝরে পড়ছে একের পর এক মৃতদেহ, পরমুহূর্তেই অন্যেরা তাদের জায়গা নিয়ে নিচ্ছে।

মড়মড় শব্দ তুলে একটা বুক শেলফ উল্টে পড়তে লাগল। জাহিদ বাচ্চাদের নিয়ে আগেই ঘরের এক কোণে সরে এসেছে, ঝটিতি দেয়ালের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে যেতেই বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেল সে। বুক শেলফের ওপাশের বন্ধ জানালাটার কোন অস্তিত্ব নেই, খোলা গহ্বর দিয়ে কালো ধোঁয়ার মত ঢুকছে আরও কয়েক হাজার চড়ুই।

বাচ্চাদেরকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে উপুড় হয়ে ওদের শরীর ঢেকে দিল জাহিদ, দু'হাতে আঁকড়ে ধরেছে ওদেরকে।

এরপর আর কিছু মনে নেই ওর।

দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে মোনা আর শাহেদ। কম্বলটা ঘাড়ের কাছে নামিয়ে মাথা বের করে ঘরের ভেতরটা দেখার চেষ্টা করল। নড়েচড়ে বেড়ানো কালো একটা মেঘ ছাড়া প্রথমে কিছু দেখা গেল না। অবশেষে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে আকার নিতে শুরু করল ভেতরের দৃশ্যাবলী।

রুস্তম শেরের শরীরের এক ইঞ্চিও খালি নেই, চড়ুই পাখিরা ঢেকে দিয়েছে ওকে। থেকে থেকে প্রতিরোধের চেষ্টা করছে সে, এখনও মরেনি।

'শাহেদ ভাই!' চেঁচিয়ে উঠল মোনা, 'ওরা শূন্যে তুলে ফেলছে ওকে!'

রুস্তম শেরের শরীরের অবশিষ্টাংশ ধীরে ধীরে মাটি ছেড়ে শূন্যে উঠে যাচ্ছে পাখিদের তৈরি কার্পেটে চড়ে। সমবেত মিছিলটা দেয়ালের গায়ের গহ্বরটার দিকে এগোচ্ছে। রুস্তম শেরের শরীর থেকে এখনও দু'এক টুকরো মাংস খুলে খুলে পড়ছে নিচে। যদিও পাখিদের ভিড়ে ওকে দেখা যাচ্ছে না। ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে বাইরে ভেসে পড়ল ওরা।

হাঁটু সমান আবর্জনা সরিয়ে বহুকষ্টে ঘরে ঢুকে পড়ল শাহেদ আর মোনা। বাচ্চারা তারস্বরে কাঁদছে, জাহিদ ওদেরকে নিজের শরীর দিয়ে ঢেকে আছে। মোনার গলা শুনে ঘুরে তাকাল জাহিদ।

মোনা বাচ্চাদেরকে তুলে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখতে লাগল কোথাও লেগেছে কিনা, নিঃশব্দে কাঁদছে।

'মনে হয় ওরা ঠিকই আছে,' ক্লান্ত স্বরে বলল জাহিদ।

শাহেদ দৌড়ে দেয়ালের গর্তটার পাশে এসে দাঁড়াল। রাতের আকাশে অভূতপূর্ব এক দৃশ্য। ছোট ছোট পাখির ঝাঁকে ঢেকে গেছে তারার রাজ্য, ঠিক

BanglaBook.org

মাঝখানে বিশাল একটা কালো ছায়া—রুস্তম শেরের ভাসমান শরীর! ধীরে ধীরে উপরে উঠে যাচ্ছে ওরা। মাটি থেকে আকাশে ডানা মেলছে অসংখ্য চড়ুই। একসময় হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

ঘরের এক কোণে বসে আছে মোনা পা ছড়িয়ে। রূপক আর রুমকিকে হাঁটুতে বসিয়ে দোলাচ্ছে। ওরা কান্না বন্ধ করে হাসতে শুরু করেছে। রূপক হাত বাড়িয়ে মায়ের গাল ছুঁয়ে দিল, যেন ওকে অভয় দেবার চেষ্টা করছে। রুমকি উঠে দাঁড়িয়ে মোনার চুল থেকে একটা পালক তুলে নিল, মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করছে।

'ওকে কি ওরা নিয়ে গেল?' শাহেদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে জাহিদ।

'হ্যাঁ,' বলেই দু'হাতে মুখ ঢেকে শিশুর মত কাঁদতে শুরু করল শাহেদ। কেন, তা নিজেই বুঝতে পারল না।

জাহিদ ওর পিঠে হাত বুলিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করল।

লজ্জা পেয়ে নিজেকে সামলে নিল শাহেদ, 'আমি ঠিক আছি। হঠাৎ কে-যে...' বাক্যটা শেষ করল না সে।

বাইরে থেকে একটা চড়ুই উড়ে এসে জাহিদের কাঁধে বসল।

'ধন্যবাদ,' পাখিটাকে উদ্দেশ্য করে বলল জাহিদ, 'আমি...'

হঠাৎ করেই নিষ্ঠুরভাবে জাহিদের ডান চোখের ঠিক নিচে ঠোকর দিল চড়ুই পাখিটা, রক্ত বেরিয়ে এল। পরমুহূর্তেই উড়ে গিয়ে সঙ্গীদের সঙ্গে মিশে গেল সে।

'কেন? কেন অমন করল পাখিটা?' মোনা প্রশ্নবোধক চোখে চেয়ে আছে ক্ষতটার দিকে।

উত্তর দিল না জাহিদ। তবে মনে হল যেন উত্তরটা সে জানে। আবুল হাশেম ভুঁইয়াও হয়ত উত্তরটা আঁচ করতে পারতেন। ওকে সাবধান করতে চেয়েছে পাখিটা। পরলোকের ওপর কোন মানুষের নিয়ন্ত্রণ খাটে না। অনধিকার চর্চা করেছে জাহিদ। শাস্তি পেতে হবে ওকে। কিন্তু কি সেই শাস্তি? সেটা কি ও পেয়ে গেছে, নাকি ভবিষ্যতের জন্যে তোলা আছে?

'ও কি মরে গেছে?' কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে প্রশ্ন করল মোনা।

'হ্যাঁ,' দৃঢ় গলায় বলল জাহিদ, 'রুস্তম শের মরে গেছে। ও নামে আর কেউ কোনদিন লিখবে না।'

বাইশ

বাচ্চাদের কোলে নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল মোনা। বুক ভরে শ্বাস নিল। ভাপসা গরম পড়েছে, তবুও বাতাসটা অন্তত পরিষ্কার। বাড়ির ভেতরটা নরকে পরিণত হয়েছে। যত দ্রুত সম্ভব দূরে সরে আসতে চাইল মোনা।

শাহেদ আর জাহিদ ওর পেছন পেছন বেরিয়েছে। চেষ্টা করেও জাহিদ এক

BanglaBook.org

মুহূর্তের জন্যেও বাড়িটার দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিতে পারছে না। মনে হচ্ছে যেন যুদ্ধের সময় গোলার আঘাতে বিধ্বস্ত হয়েছে বাড়িটা। দেয়ালের কিছু অংশ ধসে পড়েছে, ভাঙা কাঁচে চাঁদের আলো প্রতিফলিত হয়ে জরির কুচির মত ঝিলিক দিচ্ছে। চারপাশে অনেকটা জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে আছে পাখিদের মৃতদেহ আর খসে পড়া পালক।

'আপনি কি শিওর যে এটাই একমাত্র উপায়?' প্রশ্ন করল জাহিদ।

ওপর-নিচ মাথা ঝাঁকাল শাহেদ।

'মানে আমি বলতে চাচ্ছিলাম আপনি পুলিস অফিসার, প্রমাণ নষ্ট করে ফেলার জন্যে আবার অসুবিধেয় পড়বেন না তো?'

ব্যঙ্গের হাসি হাসল শাহেদ, 'কিসের প্রমাণ? এই ঘটনা কেউ বিশ্বাস করবে বলে মনে করেন?'

'না, তা মনে করি না,' একটু ইতস্তত করে বলল জাহিদ, 'তবে মনে হচ্ছে আপনি আমার ওপর রেগে আছেন। সবকিছুর জন্যে কি আপনি আমাকে দায়ী করছেন?'

'একদিনের জন্যে যথেষ্ট উত্তেজনা গেছে। দয়া করে আমাকে আর খোঁচাবেন না।' সত্যিই রেগে আছে শাহেদ, উষ্ণ স্বরে বলল, 'জলজ্যান্ত একটা লোককে চড়ুই পাখিরা উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল, নিজের চোখে সেটা দেখেছি আমি। এরপরে আর কি আশা করেন আপনি?'

জাহিদ আর কথা বাড়াল না।

সমুদ্রের দিক থেকে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া ভেসে এল।

'চলুন, কাজ শুরু করা যাক।' কোমরে হাত দিয়ে চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখল শাহেদ, 'কে কি ভাববে কেয়ার করি না। পুড়িয়ে দিতে হবে বাড়িটা। বাতাস নেই, আশেপাশে ছড়াবে না আগুন। চারদিকের জঙ্গল কিছুটা পুড়তে পারে। আগুন ছড়াবার আগেই ফায়ার ব্রিগেড চলে আসবে।'

ফোক্সওয়াগেনের চাবি ইগনিশনেই ঝুলছিল, স্টার্ট দিয়ে কিছুটা দূরে রেখে এল শাহেদ গাড়িটাকে, মোনা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে বাচ্চাদের কোলে নিয়ে। তারপর ফিরে এসে কালো ফোর্ড এসকর্টের পাশে দাঁড়াল। পাখির বিষ্ঠায় সাদা হয়ে গেছে গাড়িটা, এক ইঞ্চি জায়গা খালি নেই। আলগোছে হ্যাণ্ডেলে চাপ দিয়ে সামনের দরজা খুলে পাশ ফিরে সিটে বসল শাহেদ, পা দুটো বাইরে রাস্তার ওপর। জুতো খুলতে শুরু করেছে, মোজাও খুলে ফেলল। জাহিদ বিস্মিত হলেও কোন প্রশ্ন করল না। মোজা দুটো হাতে নিয়ে আবার জুতো পরে ফেলল শাহেদ। এই নোংরার মাঝে খালি পায়ে হাঁটার কোন ইচ্ছে নেই ওর। তারপর ঝুঁকে পড়ে ড্যাশবোর্ড খুলতেই একটা ম্যাচের বাক্স পেয়ে গেল। গাড়ি থেকে বেরিয়ে ম্যাচটা জাহিদের উদ্দেশে ছুঁড়ে দিল শাহেদ। বিনা বাক্যব্যয়ে লুফে নিল জাহিদ। গিঁট দিয়ে মোজা দুটো জুড়ে নিল শাহেদ। তারপর হেঁটে গাড়ির অন্যপাশে চলে এল, জুতোর নিচে মচমচ শব্দ উঠছে। ফুয়েল ট্যাঙ্কের ঢাকনা খুলে মোজার তৈরি রশিটা ভেতরে ঢুকিয়ে দিল যতদূর সম্ভব। বের করে আনলে দেখা গেল বেশিরভাগ

অংশই ভিজে জবজব করছে। শুকনো দিকটা ভেতরে ঢুকিয়ে দিল শাহেদ, ভিজে অংশটা বাইরে ঝুলছে।

জাহিদের দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলল, 'গাড়িটা চলতে শুরু করলেই মোজাতে আগুন ধরিয়ে দেবেন, তার আগে নয় কিন্তু। ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকাল জাহিদ।

'দুর্ঘটনার মত দেখাবে ব্যাপারটা। আশা করি কেউ কোন সন্দেহ করবে না।'

মোনা দূর থেকে চেঁচিয়ে বলল, 'কি করছ তোমরা? বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়ছে।'

'আর এক মিনিট!' চেঁচিয়ে বলল জাহিদ।

শাহেদ দরজা খোলা রেখে ফোর্ড এসকর্টের সিটে এসে বসল। দুর্গন্ধে নাক বন্ধ হয়ে আসছে। এমার্জেন্সি ব্রেক রিলিজ করে দিয়ে জাহিদের উদ্দেশে চেঁচাল, 'চলা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন, ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল জাহিদ।

বাঁ পায়ে ক্লাচ চেপে গিয়ার নিউট্রালে নিয়ে এল শাহেদ।

ধীরে ধীরে এগোতে শুরু করল ফোর্ড এসকর্ট। লাফিয়ে নেমে পড়ল শাহেদ। পরমুহূর্তেই দেখতে পেল জাহিদ ঠিকভাবেই ওর দায়িত্ব পালন করেছে, আগুন জ্বলছে গাড়িটার ফুয়েল ট্যাঙ্কের মুখে।

পনেরো ফুট দূরে বাড়ির সদর দরজা চুরমার করে দিয়ে কিছুটা ভেতরে ঢুকে গেল ফোর্ড এসকর্ট। ঝুরঝুর করে চুনবালি খসে পড়ছে। পেছনের বাম্পারে লাগানো স্টিকারটা পড়ল জাহিদ, 'ওস্তাদের মাইর শেষ রাতে।'

জাহিদের হাত ধরে দৌড়াল শাহেদ, তা না হলে হয়ত ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকত সে। আগুনের শিখা ঘিরে ধরেছে গাড়িটাকে, প্রতি মুহূর্তেই আরও উঁচুতে উঠে যাচ্ছে।

প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরিত হল ফুয়েল ট্যাঙ্ক। পায়ের নিচের মাটি কেঁপে উঠল। বাচ্চারা ভয় পেয়ে কাঁদতে শুরু করেছে। মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে পড়ল জাহিদ। আগুনের লালচে আভায় চারদিক দিনের আলোর মত উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। অকাতরে পুড়ে যাচ্ছে লাল ইঁটের তৈরি বাড়িটা। হু হু করে উঠল বুকের ভেতরটা, মনে হচ্ছে ওখানে কি যেন ফেলে এসেছে ও, হারিয়ে গেছে কিছু একটা চিরদিনের জন্যে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাঁটতে শুরু করল জাহিদ। মোনা, রূপক আর রুমকি ওর জন্যে অপেক্ষা করছে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

তান্ত্রিকের মূর্তি

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৫

ভূমিকা

এ বইয়ের সাতটি গল্পের ছয়টিই এর আগে ছাপা হয়েছে। *চূড়ান্ত পর্ব* লিখেছি এম. আর. জেমস-এর *লস্ট হার্ট* অবলম্বনে। *পুবের পাহাড়* সরাসরি কোন বিদেশী কাহিনি অবলম্বনে লিখিনি। তবে এ গল্পের কাহিনি কাকতালীয়ভাবে কোন বিদেশী গল্পের সাথে মিলে যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়। গল্পটি এর আগে কোথাও ছাপা হয়নি। *১৩ নম্বর কামরা* এম. আর. জেমস-এর *নাম্বার থারটিন* অবলম্বনে লেখা। এইচ. জি. ওয়েলস-এর *দ্য রেড রুম*-এর ছায়া থেকে লিখেছি *লাল কুঠুরি*। *স্বয়ম্ভু* ছাপা হয়েছিল কিশোর তারকালোক-এ, *পিশাচের পাল্লায়* নামে। গল্পটি কোন বিদেশী কাহিনি থেকে নেয়া না হলেও নির্ভেজাল মৌলিক বলে দাবি করব না। এ ধরনের গল্পের কিছু না কিছু অংশ অজান্তেই বিদেশী গল্পের সাথে মিলে যায়। *পিশাচী*-র বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। এটি 'সম্পূর্ণ উপন্যাস' রূপে ছাপা হয়েছিল কিশোরপত্রিকায়। *তান্ত্রিকের মূর্তি* লিখেছি এডিথ নেসবিট-এর *ম্যান-সাইজ ইন মার্বেল*-এর আংশিক ছায়া থেকে। 'বড় গল্প' হিসেবে রহস্যপত্রিকায় ছাপা হয়েছিল এটা। তবে পটভূমি ছিল বিদেশী।

প্রায় সবগুলো গল্পেই ভৌতিক আবহের সাথে রহস্যের সংযোগ ঘটিয়ে ভিন্ন একটা স্বাদ দিতে চেয়েছি, সফল হয়েছি কিনা সুপ্রিয় পাঠক-পাঠিকারাই বলবেন।

শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া
২৫.১০.৯৪

চূড়ান্ত পর্ব

জায়গাটা শহর থেকে অনেক দূরে। উঁচু পাহাড় আর বন-বনানী দিয়ে ঘেরা ছায়া ঢাকা নিঝুম প্রকৃতি। তবে জায়গাটাকে ঠিক গ্রাম বলা যাবে না, যদিও এখানে কিছু ফসলের মাঠ আর খামার আছে। আবার শহর বা শহরতলির সাথেও এখানকার পরিবেশের তেমন মিল নেই। সব মিলিয়ে জায়গাটা একটু অন্যরকম।

বেশিরভাগই বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। বাড়িগুলো যথেষ্ট দূরত্ব নিয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। প্রতিটা বাড়িতেই রয়েছে বিস্তৃত আঙিনা। তাতে শাক-সবজী, ফুল-ফলের বাগান করেন বুড়ো-বুড়িরা। কাছের শহরটার সাথে যোগাযোগের জন্যে একটি পিচ ঢালা সরু পথ চলে গেছে সর্পিল বাঁক নিয়ে। লক্কড় মার্কা দুটো মিনিবাস সকাল-সন্ধে আসা-যাওয়া করে সেই পথে।

একদিন পড়ন্ত বিকেলে মিনিবাসে করে এক ফুটফুটে ছেলে এল। বয়স এগারো কি বারো। গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে সে হনহনিয়ে এমনভাবে এগোতে লাগল যেন গন্তব্যটা তার খুব চেনা। আসলে যে বাড়িতে ছেলেটা যাচ্ছে সেটা বের করা খুব সহজ। এমন বাড়ি শহরেও সচরাচর চোখে পড়ে না। এখানকার সবচেয়ে বড় টিলাটার নিচেই সেই প্রাসাদোপম বাড়ি। কাঠের পেল্লায় দরজা লাগানো ফটকের মাথায় ইংরেজিতে খোদাই করে লেখা 'লাউরিং ক্লাউড'—গোমড়ামুখো মেঘ। কি অদ্ভুত নাম! এই নামের জন্যেই ঝকঝকে বাড়িটার গায়ে কেমন রহস্যের হালকা একটা ছায়া।

বাড়ির মালিক ইমরোজ জাহান সম্পর্কে পড়শীদের ধারণা তেমন স্পষ্ট নয়। বছর চারেক হয় বাড়িটা করেছেন তিনি। এর আগে ছিলেন ইংল্যান্ডে। শোনা যায় কেমব্রিজে লোক সাহিত্যের প্রফেসর ছিলেন তিনি। হঠাৎ সব ছেড়েছুড়ে দেশে ফিরে এসেছেন। তিনকুলে কেউ নেই। একরকম জগৎ-সংসার সম্পর্কে উদাসীন বলা যায় তাঁকে। এখানে প্রায় বিঘা খানেক জায়গার ওপরে প্রচুর টাকা ঢেলে দোতলা দালান তুলেছেন। বর্গাকার লাল ইঁটের দালানটিতে আঠারো শতকের গোড়ার দিকের ঐতিহ্যবাহী জৌলুস ফুটে আছে। পুরো বাড়িটাকে পাশ্চাত্যের প্রাচীন ঢঙে সাজিয়েছেন তিনি। তাঁর জীবন-যাপনের ধরন-ধারণও বিলেতি। এখানেই সবার মনে একটু খটকা। যে মানুষ বিলেতি চালচলনে সম্পূর্ণভাবে অভ্যস্ত, তাঁর হঠাৎ এই অখ্যাত জায়গায় এসে শেকড় গাড়ার পেছনে কারণটা কি?

ইমরোজ জাহান তেমন মিশুক নন। সারাদিন বাড়িতেই থাকেন। বাইরে

তাঁকে কদাচিৎ দেখা যায়। দিনের বেশিরভাগ সময় কাটে স্টাডিতে। রাতেও দীর্ঘ সময় পড়াশোনা করে কাটান। তাঁর স্টাডিও বটে একখান! ছাদ ছোঁয়া বড় বড় শেলফ দেয়ালের সাথে সাঁটানো। প্রতিটা শেলফে একটা করে মই। তাকগুলোর কোথাও ফাঁকা নেই। সর্বত্র শুধু বই আর বই। লেখালেখির অভ্যেস আছে ইমরোজ জাহানের। একবার স্থানীয় লোকজন মিলে একটা ম্যাগাজিন বের করলেন। তাতে একটা প্রবন্ধ দিলেন তিনি। লোয়ার এম্পায়ারের কুসংস্কারের প্রতি রোমানদের মনোভাব নিয়ে লেখা সেই প্রবন্ধ। ব্যাপারটা অনেকেই বাঁকা চোখে দেখলেন। লোক সাহিত্যের এতবড় প্রফেসর, কোথায় পুরানো দিনের কাহিনী-কীর্তি নিয়ে লিখবেন, তা নয় অন্ধকার জগতের কুসংস্কার নিয়ে মাতামাতি!

ছেলেটি যখন লাউরিং ক্লাউডের ফটকে এসে পৌছুল, সূর্য তখন নৈর্ঋত কোণের টিলাটার মাথা ছুঁইয়ে ম্লান আলো ছড়াচ্ছে। দক্ষিণ-মুখো দালানটার ওপর তির্যকভাবে এসে পড়েছে গোধূলির আলো। জানালার কাঁচগুলো জ্বল জ্বল করছে লাল আগুনের মত।

ফটকের ডান ধারে চৌকোনা এক ফোকর। ভেতরে একটা মোটা দড়ি ঝুলছে। ফোকরে হাত ঢুকিয়ে দড়িতে কষে টান দিল ছেলেটা। ভেতরে কোথাও ঢঙ ঢঙ করে বেজে উঠল ঘণ্টা। এখুনি এসে যাবে ফটক খোলার লোক। কিন্তু তর সইছে না ছেলেটার। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগটা তেমন ভারি নয়, তবু অসহিষ্ণুভাবে ডান কাঁধ থেকে বাঁ কাঁধে আনল ব্যাগটা। চারদিকে ইতিউতি নজর বোলাল কয়েকবার। একজন বুড়ো ধীর পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন পাশ দিয়ে, ছেলেটাকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন। বাই ফোকাল লেন্সের চশমাটা আরেকটু টেনে তুলে শুধোলেন, 'তোমার নাম কি, খোকা?'

'রবিন,' ঝটপট উত্তর দিল সে।

'বেড়াতে এলে বুঝি?'

'জী না, থাকতে এসেছি।'

'থাকতে এসেছ!' ভুরু কুঁচকে গেল বুড়োর। 'ইমরোজ সাহেব কি হন তোমার?'

'কাকা।'

এতদিন উড়ো উড়ো ভাবে যা কানে এসেছে আসলে তা সত্যি নয়। পৃথিবীতে একেবারে একা নন ইমরোজ জাহান।

'তা কোত্থেকে এলে, খোকা?'

'এতিমখানা থেকে।'

এবার সত্যিই অবাক হয়ে গেলেন বুড়ো। এমন বড়লোকের ভাইপো এল কিনা এতিমখানা থেকে! না হয় ছেলের বাপ-মা মারাই গেছে, তাই বলে তো দায়িত্বটা মরেনি? সেই যদি নিজের কাছে আনা হলো, আরও আগে আনলে কি হত? হায়রে বিচিত্র মানুষ! বিড়বিড় করে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়তে নাড়তে আবার এগিয়ে চললেন বুড়ো। চেহারায় তাঁর রাজ্যের হতাশা।

ফটক খুলতেই জহুর আলীর সাথে চোখাচোখি হলো রবিনের।

BanglaBook.org

'এয়ে পড়িছো তালি,' মুখ ভরে হাসল জহুর আলী। হাসিটা তার ঢুলু ঢুলু চোখ আর মাংসল গালের সাথে বেমানান। 'চলো, ভেতরি চলো।'

সশব্দে ফটক বন্ধ করে রবিনের কাঁধ থেকে ব্যাগটা নিয়ে নিল সে। তারপর দু'জনে রওনা হলো ভেতরের দিকে।

রবিনকে দত্তক নেয়ার ব্যাপারে ইমরোজ জাহানের পক্ষ থেকে জহুর আলীই যোগাযোগ করেছে এতিমখানার সাথে। এতগুলো ছেলের ভেতর থেকে রবিনকে নিজে বাছাই করেছে সে। ওকে সাথে করেই আনতে চেয়েছিল জহুর আলী, কিন্তু অফিসিয়াল ফর্ম্যালিটিজের জন্যে তখন আসতে পারেনি রবিন। কিছু নতুন পোশাক আর টাকা রেখে রাস্তা ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ে চলে এসেছিল জহুর আলী। ফিরে এসে খানিকটা চিন্তায় ছিল, ছেলেটা আবার পথ হারিয়ে ফেলে কিনা কে জানে? এখন সে চিন্তা দূর হয়েছে তার।

ভেতরে এসে অবাক হয়ে গেছে রবিন। বাইরে থেকে যতটা কল্পনা করেছিল বাস্তবে তারচেয়ে অনেক সুন্দর বাড়িটা। ফটক থেকে নুড়ি পাথরের মসৃণ পথ সোজা চলে গেছে সদর বারান্দার সিঁড়ি অবধি। পথের দু'ধারে ঝাউবীথি সমান্তরাল সরলরেখায় দাঁড়িয়ে। বারান্দার সামনে দু'ধারে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ফুলের বাগান। চোখ জুড়িয়ে গেল রবিনের।

বারান্দা পেরিয়ে হলঘরে এল ওরা। উঁচু ছাদের নিচে বড় বড় ঝাড়বাতি সগৌরবে ঝুলছে। ঘরে আসবাব নেই তেমন। প্রাচীন ভাস্কর্য, অ্যান্টিক্স, বড় বড় তৈলচিত্র—এসবের ছড়াছড়ি বেশি। একদিকের দেয়াল ঘেঁষে বড় আকারের কিছু শ্বেত পাথরের মূর্তি ভয়াল একটা পরিবেশ তৈরি করেছে। ক'জন মানুষ নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করছে প্রকাণ্ড এক ষাঁড়। দৃশ্যটা একেবারেই পছন্দ হলো না রবিনের।

মার্বেল পাথরের সিঁড়ি ভেঙে দোতলা থেকে সৌম্য চেহারার এক বৃদ্ধ নেমে এলেন হলঘরে। গায়ের রঙ ফর্সা, মাথার চুল ধবধবে সাদা, মোটা জুলফি গালের মাঝখানে এসে থেমেছে। খাড়া নাকের নিচে সুন্দর করে ছাঁটা গোঁফ। চওড়া কপাল আর ক্লীন-শেভ্ড চৌকো চিবুকে অসংখ্য ভাঁজ। পুরো চেহারার সাথে চোখ দুটো বড় বেমানান। ছোট ছোট চোখ দুটোতে বার্ধক্যের কোন ছাপ পড়েনি এখনও। আশ্চর্য এক প্রাণশক্তিতে এই ষাট বছর বয়সেও চোখের মণিগুলো কেমন চকচকে, উজ্জ্বল আর সজীব। কড়া ইস্তিরির দামী নীল স্যুট পড়েছেন তিনি। গায়ে ঘিয়ে রঙা ঢিলে শার্ট। তাঁর ভারি ঠোঁট জোড়ার ফাঁকে জ্বলন্ত চুরুট।

'এই তাহলে রবিন!' চিবুক নেড়ে দিয়ে রবিনকে আদর করলেন তিনি।

রবিন বড় বড় চোখ তুলে দেখতে লাগল তার আশ্রয়দাতাকে। এই মানুষটি আজ থেকে তার কাকা এবং অভিভাবক—তার সকল দায়দায়িত্বের ধারক এবং বাহক। কৃতজ্ঞতা আর ভক্তিতে অন্তরটা কানায় কানায় ভরে গেল রবিনের।

ভেতরে ভেতরে জহুর আলীর ওপর কিছুটা রুষ্ট ইমরোজ জাহান। দেখেশুনে হাবাগোবা ধরনের ছেলে আনতে বলেছিলেন তাকে। বোকাসোকা ছেলেদের বশ করতে সুবিধে। এই ছেলেকে সেরকম মনে হচ্ছে না। তার উজ্জ্বল চেহারায় ধারাল একটা ভাব, চোখ দুটোতে উপচানো কৌতূহল। এখন ভালয় ভালয় কাজটা

BanglaBook.org

সারতে পারলে হয়।

'পথে কোন অসুবিধে হয়নি তো?' মনোভাব গোপন করে আন্তরিক হবার চেষ্টা করেন তিনি।

'জী না, কাকা।'

'বেশ, বেশ। তোমার বয়স যেন কত?'

'মাঘের পনেরোতে বারোয় পড়ব।'

'জী, স্যার, আমারেও তাই বলিছে।'

'তুমি চুপ করো,' ধমকে উঠলেন ইমরোজ জাহান। 'তোমার মাথায় কি আছে সে তো আমি জানি। অফিসের খাতায় ওর জন্ম তারিখ দেখেছ?'

'গুইনে গুইনে তিনবার দেখিছি, স্যার।'

'ইংরেজি তারিখটা বলো তো দেখি।'

'এই সারিছে!' অনেক চেষ্টা করেও মনে করতে না পেরে শেষমেশ মাথা চুলকাতে লাগল জহুর আলী।

'অপদার্থ কোথাকার! যাও, ওকে রেশমার কাছে নিয়ে যাও।' কথা শেষ করে আবার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চলে গেলেন তিনি।

আসতে না আসতে বয়সের প্রশ্ন! ঘরে ঠাণ্ডা মাথার আর কেউ থাকলে অসঙ্গতিটা নজর এড়াত না। কিন্তু জহুর আলীর স্থূল মস্তিষ্কে সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলো কাজ করে না। আর রবিন তো প্রাণোচ্ছল কৌতূহলী বালক মাত্র—ও আর কি সন্দেহ করবে!

নাম শুনে রবিন ভেবেছিল রেশমা নামের মেয়েটি তরুণী কিংবা যুবতী হবে। বাস্তবে দেখা গেল অন্যরকম। কাঁচাপাকা চুলের এক হাসিখুশি মহিলা হচ্ছেন রেশমা। প্রথম দর্শনেই ভাল লেগে গেল তাঁকে। মমতাময়ী মায়ের আদর্শ যেন ওই চেহারা। রবিনকে সহজেই আপন করে নিলেন তিনি। ওর ঘন চুলে আঙুল চালিয়ে মিষ্টি করে বললেন, 'আমাকে খালা বলে ডেকো, সোনা।'

'আচ্ছা।' মাথা কাত করে সায় দিল রবিন।

রেশমা এ বাড়িতে আছেন শুরু থেকে। আসলে শুরু থেকেই এ বাড়িতে মানুষ মাত্র তিনজন। ইমরোজ জাহান, রেশমা আর জহুর আলী।

জহুর আলীর বাড়ি উত্তরাঞ্চলে। মোটামুটি লিখতে পড়তে জানে। যমুনার ভাঙনে ভিটে-মাটি, সহায়-সম্বল হারিয়ে সপরিবারে চলে আসে শহরে। শহরের রূঢ় বাস্তবতা আবার ভাঙন ধরায় এই পরিবারে। জীবিকার সন্ধানে তারা একে একে হারিয়ে যায় যে যার পথে। ঘটনাচক্রে একদিন রাস্তায় ইমরোজ জাহানের সাথে পরিচয় ঘটে জহুর আলীর। সরল লোকটাকে পছন্দ হয়ে যায় ইমরোজ জাহানের। তাকে সোজা নিয়ে আসেন লাউরিং ক্রাউডে। ব্যস, তারপর থেকেই সে আছে।

রেশমার জীবনটাও পোড় খাওয়া। বিবাহিত জীবনের প্রথম দিকে এক সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে সন্তান ধারণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। নিষ্ঠুর স্বামী তাঁকে তালাক দেয়। অনেক ঘুরে ঘুরে একটা মাতৃসদনে কাজ পান তিনি। এখানে

BanglaBook.org

আসার আগে পর্যন্ত সেই মাতৃসদনেই ছিলেন। রান্না-বান্না, গোছগাছ—এসব ছাড়াও জহুর আলীকে পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত। বলতে গেলে এ বাড়ির সব কিছু তিনিই চালান। মনিব তো রাতদিন স্টাডিতেই পড়ে থাকেন।

দু'দিনেই রেশমা খালার সাথে ভাব হয়ে গেল রবিনের। প্রাচুর্যে ভরপুর লাউরিং ক্লাউডের প্রতিটা জিনিস সম্পর্কে ওর দারুণ কৌতূহল। রেশমা খালাকে একের পর এক প্রশ্ন করে চলল ও। খালাও গভীর আগ্রহের সাথে জবাব দিতে লাগলেন। তবে একটা প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর পাওয়া গেল না। সিঁড়িঘরের মাথায় অদ্ভুত এক লোকের ছবি টাঙানো। বদখত চেহারার লোকটার ডানহাতে মানুষের মাথার খুলি। রেশমা খালা বললেন, ওটা কাকার চেনাজানা কোন মানুষের ছবি নয়। বিদেশ থেকে সাথে করে নিয়ে এসেছেন। ছবিটা নাকি কাকার খুব প্রিয়। রবিন ভেবে পায় না কুৎসিত ছবিটার মাঝে ভাল লাগার কি আছে।

আরেকটা জিনিস বড় খাপছাড়া। দোতলার পশ্চিম ব্লকে যেখানে কাকার স্টাডি, তার পেছন দিয়ে একটা সিঁড়ি নেমে গেছে সোজা নিচের দিকে। পেছনের বিশাল আঙিনার শেষ মাথায় ঢালু পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে শাল-গজারির ঘন বন। বনে বেড়াল জাতীয় হিংস্র জন্তুর বাস। কোন জন্তু যদি রাতে একবার পাঁচিল টপকে এসে পড়ে, তাহলে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসা তার পক্ষে একদম সহজ। কিন্তু কাকা ওসব ভয়-ভীতিকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে রাতদিন খোলা রাখেন সিঁড়ির দরজা। রেশমা খালা বলেছেন লেকের ধারে সহজে পৌঁছুবার জন্যেই সিঁড়িটা করেছেন কাকা। বিকেলে মাঝে মধ্যে লেকের ধারে হাঁটাহাঁটি করেন তিনি। খালার কথায় কোন মন্তব্য না করলেও সিঁড়ির ব্যাপারটা মন থেকে মেনে নিতে পারেনি ও। কাকার কিছু হলে তো শুধু কাকার ক্ষতি না, ওর নিজেরও ক্ষতি।

রবিনের ঘরটা দোতলার পুব দিকের ব্লকে, প্যাসেজের শেষ মাথায়। ঘরটা খুব পছন্দ হয়েছে ওর। নকশা-কাটা পাথরের ঠাণ্ডা মেঝে, নীল পেইন্ট করা ঝকঝকে দেয়াল, চকমকে ঝাড়বাতি লাগানো ছাদ—সব মিলিয়ে মাঝারি আকৃতির ঘরটা বেশ ছিমছাম। পেছনের দেয়াল জুড়ে অনেকগুলো কাঁচের জানালা। খোলা রাখলে হু হু করে বুনো বাতাস ঢোকে। জোছনা রাতে অনেকক্ষণ জানালায় দাঁড়িয়ে থাকে রবিন। বানডাকা চাঁদের আলোয় তরল মোমের মত টলমল করে লেকের পানি, লালমাটির গায়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়ানো সবুজ বনকে মনে হয় দুর্জ্ঞেয় এক বিপুল রহস্যের খনি। ভাল লাগে, বড় ভাল লাগে রবিনের।

দেখতে দেখতে শীত এসে গেল। কাকা রবিনকে বলেছেন সামনের গ্রীষ্মে ওকে ইংল্যাণ্ডে নিয়ে ভাল কোন রেসিডেন্সিয়াল স্কুলে ভর্তি করে দেবেন। সেই খুশিতে পড়াশোনা শিকেয় তুলেছে রবিন। বাংলা বই বলতে এখন শুধু সে গল্পের বই পড়ে। লাঞ্চের পর রোজ এক ঘণ্টা কাকার কাছে ইংরেজি শেখে। ব্যস, এ পর্যন্তই ওর পড়াশোনা। সন্ধে পেরোতে না পেরোতে খাবার দিয়ে দেন রেশমা খালা। খাবার সেরে কিচেনে এসে বসে দু'জন। শুরু হয় অবিরাম স্রোতের মত গাল-গল্প।

আজ কিচেনে গল্প তেমন জমছে না। ঠাণ্ডা লেগে নাক বন্ধ হয়ে গেছে

BanglaBook.org

খালার। কষ্ট হচ্ছে কথা বলতে। তার ওপর বিকেল থেকে মাথা ব্যথা। বুকে-পিঠে মালিশ করার জন্যে রসুন-তেল গরম করছেন তিনি।

হঠাৎ রবিন প্রশ্ন করে বসে, 'আচ্ছা, কাকা কি খুব ভাল মানুষ?'

'ওমা!' ভুরু কুঁচকে তাকান খালা। পরমুহূর্তে ঝরে পড়ে তাঁর স্বভাবসুলভ হাসি। 'এটা তোমার কেমন প্রশ্ন গো, ছেলে?'

রবিন ইতিমধ্যে বুঝে গেছে প্রশ্নটা বোকার মত করে ফেলেছে ও। কাকা যদি ভাল মানুষ না-ই হবেন তাহলে তার মত অনাথকে আশ্রয় দেবেন কেন? লজ্জায় গাল দুটো লাল হয়ে যায় ওর। আসলে কোন কিছু ভেবে প্রশ্নটা করেনি ও। খুব কাছের বড় মানুষদের সম্পর্কে নানারকম কৌতূহল জন্মে ছোটদের মনে। চেতনার গভীরে অলক্ষে রেখাপাত করে সেই কৌতূহল। রবিনের প্রশ্নটা এমনি এক কৌতূহলের বহিঃপ্রকাশ।

'শোনো, ছেলে,' রবিনের কাঁধে স্নেহে হাত রাখেন রেশমা খালা। 'তোমার কাকার মত ভাল মানুষ আর কখনও দেখিনি। যদি পৃথিবীতে একটিও ভাল মানুষ থেকে থাকেন তাহলে তিনি তোমার ওই কাকা।'

আরও কিছুক্ষণ কিচেনে বসে থাকে দু'জনে। কথাবার্তা তেমন হয় না। ন'টার দিকে শোবার ঘরে চলে আসে রবিন। তারপর চিৎপাত হয় বিছানায়।

ঘুমের ভেতর অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখে রবিন। ওর ঘরের সাথেই ছোটখাটো একটা স্টোররুম। রুমটা বিভিন্ন বাতিল মালে ভরা। রবিন দেখে সেই রুমের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ও। দরজার কাঁচের ভেতর দিয়ে দৃষ্টি ফেলেছে ভেতরে। পরিত্যক্ত বাথটাবটার ওপর চোখ পড়তেই আঁতকে উঠল ও। ওর বয়েসী দুটো ছেলে পাশাপাশি শুয়ে আছে বাথটাবের ভেতর। পুরো দেহ সাদা কাপড়ে ঢাকা, মুখ দুটো শুধু বেরিয়ে। কি এক অবর্ণনীয় যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেছে ওদের মুখ। চাপা গোঙানি বেরিয়ে আসছে যন্ত্রণাদগ্ধ নীল ঠোঁটের ফাঁক গলে। এ কি! ওদের হাতগুলো অমন লম্বা হয়ে বেরিয়ে আসছে কেন?

ঘুম ভাঙতেই অবাক হয়ে যায় রবিন। জোছনালোকিত প্যাসেজের ঠাণ্ডা মেঝের ওপর সে দাঁড়িয়ে। তাহলে এতক্ষণ যা দেখল সবই কি সত্যি? আতঙ্ক এসে ভর করে মনে। এক ছুটে ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করার প্রবল ইচ্ছে জেগে ওঠে। কিন্তু কি এক দুর্নিবার আকর্ষণ স্টোরের দরজার দিকে টেনে নিয়ে ওকে। ধীরে ধীরে দরজার সামনে এসে দাঁড়ায় ও। ভয়ে ভয়ে তাকায় ভেতরে। চাঁদের আলোয় ঝিকমিক করছে পাথরের শূন্য বাথটাব।

পরদিন নাশতার টেবিলে রাতের অদ্ভুত ব্যাপারটা খুলে বলে রবিন। রেশমা খালা হেসে উড়িয়ে দেন ওর শঙ্কা। সাহস দিয়ে বলেন, 'ও কিছু না। স্রেফ একটা দুঃস্বপ্ন। মাঝে মধ্যে সবাই দেখে থাকে। মন থেকে ঝেড়ে ফেল।'

কাকা কিন্তু হালকা ভাবে নিলেন না ব্যাপারটা। বেশ গুরুত্ব দিয়ে ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ লিখে রাখলেন নিজের নোটবুকে।

সারাদিন কোন কাজেই উৎসাহ পেল না রবিন। রাতে দুরুদুরু মনে বিছানায় গেল। জানালা গলে চাঁদের আলো আসা সত্ত্বেও রুপোর বাতিদানে একটা মোম

BanglaBook.org

জ্বালিয়ে রাখল। স্বপ্নহীন চমৎকার ঘুম হলো। ভোরে ঝরঝরে মন নিয়ে বিছানা ছাড়ল ও। টুথব্রাশ আর পেস্ট বের করে ব্রাশে পেস্ট লাগাল। তারপর আয়নায় ভেংচি কাটতে কাটতে দাঁত মাজতে লাগল। হঠাৎ এক জায়গায় আটকে গেল দৃষ্টি। বুকের বাঁ দিকে শার্টের এক জায়গায় বৃত্তাকার একটা গর্ত। রবিনের স্পষ্ট মনে আছে, শোবার আগে শার্টটা সম্পূর্ণ অক্ষত ছিল।

মুখ-হাত ধুয়ে শার্ট নিয়ে খালার কাছে গেল রবিন। খালা চোখ কপালে তুলে বললেন, 'কি করে ছিঁড়লে?'

'ছিঁড়িনি। জেগে দেখি এই অবস্থা। রাতে শোবার সময় দিব্যি ভাল ছিল।'

'নিশ্চয়ই ঘরে ইঁদুর ঢুকেছিল। রাতে শোবার আগে ঘরটা ভাল করে দেখে নেবে। ইঁদুরের যা উপদ্রব বেড়েছে!'

জহুর আলী কাছেই ছিল। সুযোগ পেয়ে সে যোগ দিল, 'ইন্দুরের কথা আর কও ক্যানে। ভাঁড়ার ঘরে তো আজকাল আর যাতেই ইচ্ছে করে না। মিঝে ভর্তি গিজগিজে ইন্দুর। দুইটা এত্তো বড় যে রক্ত হিম হইয়ে আসে।'

'তবু তো মারবার নাম নেই তোমার,' ভর্ৎসনা করেন রেশমা। 'সারাদিন তো প্রায় শুয়ে বসেই কাটাও, ইঁদুর মারলেও তো একটা কাজের কাজ হয়।'

'চেষ্টা কি আর করছি না গো। খাওনের সাথে নিত্যি একগাদা করে বিষ দিচ্ছি। ব্যাটারা না খালি আমি কি করবানে? ও দিনে লাঠি দিয়ে তাড়া করিছিলাম ওই ধাড়ি দুইটারে। আচানক কই যে হাওয়া হলো আর খুঁজি পালাম না।'

'হয়েছে, তোমার মত অকর্মার ধাড়ি দিয়ে কাজ হবে না।'

'একখান কথা কই তোমাগের,' গলা হঠাৎ খাদে নামায় জহুর আলী। 'আমার মন কয় এইগুলি হাচা ইন্দুর না।'

'কি বললে?'

'হ্যাঁ গো, বুবুজান, গেল রাত্তিরে নিজ কানে শুনলাম।'

'কি শুনলে?'

'তেনাদের কথা। চোরা-কুঠুরি থেইকে স্যারের জন্যি নেশার পানি আনতি গে শুনি ভেতরি ফিসফাস্ কথা হচ্ছে। শরীরের বেবাক লোম ফড়ফড়িয়ে দাঁড়াইয়ে গেল। ভয়ে দরজা খুলতি আর সাহস হলো না। আমার কাছে যে খালি বোতলগুলি ছেল, ওগুলির তলানি ব্যাক এক করি ইস্‌পিশাল পানি বানাইয়ে দিয়ে আসিছি স্যারকে।'

'বলিস কি, হতচ্ছাড়া, এঁটো খাইয়েছিস মনিবকে!'

নিজের ভুল বুঝতে পেরে কুঁকড়ে যায় জহুর আলী। গোপন ব্যাপারটা এভাবে ফাঁস করা একদম উচিত হয়নি। মনিব জানতে পারলে তার আস্ত রাখবেন না। এখন উপায়?

খপ্ করে বুবুর একটা হাত ধরে ফেলে সে। কাতর কণ্ঠে বলে ওঠে, 'তোমার পায়ে পড়ি, বুবুজান, স্যারকে কিছু কয়ো না। কি করবানে, ভয়ে বুদ্ধি বেবাক হারায় গেছিল। আমার কথা বিশ্বেস না হলি আজ সইন্ধে বেলায় কান পেতো চোরা-কুঠুরির দরজায়।'

BanglaBook.org

'চুপ, আহাম্মক!' হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ধমকে ওঠেন রেশমা। 'নিজে তো একটা কাপুরুষ, আবার ছেলেটার মনেও ভয় ঢুকিয়ে দিচ্ছে।'

মুহূর্ত কয়েক নির্বোধের মত দাঁড়িয়ে থেকে সরে পড়ে জহুর আলী।

রেশমা খালা রবিনের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেন, 'ওর কথা একটুও বিশ্বাস কোরো না। ও তো একটা নেশাখোর উল্লুক। মাথা মোটা গরু। কথার কোন ঠিক আছে ওর?'

চেষ্টা করেও জহুর আলীর কথা পুরোপুরি অবিশ্বাস করতে পারল না রবিন।

লাঞ্চের পর আজ আর ইংরেজি নিয়ে বসলেন না কাকা। রবিনকে ডেকে বললেন, 'বিশেষ কাজে রাত এগারোটা অব্দি ব্যস্ত থাকব। তুমি ঠিক এগারোটায় আসবে স্টাডিতে। নতুন একটা মজার জিনিস দেখাব তোমাকে। তোমার ভবিষ্যতের পথ নিজ চোখে দেখতে পাবে আজ। তবে হ্যাঁ, কথাটা বাড়ির আর কেউ যেন জানতে না পারে। তাহলে কিন্তু ভণ্ডুল হয়ে যাবে সব।'

'আমি কাউকেই বলব না।'

'দ্যাট'স আ গুড বয়।'

কাকার কথায় দারুণ এক রোমাঞ্চের গন্ধ পেল রবিন। অদম্য কৌতূহল উতলা করে তুলল ওকে। তখন তখুনি জানতে ইচ্ছে হলো ব্যাপারটা। কিন্তু কাকা এক কথার মানুষ। নিজের কথার বাইরে এক পা-ও এগোন না। কৌতূহলটাকে আপাতত দমিয়ে রাখার জন্যে বিছানায় গেল রবিন। কিন্তু ঘুম এল না। বরং উত্তেজনা আরও বেড়ে গেল।

বিকেলের দিকে আচমকা বদলে গেল প্রকৃতি। ঝলমলে মিষ্টি রোদ মিলিয়ে গিয়ে সারা আকাশ ছেয়ে গেল ধূসর মেঘে। চারদিকে বাতাস উঠল শোঁ শোঁ। আলো যত কমছে বাতাসের বেগও তত বাড়ছে।

বিছানা ছেড়ে পেছনের একটা জানালায় এসে দাঁড়াল রবিন। সব ক'টা জানালা এখন বন্ধ। তবু পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে বাতাসের গর্জন। যেন দূরের ওই বন থেকে ভেসে আসছে অনেক অশরীরী ফিসফাস্। জহুর আলীর সেই কথাগুলো মনে পড়ে গেল। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল রবিনের। জানালা থেকে সরে নিচে নেমে এল ও।

খাওয়ার পাট চুকে গেলে যথারীতি দু'জনে আগুনের ধারে এসে বসল। আজ জীবনের এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা বললেন খালা। কিশোরে রাতে একবার কাকতাড়ুয়াকে ভূত মনে করে কেমন ভয় পেয়েছিলেন, রসিয়ে রসিয়ে তাই শোনালেন। রবিনের মন থেকে ভূতের ভয় দূর করার জন্যেই গল্পটা বলা। কিন্তু অন্যমনস্কতা বার বার গল্প থেকে দূরে নিয়ে গেল রবিনকে।

সাড়ে ন'টার দিকে নিজের ঘরে ফিরল রবিন। একটা রূপকথার বইয়ের কিছু অংশ বাকি ছিল, টেবিলে গিয়ে মনোনিবেশ করল সেটুকুতে। দশটার দিকে শেষ হয়ে গেল বইটা। আড়মোড়া ভেঙে একটা হাই তুলল রবিন। বিছানার আরাম ওকে চুম্বকের মত টানছে। কিন্তু প্রলোভনে সাড়া দিল না ও। ঘুমিয়ে পড়লে স্টাডিতে আর যাওয়া হবে না।

কিছুক্ষণ পায়চারি করে পেছনের একটা জানালায় এসে দাঁড়াল রবিন। প্রকৃতি এখন কিছুটা শান্ত। বাতাস এলোমেলো বইলেও তাতে বিকেলের সেই গর্জন নেই। পুবের টিলায় শিরীষ গাছগুলোর মাথার ওপর ঘিয়ে রঙা চমৎকার চাঁদ উঠেছে। চাঁদ তো নয় যেন মাখনের মণ্ড, মাটিতে গলে গলে পড়ছে। রবিন জানে না আজ মাঘী পূর্ণিমা। ওর জন্যে ভয়ঙ্কর এক রাত!

লেকের ধারে উবু হয়ে কি যেন ছুটোছুটি করছে। একটা নয়, দুটো। কাঠবেরালি হবে। কিন্তু কাঠবেরালির লেজ তো অনেক লম্বা এবং রোমশ। তাছাড়া এতরাতে এখানে কাঠবেরালির আসার কথা নয়। দিনের বেলায়ই ওরা গাছ থেকে নামতে চায় না। আরে ওগুলো তো এদিকেই আসছে। রবিনের জানালার ঠিক নিচে এসে থামল। ফুটফুটে চাঁদের আলোয় ইঁদুর দুটোকে স্পষ্ট দেখতে পেল ও। অস্বাভাবিক বড় ইঁদুর। অবাক কাণ্ড তো! ইঁদুর দুটোর গায়ে হঠাৎ সাদা কাপড় এল কোত্থেকে? চোখ দুটো ভাল করে কচলে নেয় রবিন। ইঁদুর দুটো এখন নেই। ওদের জায়গায় ভোজবাজির মত আবির্ভূত হয়েছে দুটো ছেলে। এত উঁচু থেকেও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ওদের মুখ। সুতীব্র একটা যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেছে মুখের চামড়া। চাপা গোঙানি বেরোচ্ছে কণ্ঠের গভীর থেকে। এই বিকৃত মুখ দুটোই পরশুরাতে স্বপ্নে দেখেছে ও। ছেলে দুটোর হাতে লম্বা লম্বা নখ। সেই নখগুলো দিয়ে গায়ের চাদর ফালি ফালি করে ফেলল তারা। উদোম হয়ে গেল তাদের পাংশুটে শরীর। দু'জনেরই বুকের বাঁ পাশে বড় বড় দুটো গর্ত। গলগলিয়ে পচা রক্ত বেরিয়ে আসছে ভেতর থেকে।

পুরো ব্যাপারটাই রবিনের জন্যে এক নারকীয় অভিজ্ঞতা। যেন সত্যিকার নরকের সিংহদ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে ও। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না। হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে পেছন পানে ছুটতে থাকে ও। ঘরের মাঝামাঝি এসে মসৃণ মেঝেতে পা হড়কে যায়। দড়াম করে চিৎ হয়ে পড়ে মেঝের ওপর। জ্ঞান হারায় সঙ্গে সঙ্গে।

এগারোটা বাজতে আর বেশি দেরি নেই। শেষবারের মত জিনিসগুলোর ওপর নজর বুলিয়ে নিলেন ইমরোজ জাহান। রুপোর ছোট বাক্স, কয়লা ভর্তি—পেতলের পাত্র, ধূপ-ধুনো, চর্বি, দেশলাই, হাতির দাঁতের বাঁট লাগানো আট ইঞ্চি ব্লেডের ছুরি, সব সাজানো আছে টেবিলে। ছুরির ধারটা আরেকবার পরীক্ষা করে রেখে দিলেন যথাস্থানে। তারপর প্রতিদিনের মত কাগজ-কলম নিয়ে বসলেন। গোটা গোটা অক্ষরে তিনি যা লিখলেন তার সার-সংক্ষেপ হচ্ছে:

'পুরাকালের লোকেরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, একটা নির্দিষ্ট নিয়মের ভেতর দিয়ে আত্মাকে একটা বিশেষ ব্যবস্থার ভেতর স্থানান্তর করে অলৌকিক শক্তি অর্জন করা যায়। এটা তাদের অযৌক্তিক ঠুনকো বিশ্বাস নয়, সাধনালব্ধ জ্ঞান। সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে ব্যাপারটাকে বর্বরোচিত কাজ মনে হতে পারে। কিন্তু আসলে এতে তিল পরিমাণ বর্বরতা নেই। এটা আত্মার এক জগৎ থেকে অন্য এক জগতে রূপান্তর মাত্র। এই অন্য জগতে এসে আশ্চর্য এক মহাশক্তি লাভ করে আত্মা। সেই শক্তির বলে পৃথিবীর প্রধান চার প্রাকৃতিক উপাদান ক্ষিতি

BanglaBook.org

(মাটি), অপ্ (পানি), তেজ (আগুন) এবং মরুৎ (বাতাস)-কে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা লাভ করা যায়। সাইমন ম্যাগনাসের রেকর্ড থেকে জানা যায়, বাতাসে উড়বার ক্ষমতা লাভ করেছিলেন তিনি। অদৃশ্য হওয়া এবং যে কোন রূপ ধারণ করার ক্ষমতাও ছিল তাঁর। একটি ছেলের আত্মা থেকে এই শক্তি অর্জন করেছিলেন তিনি। হারমেস ট্রিস মেজিস্টাস লিখেছেন তেরো বছরের কম বয়েসী তিনটি ছেলের হৃৎপিণ্ড থেকে বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে তিনিও এই শক্তি অর্জন করেছিলেন। গত বারো বছর ধরে আমি তাঁর পদ্ধতিই অনুসরণ করে আসছি। আমার প্রথম এক্সপেরিমেন্টের করপোরা ভিলিয়া ছিল একটা জিপসী ছেলে। রাস্তায় ঘুরে ঘুরে সে বেহালা বাজিয়ে গান করত, বাপ-মা কেউ ছিল না। কাজেই তার অন্তর্ধান কারও মনে কোন সন্দেহ জাগায়নি। কিন্তু চার বছর পর জিওভ্যানি পাওলি নামের ইটালিয়ান যে ছেলেটি আমার পাশের ফ্ল্যাট থেকে হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে গেল, তার অন্তর্ধান বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করল। তৎপর হয়ে উঠল স্থানীয় গোয়েন্দা বিভাগ। সন্দেহের আওতায় পড়বার আগেই পাততাড়ি গুটিয়ে সোজা ফিরে এলাম দেশে। পরের চার বছর ধরে প্রস্তুতি নিলাম চূড়ান্ত পর্বের জন্যে। আজ রবিনের হৃৎপিণ্ড পেলেই সফল হবে আমার এতদিনের সাধনা।'

লেখা শেষ করে অদ্ভুত এক তৃপ্তি লাভ করলেন ইমরোজ জাহান। সবগুলো পাতা মিলিয়ে বেশ পুরু একটা পাণ্ডুলিপি হবে। কম তো নয়, দীর্ঘ বারো বছরের লেখা! আজকের লেখাটা আসলে তাঁর এই পাণ্ডুলিপির ভূমিকা। সম্ভবত এটাই তাঁর জীবনের শেষ লেখা।

পাণ্ডুলিপিটা কোন প্রেসে পাঠাবেন না তিনি। সযত্নে রেখে দেবেন এক গোপন স্থানে। কোন সৌভাগ্যবান একদিন পেয়ে যাবে এই পাণ্ডুলিপি। আবার শুরু হবে গোপন সাধনা। সেও তৈরি করবে আরেকটা পাণ্ডুলিপি। অবশ্যি উল্টোটিও হতে পারে। সে লোক পুড়িয়ে ফেলতে পারে এই লেখা। কিন্তু ইমরোজ জাহান কল্পনায় শুধু সফল দিকটাই দেখে থাকেন। এখনও তাই দেখছেন। আবেশে চোখ বুজে এল তাঁর। রবিনের প্রতীক্ষায় চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে পড়ে রইলেন তিনি। ঠিক এমন সময় খোলা জানালা দিয়ে এক ঝলক পাগলা হাওয়া ঢুকল ঘরে। টেবিলের কাগজগুলো সব এলোমেলো করে উড়িয়ে নিয়ে চলল পেছনের সিঁড়ির দিকে। ইমরোজ জাহান ধড়মড়িয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে কাগজগুলোর পেছনে ছুটলেন। দেখতে দেখতে কাগজগুলো বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। তিনিও দরজা পেরিয়ে সিঁড়িটার মাথায় এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু কাগজগুলো এখন হাওয়ায় ভেসে উড়ে যাচ্ছে সোজা লেকের দিকে। পাগলের মত সিঁড়ি ভেঙে নামতে লাগলেন তিনি। হঠাৎ খেয়াল হলো, স্টাডি থেকে এ মুহূর্তে বের হওয়াটা একদম উচিত হয়নি। আজ ঘরের বাইরে পা বাড়ানো নিষেধ। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। সিঁড়ির ঠিক নিচেই জ্বলজ্বলে দৃষ্টি মেলে বসে আছে অস্বাভাবিক বড় একজোড়া ইঁদুর। আশ্চর্য! ইঁদুর এতবড় হয়?

পরদিন সিঁড়ির ওপর ঘাড় মটকানো অবস্থায় পাওয়া গেল ইমরোজ জাহানকে। তাঁর ভাঁজ ভাঁজ চেহারায় তীব্র বেদনার চিহ্ন। হাত দুটো প্রবলভাবে

BanglaBook.org

চেপে ধরেছে বুক। বুকের বাঁ দিকে বৃত্তাকার একটা গর্ত। বাইরে থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ভেতরে হৃৎপিণ্ডটা নেই। সমবেত লোকজন আর শহর থেকে আসা পুলিসেরা নিশ্চিত এটা কোন বন্য জন্তুর অপকর্ম। শুধু রবিন জানে আসলে ব্যাপারটা কি।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

পুবের পাহাড়

বিজনপুরের আকাশে রাত্রি নেমে আসছে। গোলাপী মেঘগুলো সারিবদ্ধ পাহাড় ডিঙিয়ে জড় হচ্ছে পশ্চিমের তামাটে নীল দিগন্তে। একটা নিঃসঙ্গ বাজ মরচে-রঙা পাখায় তীরের মত সরু এক চিলতে রোদ মেখে পাহাড় ছাড়িয়ে অনেক উঁচুতে ভেসে বেড়াচ্ছে আপন মনে। কোথাও কোন শব্দ নেই। পুরো এলাকাটাই যেন বেদনার রঙে আঁকা একটা নিখুঁত ছবি। ছবির মাঝে সহসা প্রাণ সঞ্চারিত হলো।

আকাশ পানে ধাঁই করা শিরীষ গাছগুলোর মাঝ দিয়ে যে পথটা পাহাড়ের বুক চিরে নেমে এসেছে, দুই ঘোড়ায় টানা একটা গাড়ি ছুটে আসছে সেপথ ধরে। যাত্রী মাত্র দু'জন। চালকের আসনে বসা লোকটা আকারে দশাসই, রুক্ষ চেহারা, বয়স পঞ্চাশের ওপর। নাম পাঞ্জা খাঁ। বেশভূষা দেখে মনে হয় ডাকাত সর্দার, অথচ এ লোক বিজনপুরের পঞ্চায়েত প্রধান। উত্তরাধিকার-সূত্রেই তিনি একশো একচল্লিশ একর জমির মালিক। এর মধ্যে রয়েছে তিরিশ লক্ষ টাকার শালবন, গবাদি পশুর বিশাল খামার আর ফসলের খেত। বিজনপুরে একাই থাকেন তিনি। স্ত্রী ছেলেমেয়েরা থাকে শহরে।

অপর যাত্রী বয়সে তরুণ। চাবুকের মত ছিপছিপে গড়ন, মাথায় লম্বা লম্বা কালো চুল, চেহারায় বিজলীর চমকের মত বুদ্ধিমত্তার বিচ্ছুরণ। নাম অরুণ।

অনেকক্ষণ ধরে কথা বলছে না কেউ। অরুণ এমনিতেই কথা কম বলে, তার ওপর সঙ্গীর কাছ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে আরও নীরব হয়ে গেছে। স্টেশনে পরিচয় হবার পর থেকে একটানা কথা বলে আসছিলেন পাঞ্জা খাঁ, পাহাড়ে ওঠার পর হঠাৎ চুপ হয়ে গেছেন। কেন, তা তিনিই জানেন। হয়তো একটানা কথা বলে ক্লান্ত, কিংবা গোধূলি লগ্নের বিষণ্নতায় স্তব্ধ। অরুণের বুকের ভেতরেও কেমন অজানা একটা চিনচিনে ব্যথা। সেই অনাদিকাল থেকে মানুষের মনে প্রভাব ফেলে আসছে প্রকৃতি।

ঘোড়ার গতি বাড়াবার জন্যে লাগামে সজোরে ঝাঁকুনি দিলেন পাঞ্জা খাঁ। অরুণের মনে হলো কিছু একটা বলা দরকার। গাড়ির চাকাগুলোর অবিরাম ঘড় ঘড় শব্দ বড্ড একঘেয়ে লাগছে। ঘোড়া দুটো যেন জ্যান্ত মানুষ নয়, শবের কফিন বয়ে চলেছে। চারদিকে একবার নজর বুলিয়ে নিয়ে অরুণ বলল, 'শীত শীত লাগছে!'

শুনে হাসলেন পাঞ্জা খাঁ। বুক ভরে মিষ্টি ঠাণ্ডা বাতাস টেনে নিয়ে বললেন, 'হেমন্তের এই শেষ দিনগুলো অমৃতের মত! ইচ্ছে করে রাতভর আকাশের নিচে

BanglaBook.org

দাঁড়িয়ে থাকি।'

'দুঃখিত, খাঁ সাহেব,' বেরসিকের মত বলল অরুণ। 'আমার কিন্তু সেরকম ইচ্ছে নেই। দশটার ট্রেনে অবশ্যই ফিরে যেতে হবে। কাজেই ঝটপট বিদেয় করলে খুশি হব।'

'আগে খামারে যাই তো, তারপর দেখা যাবে।'

মনে মনে প্রমাদ গুনল অরুণ। শেষমেশ বুড়োর আতিথেয়তার ফাঁদে না পড়লে হয়। কাল জরুরী একটা কেস আছে কোর্টে। সময়মত হাজির হতে না পারলে ভীষণ ক্ষতি হয়ে যাবে। বছর পাঁচেক হয় আইন পাস করে কোর্টে প্র্যাকটিস শুরু করেছে ও। প্রথম দু'বছর এক নামকরা প্রবীণ উকিলের সহকারী ছিল। এখন নিজেই আলাদা চেম্বার খুলেছে। নাম কিনতে বয়স লাগে না, প্রমাণ করেছে ও। দেওয়ানী আদালতে বেশ নাম-ডাক অরুণ ইমতিয়াজের। বছর খানেক আগে শহরের বিশিষ্ট শিল্পপতি ইসমত আহমেদ স্বয়ং এসে তাঁর আহমেদ গ্রুপ অভ ইণ্ডাস্ট্রিজের লিগ্যাল অ্যাডভাইজার হতে বললেন। লোভনীয় প্রস্তাবটা ফেলতে পারেনি অরুণ। স্বাধীন প্র্যাকটিসের পাশাপাশি মাস মাস মোটা একটা অঙ্ক আসবে—মন্দ কি?

ইসমত আহমেদের কাজেই বিজনপুর এসেছে অরুণ। মাসখানেক আগে একটা বহুল প্রচারিত দৈনিকে জমি বিক্রির বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন পাঞ্জা খাঁ। খণ্ড খণ্ড করে কিংবা একসঙ্গে চল্লিশ বিঘা ঘেসো জমি বেচে দেবেন তিনি। ইসমত আহমেদের ইচ্ছে পুরোটাই কিনবেন। প্রথমে চিঠির মাধ্যমে পাঞ্জা খাঁর সাথে যোগাযোগ করেছে অরুণ। দু'পক্ষের মধ্যে প্রাথমিক পত্রালাপের পর জমি দেখার দিন-তারিখ ঠিক হয়েছে।

আজ বিকেলের ট্রেনে স্টেশনে এসে পৌঁছে অরুণ। তারপর পাঞ্জা খাঁর ঘোড়াঘাড়িতে চড়ে জমি দেখতে বেরোয়। ঘুরে ফিরে দেখতে দেখতে সন্ধে। ভেবেছিল রাত দশটার ট্রেন ধরবে, এখন মনে হচ্ছে মাঝরাতের আগে স্টেশনে পৌঁছুনো যাবে না।

'জমি তো দেখলেন, এবার মতামতটা শুনি,' কাজের কথা পাড়লেন পাঞ্জা খাঁ।

জমিটা দেখতে এসে অরুণের কষ্ট পোহাতে হচ্ছে ঠিকই, তবে প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে কানায় কানায়। গাছ গাছালির প্রাচুর্যের মাঝে অপূর্ব কুমারী ভূমি এটা। ডেইরী ফার্মের জন্যে পুরোপুরি উপযোগী। ইসমত আহমেদের কাছে ভাল রিপোর্ট দেবে ও।

'কই, কিছু বলছেন না যে?' জানতে উৎসুক পাঞ্জা খাঁ।

অরুণ অকপটে বলল, 'জায়গাটা পছন্দ হয়েছে আমার।'

'শুনে খুশি হলাম।'

'কিন্তু দামটা বোধহয় একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে।'

'বলেন কি!' ভুরু কোঁচকালেন তিনি। 'আজকাল যে দামে এদিককার জমি বিকোচ্ছে সে তুলনায় আমার দাবি তো কিছুই না।'

BanglaBook.org

'বিঘা প্রতি পঞ্চাশ হাজার একটু বেশিই। মাস ছয়েক আগে এদিকে মস্তাজের চাতাল নামে যে জমিটা বিক্রি হয়েছে সেটার বিঘা প্রতি দাম পড়েছে মাত্র তেতাল্লিশ হাজার টাকা।'

অরুণের প্রতি মনোভাব বদলে গেল পাঞ্জা খাঁর। যতটা ভেবেছিলেন ততটা কাঁচা নয় এ তরুণ। জিজ্ঞেস করলেন, 'মস্তাজের চাতালের বেচা-কেনা সম্পর্কে আপনি কতটা জানেন?'

পাঞ্জা খাঁর দিকে তাকিয়ে হাসল অরুণ। বলল, 'এ বছর বর্ষার শেষে বিক্রি হয়েছে জমিটা। কিনেছেন সিকান্দার ইউসুফ নামে এক ভদ্রলোক। রেজিস্ট্রির তারিখ পঁচিশে আগস্ট।'

অরুণের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করলেন পাঞ্জা খাঁ। অরুণ হেসে বলল, 'ইসমত সাহেব তাঁর ভালমন্দ দেখার জন্যেই মাস মাস আমাকে বেতন দেন। আপনি হাজার রুষ্ট হলেও আমার কিচ্ছু করার নেই।'

রাগটা আর চেপে রাখতে পারলেন না পাঞ্জা খাঁ। ছেলেমানুষের মত চাপা স্বরে গজ গজ করলেন, 'ছোকরা উকিল দেখেই বুঝেছিলাম, ইসমত সাহেব একটা ডেকরা মোরগকে স্রেফ ডানা ঝাপটাতে পাঠিয়েছেন। তাঁকে অন্য উকিল ধরতে বলব আমি।'

পাঞ্জা খাঁর মত রূঢ় প্রকৃতির মানুষের কাছ থেকে এরচে' ভাল মন্তব্য আশা করা যায় না। তার এই ভর্ৎসনার মাঝে অরুণের বিচক্ষণতারই স্বীকৃতি লুকিয়ে।

অরুণ কি বলবে মনে মনে ভাবছে, এমন সময় ঘোড়া দুটো লাফিয়ে উঠল হঠাৎ। পরমুহূর্তে বিকট ডাক ছেড়ে পিছু হটতে লাগল। পাঞ্জা খাঁ এক লাফে নেমে গেলেন রাস্তায়। ত্বরিত এক মুঠো ধুলো নিয়ে বিড়বিড় করে কি সব বলে চারদিকে ছড়িয়ে দিলেন। ধূলিকণা মাটিতে পড়ার আগেই তীব্র একটা বাতাসের ঘূর্ণি দ্রুত গাড়ির পাশ কেটে মিলিয়ে গেল পেছনে। ততক্ষণে আবার আসনে ফিরে এসেছেন পাঞ্জা খাঁ। লাগামে ঝাঁকুনি দিতেই ঘোড়া দুটো ছুটতে শুরু করল।

অরুণ অবাক হয়ে শুধোল, 'ব্যাপারটা কি, খাঁ সাহেব?'

পাঞ্জা খাঁ সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে বললেন, 'আজকের রাতটা বুঝি আপনাকে থেকেই যেতে হয়।'

তাঁর কোমল কথায় কিসের যেন একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত। অরুণের খুব জানতে ইচ্ছে করল, কিন্তু পাঞ্জা খাঁর নিরাসক্ত ভাব দেখে দমে গেল। পাহাড় থেকে নিচে না নামা অবধি আর একটি কথাও বললেন না তিনি।

অরুণ যতটা কল্পনা করেছিল তারচে' অনেক বড় পাঞ্জা খাঁর খামার বাড়ি। চারদিকে টিনের বেড়া, ভেতরে মস্ত উঠন। উঠন ঘিরে অনেকগুলো চৌচালা ঘর। ঘরগুলোতে হারিকেন জ্বলছে।

উঠন পেরিয়ে সোজা নিজের ঘরে অরুণকে নিয়ে এলেন পাঞ্জা খাঁ। ঘরের সাথেই টিউবওয়েল বসানো বাথরুম। সেখান থেকে মুখহাত ধুয়ে এল দু'জন। ইতিমধ্যে চা-নাশতা হাজির। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে দলিল-দস্তাবেজ দেখতে চাইল অরুণ। পাঞ্জা খাঁ তার আয়রন-সেফ থেকে মোটা একটা ফাইল বের

BanglaBook.org

করলেন।

সম্পূর্ণ কাগজ দেখতে দেখতে ঘণ্টা দেড়েক লেগে গেল। অরুণ সন্তুষ্ট। কাগজ পত্রে কোন খুঁত নেই। দু'পক্ষের সামনাসামনি চূড়ান্ত আলোচনার দিন ঠিক করে খাওয়ার টেবিলে গেল ওরা। খোলা হাওয়ায় ঘোরাঘুরি করে বেশ খিদে পেয়েছে দু'জনের।

শাহী ভোজ অপেক্ষা করছিল অরুণের জন্যে। ঝকঝকে ডিম্বাকার টেবিলের মাঝখানে বড়সড় একটা বারকোশ। বারকোশে আস্ত মেষশাবকের রোস্ট। খাঁটি ঘিয়ে সাঁতলিয়ে ঝলসানো হয়েছে। ম ম গন্ধে জিভে পানি এসে গেল অরুণের। বড় দুটো থালায় ফুট খানেক উঁচু পরোটার স্তূপ। সাথে শসার সালাদ।

তৃপ্তির সাথে খাওয়া শেষ করল অরুণ। এবার বিদায়ের পালা। কিন্তু পাঞ্জা খাঁ নাছোড়বান্দা। কিছুতেই যেতে দেবেন না। তাঁর এক কথা, 'সকালের আগে কোন কথা শুনছি না আপনার।'

অরুণ অনেক করে বোঝাল, রাতটা থেকে গেলে ওর নিজের হয়তো তেমন ক্ষতি হবে না, কিন্তু সর্বনাশ হয়ে যাবে মক্কেলের। এক তরফা রায়ে গরীব বেচারার জমিটা বেহাত হয়ে যাবে।

মাথা নিচু করে মুহূর্ত কয়েক কি যেন ভাবলেন পাঞ্জা খাঁ। তারপর বললেন, 'আমি আসলে অন্য কারণে আপনাকে যেতে বারণ করছি। একে তো রাত, তার ওপর নির্জন রাস্তা, বলা যায় না পথে যদি কোন—'

খাঁ সাহেবকে কথা শেষ করতে দিল না অরুণ, 'ও নিয়ে ভাববেন না। আমার সাথে আগ্নেয়াস্ত্র আছে। আর আপনি শুনে খুশি হবেন শহরের সেরা পাঁচ শ্যুটারের মধ্যে আমি একজন।'

'কিন্তু—!'

'কোন কিন্তু নয়। আপনার আতিথেয়তা এবং আন্তরিক সহানুভূতির কথা ভুলব না কোনদিন। এবার অনুগ্রহ করে স্টেশনে পৌঁছার একটা ব্যবস্থা করে দিলে অত্যন্ত খুশি হব।'

'ঠিক আছে, যাবেনই যখন, যান। তবে যাত্রাটা তেমন সুবিধের হবে না। জানেন তো কোন মোটর বাইক বা যন্ত্রযান নেই আমার। সম্পূর্ণ সেকেলে ধাঁচে জীবন-যাপন করি।'

'তাতে অসুবিধে নেই। যেমন করে এলাম তেমনি ফিরে যাব। একটা কোচোয়ান আর ঘোড়াগাড়ি হলেই চলবে।'

খানিকটা বিব্রত হলেন পাঞ্জা খাঁ। লাজুক হাসি ফুটল ঠোঁটে, 'দুঃখিত, আমাকে ক্ষমা করতে হবে। গলা কেটে ফেললেও এই রাত করে এক বেটাও গাড়ি নিয়ে বেরোবে না। স্টেশনে পৌঁছুবার জন্যে শুধু একটা উপায়ই আছে এমুহূর্তে। তা হচ্ছে ঘোড়ার পিঠ। অবশ্যি আমি খামারের সেরা ঘোড়াটাই দেব আপনাকে। উল্কা যেমন তেজী তেমনি সুবোধ। আপনি শুধু শক্ত করে লাগাম ধরে বসে থাকবেন, ঝড়ের বেগে আপনাকে স্টেশনে পৌঁছে দেবে সে। স্টেশনে আমার যে আড়তটা আছে, ওখানে ঘোড়াটা রেখে চলে যাবেন।'

BanglaBook.org

উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল অরুণ। বলল, 'যদিও ঘোড়ায় চড়ার অভ্যেস নেই, তবু মনে হচ্ছে চমৎকার হবে যাত্রাটা। তাছাড়া এতে রোমাঞ্চেরও একটা আমেজ আছে।'

খাঁ সাহেবের নির্দেশে আস্তাবল থেকে লাল একটা ঘোড়া বের করে আনল সহিস। ঘোড়াটা সাধারণ দেশী ঘোড়ার তুলনায় বড়। হৃষ্ট-পুষ্ট শরীর। নিয়মিত পরিচর্যার চিহ্ন দেহের প্রতিটা ইঞ্চিতে। রোমগুলো সুন্দর করে ছাঁটা। দেখেই বোঝা যাচ্ছে প্রচুর শক্তি রাখে।

উল্কাকে লাগাম আর জিন পরানো হলে বিদেয় নেয়ার জন্যে তৈরি হলো অরুণ। পাঞ্জা খাঁ একটা টর্চ দিতে চাইলেন সাথে। অরুণের ঝামেলা মনে হলো। ধন্যবাদ দিয়ে বলল, 'চাঁদনী রাতে আবার টর্চ দিয়ে কি হবে?'

পাঞ্জা খাঁ বললেন, 'ঠিক আছে, টর্চ দেব না। তবে এই ধুলোভরা থলেটা আপনাকে নিতেই হবে। রাতে ওসব বলা নিষেধ না থাকলে সব আপনাকে খুলে বলতাম। এখন শুধু এইটুকু বলব, এই ধুলো যতক্ষণ আপনার সাথে থাকবে খোদার কৃপায় কোন অমঙ্গল আপনাকে স্পর্শ করতে পারবে না। পথে সেরকম কোন অবাস্তব কিছু দেখলে থলে থেকে ধুলো বের করে চারদিকে ছিটিয়ে দেবেন। ব্যস, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এবার আসুন। খোদা হাফেজ।'

খাঁ সাহেবের সাথে করমর্দন করে ঘোড়ায় উঠল অরুণ। তিনি ঘোড়ার গলা চাপড়ে দিয়ে বললেন, 'সওয়ারীকে স্টেশনে ভালমত পৌঁছে দিস, উল্কা। দেখিস, যেন কষ্ট না হয় ওঁর।'

আশ্চর্য, মাটিতে পা ঠুকল উল্কা! যেন মনিবের কথা বুঝতে পেরেছে।

লাগাম ধরে ঝাঁকুনি দিতেই এগোতে শুরু করল উল্কা। ধীর পায়ে হেঁটে হেঁটে উঠন পেরোল। এই সময়টুকুর মধ্যে সহিস অরুণকে ঘোড়া চালাবার বিভিন্ন কৌশলগুলো শিখিয়ে দিল। ভাল করে বুঝিয়ে দিল ছুটন্ত অবস্থায় ঈষৎ কুঁজো হয়ে কিভাবে বসে থাকতে হবে।

খামারের গেট পেরিয়ে একটু দাঁড়াল উল্কা। নাক উঁচু করে বাতাসে কি যেন শুঁকল। তারপর চঞ্চল হয়ে উঠল তার চার পা। রাস্তায় এসে শুরু হলো খুরের দাপট। ধুলো উড়িয়ে দুর্বার বেগে ছুটে চলল সে।

নিজের ভেতর কেমন একটা চপলতা অনুভব করল অরুণ। এটাই যে ওর প্রথম ঘোড়ায় আরোহণ তা নয়। কৈশোরে দু'একবার এ অভিজ্ঞতা হয়েছে ওর। তবে মায়াবী চাঁদনী রাতে একাকী এমন করে কখনও ঘোড়া ছোটায়নি। অদ্ভুত এক ভাল লাগায় মনটা ভরে গেছে অরুণের। মনে হচ্ছে ও যেন এক অচিন দেশের রাজপুত্তুর, মায়াপুরীতে ছুটে চলেছে রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে। এই সুন্দর স্বপ্নবিলাসের মাঝে ধুলোর থলেটাকে অবাঞ্ছিত মনে হলো। পাঞ্জা খাঁর ইঙ্গিত যে ও একেবারে বোঝেনি তা নয়। তবে ওসব আজেবাজে কুসংস্কার নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন ইচ্ছেই ওর নেই। এমন স্বপ্নছাওয়া রাতে যদি সেরকম অবাস্তব কিছু আসে আসুক, সুন্দরের পাশে যদি অসুন্দর নাই থাকে তাহলে সৌন্দর্যের আসল রূপই তো দেখা হবে না।

ধুলোর থলেটা ফেলে দিল অরুণ। নিজেকে এখন হালকা লাগছে ওর। এতক্ষণ যেন একটা দুর্বহ বোঝা বয়ে আসছিল। লাগামে ঝাঁকুনির পর ঝাঁকুনি দিয়ে ঘোড়ার গতি বাড়াল ও। উল্কার মতই ছুটে চলল উল্কা। যেন এখুনি দুটো পাখা বেরিয়ে আসবে তার পিঠের দু'পাশ থেকে। তারপর উড়াল দেবে শূন্যে।

চাঁদ এখন প্রায় মাঝগগনে। ঠিক একটা রুপোর থালার মত লাগছে। বুক উজাড় করে আলো ঢালছে ঘুমন্ত পৃথিবীর বুকে। উছলে পড়া আলোতে ভেজা ভেজা দেখাচ্ছে গাছের পাতা। ধুলো ভরা সর্পিল পথটাকে মনে হচ্ছে দুধে ধোয়া নদী।

উল্কা এখন পাহাড় বেয়ে উঠছে। পাহাড় পেরোলে স্টেশন আর মাইল দুয়েক। চূড়ো থেকে স্টেশনের আলো দেখা যায়।

পাহাড়ের মাঝামাঝি এসে হোঁচট খেল উল্কা। লাফিয়ে উঠে পতন ঠেকাল। পরমুহূর্তে বিপজ্জনক ভঙ্গিতে পিছু হটতে লাগল। ঘাবড়ে গেল অরুণ। উল্কার পিঠ থেকে পড়ে গেলে সর্বনাশ! ধরণীর বুকে আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে না। শক্ত করে লাগাম টেনে ধরল ও। রেকাব পরা ডান পায়ের গোড়ালি দিয়ে বেশ ক'বার গুঁতো মারল উল্কার পেটে। কোন কাজ হলো না। বরং উল্কা আরও দ্রুত পিছু হটতে লাগল। যেন কোন কিছু দেখে হঠাৎ ভয় পেয়েছে ঘোড়াটা। বাঁ দিকের বন থেকে আচম্বিতে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডাক ছাড়ল একটা নিশাচর পাখি। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত থরথরিয়ে কেঁপে উঠল উল্কা। সজোরে ঝাঁকুনি দিয়ে রাস্তার পাশে ফেলে দিল অরুণকে। তারপর উল্টোদিকে ঘুরে তুফান বেগে ছুটতে শুরু করল।

ভাগ্য ভাল অরুণের। কাঁটাবিহীন কোমল ঝোপের ওপর পড়েছে। ফলে শরীরে কোন চোট পায়নি। আর নিচের দিকে গড়িয়ে পড়া থেকেও রক্ষা পেয়েছে। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল ও। সুন্দর একটা স্বপ্ন ভঙ্গের হতাশা ওর চোখেমুখে। বাকি পথটুকু হেঁটেই যেতে হবে। কাপড়ের ধুলোময়লা ঝেড়ে একরাশ বিরক্তি নিয়ে সামনের দিকে এগোল ও।

মিনিট পাঁচেক হাঁটার পর অরুণ টের পেল পথ হারিয়ে ফেলেছে ও। উল্টোদিকে ঘুরতে যাবে, ঠিক তখুনি আলোর বিন্দুগুলো চোখে পড়ল। দূরে এক জায়গায় তিন-চারটে আলোর বিন্দু। দিনে যখন ওরা এদিকটায় ঘুরে বেড়িয়েছে জনমানবের চিহ্নও চোখে পড়েনি। এখন দিব্যি বাতি দেখা যাচ্ছে। তাহলে এটা কি পাঞ্জা খাঁর কথানুযায়ী সেরকম অবাস্তব কিছু? প্রশ্নটা উঁকি দিতেই অরুণের মনে পড়ল, আসার পথে ঘোড়া দুটো যেখানে লাফিয়ে উঠেছিল, ঠিক একই জায়গায় হোঁচট খেয়েছে উল্কা। কিন্তু ওর যুক্তিবাদী মন এসব অবাস্তব বলে মেনে নিতে পারল না। ঘোড়ার ব্যাপার দুটো কাকতালীয় মনে হলো। অবশ্যি সূক্ষ্ম কাঁটার মত একটা সন্দেহ রয়েই গেল ভেতরে। সন্দেহ আর কৌতূহল মিলে আলোর বিন্দুগুলোর রহস্য ভেদ করার একটা অদম্য ইচ্ছে জাগিয়ে তুলল অরুণের মনে। শার্টের ভেতর শোল্ডার-হোলস্টারে পয়েন্ট থ্রী-টু ওয়েবলি অ্যাণ্ড স্কটের স্পর্শ নিল ও। এটা থাকতে ভয় কি?

ঝরে পড়া শুকনো পাতা মাড়িয়ে, হালকা ঝোপঝাড় ডিঙিয়ে, বিশাল বিশাল

BanglaBook.org

গাছগুলোকে পাশ কাটিয়ে আলোর বিন্দুগুলোর দিকে এগোল অরুণ।

মিনিট পনেরো পর একটা পুরানো চকমিলান বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল ও। চারদিকে ফুট দশেক উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বাড়িটা। মাঝখানে মোটা মোটা শিক লাগানো প্রশস্ত লোহার ফটক। যেন সত্যি সত্যি মায়াপুরীর প্রবেশ দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে ও।

বন্ধ গেটে আস্তে করে ধাক্কা দিল অরুণ। মৃদু ধাক্কা গায়ে মাখল না ভারি পাল্লা দুটো। জোরে ঠেলা দিতেই ক্যাঁচম্যাচ শব্দে দু'ফাঁক হলো ফটক। দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল অরুণ।

সামনে ঘাস ছাওয়া বিরাট উঠন, তারপর প্রাচীন স্থাপত্যে তৈরি টারেট বসানো দোতলা দালান। জায়গায় জায়গায় পলস্তারা খসা ছ্যাতলা পড়া দেয়ালের এখানে সেখানে বড় বড় ফাটল। ফাটলগুলোতে বট-পাকুড়ের চারা মনের সুখে বেড়ে উঠছে।

খটাং—খট্! চমকে উঠে পেছন ফিরল অরুণ। ফটকের পাল্লা দুটো আপনা আপনি বন্ধ হয়ে গেছে। ত্রস্ত পায়ে গেটের কাছে ছুটে গেল ও। কেউ নেই আশেপাশে, অথচ পাল্লা দুটো এক করে লোহার বারটা বসিয়ে দেয়া হয়েছে। বারটা তোলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো অরুণ। অসম্ভব ভারি। যেন মন্ত্র বলে আটকানো হয়েছে বারটা।

ঠিক ভয় নয়, এক ধরনের আড়ষ্টতা পেয়ে বসল অরুণকে। অনেকটা যন্ত্রচালিতের মত ভেতরের দিকে এগোল ও।

নিচের ঘরগুলো অন্ধকার। দোতলার তিনটে ঘরে হলদেটে মৃদু আলো। উঠনে দাঁড়িয়ে চেঁচাল অরুণ, 'ভেতরে কেউ আছেন?'

দেয়ালে দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হলো ওর কণ্ঠ, কিন্তু কারও কোন সাড়া মিলল না। দ্বিধায় পড়ে গেল অরুণ, কি করবে বুঝতে পারছে না। এমন সময় দোতলার টানা বারান্দার রেলিঙে ভর দিল একটা ছায়ামূর্তি। ভাবলেশহীন কণ্ঠে বলে উঠল, 'ডান দিকের খিলান ঢাকা পথ ধরে এগোলে দোতলার সিঁড়ি পাবেন। চলে আসুন।'

সম্মোহিতের মত ডান দিকের আর্চওয়ের দিকে এগোল অরুণ। কারুকাজ করা মোটা মোটা থাম বসানো দু'ধারে, ওপরে সুদৃশ্য খিলান। বড্ড সুশীতল আর সুনসান পথটা।

আর্চওয়ের শেষ মাথায় লোহার একটা পেঁচানো সিঁড়ি। সিঁড়িটা কোন দরজায় গিয়ে শেষ হয়নি। একেবারে ফ্লোর ভেদ করে উঠতে হয়। প্রশস্ত বারান্দায় পা রাখতেই লম্বা-চওড়া এক প্রৌঢ় এগিয়ে এলেন। চাঁদের আলোতে অরুণ যতটা দেখতে পেল তাতে বনেদী বলেই মনে হল তাঁকে।

প্রৌঢ়কে সালাম দিয়ে অরুণ বলল, 'পরিচয়ের আগে অনধিকার প্রবেশের জন্যে আমি ক্ষমা প্রার্থী।'

প্রৌঢ় সালামের কোন জবাব না দিয়ে নিরাসক্ত কণ্ঠে বললেন, 'ক্ষমা চাওয়ার কিছু নেই। এ বাড়ির দ্বার পথচারীদের জন্য অবারিত। আসুন আমার সাথে।'

BanglaBook.org

প্রৌঢ়ের সাথে সামনের বারান্দায় চলে এল অরুণ। তারপর বারান্দা পেরিয়ে মাঝারি আকৃতির একটা ঘরে ঢুকল। ছাদের নিচে সুদৃশ্য একটা কাঁচের মোমদানী ঝুলছে। অনেকগুলো মোমের নরম হলুদ আলোতে সাড়া ঘর আলোকিত প্রৌঢ়কে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিল অরুণ। বেশভূষা খুবই দামী। কোর্তার বোতামগুলো সোনার, ধুতির পাড়ে সোনালী কারুকাজ। মোমের আলোতে চকচক করছে পালিশ করা কালো জুতো। খুব সম্ভব ইনিই বাড়ির মালিক। তাঁর অভিজাত চেহারায় চাপা একটা নির্দয়ভাব। মাথায় একটা চুলও নেই, কাঁচাপাকা ঘন ভুরু জোড়া যেন কপালের দু'পাশে দুটো গোঁফ, অন্তর্ভেদী শীতল চোখ দুটোতে অজানা এক তৃষ্ণা, ছোরার মত লম্বাটে নাকের নিচে এক জোড়া পাকানো গোঁফ, দৃঢ়ভাবে সেঁটে থাকা ঠোঁট দুটিতে যেন জমে আছে রাজ্যের আক্রোশ। সহসাই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল অরুণের। কেন জানি মনে হলো প্রৌঢ়ের আক্রোশটা ওর ওপরই।

ঘরের এককোণে একটা গোল টিপয়। টিপয় ঘিরে লাল মখমল মোড়া গদি আঁটা চারটে চেয়ার। সেদিকে এগোল দু'জন। অরুণকে বসতে বলে মুখোমুখি আরেকটা চেয়ারে বসলেন প্রৌঢ়।

অরুণ অনেকটা যেন বাধ্য ছেলের মতই বসে পড়ল।

'হ্যাঁ, এবার বলুন আপনার জন্য কি করতে পারি?' প্রৌঢ়ের কণ্ঠে আন্তরিকতার চিহ্নমাত্র নেই।

অরুণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিজের পরিচয় দিয়ে খুলে বলল সব। বিজনপুরে আসার উদ্দেশ্য থেকে শুরু করে কৌতূহলী হয়ে এদিকে আসা পর্যন্ত কিছুই বাদ দিল না। শেষে বলল, 'এখন দয়া করে ফটক খোলার একটা ব্যবস্থা করলে রওনা হতে পারি।'

প্রৌঢ় সেই একঘেয়ে কণ্ঠে বললেন, 'এসেই যখন পড়েছেন, রাতটা অন্তত থেকে যান। সকালে না হয় রওনা দেবেন।'

অরুণ ওর অসুবিধের কথা বুঝিয়ে বলল। যে করেই হোক রাতের মধ্যেই শহরে পৌঁছুতে হবে।

প্রৌঢ় মাথা ঝাঁকালেন, 'ঠিক আছে, রাতেই স্টেশনে পৌঁছে দেব আপনাকে। তবে একটু অপেক্ষা করতে হবে। বিশেষ এক কাজে পাঠিয়েছি আমার টাঙ্গা, এখানে বারোটার আগে পৌঁছুবে না।'

'ধন্যবাদ, টাঙ্গা লাগবে না। বাইরে ফুটফুটে জোছনা, বাতাসও ফুরফুরে, হাঁটতে ভালই লাগবে আমার।'

চেহারা কঠিন হয়ে গেল প্রৌঢ়ের। কাটা কাটা স্বরে বললেন, 'আগের সেই জাঁক জমক না থাকলেও বিগ্রহ রায়ের মনমানসিকতা এতটুকু বদলায়নি। যে কোন আগন্তুককে সাধ্যমত সহযোগিতা করার চেষ্টা করি আমি।'

অপ্রস্তুত হলো অরুণ। ভেতরে ভেতরে প্রৌঢ় এতটা অনুভূতিপ্রবণ বুঝতে পারেনি। তাঁর আভিজাত্যে ঘা দেয়ার কোন ইচ্ছেই ছিল না ওর। হেসে পরিবেশটা হালকা করার চেষ্টা করল ও। বলল, 'দুঃখিত, আমি আসলে ওভাবে বলিনি। ঠিক আছে, আপনার টাঙ্গা এলেই রওনা হব।'

BanglaBook.org

প্রৌঢ়ের অটল গাম্ভীর্যে কোন ফাটল ধরল না। ভারি কণ্ঠেই বললেন, 'আপনি বিশ্রাম নিন। আমি একটু ভেতর থেকে আসছি।'

উত্তর দিকের দেয়ালের মাঝ বরাবর একটা ভেজানো দরজার দিকে এগোলেন তিনি। কবাট খুলে ভেতরে ঢুকে সশব্দে আটকালেন দরজা। তার জুতোর ছন্দময় শব্দ ভেসে আসতে লাগল। সিঁড়ি ভেঙে নেমে যাচ্ছেন কোথাও।

মিনিট পাঁচেক চুপচাপ বসে থেকে উঠে দাঁড়াল অরুণ। ঘুরে ফিরে দেখতে লাগল ঘরটা। ভেতরের দেয়ালগুলো বাইরের দেয়ালগুলোর মত অমন জরাগ্রস্ত নয়। মাত্র কয়েক জায়গায় সরু ফাটল। বহু পুরানো একটা দেয়াল-ঘড়ি আর বিগ্রহ রায়ের একটা লাইফ-সাইজ পোর্ট্রেট ছাড়া আর কোন সাজসজ্জা নেই দেয়ালে। ছবিতে বিগ্রহ রায় খাঁজ-কাটা চাবুক হাতে রাগী ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। ঘড়িতে এগারোটা বেজে পঁচিশ মিনিট। তবে পেণ্ডুলাম থেমে আছে। মনে হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে অকেজো।

ঘরে টিপয় এবং চেয়ারগুলো ছাড়া আর কোন আসবাব নেই। মেঝে ভর্তি রাজ্যের ধুলো। কতদিন ঝাঁট দেয়া হয় না কে জানে?

ব্যাপারটা অবাক করল অরুণকে। চেয়ার টেবিল ঝকঝকে, দেয়াল-ঘড়ি আর পোর্ট্রেটেও কণা পরিমাণ ধুলো নেই, অথচ মেঝেটা নোংরা! যেন নিতান্ত দরকার বলেই ঘড়ি, ছবি আর চেয়ার-টেবিল পরিষ্কার রাখা হয়েছে।

'আপনার চা!'

একটা বিদঘুটে কণ্ঠস্বর চমকে দিল অরুণকে। যেন প্রবলভাবে চেপে ধর গলা থেকে বেরোতে গিয়ে থেঁতলে গেছে কথাগুলো।

কালো ঘাগরা পরা বেঁটে, স্থূলকায়া এক কুৎসিত মহিলা এসে দাঁড়িয়েছে খুব সম্ভব এ বাড়ির দাসী। মহিলার পোশাক আর গায়ের রং প্রায় একই। রক্তা দুটি চোখে সরীসৃপের দৃষ্টি। মুখভর্তি দগদগে ঘা। বোটকা একটা গন্ধ আসছে গ থেকে। গা ঘিন ঘিন করে উঠল অরুণের। আপদটাকে বিদেয় করার জন ঝটপট কাপটা নিয়ে নিল ও।

দাসী চলে যেতেই কাপটা টিপয়ে নামিয়ে রাখল অরুণ। কেটে ফেললেও চা গলা দিয়ে নামবে না ওর। ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠল অরুণ। অল অপেক্ষা একদম সহ্য হয় না ওর। বড্ড রাগ হলো নিজের ওপর। অত কৌতূহ হবার দরকারটা কি ছিল?

কোথায় যেন গুম্ গুম্ শব্দ হচ্ছে। মনে হচ্ছে পাশের ঘরেই। ক্রমশ জোর হচ্ছে শব্দটা। পশ্চিমের খোলা দরজাটার দিকে এগোল অরুণ। খানিকটা দ্বিধা-দ্ব নিয়ে পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল ভেতরে এ ঘরেও অনেকগুলো মোম জ্বলছে ছাদে নিচে। ঘরে কেউ নেই। উত্তরের দেয়ালের ভেতর থেকে আসছে শব্দটা। এগি গিয়ে লোহার ভেজানো দরজায় কান ঠেকাল অরুণ। আরও স্পষ্ট হলো শব দরজার কড়া অনেকক্ষণ ঝাঁকাল ও। চেঁচাল বার কয়েক। কেউ সাড়া দিল ন অনেকটা নিরাশ হয়েই দরজায় ধাক্কা দিল ও। অমনি হাট করে খুলে গেল দরজ একটা লোহার সিঁড়ি দরজার গোড়া থেকে সোজা নেমে গেছে নিচে। শেষ হয়ে

BanglaBook.org

একটা আবদ্ধ ঘরে। অনেকগুলো মশাল জ্বলছে ঘরটায়। বিশালদেহী ক'জন মানুষ একটা মঞ্চ তৈরি করছে। হাতুড়ি-কাঠের ঠকাস্ ঠকাস্ ঠোকাঠুকি অতদূর থেকে গুম্ গুম্ প্রতিধ্বনি তুলছে। লোকগুলোর নজর কাড়বার জন্যে নানাভাবে ডাকল অরুণ, কিন্তু পলকের তরেও ফিরে তাকাল না কেউ। যেন সবাই এক একটা কলের পুতুল, আড়ালে বসে অসীম শক্তিধর কেউ কলকাঠি নেড়ে চালাচ্ছে ওদের।

নিচে নামবার জন্যে সিঁড়ির দিকে এগোল অরুণ, ঠিক তখুনি দড়াম করে আটকে গেল দরজা। অল্পের জন্যে নাকমুখ রক্ষা পেল ওর। পিছিয়ে এসে বড় করে শ্বাস টানল ও। হঠাৎ করেই বড্ড অসহায় বোধ করল। মনে হলো একটা গভীর ষড়যন্ত্র যেন দানা বেঁধে উঠছে ওকে ঘিরে। নিজেকে সাহস দিল অরুণ, এভাবে ভেঙে পড়লে চলবে না, দেখাই যাক না কি হয়।

আলোকিত তৃতীয় ঘরটায় ঢুকল ও। ঠিক ওর মুখোমুখি দেয়ালে বিশাল একটা বুকশেল্ফ। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত প্রতিটা তাকে সারি সারি বইয়ে ঠাসা। অবাক হলো অরুণ। এই প্রেতপুরীতে এমন দৃশ্য বড়ই বেমানান। বইগুলো নেড়েচেড়ে দেখার জন্যে একটা তাকের দিকে এগোল ও। মোটা একটা বই টেনে বের করল। অমনি বইয়ের আড়াল থেকে লাফিয়ে নামল একটা ধাড়ি ইঁদুর। মেঝেতে পড়েই ভোঁ দৌড়। লাফ দেয়ার সময় মেঝেতে এক টুকরো কাগজ ফেলেছে ইঁদুরটা। কাগজটা তুলে নিল অরুণ। তাতে গোটা গোটা কালো অক্ষরে লেখা—

'আপনার সামনে ভয়ংকর বিপদ! আপনাকে স্টেশনে পৌঁছে দেয়ার জন্যে কোন টাঙ্গা এসে পৌঁছুবে না। ঠিক মধ্যরাতে অপদেবতার উদ্দেশ্যে বলি দেয়া হবে আপনাকে। গুপ্তকুঠুরির ওই দৈত্যাকার কালো পুতুলগুলো বিগ্রহ রায়ের আজ্ঞাবহ দাস। মনিবের নির্দেশে যজ্ঞের আয়োজনে ব্যস্ত। হাতে সময় বেশি নেই, নইলে সব খুলে বলতাম। বাঁচতে চাইলে এক্ষুণি আপনাকে দেয়াল-ঘড়িটা ভাঙতে হবে। কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব না করে এক্ষুণি! বারোটা বেজে গেলেই সর্বনাশ!'

'এই যে শুনছেন!'

অদ্ভুত একটা সুরেলা কণ্ঠ চমকে দিল অরুণকে। পেছন ফিরতেই চোখ ধাঁধিয়ে যাবার উপক্রম হলো। এত সুন্দর মেয়ে জীবনে এই প্রথম দেখল ও। কাঁচা সোনার মত গায়ের রঙ, কুঞ্চিত চুলে কালো মেঘের প্রাচুর্য, কাজলকালো আয়ত চোখ দুটোতে পদ্ম-দীঘির গভীরতা, নাকটা যেন প্রচুর সময় নিয়ে গড়েছেন ঈশ্বর, টুকটুকে পাতলা ঠোঁট জোড়ায় পৃথিবীর সব অমৃত যেন জড় হয়ে আছে। রুপোলী চুমকি বসানো ধবধবে সাদা গাউনে অপূর্ব লাগছে তাকে। স্বর্গের অপ্সরীরা কি এর চেয়েও সুন্দর?

'আপনার হাতেও দেখছি একই রকম কাগজ,' চাপা উৎকণ্ঠা অপরূপার কণ্ঠে। 'ওটাতেও নিশ্চয়ই ঘড়িটা ভাঙার কথা লেখা?'

'হ্যাঁ,' মন্ত্রমুগ্ধের মত বলল অরুণ।

'কিন্তু সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও ঘড়িটা ভাঙার মত কিছু পেলাম না।

BanglaBook.org

আর ঘড়িটা এত উঁচুতে যে হাতও পৌঁছে না। ভাবছি বইগুলো ছুঁড়ে মারব কিনা?

'তার দরকার হবে না। আমার কাছে রিভলভার আছে। কিন্তু আপনি এখানে এলেন কি করে?'

'সে অনেক কথা,' হাসল অপরূপা। মোমের আলোতে ঝিলিক দিয়ে উঠল তার মুক্তোদানার মত দাঁত। 'আগে আমাদের এই প্রেতপুরী থেকে উদ্ধার পাবার চেষ্টা করা উচিত নয় কি?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই, কিন্তু ঘড়িটা তো অচল।'

'আমি কি তাহলে ভুল দেখেছি?' অনেকটা স্বগতোক্তির মত শোনাল। 'চলুন তো দেখি।'

অপরূপার সাথে এগোল অরুণ। ফিরে এল প্রথম ঘরটায়। ঘড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল দু'জন। ছন্দময় ভঙ্গিতে দোল খাচ্ছে পেণ্ডুলাম। মিনিটের কাঁটা এগিয়েছে আরও তিরিশ ঘর। নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকাল অরুণ। ওর ঘড়িতেও একই সময়। এগারোটা পঞ্চান্ন। তারমানে পেণ্ডুলাম অচল থাকা অবস্থায়ও ঘড়ি সচল ছিল। এটা কি করে সম্ভব?

এদিকে উত্তরের বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে জুতোর ভারি শব্দ আসছে। সিঁড়িতে ধীরে ধীরে পা ফেলে উঠে আসছে কেউ। পোর্ট্রেটের ওপর চোখ পড়তেই রক্ত হিম হয়ে এল অরুণের। চোখের সামনে অবিশ্বাস্য কাণ্ড! ভুরু কুঁচকে ফেলেছেন বিগ্রহ রায়। প্রবল আক্রোশে বিকৃত হয়ে গেছে চেহারা। রাশি রাশি ঘৃণা বিচ্ছুরিত হচ্ছে দু'চোখের বিষদৃষ্টি থেকে। যেন এক্ষুণি ছবি থেকে বেরিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়বেন চাবুক হাতে।

বারোটা বাজতে আর এক মিনিট বাকি। দরজার ওপাশে জুতোর শব্দ থেমে গেছে। যে কোন মুহূর্তে ঝট করে খুলে যাবে দরজা। আর দেরি নয়—ভেতর থেকে তাড়া অনুভব করল অরুণ। শোল্ডার হোলস্টার থেকে ত্বরিত রিভলভারটা বের করল ও। ঘড়ির ডায়ালের মাঝ বরাবর একটা গুলি করল। বিকট ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে আর্তনাদ করে উঠল ঘড়িটা। পরমুহূর্তে দেয়াল থেকে খসে পড়ে চুরমার হয়ে গেল। শব্দের প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যেতে না যেতে অকস্মাৎ কেঁপে উঠল সারা বাড়ি। ক্রমশ বেড়েই চলল কম্পন—যেন প্রলয়ংকরী ভূমিকম্প শুরু হয়েছে। চারদিকে অজস্র ভাঙচুরের শব্দ। দিশে হারাবার মত অবস্থা।

কাঁধে ঝাঁকুনি খেয়ে চমক ভাঙল অরুণের। অপরূপা ওকে বাইরে বেরোবার জন্যে তাড়া দিচ্ছে। তার হাত ধরে দৌড়ুল অরুণ। বারান্দা পেরোবার সময় বেশ ক'বার পতন সামলাতে হলো। লোহার পেঁচানো সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নিচে নেমে এল ওরা। আর্চওয়ে পেরোবার সময় ওপর থেকে বড় বড় পাথরের টুকরো খসে পড়তে লাগল। সম্পূর্ণ অলৌকিকভাবে বেঁচে গেল দু'জন। উঠন পেরোবার সময় অরুণ টের পেল পেছনে বিশাল দালানটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ছে। লোহার ফটক থেকে বারটা উধাও। খুব সহজেই ফটক পেরোল ওরা। পরমুহূর্তে বিকট শব্দে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল ফটকটা। পাঁচিলটা টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

BanglaBook.org

প্রেতপুরী থেকে বেরোবার পরেও থামল না ওরা। দৌড়ে গেল অনেকদূর। বনের ভেতরে একটা খোলা চত্বরে এসে হাঁপাতে লাগল দু'জন। অরুণ এখনও হাত ছাড়েনি অপরূপার। কিছুটা ধাতস্থ হতেই ও অনুভব করল মেয়েটার হাত বরফের মত ঠাণ্ডা। তড়িতাহতের মত হাতটা ছেড়ে দিল ও। মেয়েটা কি বুঝল, হাসি লুকিয়ে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াল।

অনেকগুলো প্রশ্ন একসঙ্গে উঁকি দিল অরুণের মনে। মেয়েটা এত রাতে বনের ভেতর কেন? বন দূরের কথা, গভীর রাতে কোন অভিজাত পরিবারের মেয়ের ঘর ছেড়ে বাইরে বেরোবার কথা চিন্তাই করা যায় না। তাছাড়া সাহসটাও খুব বেশি। যত আধুনিকাই হোক, বাঙালী মেয়েদের এতটা সাহস সচরাচর দেখা যায় না। সবচে' বড় কথা আশেপাশে কোন লোকালয় নেই। কিন্তু দ্বিধায় পড়ল অরুণ। এখনও পরিচয়ই হয়নি, আগেই এতসব জিজ্ঞেস করাটা কি ঠিক হবে? তারচে' বরং এগোতে এগোতে আলাপে-সালাপে জানা যাবে সব।

'চলুন, সামনের দিকে এগোই,' ভাবনা থেকে বাস্তবে ফিরে এল অরুণ।

কিন্তু কোথায় অপরূপা? চারদিকে ভাল করে নজর বোলাল ও। কোথাও নেই।

বুকের ভেতর হঠাৎ করেই একটা শূন্যতা অনুভব করল অরুণ। মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। যেন এইমাত্র একটা দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছে। পা দুটো টেনে টেনে হাঁটতে লাগল ও।

কিছুদূর এগোতেই অশ্ব খুরধ্বনি কানে এল। একসঙ্গে অনেকগুলো। একটু পরেই সাত-সাতটা ঘোড়া এসে হাজির। সবার আগে পাঞ্জা খাঁ। হাতে তাঁর পাঁচ ব্যাটারির টর্চ। ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে অরুণের সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন, 'উল্কাকে ফিরে যেতে দেখেই বুঝেছি পুবের পাহাড়ের প্রেতপুরী আপনাকে হাতছানি দিয়েছে। ইস্, উৎকণ্ঠায় নির্ঘাত আমার সাত বছরের আয়ু ঝরে গেছে। তবু ভাল যে আপনাকে সুস্থ অবস্থায় পেলাম। তবে আমার কথা এভাবে অবজ্ঞা করা একদম উচিত হয়নি আপনার। নিশ্চয়ই ধুলোর থলেটা ফেলে দিয়েছিলেন?'

খুবই বিব্রত হলো অরুণ। লাজুক হেসে বলল, 'আমাকে ক্ষমা করবেন, খাঁ সাহেব। সত্যিই আমি অমার্জনীয় ভুল করেছি।'

'অত লজ্জা পেতে হবে না। ক্ষতি তো আমার না, হলে আপনারই হত। তা এমন বহাল তবিয়তে আছেন কি করে? সেরকম কিছুই কি ঘটেনি?'

'ঘটেনি আবার! শুনুন খুলে বলছি সব।'

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অরুণের কথা শুনল সাতজন মানুষ। পাঞ্জা খাঁ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কিছুটা উদাস কণ্ঠে বললেন, 'বহুকাল আগে এদিককার জমিদার ছিলেন বিগ্রহ রায়। এই বন-জঙ্গল কিছুই ছিল না তখন। পাহাড়ের চুড়োয় ছিল তাঁর উঁচু পাঁচিল ঘেরা সুরম্য বাড়ি। ভয়ংকর রকমের অত্যাচারী ছিলেন তিনি। কত প্রজার ঘরবাড়ি যে পাইক-বরকন্দাজ দিয়ে ধূলিসাৎ করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। শাস্তিদানের জন্যে বাছা বাছা ক'জন বিশালদেহী লোক ছিল তাঁর। তাঁদের হাতে

BanglaBook.org

কোন প্রজা একবার পড়লে আর মায়ের বুকে ফিরে যেতে পারত না।

'বিগ্রহ রায়ের ছিল এক পরমাসুন্দরী মেয়ে। নাম দিতি। বাবার কঠোর শাসনের ভেতরে থেকেও মেয়েটা ভালবেসে ফেলে এক সহিসের ছেলেকে। সহিসের সুদর্শন ছেলেও ভয়ডর উপেক্ষা করে সাড়া দেয় জমিদার কন্যার আহ্বানে। কিন্তু অল্প ক'দিনের মধ্যেই ব্যাপারটা জেনে ফেলেন বিগ্রহ রায়। মেয়েকে ডেকে খুব করে শাসন করে দেন। কিন্তু জল তখন অনেকদূর গড়িয়েছে। একরাতে পালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেয় দু'জন। ঘোড়া নিয়ে গভীর রাতে অপেক্ষা করতে থাকে অসিত। কিন্তু দিতি আসে না, তার বদলে আসে জমিদারের আজ্ঞাবহ দাসেরা। তারা অসিতকে মারতে মারতে অজ্ঞান করে ফেলে দেয় পাহাড় থেকে। আর ওদিকে দিতি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে। ওই ঘটনার পর বিগ্রহ রায়ের অত্যাচার আরও বেড়ে যায়। লোকজন পালাতে শুরু করে এই এলাকা ছেড়ে। শেষমেশ আত্মীয়-পরিজনেরাও ত্যাগ করে বিগ্রহ রায়কে। তারপর আরও দীর্ঘদিন পর রোগে-শোকে ধুঁকতে ধুঁকতে মারা যান অত্যাচারী বুড়ো জমিদার। এখনও কোন কোন চাঁদনী রাতে ধ্বংসস্তূপ থেকে আবার খাড়া হয়ে দাঁড়ায় বাড়িটা। ঘরে ঘরে জ্বলে ওঠে আলো। পথচারীদের মায়াবী হাতছানিতে ডাকে। যারা সব জানে তারা যায় না। যারা জানে না তারা বিভ্রান্ত হয়। তাদের কেউ ফিরে আসে, কেউ ফেরে না। এই হচ্ছে পুবের পাহাড়ের গল্প। এবার চলুন, আপনাকে স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

ইঁদুরের ফেলে যাওয়া চিরকুটের কথা মনে পড়ল অরুণের। তাহলে দিতিই কি ওকে সতর্ক করে দিয়েছিল? পকেট থেকে চিরকুটটা বের করল অরুণ। একটা অক্ষরও নেই ওতে—একদম সাদা। চিরকুটটা ফেলতে গিয়েও ফেলল না ও। এক রোমাঞ্চকর রাত আর এক অপূর্ব সুন্দরীর স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রেখে দিল কাগজটা।

পাঞ্জা খাঁ নিজের ঘোড়ায়ই তুললেন অরুণকে। অরুণও কোন আপত্তি করল না। সুবোধ বালকের মত পাঞ্জা খাঁর পেছনে গিয়ে বসল। তারপর ছোট্ট দলটা রওনা হলো স্টেশনের দিকে। বন থেকে বেরোতেই তাদের চোখে পড়ল এক অনুপম দৃশ্য। কুচকুচে কালো একটা ঘোড়া ছুটে যাচ্ছে ডান দিকের টিলাটার দিকে। চাঁদের আলো পিছলে পড়ছে ঘোড়ার মসৃণ গা থেকে। পিঠে দু'জন সওয়ারী। প্রথমে মেয়ে, তারপর ছেলে। যেন রাজকন্যা নিয়ে ছুটে চলেছে রাজকুমার।

পাঞ্জা খাঁ মন্ত্রমুগ্ধের মত বললেন, 'দিতি আর অসিত যায়!'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

১৩ নম্বর কামরা

বিকেলের দিকে হোটেলে ফিরল জহির। সারাদিন বড্ড ধকল গেছে আজ। ক্লান্তিতে ভেঙে আসতে চাইছে শরীর। ওপরে না গিয়ে সোজা নিচের রেস্টুরেন্টে ঢুকল ও। গরম গরম সিঙাড়া আর এক কাপ চা খেয়ে চলে এল নিজের রুমে। মাথার ঝিমঝিম ভাব কমে এসেছে অনেকটা।

মাত্র আজই এ হোটেলে উঠেছে জহির। এ শহরে ওর আগমনও ঘটেছে আজ সকালে। একটা সাপ্তাহিকে কাজ করে ও। স্টাফ রিপোর্টার। একটা চাঞ্চল্যকর খুনের রিপোর্ট কভার করতে পাঠানো হয়েছে ওকে। হোটেলে এসে রুম বুক করেই কাজে নেমে পড়েছিল। সারাটা দিন ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছে, তবু কাজ শেষ হয়নি। আরও দু'একদিন থাকতে হবে।

এমনিতে জহির খুব হাসিখুশি ছেলে। বন্ধুদের আড্ডায় আসর জমিয়ে রাখে। কিন্তু লেখালেখির জন্যে নিরিবিলি জায়গাই ওর পছন্দ। সেজন্যেই এ হোটেল বেছে নিয়েছে। হোটেলটা শহরের ব্যস্ত এলাকার বাইরে। অনেকখানি জায়গা জুড়ে দোতলা দালান। চুন-সুরকি-ইঁটের গাঁথনি, বয়স কম করে হলেও একশো। দরজা-জানালার পেডিমেন্টগুলোর ছিরি-ছাঁদ ভাল, তবে জৌলুস নেই। পলস্তারা চুনকাম আর রঙ দিয়ে বাড়ির জীর্ণতা ঢাকার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু গভীরভাবে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যৌবন হারিয়ে দালানটা এখন বুড়ো। হয়তো কোন অভিজাত পরিবার নিজেদের বসবাসের জন্যে গড়েছিল বাড়িটা। হাত ঘুরে ঘুরে এটার মালিক এখন ইদ্রিস মণ্ডল।

লোকটাকে প্রথম আলাপেই ভাল লেগে গেছে জহিরের। বয়স চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ। দৈর্ঘ্য প্রস্থে প্রমাণ সাইজ। গায়ের রঙ কালো। গোলগাল চেহারায় কেমন কৌতূহলী একটা ভাব। পান রাঙানো ঠোঁটে সারাক্ষণ হাসি লেগে আছে। সব মিলিয়ে একজন দিল খোলা সরল মানুষ। জহিরের রুমটা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সাফ-সুতরো করিয়েছে সে।

মোট ষোলোটা রুম নিয়ে দোতলার রেস্টহাউজ। দশটায় ভাড়াটে আছে, বাকিগুলো খালি। জহিরের রুম নম্বর বারো। মাঝারি আকৃতির রুমটা বেশ ছিমছাম। পেছনের দেয়ালে বড় বড় জানালা। সেখানে গিয়ে দাঁড়ালে শহরতলির জীবন্ত ছবি ধরা পড়ে চোখে। হোটেল কম্পাউন্ডের ঠিক পরেই একটা লাল সুরকির পথ সরল রেখার মত চলে গেছে আড়াআড়ি। রাস্তার একপাশে কাঠের ল্যাম্পপোস্টগুলো পরস্পরের কাছ থেকে বেশ দূরত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে। যানবাহন

বলতে শুধু সাইকেল আর রিকশা। মাঝেমধ্যে পথচারীদের সচকিত করে মালবোঝাই ট্রাকের সগর্জন আবির্ভাব ঘটে। রাস্তার ধারে গড়ে ওঠা বাড়িগুলোর বেশির ভাগই টিনের, কতগুলোর বেড়া আবার বাঁশের, টিনশেড বিল্ডিংও আছে দু'তিনটে। রাস্তায় মলিন কাপড় পরা ব্যস্ত মানুষের আনাগোনা। দারিদ্র্য এখানে উদার চিত্তে উন্মুক্ত করে রেখেছে দ্বার। দেশের ভেতরটাকে ভাল করে দেখতে হলে এখান থেকেই যাত্রা শুরু করতে হবে। সুরকি ঢালা পথ, কাঁচামাটির সড়ক, ভাঙা কালভার্ট, বাঁশের পুল, এবড়োখেবড়ো আল এসব ভেঙে এগিয়ে যেতে হবে শেকড়ের দিকে।

একপ্রস্থ ঘুমের পর বেশ চাঙা বোধ করে জহির। মুখহাত ধুতে ধুতে পরবর্তী কর্মপন্থা ঠিক করে ফেলে। অন্ধকার না হওয়া অবধি হাঁটাহাঁটি করবে বাইরে। লেখার আইটেমগুলো সাজিয়ে নেবে এক এক করে।

শার্ট-প্যান্ট পরে গায়ে জ্যাকেট চাপায় জহির। নিচের রেস্টুরেন্টে এসে চা খায় এক কাপ। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

হাঁটতে হাঁটতে পেছনের রাস্তাটায় চলে আসে ও। সন্ধে হতে আরও কিছুটা বাকি। একটু পরেই পৌষের হিমবুড়ি কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে নেমে আসবে। জহিরের এখনই কেমন শীত শীত লাগছে। রাজধানীর চেয়ে এখানে শীত বোধহয় একটু বেশি। রাস্তার ধারে উদোম গায়ের ক'টা ছেলে শীতকে কলা দেখিয়ে ধুলোর মাঝে ছুটোছুটি করে খেলছে। তাদের একজন হঠাৎ প্যান্ট অনেকটা নামিয়ে দিয়ে বসে পড়ে এক জায়গায়। জহিরের উপস্থিতিকে উপেক্ষা করে দিব্যি চালিয়ে যায় হিসি। আপন মনে হেসে ওঠে জহির। এই না হলে শহরতলি!

হাঁটতে হাঁটতে অনেকদূর এসে পড়ে জহির। সূর্য ডুবে গেছে অনেকক্ষণ। চারদিকে এখন গাঢ় অন্ধকার। ল্যাম্পপোস্টগুলোর অপর্যাপ্ত আলো কুয়াশা ঢাকা অন্ধকারকে কেমন রহস্যময় করে তুলেছে। এমনিতে জহির খুব কনশাস। স্থান-কাল-পাত্র বাছবিচারে ভুল হয় না সচরাচর, কিন্তু একটা কিছুর ভেতর ডুবে গেলে পারিপার্শ্বিকতা ভুলে যায় বেমালুম। সংবিৎ ফিরে পেতেই ফেরার তাগিদ অনুভব করে ও। রাস্তা এরই মধ্যে ফাঁকা হয়ে গেছে। যানবাহন একদম নেই। পথচারীও দু'একজন। একটু পা চালিয়েই এগোতে থাকে জহির।

সামনেই একজন বুড়ো রাস্তার ধারে আগুন জ্বেলে হাত-পা ছড়িয়ে বসেছে। আগুনের কুণ্ডটি বেশ বড়, দাউ দাউ করে জ্বলছে। অনেকগুলো টুকরো কাঠ পুড়ছে পুটপুট করে। বুড়োর পাশেও রয়েছে কিছু শুকনো কাঠ। বেশ কৌতূহল হয় জহিরের। এক আঁটি লাকড়ি জোগাড় করতে গিয়ে যেখানে শহরতলির মানুষগুলো রীতিমত হিমশিম খায় সেখানে এই বুড়ো অবলীলায় দামি কাঠগুলো পোড়াচ্ছে। কাঠগুলো অপচয় না করে বাড়িতে গিয়ে উনুনের ধারে বসলেই তো হয়।

সুকুমার রায়ের সেই কাঠবুড়োর কথা মনে পড়ে গেল।

'হাঁড়ি নিয়ে দাড়িমুখো কে যেন কে বৃদ্ধ,
রোদে বসে চেটে খায় ভিজে কাঠ সেদ্ধ।'

এই বুড়ো রোদে বসে কাঠ লেহন করছে না, হিমে বসে কাঠ পোড়াচ্ছে।

BanglaBook.org

কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই পলকের জন্যে জহিরের দিকে তাকাল বুড়ো। পরমুহূর্তে আবার দৃষ্টি ফেলল অগ্নিকুণ্ডের দিকে। এমন উজ্জ্বল, ঠাণ্ডা, অন্তর্ভেদী দৃষ্টির মুখোমুখি জীবনে আর কখনও হয়নি ও। আশ্চর্য এক সজীবতা আর তেজ লুকিয়ে আছে চোখ দুটোর মণিতে। একটা উলেন ওভার কোট পরে আছে বুড়ো। কোটটা অনেকদিনের পুরানো। এখানে সেখানে রঙ জ্বলে গেছে। কোটের ডান পকেটে নাইলনের মোটা একটা দড়ি। দড়ির রঙ টকটকে লাল। কি মনে করে দড়িটা সাথে রেখেছে তা সেই জানে।

চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ আছে বুড়োর। লম্বা চুলগুলো ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে। মোটা ঘন ভুরুজোড়াও একই বর্ণের, এমনকি খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ পর্যন্ত। নাকটা শিকারী পাখির ঠোঁটের মত বাঁকানো। ভাঁজ ভাঁজ চামড়ার বিষণ্ন মুখটা আগুনের আলোয় লালচে দেখাচ্ছে। অদ্ভুত একটা রহস্যময় দ্যুতি ফুটে বেরোচ্ছে ওই চেহারা থেকে। জহিরের কৌতূহল গাঢ় হলো।

'আপনার পাশে বসতে পারি?' সবিনয়ে বলল জহির।

'বসুন, ইচ্ছে হলে বসুন।' চাপা ফ্যাঁসফেঁসে কণ্ঠে জবাব এল। যেন প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় বসে গেছে তার গলা।

'আপনার বাড়ি কি এখানেই?' জিজ্ঞেস করল জহির।

'কেন?' চোখ না তুলে একই সুরে জানতে চাইল সে।

'এমনি, স্রেফ কৌতূহল।'

'এত কৌতূহল থাকা ভাল নয়। যান রুমে ফিরে যান।'

বাড়ি ফিরতে না বলে ওকে রুমে ফিরতে বলছে কেন বুড়ো? হোটেলের কোন অক্যুপ্যান্ট নাকি?

'একটা প্রশ্ন করতে পারি?' নরম কণ্ঠে শুধোল জহির।

'করুন।'

'আপনি কি ইদ্রিস মণ্ডলের হোটেলে উঠেছেন?'

কোন কথা না বলে জহিরের দিকে পূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকাল বুড়ো। এক জোড়া তীব্র সবুজ চোখ জহিরকে মেপে নিল তার নিজস্ব মাপকাঠিতে। অজান্তেই শিউরে উঠল জহির। শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গেল হিমস্রোত। ওই দৃষ্টি যেন পৃথিবীর কোন মানুষের নয়, কোন অনন্তলোকের এক মৃত্যুঞ্জয়ী জীবের, যার দৃষ্টিসীমার কোন বাঁধন নেই। নিজের ভেতর সূক্ষ্ম একটা আলোড়ন অনুভব করে জহির। ক্ষণিকের তরে আত্মবিস্মৃত হয়ে যায়। মনে হয় এ পৃথিবী কিছু নয়, সবই শুধু মায়ার খেলা!

অদ্ভুত একটা ঘোর নিয়ে হোটেলে ফেরে জহির। যেন অনন্ত পথ পেরিয়ে এই মাত্র আপন ঠিকানায় পৌঁছুল। সারা মন জুড়ে অস্বস্তিকর অনুভূতি। খেতে বসে বার বার আনমনা হয়ে গেল।

রুমে ফিরে জহির টের পেল কিছুই লিখতে পারবে না আজ। বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করে পর পর দুটো সিগারেট শেষ করে ফেলল। আচ্ছন্নতা কাটাতে হলে অন্য দিকে ফেরাতে হবে মন। সাথে করে আনা বইটার কথা মনে পড়ে গেল। স্যাক্স রোমারের ক্রাইম থ্রিলার 'দ্য ডেভিল ডক্টর'। ঘরে এসে খোঁজাখুঁজি করে

BanglaBook.org

বইটা পেল না ও। হঠাৎ মনে পড়ে গেল জ্যাকেটের পকেটে আছে বইটা। আর জ্যাকেটটা ফেলে এসেছে রেস্টুরেন্টের চেয়ারে।

দরজা ভেজিয়ে দিয়ে নিচে নেমে এল জহির। রেস্টুরেন্ট একদম ফাঁকা। আটটা বাজলেই এখানে গভীর রাত, আর এখন তো বাজে দশটা। ইদ্রিস মণ্ডল তার টেবিলে সারাদিনের হিসেবপত্তর দেখছে। থালাবাসন গুছিয়ে শোয়ার আয়োজন করছে বয়-বেয়ারার দল। জ্যাকেটটা যথাস্থানেই পেল জহির। ইদ্রিস মণ্ডলের সাথে চোখাচোখি হওয়ায় মুচকি একটু হাসল ও। প্রত্যুত্তরে মণ্ডলও মুচকি হেসে মন দিল হিসেবে।

দরজায় ধাক্কা দিয়ে অবাক হয়ে গেল জহির। খুলছে না, ভেতর থেকে বন্ধ। দরজার মাথায় লেখা রুম নম্বরের দিকে তাকাল ও। ঝকঝকে সাদা দেয়ালে চকচক করছে কালো কালো অক্ষর—রুম নম্বর ১৩। নিজের বোকামি দেখে মনে মনে হাসল ও। পিছিয়ে এসে বারো নম্বরের দরজায় ধাক্কা দিল। সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল দরজা।

রুমে ঢুকতে না ঢুকতে ইলেকট্রিসিটি চলে গেল। শহরতলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য!—মনে মনে টিপ্পনী কাটল জহির। পকেট থেকে দেশলাই বের করে একটা মোম জ্বালল ও। মোমটা ইদ্রিস মণ্ডলই দিয়েছে। এখানে দিনে অন্তত বার তিনেক বিদ্যুৎ-বিভ্রাট ঘটে। আর একবার মহাশয়ের প্রস্থান ঘটলে ঘণ্টাখানেকের আগে প্রত্যাগমন ঘটে না।

মোমের হালকা আলোতে কেমন ছোট দেখাচ্ছে রুমটা। দিনে বেশ বড় মনে হয়েছে। মৃদু আলোতে পড়া বা লেখা কোনটাই হয় না জহিরের। আরে, ছোট টিপয়টা গেল কোথায়? ডান ধারের দেয়াল ঘেঁষেই তো ছিল ওটা। কেউ এসে নিয়ে যায়নি তো? বিকেলে ঘুমোতে যাবার আগে দরজা ভেজিয়ে দিলেও ছিটকিনি লাগায়নি ও। তখন কেউ ঢুকেছিল হয়তো। কোন অকুপ্যান্ট কিংবা বেয়ারা। যাকগে, ওটা আর এমন কি?

পেছনের একটা জানালায় এসে দাঁড়াল জহির। দোতলার সবগুলো জানালা গরাদহীন। ফলে মুক্ত-স্বাধীন একটা ভাব আছে রুমগুলোতে। উইণ্ডোসিলে দু'হাতের কনুই রেখে উবু হয়ে বাইরের গাঢ় অন্ধকারে দৃষ্টি মেলল জহির। ধারাল শীত আঁচড় কাটতে লাগল ওর চোখেমুখে। তবু কেন জানি এভাবে থাকতেই ভাল লাগছে এ মুহূর্তে। একটা সিগারেট ধরিয়ে চুপচাপ টানতে লাগল ও। পাশের রুম থেকে জুতোর খট্ খট্ শব্দ ভেসে আসছে। কে লোকটা? মনে মনে ভাড়াটে-তালিকা ঘেঁটে লোকটাকে সনাক্ত করতে চেষ্টা করল জহির। দশে কোন ভাড়াটে নেই, এগারোও তালাবদ্ধ, বারোতে সে নিজে, তেরোতে... । অনেক চেষ্টা করেও তেরো নম্বরের অকুপ্যান্টের নাম মনে করতে পারল না ও। চোদ্দ নম্বরের অকুপ্যান্টের নাম সহজেই মনে এল। অরবিন্দ নাগ নামের এক মাঝবয়েসী ভদ্রলোক নিয়েছেন রুমটা। পেশায় উকিল। সকালে রেস্টুরেন্টে পরিচয় হয়েছে তাঁর সাথে। গম্ভীর প্রকৃতির লোক। নাশতা খেতে খেতে এক গাদা কাগজ দেখছিলেন আর মেপে মেপে কথা বলছিলেন। অস্পষ্ট একটা যন্ত্রণা পীড়া দিতে

BanglaBook.org

থাকে জহিরকে। নিজের স্মৃতিশক্তির ওপর অগাধ বিশ্বাস ওর। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনেক জটিল বিষয় মেমোরিতে গেঁথে নিয়ে দারুণ ফল পেয়েছে। আর আজ সামান্য একটা স্থূল জিনিস মনে পড়ছে না? আশ্চর্য!

অকস্মাৎ লালচে আলো ছড়িয়ে পড়ল তেরো নম্বরের খোলা জানালা দুটো থেকে। সীমানা পাঁচিলে কাঠামো ফুটে উঠেছে জানালা দুটোর। খুব সম্ভব লাল শেড লাগানো কোন ল্যাম্প জ্বলছে ঘরটাতে। কিন্তু কেরোসিন ল্যাম্পে তো এত আলো হবার কথা নয়। যেন আগুন লেগেছে ঘরটাতে। একটা লোক অস্থিরভাবে পায়চারি করছে ঘর জুড়ে। গায়ে খুব সম্ভব ওভারকোট। মাঝে মাঝে চিৎকার দেয়ার ভঙ্গিতে হাত দুটো শূন্যে তুলে ঝাঁকাচ্ছে। কোন কারণে সে সাংঘাতিক রকম উত্তেজিত। পাগল নাকি লোকটা?

সিগারেটটা উইণ্ডোসিলে পিষে দিয়ে জানালা দুটো বন্ধ করে দিল জহির। এভাবে আর কতক্ষণ অপেক্ষা করা যায়? ইলেকট্রিসিটি আদৌ আসবে কিনা কে জানে? মোম নিভিয়ে বিছানায় গিয়ে লেপ মুড়ি দিল ও। মিনিট পাঁচেকের ভেতর তন্দ্রা এসে গেল। তন্দ্রার ঘোরে সাঁ করে মনে পড়ল আসলে তেরো নম্বরের কোন রুমই নেই তালিকায়। অকুপ্যান্ট-লিস্টে বারোর পরেই ছিল চোদ্দ। তেরো নম্বর তালিকায় নেই, অথচ রুমটা জলজ্যান্ত বিদ্যমান, এমনকি ভাড়াও নিয়েছে একজন! রুমটা তালিকাভুক্ত না করার কারণটা কি? জিজ্ঞেস করতে হবে ইদ্রিস মণ্ডলকে।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই অবাক জহির। টিপয়টা যেখানে ছিল, ঠিক সেখানেই আছে। রাতে দরজা বন্ধ করে শুয়েছিল ও, এখনও বন্ধই আছে, তাহলে ওটা এল কেমন করে? তবে কি রাতে ভুল দেখেছে ও? তাছাড়া আর কি হবে? ভেতর থেকে সায় না পেলেও খোঁড়া যুক্তিটা মেনে নিতে বাধ্য হলো জহির।

কাজের কথা মনে পড়তেই ফালতু চিন্তা সব মন থেকে ঝেড়ে ফেলল ও। আড়মোড়া ভেঙে বিছানা থেকে নেমে প্রথমেই খুলে দিল জানালাগুলো। ঠিক তখুনি আরেকটা ধাক্কা খেল। স্পষ্ট মনে আছে, রাতে দেয়াল ঘেঁষে লাগানো উইণ্ডোসিলে অর্ধদগ্ধ সিগারেটটা পিষে দিয়েছিল। দুমড়ানো সিগারেটটা এখন দেখা যাচ্ছে মাঝের জানালায়। রাতে জানালা ছিল দুটো, এখন তিনটে। এটা কেমন করে সম্ভব? হঠাৎ নিজের ওপর সন্দেহ হলো ওর। মগজে কোন ত্রুটি দেখা দেয়নি তো? কিন্তু চিন্তাভাবনা তো স্বাভাবিক ভাবেই এগোচ্ছে। মুখহাত ধুয়ে নাশতা খেতে হবে, তারপর কাপড় পাল্টে বেরোতে হবে কাজে—সব ঠিক ঠিক বলে দিচ্ছে ব্রেন। মেমোরিও যথেষ্ট শার্প। কালকের প্রতিটা ঘটনা নিখুঁতভাবে মনে পড়ছে। অচেনা সেই কাঠবুড়োর কথা স্মরণ হতেই অস্বস্তিকর অনুভূতিটা নাড়া দিয়ে গেল ওকে। আসলে ওই বুড়োর সাথে দেখা হবার পর থেকেই সবকিছু কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। কনশাস মাইণ্ড সূক্ষ্মপ্যাঁচে বার বার কাবু হচ্ছে সাব-কনশাস মাইণ্ডের কাছে। নিজেকে নিয়ে গভীর ভাবে ভাবতে হবে। কিন্তু আপাতত সে সুযোগ নেই। এখুনি নাশতা সেরে বেরিয়ে পড়তে হবে।

সারাটা দিন ব্যস্ততার ভেতর দিয়ে কাটল। কাজ প্রায় শেষ। আর দু'একজন

BanglaBook.org

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ আর থানার অফিসার-ইন-চার্জের ব্রিফিং পেলেই ফেরা যাবে। রেস্টুরেন্টে বসে চা খেতে খেতে তলিয়ে দেখছিল জহির, রিপোর্টিংয়ে কোথাও খুঁত রয়ে গেল কিনা, এমন সময় অরবিন্দ নাগ এসে ওর মুখোমুখি চেয়ারটা দখল করলেন। তাঁকে বেশ প্রফুল্ল দেখাচ্ছে আজ। সম্ভবত কোন জটিল কেস থেকে উদ্ধার পেয়েছেন।

একটা বয় এসে চা দিয়ে গেল। ধূমায়িত চায়ে আয়েশ করে চুমুক দিতে লাগলেন তিনি। হঠাৎ নাটকীয় সুরে বলে উঠলেন, 'কিছু মনে না করলে একটা কথা জিজ্ঞেস করব।'

'বেশ তো, করুন,' হাসল জহির।

'আপনার কি ইনসমনিয়া আছে, ব্রাদার?'

'কেন?'

'কাল সারারাত যেভাবে পায়চারি করেছেন, তাই মনে হলো। কেসের কাগজপত্র দেখতে দেখতে তিনটে বেজে গিয়েছিল। বিছানায় গেছি সাড়ে তিনটের দিকে। তখনও আপনার জুতোর খট্ খট্ শুনেছি।'

'জুতোর খট্ খট্ ঠিকই শুনেছেন,' সকৌতুকে বলল জহির। 'তবে সে জুতো আমার নয়, তেরো নম্বরের অক্যুপ্যান্টের।'

'তেরো নম্বরের অক্যুপ্যান্ট!' হো হো করে হেসে উঠলেন নাগ। 'তেরো নম্বর রুম আপনি পেলেন কোথায়? রাত জেগেছেন এটা তো কোন লজ্জার ব্যাপার নয় যে ঢেকে রাখতে হবে। আমিও তো প্রায়ই গভীর রাতে ঘুমোই।'

জহিরের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। ফাজলামোর একটা সীমা আছে। তাছাড়া নাগ বাবুর সাথে ওর এমন কোন সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি যা অবলীলায় রসিকতায় গড়াতে পারে।

'দেখুন,' একটু রূঢ় স্বরেই বলল জহির। 'আমার ইনসমনিয়া নেই। থাকলেও লুকোবার কোন কারণ দেখি না। আপনি ভাড়াটে তালিকায় তেরো নম্বর না দেখে ভাবছেন এই নম্বরের কোন রুম নেই। কিন্তু আপনার আগের রুমটার দিকে তাকালেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

এবার অরবিন্দ নাগও গম্ভীর হয়ে গেলেন। জহির যে ঠাট্টা করছে না এটা তাঁর কঠিন চেহারাই বলে দিচ্ছে। চেহারায় অবিশ্বাস আর সন্দেহ ফুটে উঠল তাঁর। শুধু ভাড়াটে-তালিকা দেখে তেরো নম্বরের অনুপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হননি তিনি, রুমে যেতে আসতে প্রতিবারই তাঁর নজরে পড়েছে বারোর পরেই চোদ্দ।

'চলুন, ওপরে গিয়ে দেখি কার কথা ঠিক,' উঠে দাঁড়ালেন নাগ। জহিরও উঠে পড়ল। দু'জনে এগোল সিঁড়ির দিকে।

এতবড় বিস্ময় জীবনে আর কখনও আসেনি জহিরের। পাশে দাঁড়ানো নাগ দাঁত বের করে হাসছেন। দৃষ্টি জুড়ে উপচানো কৌতুক। এমন মজা খুব কমই উপভোগ করেছেন তিনি। নিজের অবস্থান সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠল জহির। পায়ের নিচে ফ্লোরটা আছে তো?

BanglaBook.org

'আপনি তো ব্রাদার ঘাবড়ে দিয়েছিলেন আমাকে,' করিডরের নীরবতা ভাঙলেন নাগ। 'যাক, তবু ভাল রুমটা নেই। থাকলে নির্ঘাত হার্ট অ্যাট্যাক হয়ে যেত। হার্টের প্রোবলেম আছে আমার। যাই, ব্রাদার, একটু রিল্যাক্স করিগে। পরে আপনার সাথে গল্প করব।'

খুব দ্রুত রুমে চলে গেলেন অরবিন্দ নাগ। হাসি চাপতে বোধহয় কষ্ট হচ্ছিল তাঁর। এখন প্রাণ খুলে হাসবেন। কান পেতে রইল জহির। কিন্তু হাসির কোন শব্দ পাওয়া গেল না।

ব্যাপারটাকে কোনভাবেই আর হালকাভাবে নেয়া যাবে না। কিছু একটা ঘটছে। দশ বছরের সাংবাদিক জীবনে বেশ কিছু কঠিন সমস্যাকে ফেস করেছে জহির। একবার এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতার স্বরূপ উন্মোচন করায় প্রবল চাপের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এতটুকু না ঘাবড়ে ঠাণ্ডা মাথায় সে বিপদ সামাল দিয়েছিল ও। তখন থেকেই সাংবাদিক মহলে বিশেষ একটা পরিচিতি আছে ওর। কিন্তু আজকের সমস্যাটা সম্পূর্ণ অন্যরকম। কুসংস্কারমুক্ত একজন যুক্তিবাদী মানুষের জন্যে সমস্যাটা যে কত জটিল বলে বোঝাবার মত নয়।

'স্টেডি, জহির! স্টেডি!'—মনে মনে নিজেকে সাহস দিল ও। এখন প্রধান কাজ হচ্ছে নার্ভ ঠিক রাখা। নার্ভ ঠিক থাকলে বুদ্ধি খোলে। আর বুদ্ধিই মানুষকে সমস্যা বা বিপদ থেকে উদ্ধার করে থাকে।

নিচে এসে ইদ্রিস মণ্ডলের দিকে এগোল জহির। একটা সস্তা প্রেমের উপন্যাস নিবিষ্ট মনে পড়ছিল সে, জহিরকে দেখে থতমত খেয়ে বইটা রেখে দিল—যেন একটা বাচ্চা ছেলে লুকিয়ে বড়দের বই পড়তে গিয়ে ধরা পড়েছে।

'কিছু বলবেন, ভাইজান?' মণ্ডলের ঠোঁটে বোকার হাসি।

'হ্যাঁ, একটা জিনিস লক্ষ করলাম আপনার রেস্টহাউজে। তেরো নম্বরের কোন রুম নেই। ব্যাপারটা কি?'

'ব্যাপার কিছু না। রঙমিস্ত্রী তেরো নম্বর লেখতে ভুইলা গেছিল। আমিও আর অযথা ঘষামাজা করতে দেই নাই। নম্বর একটা হইলেই হইল। কি বলেন, ভাইজান?'

'হ্যাঁ, তা ঠিক,' চরমভাবে আশাহত হলো জহির। ঘুরে রওনা হবে, এমন সময় পেছন থেকে কোমল কণ্ঠে ডাকল মণ্ডল, 'ভাইজান!'

তার ডাকের ভেতর এমন কিছু ছিল যা কৌতূহলী করে তুলল জহিরকে।

'তেরো নম্বর নিয়া একটা ঘটনা ঘটছে। ঘটনাটা খুব ভয়ের। আজ পর্যন্ত কাউরে বলি নাই। আপনে ওই নম্বরের ব্যাপারে খোঁজ নিলেন বইলা আপনারে বলতে ইচ্ছা করতাছে। যদি অনুমতি দেন তো বলি।'

'বলুন,' আর তর সইছে না জহিরের।

'মিথ্যা বলার জন্যে প্রথমেই মাফ চাইয়া নিতাছি,' হাত জোড় করে উঠে দাঁড়াল মণ্ডল।

'ঠিক আছে, আপনি শুরু করুন।'

লম্বা দম নিয়ে ইদ্রিস মণ্ডল শুরু করল তার ভয়াল কাহিনী। প্রতিটা কথা

BanglaBook.org

গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগল জহির।

এক ইংরেজ বুড়ো বানিয়েছিল বাড়িটা। একাই থাকত বাড়িতে। আগাগোড়াই সে একজন রহস্যময় মানুষ। গভীর রাতে এ বাড়িতে হিংস্র জন্তুর গর্জন শোনা যেত। সন্ধের পর কোন মানুষ ধারে কাছে ঘেঁষত না। এক রাতে বুড়োর চিৎকারে আশেপাশের সবার ঘুম ভেঙে গেল। লাঠি-বল্লম নিয়ে এগিয়ে এল তারা। দেখে দোতলার একটা ঘরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। শুরু হলো ছুটোছুটি। কলস কলস পানি ঢেলে আগুন নেভানো হলো। কিন্তু ততক্ষণে বুড়ো পুড়ে ছাই। আগুন কোত্থেকে কেমন করে লেগেছিল, অনেক চেষ্টা করেও কেউ বের করতে পারেনি। ওই ঘটনার পর দীর্ঘ দিন খালি পড়েছিল বাড়িটা। বুড়োর ওয়ারিশ এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কোন তৎপরতা না দেখে এক প্রভাবশালী হিন্দু ব্যবসায়ী পরিবার নিয়ে উঠে পড়ে বাড়িতে। শুরুতে বেশ অবস্থাপন্ন ছিল এ পরিবার। এ বাড়িতে আসার পর একের পর এক বিপর্যয় নেমে আসে তাদের সংসারে। একসময় হতদরিদ্রের পর্যায়ে চলে আসে তারা। তখন বাড়িটা বেচে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু এখানে এতবড় বাড়ি কেনার মত টাকা আছে কার? তাছাড়া বাড়িটার অনেক দুর্নাম। কিন্তু ইদ্রিস মণ্ডল ওসব কুসংস্কারে বিশ্বাসী নয়। মস্তান আর চাঁদাবাজদের উৎপাতে শহরের মাঝখানে তার হোটেল ব্যবসায় লালবাতি জ্বলতে বসেছিল, তাই নিরিবিলিতে সস্তায় বাড়িটা পেয়ে আর দেরি করেনি। এখানে লাভ কম, তবে মস্তানদের উটকো উপদ্রব নেই। এমনিতে হাত-পা ঝাড়া মানুষ মণ্ডল। একমাত্র মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। স্ত্রী মারা গেছে বছর তিনেক আগে।

বাড়িটা কিনে প্রথমেই মেরামতের কাজে হাত দেয় ইদ্রিস মণ্ডল। পলস্তারা-চুনকামের কাজ শেষ হবার পর লাগানো হয় রঙমিস্ত্রী।

জানালা-দরজায় রঙ লাগিয়ে রুমগুলোতে নম্বর বসাতে শুরু করে সে। নম্বর বসানো শেষ হলে কাজ দেখতে বেরোয় মণ্ডল। দেখে এক জায়গায় ভুল করে ফেলেছে রঙমিস্ত্রী। বারোর পরে তেরো না লিখে লিখেছে চোদ্দ। ভুলটা তাকে দেখানো হলো। কিন্তু সে লজ্জিত না হয়ে অবাক হলো। বলল নম্বর সে ঠিকই লিখেছিল, কেউ ফাজলামো করে একাজ করেছে। তার কথায় রেগে গেল মণ্ডল। গাঁজাখোর, ফাঁকিবাজ বলে গালমন্দ করল। রঙমিস্ত্রী গালমন্দ সব হজম করে ভুল সংশোধনের কাজে মন দিল। পরদিন রুম নম্বর দেখতে গিয়ে আবার মেজাজ বিগড়ে গেল মণ্ডলের। সেই একই ভুল। রঙমিস্ত্রীকে ডেকে এনে হাতেনাতে ভুল ধরিয়ে দেয়া হলো। তার মুখটা কাগজের মত সাদা হয়ে গেল। বিড়বিড় করে কি সব বলতে বলতে জ্ঞান হারাল সে। তার জ্ঞান আর ফিরল না। পরদিন ভোরে হাসপাতালে মারা গেল লোকটা। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল ইদ্রিস মণ্ডলের। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নিয়ে থাকা-খাওয়ার ব্যবসাটা শুরু করল সে। এরই মধ্যে কেটে গেছে একটি বছর।

কথা শেষ করে সশব্দে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ইদ্রিস মণ্ডল। জহির আরও কিছু তথ্য পাবার আশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে রইল। কিন্তু ইদ্রিস মণ্ডল আর একটি কথাও বলল না। চেয়ারে হেলান দিয়ে উদাস চোখে ছাদের দিকে তাকিয়ে রইল।

BanglaBook.org

রঙমিস্ত্রীর মৃত্যুর ব্যাপারে সহজ একটা ব্যাখ্যা ইতিমধ্যে দাঁড় করিয়ে ফেলেছে জহির। প্রচণ্ড বিস্ময় আর সীমাহীন ভীতি মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে তাঁকে। তবে তার ভয়টা অমূলক নয়। প্রবল যুক্তিবাদী না হলে ওর নিজের ক্ষেত্রেও এরকম পরিণতি আসতে পারত। জহির স্থির করল ইদ্রিস মণ্ডলকে সরাসরি সব খুলে বলবে না। চাক্ষুষ দেখাবে। একজন সাক্ষী এবং সহযোগী পেলে অন্যদের বিশ্বাস করানো সহজ হবে। তারপর সম্মিলিতভাবে চেষ্টা চালানো যাবে রহস্য উদ্‌ঘাটনের।

'মন খারাপ করবেন না,' মুখে হাসি টেনে ইদ্রিস মণ্ডলকে সান্ত্বনা দিল জহির। 'মৃত্যু মানুষের জীবনে একটা অনিবার্য ঘটনা। একেক জনের মৃত্যু আসে একেকভাবে। এতে মন খারাপের কিছু নেই। আজ আসুন না আমার রুমে, গল্প করব দু'জনে।'

ইদ্রিস মণ্ডল বরাবরই শিক্ষিত ভদ্র মানুষের উষ্ণ সান্নিধ্যের কাঙাল। হঠাৎ আমন্ত্রণ পেয়ে বিগলিত হয়ে গেল। নির্দ্বিধায় রাজি হয়ে গেল সে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে রাত ন'টার দিকে রুমে ফিরল জহির। ইদ্রিস মণ্ডলকে দশটার দিকে আসতে বলেছে ও। লেখালেখির কাজটা সেরে ফেলবে এই ফাঁকে।

টেবিলে গিয়ে বসতে না বসতে ইলেকট্রিসিটি চলে গেল। নির্ঘাত এক ঘণ্টার ফের। মেজাজটা সাংঘাতিক রকম খিঁচড়ে গেল জহিরের। আজ আর আলো জ্বালল না। পেন্সিল টর্চটা হাতের মুঠোয় রেখে সোজা বিছানায় এসে চিৎ হলো। ঘরের ভেতর জমাট অন্ধকার। যেন হাত বাড়ালেই কোন নিরেট বস্তুর স্পর্শ পাওয়া যাবে। গত কয়েক ঘণ্টার রহস্যময় বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলো একটা ছকে সাজাতে চেষ্টা করল জহির।

তেরো নম্বরের আকস্মিক আবির্ভাব, ভেতরে কারও অস্থির পায়চারি, আবার তেরো নম্বরের অন্তর্ধান, জানালার আনাগোনা, টিপয়ের অন্তর্ধান এবং পুনরাগমন…নাহ্, সবই কেমন খাপছাড়া—অবাস্তব!

ইদ্রিস মণ্ডলের কথার সূত্র ধরে গোড়ার দিকে চলে গেল জহির। ইংরেজ বুড়োর কথা মনে পড়তেই একজোড়া তীব্র সবুজ চোখ চমকে দিল ওকে। যুক্তিবাদী জহিরের সকল যুক্তি এই প্রথম হার মানল। অন্ধ-বিশ্বাসের চেয়েও প্রবল একটা বিশ্বাস শক্ত শেকড় গাড়ল মনে। ভয়ের আসল রূপ প্রত্যক্ষ করল জহির, একটা ঘৃণ্য কেন্নোর মত পিল পিল করে এগিয়ে আসছে ভয়।

বড় বড় পা ফেলে বারান্দা দিয়ে হেঁটে আসছে কেউ। জুতোর খট্ খট্ শোনা যাচ্ছে। চারদিক সুনসান থাকায় সামান্য শব্দটাও কানে বড় লাগছে। জহিরের দরজায় এসে শব্দটা হঠাৎ থেমে গেল। হার্টবিট বেড়ে গেল ওর। এখুনি হয়তো ভেজানো দরজাটা খুলে যাবে। ভাঁজ ভাঁজ চামড়ার বিষণ্ন একটা মুখ উঁকি দেবে ভেতরে, যার চুলগুলো ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে, নাকটা শিকারী পাখির মত বাঁকানো, আর চোখ দুটো ঘন সবুজ।

প্রথমে একটা গলা খাঁকারি শোনা গেল, তারপর খুলে গেল দরজা। হারিকেন ধরা একটা হাত ঢুকল ঘরে, পরক্ষণে উঁকি দিল একটা কৌতূহলী মুখ। ইদ্রিস

BanglaBook.org

মণ্ডল!

'কি ব্যাপার, ভাইজান, মোম কি শেষ হইয়া গেছে?' হারিকেনটা টেবিলের ওপর রাখল ইদ্রিস মণ্ডল।

'না, এমনি জ্বালাইনি।' শোয়া থেকে উঠে বসল জহির। মণ্ডলকে বসতে বলল চেয়ারে।

'এখানকার কথা আর বলব কি, ভাইজান,' বেশ সংকুচিত মণ্ডল। 'বড় শরমিন্দা আমি, বড় শরমিন্দা!'

'না না, লজ্জা পাবার কি আছে, কারেন্টের ওপর তো কারও হাত নেই। দোষ যদি থাকে তো সেটা পিডিবি'র।'

জহির ইতিমধ্যে দেখে নিয়েছে ইদ্রিস মণ্ডলের পায়ে জুতো নেই। লুঙ্গি পরে গেঁয়ো ভূত ছাড়া কেউ জুতো পায়ে দেয় না। মণ্ডলের পায়ে সস্তা একজোড়া চপ্পল। চপ্পলে শব্দ হবার প্রশ্নই ওঠে না। অরবিন্দ নাগ অবশ্যি জুতো পরেন, তবে সে জুতোর শব্দ খট্ খট্ নয়, মচ্ মচ্।

মণ্ডলের মাঝে কেমন একটা দ্বিধাগ্রস্ত ভাব। কিছু যেন বলতে চায় সে, কোন কারণে বলতে পারছে না।

জহির শুধোল, 'কোন সমস্যা হয়েছে আপনার?'

'জী না, ভাইজান। কোন সমস্যা হয় নাই।'

'তাহলে উসখুস করছেন কেন?'

'আরেকটা জিনিস আপনারে বলা হয় নাই। ভাবছিলাম ঘটনাটা চাইপা যাব। কিন্তু মন মানল না। এই রুমটা প্রথম যারে ভাড়া দেই সেই লোক দ্বিতীয় রাত্রে গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করে। ওই মর্মান্তিক ঘটনার পর আমার ব্যবসা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হইছিল। অনেক কষ্টে আবার একটু সোজা হইতে পারছি। তবে এই রুমটা দীর্ঘ এক বছর তালা দিয়া রাখছিলাম। খুলব না খুলব না কইরাও শেষ পর্যন্ত খুইলা ফেললাম। আর আপনেও বাইছা বাইছা এই ঘরটাই পছন্দ করলেন।'

শিরদাঁড়ায় হিমস্রোত বয়ে গেল জহিরের। গায়ের রোম কদম পাপড়ির মত দাঁড়িয়ে গেল অজান্তেই। চঞ্চল চড়ুইয়ের মত লাফাতে শুরু করেছে হৃৎপিণ্ড। এই রুমে আজ ওর দ্বিতীয় রাত। তাহলে ওর ভাগ্যেও কি নেমে আসছে সেই চূড়ান্ত অমোঘ পরিণতি?

এক প্রকার নিশ্চিত হয়েই মণ্ডলকে জিজ্ঞেস করে বসে জহির, 'আচ্ছা, সেই লোকটার ফাঁসির দড়িটা কি লাল ছিল?'

বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল ইদ্রিস মণ্ডল। বিস্ফারিত চোখ দুটো যেন এখুনি রবারের বলের মত বেরিয়ে আসবে। ভয়ার্ত কণ্ঠে থেমে থেমে বলল, 'আপনে জানলেন কেমনে?'

জহির কিছু বলবার আগেই ধাম করে খুলে গেল দরজা। ঝড়ো গতিতে ঘরে ঢুকলেন অরবিন্দ নাগ। হারিকেনের টিমটিমে আলোতেও তাঁর ভয়ার্ত চাউনি নজর এড়াল না কারও। কিছুটা যেন কাঁপছেন।

'সাংঘাতিক একটা কাণ্ড ঘটে গেছে!' বড় করে শ্বাস টানলেন তিনি। হাঁপাতে

BanglaBook.org

হাঁপাতে বললেন, 'দিনে দিব্যি তিনটে জানালা ছিল, এখন দুটো দেখতে পাচ্ছি। এটা—এটা কেমন করে সম্ভব!'

লাফ দিয়ে বিছানা ছাড়ল জহির। দু'জনকে তাড়া দিয়ে বলল, 'চলুন তো দেখি!'

দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। তিনজনের সম্মিলিত ধাক্কায়ও কোন কাজ হলো না। রুম নম্বরের ওপর পেন্সিল টর্চের আলো ফেলল জহির। যা অনুমান করেছে তাই। সাদা দেয়ালে প্রকট হয়ে ফুটে আছে—রুম নম্বর ১৩।

তিনজনেরই চোখের সামনে অবিশ্বাস্য নগ্ন বাস্তব। জহিরই প্রথম কর্তব্যজ্ঞান ফিরে পেল। টর্চ নিভিয়ে মণ্ডলকে বলল, 'জলদি দরজা ভাঙার ব্যবস্থা করুন। এটা ভাঙলেই বেরিয়ে আসবে সব রহস্য।'

ছুটে নিচে নেমে গেল ইদ্রিস মণ্ডল। সারা এলাকা নিঝুমপুরী। মণ্ডলের হাঁক-ডাক নৈঃশব্দের পিঠে চাবুক হানছে। বয়-বাবুর্চি সবাইকে এক জায়গায় জড়ো করছে সে।

মিনিট পাঁচেক পর তিনজন মুসকো জোয়ান নিয়ে হাজির হলো মণ্ডল। একজনের হাতে বড় একটা শাবল, বাকি দু'জনের হাতে মোটা লাঠি। মনিবের নির্দেশে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা। দরজায় দমাদম পড়তে লাগল লাঠি আর শাবলের গুঁতো। কিন্তু দরজা যেন পাথরের দেয়াল, এতটুকু কাবু হচ্ছে না। জোয়ান তিনজনও ছাড়বার পাত্র নয়, একমনে গুঁতো মেরে যাচ্ছে। অনেকদিন পর একটা মজার কাজ পেয়েছে তারা। ভাঙাভাঙির মত আরামের কাজ আর নেই। মজার ব্যাপার হচ্ছে লোক তিনজন জানে না, কেন তারা দরজাটা ভাঙছে।

ইতিমধ্যে গোটা রেস্টহাউজে সাড়া পড়ে গেছে। ভাড়াটেরা যার যার রুমের দরজা খুলে হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে আসছে। ভয় আর কৌতূহলের মিশেল অভিব্যক্তি নিয়ে তারা জড়ো হচ্ছে বারান্দায়।

চড়াৎ-চড়্-ড়্-ড়্-দড়াম! আচমকা ফ্রেমসহ পুরো দরজাটাই পড়ে গেল ভেতরে। দরজার ওপরের দেয়ালটুকু খসে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। পরমুহূর্তে রুমটার ছাদ বিকট শব্দে ধসে পড়ল তেরছাভাবে। পাশের একটা রুমও চুরমার হলো সেই সাথে।

বারান্দায় দাঁড়ানো হতবিহ্বল এক গাদা লোকের সামনে মাত্র কয়েক মুহূর্তে ঘটল নারকীয় ধ্বংসযজ্ঞ। তাদের সামনে এখন আর রহস্য বলতে কিছু নেই। সব রহস্য হারিয়ে গেছে বারো আর চোদ্দ নম্বর রুমের ধ্বংসস্তূপের মাঝে।

BanglaBook.org

লাল কুঠুরি

হো হো করে হেসে উঠল আরিফ। কিন্তু সোনাবুড়ো একটুও বিচলিত হলো না। বরং সে বিরক্তির সাথে দৃষ্টি বিনিময় করল পান্তার মা'র সাথে।

'আপনে তাইলে বিশ্বাস করলেন না?' ঠোঁট টিপে হাসল পান্তার মা। খানিকটা যেন বিদ্রূপ মেশানো তার হাসিতে।

'মোটেও না।'

'ক্যান?'

'নেই বলে।'

'আপনে আইজ রাইতটা লাল কুঠুরিতে কাটাইতে পারবেন?' কঠিন স্বর সোনাবুড়োর। আগুনের আলোতে জ্বল জ্বল করছে তার দু'চোখ।

'নিশ্চয়ই। আপনার কথামত যদি সেই জাজিম পাতা পালঙ্কটা থাকেই চমৎকার ঘুম হবে আমার।'

'আপনের কিছু হইলে কিন্তু—'

'না, না,' তার মুখের কথা কেড়ে নিল আরিফ। 'আপনাদের কাউকেই দায়ী করব না। তবে আমি একশো ভাগ নিশ্চিত কিচ্ছু হবে না আমার। তা এখুনি যাব, না আরও কিছুক্ষণ গপ্পো-সপ্পো চলবে।'

'এখন না। যাবেন রাত্রি বারোটায়। যখন শেওড়া গাছের পেঁচাটা ডাক দিব তখন।'

'আচ্ছা,' ছোট্ট করে শিস দিল আরিফ। 'তাহলে, পান্তার মা, আরেক কাপ চা হয়ে যাক।'

'বসেন, আনতাছি।'

চুলোর পাশ থেকে উঠে গেল পান্তার মা। ফ্লাস্ক থেকে চা আনবে। সোনাবুড়ো গম্ভীর মুখে একখণ্ড কাঠ ছেড়ে দিল নিভু নিভু আগুনে। বদ্ধমূল বিশ্বাসে ঘা খেয়ে মুষড়ে পড়েছে বেচারা। ক্ষোভ চাপতে কষ্ট হচ্ছে।

সোনাবুড়োকে আঘাত দেয়ার কোন ইচ্ছেই ছিল না আরিফের। প্রথমে হালকা ভাবেই আলাপটা শুরু হয়েছিল। লাল কুঠুরির প্রসঙ্গ ওঠার পর ক্রমশ ভারি হয়ে উঠল পরিবেশ। নিজের ওপর রাগ হলো আরিফের। অযথাই আসরটা মাটি করে ফেলল ও। শীতের রাতে আগুনের ধারে বসে গল্প করার মত মজা আর কিছুতে আছে নাকি? তাছাড়া এমন অলস অবসরই বা ক'টা মেলে? ঢাকায় ফিরে গিয়ে তো সেই কোলাহল মুখর কর্মব্যস্ততার মাঝেই ডুবে যেতে হবে।

BanglaBook.org

গত পরশু এই গাঁয়ে এসেছে আরিফ। একটা সিনে-সাপ্তাহিকে কাজ করে ও। এক ফিল্ম ডিরেক্টরের অনুরোধে লোকেশন দেখতে এসেছে। লারে-লাপ্পা মার্কা ফ্যান্টাসি ছবি বানাবেন তিনি। আরিফ ফিরে গিয়ে এ জায়গা সম্পর্কে রিপোর্ট দেয়ার পর ডিরেক্টর সিদ্ধান্ত নেবেন এদিকে আসবেন কিনা। আরিফের অবশ্যি জায়গাটা খুবই পছন্দ হয়েছে। শহর থেকে বেশ দূরে গ্রামটা। অন্যান্য গ্রামগুলোর তুলনায় একটু বেশি নির্জন। তার ওপর সোনায় সোহাগার মত জুটেছে 'রায় ভবন'—পুরানো জমিদার বাড়ি। পুরো আউটডোর শুটিং এখানেই শেষ করা যাবে।

গাঁয়ে ছায়াছবির শুটিং হবে শুনে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান শমশের আলী খুব খাতির করেছেন আরিফকে। প্রথম দু'রাত তাঁর বাড়িতেই ছিল ও। চেয়ারম্যান নিজে ওর সঙ্গে থেকে পুরো গ্রামটা ঘুরিয়ে দেখিয়েছেন। মাছের এই আকালের দিনেও দীঘির সংরক্ষিত বিশেষ ভাণ্ডার থেকে কেজি দশেক ওজনের রুই মেরে খাইয়েছেন। এতটা যত্ন আশা করেনি আরিফ। ও তো আর বিশিষ্ট কেউ নয়, একটা মাঝারি মানের সিনে-সাপ্তাহিকের সাব-এডিটর। ফিল্মের লোকজন এবং তাদের অনুরাগী ছাড়া আর তো কেউ পাত্তাই দিতে চায় না। শমশের আলী লোকটা আবার সিনেমার পোকা। যুবক বয়সে 'রূপবান' ছবি নাকি তেইশবার দেখেছিলেন। গান থেকে শুরু করে পুরো ছবির ডায়লগ এখনও তাঁর ঝাড়া মুখস্থ। যুবক বয়সে একবার কোন এক ছবির শুটিং দেখতে গিয়ে নায়িকার পরিত্যক্ত একগাছি চুল নিয়ে এসেছিলেন তিনি। সে নায়িকা আজকাল মা-খালার চরিত্রেও সুযোগ পান না, অথচ তার সেই চুল এখনও সযত্নে শমশের আলীর কাছে রক্ষিত। শমশের আলী স্বেচ্ছায় সানন্দে শুটিংয়ের পুরো ইউনিটের থাকা-খাওয়ার দায়িত্ব নিতে চেয়েছেন। প্রযোজকের জন্যে এটা হবে একটা বিরাট রিলিফ।

আজ বিকেলে চেয়ারম্যানের কাছ থেকে বিদেয় নিয়ে রায় ভবনে এসে উঠেছে আরিফ। এক সময় জমজমাট অবস্থা ছিল এ বাড়ির। জমিদারি প্রথা ওঠে যাবার পর ঢাকায় বসত গেড়েছে রায় পরিবার। বর্তমানে সোনাবুড়োই বাড়িটা দেখাশোনা করছে। তিনকুলে কেউ নেই বুড়োর। পান্তার মা-ই তাকে রেঁধে-বেড়ে খাওয়ায়। এখানেও যত্ন-আত্তি ভালই পাচ্ছে আরিফ। তবে শুটিংয়ের ব্যাপারে ভাবভঙ্গিতে অসম্মতি প্রকাশ করেছে বুড়ো। কেন জানি সিনেমা, নাটক, যাত্রা এসবের প্রতি রাজ্যের বিরাগ বুড়োর। পান্তার মা আবার সম্পূর্ণ উল্টো। ফিল্মের লোকজন আসবে শুনে মহিলা ভীষণ খুশি। সে বায়না ধরেছে ছবিতে তাকে একটা রোল দিতে হবে। আরিফ আশ্বাস দিয়েছে ডিরেক্টরকে বলবে এ ব্যাপারে। এখন দরকার শুধু রায় পরিবারের অনুমতি। অনুমতিটা সহজে মিলবে বলেই আরিফের বিশ্বাস।

আজ ছিল স্থানীয় হাটবার। প্রতি বুধবার এখানে হাট বসে। সন্ধের আগ দিয়ে হাট থেকে বড় একটা মোরগ এনেছে আরিফ। সাথে চিকন চাল। পান্তার মা ভুনিখিচুড়ি আর ঝাল ঝাল করে মোরগ রেঁধেছিল। ভালই রাঁধে সে। তৃপ্তির সাথে খেয়েছে আরিফ। সোনাবুড়োও খেয়ে গদগদ। খাওয়া শেষে তিনজন প্রশস্ত

BanglaBook.org

রান্নাঘরে এসে বসেছে। চুলোর ওপর হাত মেলে ধরে গল্প করছে। শুরুতে আসরটা জমে উঠেছিল। সোনাবুড়ো এক মুখে অসংখ্য কেচ্ছা শোনাচ্ছিল রায় পরিবারের। এ পরিবারের আদি উৎস থেকে বর্তমান ধারা পর্যন্ত সব তার নখদর্পণে। আর পাঁচটা জমিদার পরিবারের মতই গতানুগতিক এদের ইতিহাস। দু'তিনটে মিথও আছে সনাতন ধাঁচের। তবে রায়দের মেজ বউয়ের মৃত্যুটা সত্যিই করুণ।

মেজ বউ ছিল পরমা সুন্দরী। তার গুণও ছিল অনেক। কিন্তু তার রূপ আর গুণের কোন কদরই ছিল না লম্পট মেজ কুমারের কাছে। প্রায়ই সে বেহেড মাতাল হয়ে স্ত্রীকে মারধর করত। মেজ বউ অনেক চেষ্টা করেও স্বামীকে কুপথ থেকে ফেরাতে পারেনি। বরং দিনকে দিন তার অত্যাচার আরও বেড়েই চলে। একদিন গভীর রাতে কি এক তুচ্ছ কারণে পাষণ্ড স্বামীর হাতে নির্মম ভাবে খুন হয়ে গেল মেজ বউ। তারপর থেকেই এ বাড়িটা সবার কাছে অভিশপ্ত। সোনাবুড়ো অবশ্যি বলেছে, পুরো বাড়ি নয়, শুধু লাল কুঠরিটাই ভুতুড়ে। ওখানেই খুন হয়েছিল মেজ বউ। এখনও নিশুতি রাতে লাল কুঠরিতে গুমরে গুমরে কাঁদে মেজ বউয়ের অসুখী প্রেতাত্মা। সোনাবুড়ো অসংখ্যবার নিজ কানে শুনেছে। পান্তার মা-ও একই কথা বলছে। সোনাবুড়োর বরাবরই ডরভয় কম। তার কথা, 'মাঠান আছেন তাঁর জায়গায়, আমার জায়গায় আমি। আমরা কেউ কারও কোন ক্ষতি না করলেই হইল।'

পান্তার মা অবশ্যি প্রথম প্রথম ভয় পেত, তবে এখন আর পায় না। তার কথা, মা-ঠাকরুন যদি সামনে কোনদিন পড়েই যান, খুড়োর কাছ থেকে শেখা বন্দনা গীতটা শুনিয়ে দেবে। তাহলেই তিনি আর কিচ্ছুটি বলবেন না। এ কথা শুনেই হেসে ওঠে আরিফ।

বাইরে কোথাও কাঠে করাত চালাবার মত শব্দ হলো। পর পর কয়েকবার।

'পেঁচায় ডাক দিছে,' কান খাড়া করেই রেখেছিল সোনাবুড়ো। ব্যাপারটাকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছে সে। 'যান এখন।'

'কোন্ দিক দিয়ে যেতে হবে?' জানতে চাইল আরিফ।

'পরথমে বারিন্দা ধইরা সিধা পুব দিকে যাবেন,' বলল পান্তার মা। 'শেষ মাথায় একটা ঘর। ঘরে একটা সিঁড়ি। সিঁড়ি ধইরা দোতলায় হাতের বাঁয়ে একটা দরজা। সেই দরজা দিয়া ঢুইকা তিনটা ঘর পার হইলে আরেকটা সিঁড়ি। সিঁড়িটা তিন ধাপ নিচে আরেকটা বারিন্দায় শেষ হইছে। সেই বারিন্দা দিয়া আগালেই লাল কুঠরি।'

আরিফ উঠে দাঁড়াল। মজাই লাগছে ওর। এ অবধি শুধু শুনেই এসেছে, এখনও চাক্ষুষ দেখেনি। আজ যদি দেখাটা মিলেই যায়, বন্ধুদের আড্ডা মাত করার একটা জিনিস পাওয়া যাবে। অবশ্যি গল্পটা রসাল করার জন্যে কিছুটা রঙ চড়াতে হবে।

'দাদা,' হারিকেনের আলোতে করুণ দেখাচ্ছে পান্তার মা'র মুখ। 'এহনো সময় আছে ভাইবা দ্যাহেন। খামাকা সাহস দেহাইতে গিয়া—'

BanglaBook.org

'অযথাই ভয় পাচ্ছ তুমি,' পান্তার মা'কে কথা শেষও করতে দিল না আরিফ। 'দেখো, কিচ্ছু হবে না আমার।'

সোনাবুড়োর মুখে রা নেই। সে স্থির দৃষ্টিতে আরিফের দিকে তাকিয়ে। চোখেমুখে চাপা ভর্ৎসনা।

একটা দেশলাই পকেটে ভরে মোম হাতে এগোল আরিফ। পান্তার মা'র কথামত বারান্দা পেরিয়ে, পেঁচানো সিঁড়ি ভেঙে, তিনটে ঘর পেরিয়ে, আরেকটা সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে বারান্দা ধরে এগিয়ে লাল কুঠুরির সামনে এসে দাঁড়াল। ঘরটাকে এত প্যাঁচগোছের ভেতর পুরে রাখার কোন মানে খুঁজে পেল না আরিফ। যেন রহস্য সৃষ্টির জন্যেই ঘরটা এমন করে তৈরি করা হয়েছে।

সেগুন কাঠের দরজায় ঠেলা দিতেই ক্যাঁচম্যাচ করে মৃদু আপত্তি তুলে দু'পাশে সরে গেল ভারি কবাট। নোনা গন্ধে ভরা ভাপসা বাতাস উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল আরিফকে। ভেতরে জমাট অন্ধকার। দিনের বেলায়ই এখানে আলো আসার সুযোগ পায় না, আর এখন তো গভীর রাত। এই কামরাটা শুধু রাত্রি যাপনের জন্যে ব্যবহার করা হত। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘর ব্যবহার করতেন তাঁরা।

ভেতরে ঢুকে আরিফ টের পেল এত বড় ঘরের জন্যে একটা মোম কিছুই নয়। ঘরের সবকিছু আবছা ভাবে দেখতে চাইলেও অন্তত তিনটে মোমের দরকার। কিন্তু এখন মোম আনতে গেলে সোনাবুড়ো আর পান্তার মা ওকে ভীতুর ডিম ভাববে।

আলো ধরে ধরে পালঙ্কটার কাছে চলে আসে আরিফ। সত্যিই দেখার মত পালঙ্ক। উঁচু প্রায় এক মানুষ সমান। চারদিকে কারুকাজ খচিত কাঠের রেলিঙ দিয়ে ঘেরা। চার মাথায় চারটে কাঠের হাতি শুঁড় তুলে দাঁড়িয়ে। পায়াগুলোতে আবার বাঘের থাবা। ফুটখানেক উঁচু তোষক পালঙ্কের মাঝখানটা দখল করে আছে। লাল টুকটুকে চাদরটা নরম মখমলের। বিছানায় ওঠার জন্যে পাঁচ ধাপের একটা কাঠের সিঁড়ি আছে নিচে। মোমের ফিকে আলোতেও দিব্যি চকচক করছে কালো বার্নিশ করা পালঙ্কটা।

মোমটা এক জায়গায় রাখা দরকার। পালঙ্কের পাশেই এক গোল টিপয়। টিপয়ের মাঝখানে একটা কাঁচের মোমদানী। তাতে অর্ধদগ্ধ তিনটে বড় মোম। মোমগুলো জ্বালতেই অনেকখানি আলো ছড়াল ঘর জুড়ে। নিজের মোমটা নিভিয়ে ঘরের চারদিকে একবার নজর বুলিয়ে নিল ও। উত্তর দিকের দেয়াল ঘেঁষে প্রকাণ্ড এক ড্রেসিং টেবিল। ডিম্বাকার আয়না দেয়ালের অনেকটাই দখল করে নিয়েছে।

আরে, আয়নার ভেতর ওটা কিসের মাথা? নড়ছে মনে হচ্ছে! বুকটা ধড়াস করে ওঠে আরিফের। অজান্তেই ক'পা এগোয়। ভাল করে লক্ষ করতেই ভুল ভাঙে ওর। বিপরীত দিকের দেয়ালে লটকানো প্রকাণ্ড এক মোষের মাথার প্রতিবিম্ব পড়েছে আয়নায়। নড়ছে না, একদম স্থির।

নিজের বোকামি দেখে হাসল আরিফ। শেষমেশ মনের ভূতেই আবার তাড়া না করে!

BanglaBook.org

ড্রেসিং টেবিলে আরেকটা মোমদানী পেল আরিফ। মোমগুলো জ্বালতেই আলোর পরিধি বিস্তৃত হলো। ঘরের সবকিছু স্পষ্ট হয়ে উঠল আরও। দেয়ালের চার কোণে উঁচু ধাতব স্ট্যাণ্ডের ওপর আরও চারটে মোমদানী পেল ও। সেগুলোতেও তিনটে করে মোম—সবই আধপোড়া। একে একে সবগুলো মোম জ্বেলে দিল আরিফ। রক্তবর্ণ মসৃণ দেয়ালে আলো প্রতিফলিত হয়ে লালচে একটা আভা তৈরি হলো ঘরে। ঘরটার নাম 'লাল কুঠুরি' হবার কারণ এতক্ষণে পরিষ্কার।

ঘরে পালঙ্ক, টিপয় আর ড্রেসিং টেবিল ছাড়া আর কোন আসবাব নেই। ওপরে ঝাড়বাতির হুকগুলো শূন্য পড়ে আছে। একটা জিনিস ভেবে অবাক হলো আরিফ, এই দামী আসবাব তিনটে এখানে ফেলে রাখা হয়েছে কেন? দামের কথা না হয় বাদই গেল, মর্যাদার দিক দিয়েও তো এগুলো কম নয়। জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত রাজ-রাজড়াদের দামী আসবাবগুলোর মাঝে সাদরে স্থান পাবে এগুলো। সকালে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে হবে সোনাবুড়োকে।

অকস্মাৎ পুব দিকের বন্ধ দরজাটা খুলে গেল হাট করে। শোঁ শোঁ করে এক ঝলক দুরন্ত বাতাস ঢুকল ঘরে। মোমের শিখাগুলোকে পাগলা নাচ নাচিয়ে ঘর জুড়ে একটা অশান্ত ঢেউ তুলেই মিলিয়ে গেল বাতাস। আরিফ চমকে ওঠার ধাক্কাটা সামলে নিতে না নিতে আরেকটা তোলপাড় শুরু হলো খোলা দরজার ওপাশে। যেন একটা চঞ্চল পাখি দ্রুত ডানা ঝাপটে ওড়াউড়ি করছে। আরিফ মুহূর্ত কয়েক স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থেকে দরজাটার দিকে এগোল। দরজা পেরোতেই ভোজবাজির মত মিলিয়ে গেল লুটোপুটির শব্দ।

ছোট্ট একটা ষড়ভুজ আকৃতির ঝুল বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে ও। চারদিকে বরফি-কাটা নকশাদার রেলিং দিয়ে ঘেরা। রেলিঙের ওপর খিলান করা পাঁচটা বড় বড় উন্মুক্ত জানালা। রেলিঙে ভর দিয়ে একটা জানালা গলে মাথা বাড়াতেই কুয়াশা ঢাকা রাত চোখেমুখে শীতল আদর বোলাল। আধখানা চাঁদ থেকে নেমে আসা মৃদু আলো যেন ক্রমাগত রহস্যের জাল বুনে চলেছে ধরিত্রীর বুকে।

হঠাৎ কিছু একটা পড়ল আরিফের বাঁ কাঁধে। স্পর্শটা খুবই হালকা। ইন্দ্রিয়গুলোর অতি সতর্কতার জন্যেই টের পেল আরিফ। ঘাড় ফেরাতেই দেখে কালির ফোঁটার মত কি একটা জিনিস। আঙুলের ডগায় লাগিয়ে নাকের সামনে ধরতেই আমিষ গন্ধ পেল ও। রক্ত! হৃৎকম্পন বেড়ে গেল ওর। ওপরের দিকে তাকাতেই আরও ক'ফোঁটা রক্ত পড়ল চুল আর কপালে। তারপর পড়তেই থাকল। দ্রুত ক'পা পিছিয়ে এল আরিফ। অমনি নজরে পড়ল পাখিটা। খিলানের আবছা অন্ধকার কোণে একটা দাঁড়ে বসে আছে। মনে হচ্ছে কবুতর। একটা ডানা বিচ্ছিরিভাবে ঝুলে পড়েছে। ওই ডানা থেকেই রক্ত ঝরছে। বড্ড মায়া হলো আরিফের। পাখিটার পরিচর্যা দরকার। তা নইলে রক্ত ক্ষরণে অচিরেই মারা যাবে। কিন্তু পাখিটা নাগালের বাইরে। রেলিঙে দাঁড়ালে ধরা যাবে, তবে পড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। ঘরে ঢুকে টিপয় থেকে মোমদানীটা নামিয়ে টেনে-হিঁচড়ে বারান্দায় নিয়ে এল ও। কিন্তু কোথায় পাখি! দাঁড়টাও উধাও। তাহলে কি ভুল দেখেছে ও? কিন্তু রক্তের ফোঁটাগুলো যে এখনও রয়ে গেছে!

আরিফের বিহ্বলতা কাটল চাপা কান্নার সুরে। যেন ঘরের ভেতর ফুঁপিয়ে কেউ কাঁদছে। শব্দটা খুবই ক্ষীণ, তবে গভীর ক্ষতের মত বেদনা লুকিয়ে সে কান্নায়। ক্ষণিকের তরে আনমনা হয়ে গেল আরিফ, হু হু করে উঠল বুকের ভেতরটা, তারপর আবার ফিরে এল বাস্তবে। তাহলে কি সোনাবুড়োর কথাই ঠিক?

ডান হাতে মাথার দু'পাশটা চেপে ধরল আরিফ। বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'যা শুনছি সব ভুল! সব ভুল!! সব ভুল!!!'

আত্ম-সম্মোহনে কাজ হলো। নিয়ন্ত্রণে এল মন। আর শোনা যাচ্ছে না চাপা কান্না। নিজেকে ভীষণ পরিশ্রান্ত মনে হলো আরিফের। ক্লান্ত পা জোড়া টেনে টিপয়টা নিয়ে ঘরে ঢুকল ও। টিপয়টা জায়গামত রেখে মোমদানীটা আবার যথাস্থানে বসাল। তারপর সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল পালঙ্কে। বালিশ আর চাদরের ধুলো ঝেড়ে পশমী কম্বলটা টেনে নিয়ে সটান হলো বিছানায়। কিন্তু কম্বলটার জায়গায় জায়গায় শুকনো খসখসে এসব কি? তাছাড়া সারা বিছানা জুড়ে কেমন পুরানো একটা অস্বস্তিকর গন্ধ। ঘুমটা আজ মোটেও ভাল হবে না।

হঠাৎ করেই ব্যাপারটা টের পেল আরিফ। একটা একটা করে মোম নিভে যাচ্ছে ঘরের। যেন কেউ নিপুণভাবে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিচ্ছে মোমগুলো। প্রথমে টিপয়ের মোমগুলো নিভে গেল। তারপর নিভল ড্রেসিং টেবিলের মোম। সবশেষে কোণেরগুলো। পুরো ব্যাপারটাই ঘটল আরিফের শোয়া থেকে উঠে বসার মধ্যে। মেঝেতে আলতো পা ফেলে কে যেন হাঁটছে। ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে পদশব্দ। নিজেকে স্থির রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করল আরিফ, কিন্তু পায়ের শব্দ একেবারে বিছানার কাছে এসে গেছে। পাগলের মত পকেট থেকে দেশলাইটা বের করল আরিফ। প্রথম কাঠি জ্বলল না, দ্বিতীয় কাঠি জ্বলে উঠল তৃতীয়বারের চেষ্টায়। নিজের মোমটা ধরিয়ে ফেলল ও। কিন্তু সারা ঘর একদম ফাঁকা। কিচ্ছু নেই।

মাথা ঠাণ্ডা করে মোমগুলো নিভে যাওয়ার কারণ অনুসন্ধান করল আরিফ। যে মোমগুলো আগে জ্বেলেছে সেগুলো নিভেছে আগে এবং পরেরগুলো নিভেছে পরে। অর্থাৎ মোমগুলো নিভেছে নিয়ম মাফিক। বাতাস কখনও এরকম শৃঙ্খলা মেনে আগুন নেভায় না। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে কি? মোমগুলো পুড়তে পুড়তে এমন একটা পর্যায়ে এসেছে, ওগুলোর আর আলো ধরে রাখার শক্তি নেই। কিন্তু ব্যাখ্যাটা নিজের কাছেই কেমন বেখাপ্পা মনে হলো আরিফের। মোমগুলো পরীক্ষা করার জন্যে বিছানা থেকে নামল ও। প্রথমে টিপয়ের মোমগুলোতে আগুন দিল। দিব্যি জ্বলতে লাগল ওগুলো। একটা শিখাতেও বিন্দুমাত্র কাঁপুনি নেই। এক এক করে বাকি মোমগুলোও ধরাল আরিফ। সবগুলোই সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে জ্বলছে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ মোমগুলোর নীরব দহন দেখল ও। শিখাগুলোর মাঝে ছলচাতুরির কোন লক্ষণ নেই। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে পুবের দরজাটা বন্ধ করে দিল আরিফ। তারপর আবার উঠে এল পালঙ্কে। মোম আর দেশলাইটা হাতের মুঠোয় রাখল এবার। আরও কিছুটা সময় পেরিয়ে গেল নিঃশব্দে। মোমের

BanglaBook.org

মাথায় আগুনের খুদে জিভগুলো শান্তসুবোধ, অটল। দু'চোখ ভেঙে ঘুম আসছে আরিফের। আজকের রাতটা বন্ধুদের আড্ডায় চমৎকার রস ছড়াবে। গর্ব আর আনন্দের আগাম আস্বাদ পেয়ে ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটল ওর।

রাত তখন শেষ প্রহর অতিক্রম করছে। কোন কারণ ছাড়াই ঘুম ভেঙে গেল আরিফের। মিশমিশে অন্ধকারে নিজের অবস্থান ঠাওরাতে কেটে গেল মুহূর্ত কয়েক। তারপর সবই মনে পড়ল একে একে। সোনাবুড়োর কথা মিথ্যে প্রমাণ করতে লাল কুঠুরিতে এসেছে ও। অনেকগুলো মোম জ্বেলে পালঙ্কে এসে শুয়েছে। মোমগুলো কি শেষ হয়ে গেছে? শেষ হবারই কথা। কিন্তু হাতের সেই মোম আর দেশলাই গেল কোথায়? হাত বাড়িয়ে এদিক ওদিক খুঁজল ও। হঠাৎ খুব নরম ভেজা ভেজা ঠাণ্ডা চটচটে জিনিসে হাত লাগল ওর। নাকের কাছে ধরতেই শিউরে উঠল সারা শরীর। রক্ত! ঠিক তখুনি গভীর হতাশায় ভরা একটা বেদনার্ত দীর্ঘশ্বাস কানে এল। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ছিটকে উঠল আরিফ। পাগলের মত হাঁচড়ে-পাঁচড়ে বিছানা থেকে নামল ও। হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ঝেড়ে মারল দৌড়। সোজা গিয়ে বাড়ি খেল দেয়ালে। মাথাটা ঠুকে গেল ভীষণভাবে। সংজ্ঞা হারাবার পূর্বক্ষণে কণ্ঠ চিরে বেরোল তীক্ষ্ণ আর্তনাদ।

পরদিন দুপুরে জ্ঞান ফিরল আরিফের। মাথা জুড়ে চাপ চাপ যন্ত্রণা। চওড়া ব্যাণ্ডেজে কপাল ঢাকা। সোনাবুড়ো, পান্তার মা, ডাক্তার এবং আরও ক'টি কৌতূহলী মুখ ঝুঁকে আছে ওর দিকে।

'যাক, ভাই, বাঁচালেন!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন তরুণ ডাক্তার। 'আমি তো চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। সদরে নিতে হলে বড্ড ঝক্কি পোহাতে হত। পাক্কা বারো মাইল এখান থেকে।'

পান্তার মা'র মুখটা শুকনো দেখাচ্ছে। সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'মায়ের পোলা এইবার ভালয় ভালয় মায়ের বুকে ফিরে যান।'

সোনাবুড়োর ঠোঁটে চাপা বক্র হাসি। সে ভুরু নাচিয়ে বলল, 'এখন তো বিশ্বাস হইল?'

'না, এখনও বিশ্বাস করি না আমি। হয়তো একটা দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম, আর তা থেকেই—'

ডান হাতের দিকে চোখ পড়তেই কথা আটকে গেল আরিফের। হাতে লেপ্টে থাকা জমাট রক্ত কার? ওর, না সেই…!?

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

স্বয়ম্ভু

শেষ অবধি পথের দেখা মিলল। মরুভূমিতে অকস্মাৎ মরূদ্যান মিলে যাওয়ার মত একটা চমকপ্রদ ঘটনা যেন। আনন্দে লাফাতে ইচ্ছে হলো শাওনের। ও ধরেই নিয়েছিল রাতটা বনের ভেতরেই কাটাতে হবে। আর তা যদি হত, দুর্ভোগের কোন শেষ থাকত না। হয়তো জীবন নিয়েও আশঙ্কা দেখা দিত। যেন একটা জীবন্ত দুঃস্বপ্ন পেরিয়ে এল ও।

শিকারে বেরিয়েছিল শাওন। একা নয়, সাথে দুই মামাত ভাইও ছিল। এতক্ষণে নিশ্চয়ই ওরা বাড়ি ফিরে গেছে। আর বাড়িতে শুরু হয়েছে মহা হুলস্থূল। বড় মামা অল্পেই উত্তেজিত হয়ে পড়েন। শাওন কল্পনায় স্পষ্ট দেখতে পেল, সদলবলে লাঠি-সোঁটা নিয়ে ওকে খুঁজতে বেরিয়েছেন বড় মামা। এখান থেকে উজানতলি কতদূর কে জানে?

ইতিমধ্যে আঁধার ঘনিয়ে এসেছে। পুব আকাশে আষাঢ়ী পূর্ণিমার চাঁদ। চারদিকে খাঁ-খাঁ জোছনা। পথঘাট দিব্যি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আশপাশে কোন বাড়িঘর নেই। দূরে ক'টা আলোর বিন্দু। বন্দুকটা কাঁধে ঝুলিয়ে ওদিকেই এগোল ও।

যেতে যেতে নিজেকে আবারও ভর্ৎসনা করল শাওন। মামারা সবাই আজ ওদের শিকারে বেরোতে বারণ করেছিলেন। বর্ষাকাল শিকারের জন্যে নয়। এসময় সাপ-খোপের ভয় থাকে বনে। জন্তু-জানোয়ার পানির ভয়ে আড়াল থেকে বেরিয়ে আশ্রয় নেয় উঁচু শুকনো জায়গাগুলোতে। কিন্তু মামাত ভাইয়েরা ওকে ফিসফিস করে বলল, আষাঢ় মাসই হচ্ছে বনমোরগ ধরার আসল সময়। বৃষ্টিতে ভিজে জবুথুবু হয়ে থাকে ওরা। গাছের ডাল, মাটির ঢিবি এসব জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমোয়। একরকম পালিয়েই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল ওরা। তিনজনের সাথেই পয়েন্ট টু টু বোর। উজানতলি থেকে মাইল চারেক দূরে এক পাহাড়ের ওপর বন। পাহাড়টা তেমন উঁচু নয়, তবে গাছ-গাছালি একটু ঘন। বনে ঢুকে একটা গাছকে চিহ্নিত করে তিনজন তিনদিকে চলে যায়। কথা ছিল ঠিক দু'ঘণ্টা পর চিহ্নিত গাছতলে এসে মিলবে ওরা। কিন্তু একটা মোরগের পেছনে ছুটতে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলে শাওন। তারপর অনেক ভোগান্তির পর এই বেরিয়ে আসা। বড়দের নিষেধ না শুনে সত্যিই একটা বিরাট বোকামি হয়েছে।

মিনিট বিশেক পর আলোর বিন্দুগুলো বৃত্তে রূপ নিল। আরও মিনিট দশেক

banglabook.org

পর একটা ছোটখাটো বাজারে এসে পৌঁছুল শাওন। ক'টা মুদি দোকান আর খুপরি মত একটা হোটেল নিয়ে বাজারটা। হোটেলে ঢুকেই শাওন টের পেল পেটে ভীষণ খিদে। শরীরটাও খুব ক্লান্ত। তা তো হবেই। বার কয়েক বিশ্রাম নেয়া বাদে সেই দুপুর থেকে সন্ধে পর্যন্ত পথের খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরে বেরিয়েছে ও। বুনো কাঁটার আঁচড় খেয়ে কেড্স জোড়া ক্ষত-বিক্ষত। জিনসের প্যান্টটারও নিচে কয়েক জায়গায় ছড়ে গেছে।

হোটেলে আর কোন খদ্দের নেই। কোন বয়-বেয়ারাও দেখা যাচ্ছে না। খুব সম্ভব মালিক নিজেই সবকিছু। ঝাঁপ ফেলতে যাচ্ছিল সে, শাওনকে দেখে আবার হাঁড়ির কাছে ফিরে গেছে। এরই মধ্যে এক জগ পানি রেখে গেছে টেবিলে। মুখহাত ধোয়ার পর ক্লান্তি অর্ধেক কমে গেল শাওনের। বাঁশপাতা মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খাওয়ার পর অনেকটা সজীব মনে হলো নিজেকে। বিল মেটাবার সময় হোটেলঅলাকে জিজ্ঞেস করল, 'উজানতলি এখান থেকে কদ্দূর?'

'তা মাইল দশেক তো অইবই।'

'এখান থেকে যাব কি করে?'

'দিন থাকলে রিকশা পাইতেন। এই রাইত কইরা হাঁটন ছাড়া উপায় নাই। বড় সড়ক ধইরা সিধা হাঁইটা যাইবেন। তয় রাইত কইরা না যাওনডাই ভালা।'

'কেন?' ভুরু কোঁচকাল শাওন। 'ডাকাত-লুটেরার উপদ্রব আছে নাকি?'

'জে না, উপরদবডা অন্য এক জিনিসের। রাইত কইরা কওনডা ঠিক অইব না।'

শাওন আঁচ করল হিংস্র জন্তুর ভয় দেখাচ্ছে সে। তাজা কার্তুজ ভরা আগ্নেয়াস্ত্র থাকতে জন্তু-জানোয়ার আসবে ওর সামনে? ফুঃ!

হোটেলঅলার কাছ থেকে বিদেয় নিয়ে গলা ছেড়ে গাইতে গাইতে রওনা দিল শাওন।

চাঁদ এখন অনেকটা ওপরে। অকৃপণভাবে মায়াবী আলো ছড়িয়ে চলেছে নিশিরানীর বুকে। প্রশস্ত কাঁচা মাটির সড়কের দু'ধারে, হালকা ঝোপঝাড়ে ঝিঁঝি পোকার ডাক। এখানে ওখানে জোনাকির ঝাঁক বুটিদার করে তুলেছে অন্ধকার। সকালের দিকে বৃষ্টি হয়েছিল। এখন এক রত্তি মেঘও নেই। তবে যে কোন মুহূর্তে আকাশ কালো হয়ে যেতে পারে। বর্ষার মেঘকে একটুও বিশ্বাস নেই। বাতাস বইছে থেমে থেমে। ভেজা বাতাসে কেমন একটা অচেনা গন্ধ।

হঠাৎ শাওনের মনে হলো পিছু পিছু কে যেন আসছে। ঘাড়ের ওপর অস্বস্তিকর অনুভূতি। গান থামিয়ে থমকে দাঁড়াল ও। পেছন ফিরল ধীরে ধীরে।

একটা লোক খুব দ্রুতগতিতে হেঁটে আসছে। বন্দুকটা কাঁধ থেকে নামিয়ে হাতে নিল ও। ততক্ষণে কাছে এসে গেছে লোকটা। এসেই একগাল হাসি, 'আপনে যাইবেন কই, ভাইজান?'

'উজানতলি।'

আমিও ওইদিকেই যামু। ভালই অইল। একজন সাথী পাইয়া গেলাম।'

শাওনও মনে মনে খুশি। দশ মাইল পথ, কম দূর তো নয়, একজন সঙ্গী

BanglaBook.org

পেলে কথায় কথায় একঘেয়েমিটা কাটানো যাবে। তাছাড়া ডরভয় বলেও কিছু থাকবে না।

যেতে যেতে লোকটাকে ভাল করে একবার দেখে নিল শাওন। গায়ের রঙ কালোই হবে—জোছনার আলোয় পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। মাঝারি গড়ন, চেহারায় কেমন বোকা বোকা একটা ভাব। গায়ে ফুল-হাতা কালো শার্ট, পরনে চেক-কাটা লুঙ্গি। পায়ে সস্তা চপ্পল।

শাওন জিজ্ঞেস করল, 'আপনার নামটা কি, ভাই?'

'গরীবের নাম শুইনা কি করবেন, ভাইজান?' ছন্নছাড়া দুঃখী মানুষের মত হাসল সে। 'আমার খবর শুইনা অযথা মেজাজ খারাপ অইব। তার চাইতে আপনের খবর কন। শহরের মানুষ অইল খবরের জাহাজ।'

শাওন হাসল, 'আমি যে শহরের মানুষ—বুঝলেন কি করে?'

'ভাইজানে যে কি কয়! এইরকম জামা জুতা পইরা, কান্ধে বন্দুক ঝুলাইয়া, আর কে রাস্তা দিয়া হাঁটবো? আমার মতন গেরাইম্যা ভূত?'

শাওন অন্য প্রসঙ্গে গেল, 'আপনি করেন কি?'

'তেমন কিছু না। বনজঙ্গলে ঘুইরা বেড়াই।'

'মানে?'

'আমি একজন গায়েন।'

'তাহলে তো ভালই হলো। গান শুনতে শুনতে যাওয়া যাবে। শোনান না একটা গান।'

'আমার গান আপনের ভাল লাগবো না,' কেমন শীতল আর উদাস শোনাল তার কণ্ঠ। 'আন্ধার জীবনের গান কারোরই ভাল লাগে না।'

গায়েনের কথা শেষ হতে না হতেই অদ্ভুত একটা কাণ্ড ঘটল। রাস্তার ধারে এক জায়গায় গাছ-গাছালির ঘন সন্নিবেশ থেকে একসঙ্গে অনেকগুলো নিশাচর পাখি ডেকে উঠল আচম্বিতে। যেন পাথর-রাত্রির গায়ে তীক্ষ্ণ দাঁতঅলা একসারি ধাতব চাকা ঝাঁপিয়ে পড়ল। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল শাওনের। গায়েনের মাঝে কোন ভাবান্তর নেই। যেন পাখিগুলোর ভয়াল ডাক কানেই যায়নি তার। উদাস হয়ে কি ভাবছে তা সেই জানে।

মিনিট পাঁচেক নিঃশব্দেই হাঁটল ওরা। তারপর হঠাৎ করেই গান শুরু করে দিল গায়েন। ভাঙা ভাঙা কর্কশ কণ্ঠ। খানিক আগের সেই মোলায়েম কণ্ঠের সাথে একটুও মিল নেই। গানের মর্মার্থ ভাব মেশানো। মানুষ আঁধারকে ভয় পায়, ঘৃণা করে, অসুন্দর বলে ধিক্কার দেয়, তবু সেই আঁধারকেই ভালবাসে গায়েন। তার বেসুরো গান শুনে কতগুলো শেয়াল দৌড়ে পালাল আশেপাশের ঝোপ থেকে। ভীষণ রাগ হলো শাওনের। নিজের ওপরেই। কেন যে লোকটাকে গান গাইতে বলেছিল!

মাঝপথে আচমকা গান থামিয়ে দিল গায়েন। শাওনের দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'তাড়াতাড়ি দোয়া পড়েন, ভাইজান। সামনে নিমতলি শ্মশান!'

BanglaBook.org

শ্মশানকে ভয় পায় না শাওন। কিন্তু গায়েনের কথার ঢঙেই ফড়ফড়িয়ে দাঁড়িয়ে গেল গায়ের রোমগুলো। সঙ্গী ভাল, তবে ভীতু সঙ্গী ভাল নয়—খুব ভাল করেই উপলব্ধি করল ও।

এখন শ্মশান পেরোচ্ছে ওরা। বাঁ দিকে রাস্তা থেকে অল্প এগোলেই শ্মশান। তাকাব না তাকাব না করেও শেষমেশ শ্মশানের দিকে তাকাল শাওন। একটা ডোবার ধারে চার-পাঁচটা উঁচু নিম গাছ, গাছ আর ডোবার মাঝখানে প্রশস্ত জমিটুকুতে মড়া পোড়ানো হয়। ভয় পাবার মত কিছুই নেই ওখানে।

গায়েনকে শাওন বলল, 'শ্মশানটা ভাল করে দেখে নিন। আপনার ভয়টা কেটে যাবে।'

গায়েন শ্মশানের দিকে তাকাবার আগেই পেছন থেকে দ্রুত এগিয়ে আসা হৈ ৮৩ শুনে হকচকিয়ে গেল। শাওনও থমকে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরল। পরক্ষণে দুটো শেয়াল তীব্র বেগে পাশ কাটাল ওকে। তারপরই দশ-বারো জন মানুষ লাঠি আর বল্লম নিয়ে হাজির। শাওন ভাবল ডাকাত। হলকুম শুকিয়ে এল ওর। এতগুলো ডাকাতের সাথে একটা বন্দুক দিয়ে কি করবে?

শাওনের ধারণা ভুল প্রমাণ করে বল্লমধারী মাঝবয়েসী এক লোক ওকে শুধোল, 'কুটুমের বাড়ি কই গো?'

'বাড়ি শহরে। উজানতলিতে মামার বাড়ি যাচ্ছি।'

'এই রাত্রিবেলায় যাওন তো ঠিক অইবো না। এই রাস্তাটা ভালা না। বিপদ অইতে পারে। আপনে আমাগো লগে চলেন। রাইতটা কাটাইয়া সকালে রওনা দিবেন।'

'ধন্যবাদ। রাতেই ওখানে পৌঁছুতে হবে আমাকে। সবাই চিন্তা করছে। শিকারে-বেরিয়ে বনের ভেতর পথ হারিয়েছিলাম।'

'কিন্তু কুটুম, একা একা—'

'একা কোথায়?' লোকটাকে কথা শেষও করতে দিল না শাওন। 'এক গায়েন আছে আমার সাথে।'

'কই সেই লোক?'

পেছন ফিরে শাওন দেখে গায়েন নেই। নিশ্চয়ই ভয়ে দৌড় দিয়েছে। ও বলল, 'লোকটা একটু ভীরু প্রকৃতির। আপনাদের দেখে আড়ালে কোথাও গা ঢাকা দিয়েছে। মনে করেছে ডাকাত। আপনারা চলে গেলেই আবার বেরিয়ে আসবে।'

'ও আইচ্ছা,' একটু যেন আশাহত হলো লোকটা। 'তাইলে আমরা যাই গো, কুটুম। ভালয় ভালয় য্যান বাড়ি ফিরতে পারেন।'

লোকগুলো চলে গেল। কিন্তু গায়েনের ফিরে আসার কোন লক্ষণই নেই। মিনিট কয়েক অপেক্ষা করে আবার রওনা হলো শাওন। যেতে যেতে বেশ ক'বার 'গায়েন' 'গায়েন' বলে চেঁচাল। কোন সাড়া মিলল না।

সামনে তেরাস্তার মোড়ে বট গাছটার তলে পাওয়া গেল গায়েনকে। শাওনের জন্যে অপেক্ষা করছিল। শাওন তাকে দেখেই ভর্ৎসনা ছুঁড়ে দিল, 'আচ্ছা ভীতুর ডিম তো আপনি! কতগুলো মানুষ শেয়াল তাড়াতে তাড়াতে এসেছে, আর তা

BanglaBook.org

দেখেই আপনি দৌড়ে পালালেন!'

অন্ধকার থেকে চাঁদের আলোতে বেরিয়ে এল গায়েন। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'ভয় কি আর সাধে পাইছি। যদি সেই কথা জানতেন, তাইলে আপনেও দৌড়াইতেন আমার লগে।'

'কথাটা শুনি।'

'এই রাইত কইরা কওয়াটা—'

'কিচ্ছু হবে না বলুন।' জেদী কণ্ঠ শাওনের।

'সবাই কয় একটা পিশাচ নাকি আছে এইদিকে। রাইতবিরাইতে এই পথে ঘোরাঘুরি করে। তার সারা শরীর ভর্তি চোখ। যে তারে দেখে সে ভয়ে মইরা যায়।'

হো হো করে হাসল শাওন। 'এটা একটা গুজব ছাড়া কিছুই না।'

'জে না, গুজব না। এই দ্যাখেন।'

গায়ের শার্টটা খুলে ফেলল সে। শাওন চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখল তার গা ভর্তি অসংখ্য চোখ। সবগুলোই পিট্ পিট্ করছে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

পিশাচী

এক

গ্রীষ্মের আকাশ তেতে আছে জ্বলন্ত চুলোর মত। খাঁ খাঁ রোদে পুড়ে মরছে নিঝুম অলস দুপুর। চৌধুরী বাড়ির সিঁড়িঘরে এমুহূর্তে অসহ্য ভাপসা গরম। সেই গরমে সেদ্ধ হতে হতে একের পর এক পুরানো বইগুলো ঘেঁটে চলেছে শিশির।

দোতলায় ওঠার সিঁড়ির ঠিক পাশেই ঘরটা। অর্ধেক মাটির নিচে, অর্ধেক ওপরে। প্রবেশ দরজা একটাই। কোন জানালা নেই। দরজার বিপরীত দিকের দেয়ালে ঘুলঘুলি আছে গোটা তিনেক। ওগুলো দিয়ে বাইরে থেকে যে আলো আসছে তাতে স্পষ্ট করে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু এ নিয়ে শিশিরের কোন মাথাব্যথা নেই। অনাদরে ফেলে রাখা একগাদা পুরানো বইয়ের স্তূপ থেকে একটা করে বই তুলে নিয়ে প্রায় নাকের ডগায় এনে দ্রুত পাতা ওল্টাচ্ছে। একটা ডায়েরী খুঁজছে ও। ডায়েরীটা ওর কাছে গুপ্তধনের নকশার মতই দামী।

এসএসসি দিয়ে দাদার বাড়ি বেড়াতে এসেছে শিশির। ইতিমধ্যে এক হপ্তা পেরিয়ে গেছে। গত ক'টা দিন বড্ড একঘেয়েভাবে কেটেছে ওর। বাড়িতে মানুষ বলতে দাদু-দিদা আর দু'জন চাকর-চাকরানী—বিশাল পুরীতে যাদের অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া দায়। হৈ-হুল্লোড় ছাড়া কি আর ছুটি-ছাটা ভাল লাগে?

শিশিরের প্রপিতামহ ছিলেন এ-তল্লাটের জমিদার। আফতাব চৌধুরীর দোর্দণ্ড প্রতাপের কথা এখনও মানুষের মুখে মুখে। শিকারের প্রচণ্ড নেশা ছিল তাঁর। শীত এলেই সঙ্গী-সাথী নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন। ফিরতেন অসংখ্য পশুপাখি মেরে। এখনও চৌধুরী বাড়ির দেয়ালে দেয়ালে শোভা পাচ্ছে আফতাব চৌধুরীর হাতে প্রাণ-হারানো বাঘ, হরিণ, মোষের মাথা আর চামড়া। আরেকটা শখ ছিল তাঁর। সেই গোপন শখের কথা খুব কাছের দু'চারজন ছাড়া আর কেউ জানত না। প্রেত-চর্চা করতেন তিনি। গভীর রাতে এ বাড়িরই এক গুপ্ত কুঠুরিতে উন্মোচিত হত এক অন্ধকার জগতের দ্বার।

পরদাদার প্রেত-চর্চার কথা হঠাৎ করেই জানতে পেরেছে শিশির। কাল দুপুরে তেতলার চিলেকোঠায় গরাদহীন জানালাটার ধারে, রঙ-চটা বিশাল পালঙ্কটায় উপুড় হয়ে সঙ্গে করে আনা গল্পের বইগুলো দেখছিল ও। মন বসাতে পারছিল না একটাতেও। বড্ড আফসোস হচ্ছিল ওর। মেজ'পার সাথে সিঙ্গাপুর গেলেই ছুটিটা বেশ কাটানো যেত। দরাজ দিল দুলাভাইয়ের কাছ থেকে বাগানোও যেত কিছু পছন্দের জিনিস। কিন্তু বাদ সাধলেন বাবা। বললেন, 'বিদেশ বিভুঁইয়ে

BanglaBook.org

গিয়ে কাজ নেই, ছুটিটা বরং গাঁয়ে তোমার দাদু-দিদার ওখানেই কাটিয়ে এসো। গ্রাম হচ্ছে আমাদের শেকড়। মূল উৎসের সাথে চেনাজানা, ঘনিষ্ঠতা না থাকলে চলবে কেন? তাছাড়া তোমার দিদা তোমাকে দেখার জন্যে অস্থির হয়ে আছেন।'

মা আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, 'তোর বাবার কথায় ভজিস না। আগে সিঙ্গাপুর থেকেই ঘুরে আয়। পরে না হয় গ্রামে যাস। বিদেশে তো আর যখন তখন ইচ্ছে করলেই যাওয়া যায় না!'

মেজ'পাও মা'র কথায় সায় দিল। কিন্তু শিশিরের ঘাড়ে কোন্ ভূত চাপল, বাবার কথাই মেনে নিল। এবং এখানে এসেই টের পেল কাজটা আসলে স্ববিরোধী হয়ে গেছে। মনটা আসলে সিঙ্গাপুর যাবার জন্যেই এক পায়ে খাড়া ছিল, মনের সাথে বিদ্রোহ করে বসেছে ও। দাদার বাড়িতে আবদ্ধ জলের মাছের মত অবস্থা হয়েছে ওর। ঘুরে ফিরে সেই এক বাড়ি, এক ঘর, একই মানুষ। তা আবার একজনও ওর সমবয়েসী নয়। চাকর হারিস আলীর বয়স পঞ্চাশের ওপরে। হাসিখুশি চেহারা, মাথা ভর্তি টাক, বেঁটেখাটো তামাটে গায়ে অসুরের শক্তি। ঘর থেকে বাইরে পা দিলেই দেহরক্ষীর মত পিছু নেয় সে। বড় দীঘিটার তীরে গিয়ে একটু দাঁড়ালেই বলবে, 'এইহানে বেশিক্ষণ থাকন যাইব না, বাপজান!'

'কেন?'

'জ্যান্ত দীঘি এইডা। পানির নিচে সিন্দুক আছে একডা। পরতি আমাবস্যায় ভাইসা ওডে। কাউরে একলা পাইলে শিকল দিয়া বাঁইন্ধা টাইনা লইয়া যায়।'

লোকটির অবিশ্বাস্য কথাগুলো শুনতে মজাই লাগে। তার বলার ভঙ্গিটাও চমৎকার। আষাঢ়ে গল্পগুলোর জন্যেই তাকে পছন্দ করে শিশির। কিন্তু রাজিয়ার মা? চৌধুরী বাড়ির খাস ঝি বলে তার চোটপাটই আলাদা। সন্ধেবেলা সদর বাড়িতে একটু হাঁটাহাঁটি করতে দেখলেই সে আদেশের সুরে বলবে, 'খোকাসাব, শিগগির হাতমুখ ধুইয়া ঘরে যান। আম্মাজান কিন্তুক রাগ অইব।'

এতদিন ছিল পড়াশোনা আর পরীক্ষার ফাঁদ। এখানে এসে পা দেয়া হয়েছে ছুটির ফাঁদে। বাইরের কারও সঙ্গে বসে যে ও দু'দণ্ড কথা বলবে সে উপায়ও নেই। চৌধুরী বাড়ির চারদিকে কোয়ার্টার মাইলের মধ্যে কোন বাড়িঘর নেই। শিশিরের দাদা আসিফ চৌধুরী যদিও নরম মেজাজী মানুষ, তবু কাজ ছাড়া কোন গাঁয়ের লোক পারতপক্ষে তাঁর কাছে আসে না। চৌধুরীদের আগের সেই প্রভাব-প্রতিপত্তি না থাকলেও এঁদের প্রতি গ্রামবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গি একটুও বদলায়নি।

শিশির সেধে গিয়ে গাঁয়ের ছেলেদের সাথে ভাব জমাবার চেষ্টা করে দেখেছে। কোন লাভ হয়নি। এক ধরনের জড়তা আড়ষ্ট করে ফেলে ওদের। চেহারায় ফুটে ওঠে সমীহ আর ঈর্ষার এক মিশেল অভিব্যক্তি।

এসব ছোটখাটো নানা ঘটনায় মনটা হাঁপিয়ে উঠেছিল শিশিরের। কালকের কোকিল ডাকা উদাস দুপুরটা এতই অসহ্য লাগছিল যে, ফিরে যাবার সিদ্ধান্তটা নিয়েই ফেলেছিল ও। কিন্তু তেষ্টা মেটাতে গিয়ে খোঁজ পেল নতুন এক উন্মাদনার।

হলঘর মত প্রশস্ত ডাইনিং রুমের সাথেই দাদু-দিদার শোবার ঘর। রাজিয়ার

মা মেঝেতে সটান হয়ে মিহি সুরে নাক ডাকাচ্ছিল বলে নিজেই জগ থেকে পানি ঢালতে গেল শিশির। এমন সময় দাদু-দিদার কথোপকথন কানে এল।

জাঁতিতে ঠকাস্ ঠকাস্ সুপোরি কাটতে কাটতে দিদা বলছিলেন, 'বইপত্তরগুলো ওখানে ওভাবে ফেলে না রেখে পুড়িয়ে ফেলো। ছেলেটা তো আর দু'একদিনের জন্যে আসেনি। অনেকদিন থাকবে। এ বয়েসী ছেলেদের মনে নানারকম কৌতূহল থাকে। বলা যায় না একদিন হুট করে সিঁড়িঘরে ঢুকে পড়তে পারে। আর বইগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে যদি সেই ডায়েরীটা পেয়ে যায়—'

'সিঁড়িঘরে ঢুকবে কি করে?' দাদুর কণ্ঠ। 'তালা দেয়া আছে না! চাবি তো তোমার কাছেই। ওটা তুমি না দিয়ে বসলেই হবে।'

'যদি বায়না ধরে?'

'ভুলিয়ে ভালিয়ে—'

'আহা, কথা কি!' দাদুকে কথা শেষও করতে দিলেন না দিদা। 'আক্কেল দেখে মরে যাই! নাতি আমার দুধের শিশু কিনা! আচ্ছা, ওগুলো পোড়াতে তোমার অসুবিধেটা কোথায়?'

'বাবার স্মৃতি নিশ্চিহ্ন করতে কার ভাল লাগে বলো?'

'স্মৃতি না বলে বলো কলঙ্ক। নামাজ-কালাম রেখে উনি করেছেন পিশাচের পুজো! আমি চাই না আমার নাতি তার পূর্বপুরুষের এই অপকর্মের কথা জানুক।'

'তুমিই জানিয়ে ছাড়বে। অযথা বাড়াবাড়ি করছ। বইগুলো এখন পোড়াতে গেলেই বরং ছেলেটা কৌতূহলী হয়ে উঠবে। সিঁড়িঘরেই খুব নিরাপদে আছে ওগুলো। তাছাড়া সব বইয়ের ভেতরেই তো আর ওসব কথা লেখা নেই। লেখা আছে একটা মাত্র ডায়েরীতে।'

'ঠিক আছে, ওই ডায়েরীটাই না হয় পুড়িয়ে ফেলো।'

'এতগুলো বইয়ের ভেতর ওটা কোথায় পড়ে আছে কে জানে? খুঁজতে যাওয়াটাই তো একটা ঝক্কি!'

'বার বার সেই একই গোঁ! একটা অঘটন না ঘটিয়ে ছাড়বে না তুমি।'

'গোঁ তো ধরেছ তুমিই। সেই কবে থেকে একই কথা বার বার বলে আসছ। এতগুলো বছরেও যখন কোন অঘটন ঘটেনি, কোনদিন আর ঘটবেও না। ওসব কথা এখন বাদ দাও। বড্ড ঘুম পেয়েছে।'

এরপর দাদুর আর কোন কথা শোনা গেল না। তবে দিদা আরও কিছুক্ষণ গজ গজ করলেন। শিশিরের কানে সেসব কথা ঢুকল না। ওর মাথায় তখন ডায়েরীটা বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। চোখের সামনে তরতাজা অ্যাডভেঞ্চার।

দিদার চাবির গোছাটা কোথায় থাকে ভাল করেই জানে শিশির। কোন্ তালার কোন্ চাবি সেটাও ওর নখদর্পণে। তার ওপর আরেকটা সুবিধে, চাবিগুলোতে রোজ হাত দেয়া হয় না। গত রাতে দাদু নিজের লাইব্রেরিতে বসে বই পড়ার সময় যখন হাঁক ছেড়ে দিদার কাছে এক খিলি পান চাইলেন, তখুনি সিঁড়িঘরের চাবিটা হাতাবার সুযোগ এসে গেল। কিছুটা শুচিবাই আছে দাদুর। কাজের লোকদের হাতের কোন জিনিস মুখে দিতে পারেন না। কাজেই তাঁর পান-তামাকের ব্যবস্থাটা

BanglaBook.org

সবসময় দিদাকেই করে দিতে হয়। আগে থেকেই ওঁৎ পেতে ছিল শিশির। দিদা পান নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া মাত্র নিঃশব্দে বড় বড় পা ফেলে ঘরে ঢুকল ও। দিদার বালিশের নিচ থেকে দ্রুত বের করল ইংরেজি 'এস' আকৃতির রুপোর রিঙটা। এক গোছা চাবি থেকে ঝটপট খসিয়ে নিল নির্দিষ্ট চাবি। তারপর রিঙটা আবার যথাস্থানে রেখে সন্তর্পণে বেরিয়ে এল।

রাতেই একবার সিঁড়িঘরে ঢুঁ মারতে চেয়েছিল শিশির, কিন্তু সাহসে কুলোয়নি। অনেকদিনের পুরানো ঘর, সাপ-বিচ্ছু থাকা বিচিত্র কিছু নয়। তাছাড়া গাঢ় আঁধারে শুধুমাত্র মোম কিংবা হারিকেনের আলোতে অতগুলো বইয়ের মাঝে ডায়েরী খুঁজতে যাওয়াটা বিরাট বোকামি—দাদু নিজেই যেখানে ঝক্কির কথা বলেছেন।

ডায়েরীটা ঘুমোতে দেয়নি শিশিরকে। প্রায় সারারাত এপাশ ওপাশ করে কেটেছে। ভোর রাতে যদিও বা একটু তন্দ্রা লেগেছিল, দুঃস্বপ্ন দেখে তড়াক করে উঠে বসতে হয়েছে।

সকালে একটু বেলা করেই ঘুম ভেঙেছিল। বিলেতী কায়দায় নাশতা করতে বসে এক বিতিকিচ্ছি কাণ্ড করে বসল শিশির। দেয়ালের দিকে উদাস দৃষ্টি মেলে রুটি চিবোতে গিয়ে ন্যাপকিন চিবোতে শুরু করল। দিদা তো হাসলেনই, সদাগম্ভীর রাজিয়ার মাও হেসে খুন।

সারাটা সকাল কাটল ছটফট করে। দুপুরটা এল যেন কাছিমের পিঠে সওয়ার হয়ে। খাবার সেরে সবাই বিশ্রামে মগ্ন হতেই চুপিসারে সিঁড়িঘরে ঢুকে পড়ল শিশির। শুরু হলো বই ঘাঁটাঘাঁটি।

সিঁড়িঘরটা আসলে একটা স্টোর। ভাঙা চেয়ার-টেবিলসহ বিভিন্ন বাতিল মাল রাখা হয়েছে এখানে। পুব দিকের দেয়াল ঘেঁষে পাঁচটা স্তম্ভে মাঝ দেয়াল অবধি স্তূপ করে রাখা হয়েছে আফতাব চৌধুরীর প্রিয় বইগুলো। সবগুলো বই-ই ইংরেজি। বেশিরভাগই আবার প্রাচ্য-প্রতীচ্যের প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে। এগুলো হেফজ করা শিশিরের কম্মো নয়। ডায়েরীটা আবার এরকম খিট্‌মিটে না হলেই হয়!

ফিল্ম-প্রোজেক্টরের রশির মত ঘুলঘুলি দিয়ে আসা আলোর তেজ মরে এসেছে। এখুনি বাড়ির সবাই জেগে উঠবে। আর বেশি দেরি করা যাবে না। কিন্তু সেই ডায়েরীটা কোথায়?

চারটে স্তম্ভ ইতিমধ্যে দেখা হয়ে গেছে। হলদেটে মলিন বইগুলোর একটাও অক্ষত নেই। কোনটার মলাট আছে তো ভেতরে কিছু পাতা নেই, কোনটার পাতা ঠিক আছে তো মলাট উধাও, তার ওপর কাগজ বিধ্বংসী খুদে জীবগুলো কেটেকুটে সাড়ে সর্বনাশ করেছে বইগুলোর। যদিও হারিস আলী মাসে দু'বার ঘরটা সাফসুতরো করে, তবু আরসোলা আর ইঁদুরের দঙ্গল একেবারে নিপাত করতে পারেনি। শিশিরের সামনেই বেশ কটা আরসোলা বইগুলোর ওপর হৃষ্টচিত্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু ও নিয়ে মাথা ঘামালে চলবে না। সবাই জেগে ওঠার আগেই কাজ সারতে হবে।

BanglaBook.org

বইয়ের শেষ স্তম্ভে হাত দিল শিশির। তিনটে বই সরাতেই পেয়ে গেল ডায়েরীটা। আকারে খুব একটা বড় নয়, শক্ত বোর্ড বাঁধাই করা মলাট চামড়ার জ্যাকেটে মোড়ানো। জ্যাকেটের গায়ে অসংখ্য ফুটো। ডায়েরীটা শার্টের তলায় লুকিয়ে প্যান্টের ভেতর গুঁজে রাখল শিশির। তারপর দরজাটা তালাবদ্ধ করে চলে এল দোতলায়, নিজের শোবার ঘরে। বিছানার নিচে লুকিয়ে রাখল ডায়েরীটা। এখন চাবিটা ভালয় ভালয় যথাস্থানে রাখতে পারলেই হাঁফ ছাড়া যাবে।

দুই

রোদ পড়ে গেলে বড় ধামা আর চটের থলেটা নিয়ে হাটে যাবার জন্যে তৈরি হলো হারিস আলী। টাকা পেলেই রওনা হবে।

দিদা বেড-সাইড টেবিলের ড্রয়ার খুলে দেখেন টাকা নেই। সব খরচ হয়ে গেছে। আলমারিতে আবার হাত দিতে হবে। কপাল গুণে শিশির এখন দিদার ঘরেই। চায়ে চুমুক দিতে দিতে দিদার কাজকর্ম দেখছে। দিদা বালিশের নিচে হাত দিতেই বুকটা ধড়াস করে উঠল ওর। সিঁড়িঘরের চাবিটা এখনও জায়গামত রাখা হয়নি। আসলে রাখার সুযোগই পায়নি ও। ভেবেছিল রাতে একফাঁকে রেখে দেবে, কিন্তু দিদা তা আর হতে দিচ্ছেন কই?

এই ষাট বছর বয়সেও চশমার পুরু লেন্সের আড়ালে দিদার অভিজ্ঞ চোখজোড়া খুবই সতর্ক। চারপাশের কোন কিছুই তাঁর নজর এড়ায় না। চাবি খোয়া যাবার ব্যাপারটা নির্ঘাত টের পেয়ে যাবেন। আর এ ব্যাপারে ঘুরেফিরে শেষমেশ ওকেই ধরে ফেলবেন।

শিশির মনে মনে ফন্দি আঁটল, চাবির গোছার দিকে দিদা সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকানো মাত্র পেট ব্যথার ভান করে চিৎকার দিয়ে উঠবে। এতে ক্ষণিকের জন্যে হলেও দিদাকে সন্দেহ থেকে সরিয়ে রাখা যাবে। কিন্তু পরিকল্পনাটা নিজের কাছেই কেমন হাস্যকর মনে হলো। দিদা যা বুদ্ধিমতী—শেষমেশ চালাকিটা ধরেই ফেলেন কিনা?

'হারিস চাচাকে হাট থেকে সরপুঁটি আনতে বোলো, দিদা। অনেকদিন সরপুঁটি ভাজা খাই না।' আব্দার জুড়ে দিল শিশির। দিদার মনোযোগ অন্যদিকে ফেরানোর চেষ্টা আর কি।

'আহা রে, ভাই, সেদিন কি আর আছে!' চাবির গোছাটা বের করে শিশিরের দিকে ফিরলেন দিদা। 'হাটবাজারে তো আজকাল মাছই পাওয়া দায়! আচ্ছা দেখি, হারিসকে দিয়ে তোমার পছন্দের জিনিস আনাতে পারি কিনা।'

আলমারি খুলে টাকা নিয়ে ওটা আবার লক করলেন দিদা। চাবির গোছা যথাস্থানে রেখে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। এই-ই সুযোগ। শার্টের পকেটেই আছে চাবিটা। এক মুহূর্তও দেরি না করে ওটাকে রিঙবন্দী করে ফেলল ও।

BanglaBook.org

সাপার পর্যন্ত সময়টা খুব কষ্টে কাটল শিশিরের। খেতে বসেও তেমন স্বস্তি পেল না। হাটে সরপুঁটি পেয়েছিল হারিস আলী। হাতছাড়া হবার ভয়ে দামাদামী না করেই কিনে এনেছে। বেশ পুরুষ্টু সরপুঁটি। সবক'টিই ভাজা হয়েছে। কিন্তু মুখে রুচল না শিশিরের। ওর খাই খাই ভাবটা এখন আফতাব চৌধুরীর ডায়েরীর ওপর হুমড়ি খেয়ে আছে। সুযোগ আসা মাত্র শুরু হবে অক্ষর, শব্দ আর বাক্য গেলা।

ন'টার দিকে নিজের রুমে ঢুকল শিশির। দরজায় হুড়কো লাগিয়ে উপুড় হলো বিছানায়। হারিকেনের মৃদু আলোতে মেলে ধরল ডায়েরীটা।

হলদেটে বিবর্ণ পাতাগুলোর প্রায় সবই ক্ষত-বিক্ষত। কালি ছড়ে গিয়ে অস্পষ্ট হয়ে গেছে লেখা। ভাষাটা বাংলা কি ইংরেজি—বুঝতে হলে বিশেষজ্ঞের কাছে যেতে হবে।

নিদারুণভাবে হতাশ হলো শিশির। দূর, এত কষ্ট, এত সতর্কতা সবই যে মাঠে মারা গেল! বিষণ্ন মনে ক্ষয় ধরা পাতাগুলো উল্টে চলল ও। শেষের দিকে হঠাৎ করেই যেন একটুখানি আশার আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল। শেষ ক'টা পাতা একেবারে নষ্ট হয়ে যায়নি। ছিটে-ফোঁটা ক্ষতগুলোকে বাদ দিলে পাতা ক'টাকে অক্ষতই বলা চলে। কালি ছড়ে গেলও বাংলা অক্ষরগুলো এখনও পড়া যায়। যেন শিশিরের পড়ার অপেক্ষাতেই এতদিন কালের করাল গ্রাস থেকে নিজেদের কোনরকমে বাঁচিয়ে রেখেছে অক্ষরগুলো।

কিন্তু ঝক্কিটা কম গেল না। পাঁচ পৃষ্ঠার পাঠোদ্ধার করতে পুরো একটা ঘণ্টা লেগে গেল। লেখাটুকু সাধুভাষা থেকে কথ্য ভাষায় সংক্ষেপে সাজিয়ে নিলে যা দাঁড়ায় তা হচ্ছে—

'ডায়েরীর শুরু থেকে এ পর্যন্ত যা লিখেছি সব সত্যি। এক বর্ণও মিথ্যে নেই এতে। আমি জানি আমার পরবর্তী বংশধরদের অনেকেই এ ডায়েরী পড়ে সন্দিহান হয়ে উঠবে। অবজ্ঞা আর ভর্ৎসনা ছুঁড়ে দেবে আমার প্রতি। তাদের সন্দেহ সমূলে দূর করবার জন্যেই এই লেখাটা লিখে যাচ্ছি। আগেই বলেছি প্রেত সাধনাকে স্রেফ একটা শখ হিসেবে নিয়েছিলাম। আলোকিত ভুবনের বাসিন্দা হয়ে অন্ধকার জগতের প্রাণীদের নিয়ে মেতে উঠেছিলাম এক রোমাঞ্চকর খেলায়। আমার এই বিচিত্র শখের ছোট্ট একটা নিদর্শন রেখে গেলাম এ বাড়ির এক গুপ্ত কুঠুরিতে। এক পিশাচীকে মন্ত্রবলে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি ওখানে। অন্ধকার জগতের প্রাণীদের অস্তিত্ব এবং আমার গোপন সাধনার সত্যাসত্য প্রমাণের জন্যেই এ আয়োজন। কারও সন্দেহ হলে বিশেষ একটা পদ্ধতির মাধ্যমে জাগাতে পারবে ওই পিশাচীকে। দেখা শেষ হলে আবার বিশেষ নিয়মে ঘুম পাড়িয়ে রাখা যাবে ওটাকে। তবে হে আমার বংশধরেরা—তোমরা সাবধান! এ খেলা হচ্ছে জীবন-মরণ খেলা। নিয়ম-কানুন একচুল এদিক-সেদিক হলেই চরম বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। শুধুমাত্র সাহসী এবং অত্যুৎসাহীদের প্রতিই রইল আমার পিশাচী দর্শনের আমন্ত্রণ। নিয়ম-কানুনগুলো সহজভাবে না লিখে ছন্দের ফাঁদে বন্দী করে গেলাম। সেরকম আগ্রহী হলে অবশ্যই ছন্দের ফাঁদ থেকে উদ্ধার করতে পারবে আমার নির্দেশনা।'

ছড়া দুটো মেরুন রঙের কালি দিয়ে লেখা। কালিটা খুবই ভাল। এতগুলো বছরেও কোন অক্ষর থেকে বিন্দু পরিমাণ কালি ছড়ে যায়নি।

ছড়া দুটো পড়তে শুরু করল শিশির—

প্রথম ছড়া

নয় তামাশা নয় রঙ্গ
আছে যে এক সুরঙ্গ
বুদ্ধি যদি থাকে ঘটে
খুঁজে নিতে পারবে বটে।
ময়ূর কোঠার দেয়ালেতে সেখানটায় রবি
দ্বি-প্রহরে ছায়া ফেলে আঁকে এক ছবি।
তালগাছের মাথা আর বাবুই পাখির নীড়
ঠিক তার বিপরীতে হৃদয়ভেদী তীর।
আর যাব না একচুলও, এটুকুই বেশ
নির্দেশনার প্রথম কিস্তি এখানেই শেষ।

দ্বিতীয় ছড়া

যদি তুমি হও ধীমান
রাখো এবার তার প্রমাণ।
আছে যে এক বট গাছ উত্তরে দীঘির
তার সমুখে পোঁতা আছে তাম্রের তীর।
গুঁড়ি থেকে তিন হাত এগিয়ে যাবে
আরও তিন হাত খুঁড়লে সে তীরটা পাবে।
তীর থেকে বারো হাত এগোলেই হাঁড়ি
উপকরণ আছে সব ভেতরে তারই।
আছে এক নির্দেশনা রাঙতায় মোড়া
করণীয় সবই তায় পাবে আগাগোড়া।
যা বলার বলে দিলাম এবার আমি আসি
মনে রেখো ভুল হলে পড়বে যে ফাঁসি।

রহস্য বেশ ভালই জমিয়েছেন আফতাব চৌধুরী। ঠিক একেবারে গোয়েন্দা গল্পের সাঙ্কেতিক চিরকুটের মত। তবে ব্যাপারটাকে এখন আর অত গুরুগম্ভীর মনে হচ্ছে না। কেমন যেন খেলা খেলা ভাব। ছুটির অলস মুহূর্তগুলোকে রোমাঞ্চে ভরিয়ে তোলার জন্যে শিশিরও ব্যাপারটাকে একটা মজার খেলা হিসেবেই নেবে।

ছড়া দুটো বেশ ক'বার আওড়ে মুখস্থ করে নিল শিশির। তারপর ডায়েরীটা বিছানার তলায় রেখে দিয়ে চিৎপাত হলো। চোখ বুজে মনে মনে ভাবতে লাগল ছড়া দুটোর কথা।

তিন

কালকের মত আজও সবার দিবানিদ্রার সুযোগে ঘর থেকে বেরোল শিশির।

সদর বাড়ির নিচতলার প্রশস্ত হলঘরটাই ময়ূর কোঠা। আফতাব চৌধুরীর জলসাঘর ছিল এটা। বিভিন্ন উৎসবে নাচগানের আসর বসত এখানে। বলাই বাহুল্য এখন আর সে অবস্থা নেই। রঙ-বেরঙের বড় বড় ঝাড়বাতি, চুমকি আর পাথর বসানো ঝালর, ফুল-পাতা নকশা আঁকা ইরানী গালিচা—এসব সেই কবেই ময়ূর কোঠার সব জৌলুস চুরি করে পালিয়েছে। ঘরটা এখন নিঃসঙ্গ অন্ধের মত পড়ে আছে এক কোণে।

ময়ূর কোঠার দক্ষিণে এক চিলতে উঠনের ওধারে বিরাট আমবাগান। সেই আমবাগানের ভেতর একটা তাল গাছ সবক'টা আম গাছের মাথা ছাড়িয়ে সিনা টান করে দাঁড়িয়ে। গাছটাতে বাবুই পাখির অনেকগুলো বাসা। তবে একটা বাবুইও নেই ওখানে। অজ্ঞাত কারণে বাসা ফেলে চলে গেছে।

মাঝ দেয়ালের নিচের অর্ধে ছায়া পড়েছে তাল গাছের। মাথার ছায়া বরাবর দেয়ালের ভেতরকার অংশটা আন্দাজ করে নিল শিশির। তারপর চলে এল ভেতরে। উত্তর দিকের দুটো জানালা খুলে দিতেই দক্ষিণের দেয়ালে লেপ্টে থাকা অন্ধকার সরে গেল স্যাঁৎ করে। অনুমিত জায়গাটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল ও। ঝুরঝুরে পলস্তারার গায়ে তীরের আবছা কোন আকারও চোখে পড়ল না। ডায়েরীর প্রথম ছড়াটা মনে মনে আওড়াল শিশির। ছড়ার মাঝেই বুদ্ধি খাটাবার কথা লেখা আছে। নিশ্চয়ই কোন কৌশলে দেয়ালের ভেতর লুকিয়ে রাখা হয়েছে তীরটাকে।

হাতের তালু দিয়ে দেয়াল চাপড়াতে শুরু করল শিশির। এক জায়গায় কেমন একটা ভোঁতা শব্দ হলো। মনে হচ্ছে ভেতরটা যেন ফাঁপা। খুঁজে পেতে বড় একটা পেরেক আর হাতুড়ি নিয়ে এল ও। সন্দেহজনক স্থানে পেরেক বসিয়ে ঘা মারল হাতুড়ি দিয়ে। নোনা ধরা দেয়াল থেকে ঝুপ করে খসে পড়ল এক টুকরো পলস্তারা। কিন্তু লাল ইঁটের বদলে সোনালী ওটা কি? পেরেক দিয়ে গুঁতো মারতেই ধাতব শব্দ হলো। আশার আলো জ্বলে উঠল চোখের সামনে। দ্বিগুণ উৎসাহে পেরেক আর হাতুড়ি দিয়ে পলস্তারা খসাতে লাগল ও।

মিনিট তিনেক পর বড়সড় পান পাতার আকৃতির এক হৃদয় বেরিয়ে এল। ধাতুটা খুব সম্ভব পেতল। দেয়ালের একটু ভেতরের দিকে বসানো হৃদয়টা। ঠিক মাঝখানে একটা ফুটো। ফুটোর ভেতর একটা ধাতব শলাকা ঢোকানো। ইঞ্চিখানেক বেরিয়ে আছে শলাকাটা। শিশির বুঝে গেল এটাই আসলে হৃদয়ভেদী তীর। কিন্তু এই হৃদয়ভেদী তীরের সাথে সুরঙ্গের সম্পর্কটা কি? এটা কি সেই

BanglaBook.org

সুরঙ্গের কোন বোতাম? ডিটেকটিভ মুভিতে যেরকম দেয়ালের একস্থানে লুকানো বোতামে চাপ দিতেই গুপ্তপথের দরজা খুলে যায়, সেরকম এ বোতামও হয়তো খুলে দেবে সুরঙ্গের মুখ।

তীরটাতে চাপ দিল শিশির। একচুলও এগোল না। এদিক-ওদিক ঘোরাবার চেষ্টা করল। কোনদিকেই ঘুরল না। টান মেরে দেখল। তাতেও কোন কাজ হলো না। এবার হাতুড়ি দিয়ে আলতো করে ঘা বসাল শিশির। একটু যেন সামনের দিকে এগোল ওটা। আরও দু'তিনটে ঘা মারতেই ফুটোর ভেতর সেঁধুল উঁচু অংশটা। দৌড়ে বাইরে চলে এল ও। পলস্তারা ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে তীরের মাথা। টান দেয়ায় কাজ হয়নি কেন এখন বোঝা যাচ্ছে। তীরের ত্রিভুজ মাথা আঁকশির মত আটকে ছিল গর্তের মাথায়। ত্রিভুজ ধরে টান দিতেই বেরিয়ে এল তীরটা। ইতিমধ্যে দেয়াল থেকে সরে গেছে তাল গাছের ছায়া। সদ্য উন্মোচিত ছিদ্র দিয়ে সুড়সুড়িয়ে ঢুকছে প্রখর সূর্যের আলো।

তীরটা নিয়ে বিষম চিন্তায় পড়ল শিশির। এটা দিয়ে কি করে গুপ্ত কুঠরির পথ বের করবে কিছুতেই মাথায় আসছে না। তীরটা নিয়ে আবার ময়ূর কোঠায় চলে এল ও। দেয়ালের ফুটো দিয়ে সূর্যের আলো এসে বিপরীত দিকের দেয়ালের এক জায়গায় স্থির হয়েছে। ভুরু কুঁচকে গেল ওর। ওখানেই কিছু লুকানো আছে নাকি?

হাতুড়ি আর পেরেক দিয়ে আবার খোঁচাখুঁচি শুরু করল ও। লোনা ধরা দেয়াল বলেই কাজটা খুব সহজে এগোল। নইলে বিশ ইঞ্চি দেয়ালের ইঞ্চিখানেক পুরু পলস্তারা খসানো চাট্টিখানি কথা নয়।

পেতলের একটা কী-হোল বেরিয়ে এল। দেয়ালের গায়ে কী-হোল দেয়ার মানেটা কি? তাহলে কি দেয়ালের মাঝেই গুপ্ত কুঠরির দরজা লুকিয়ে? কী-হোলের চাবিটাই বা কোথায়? ডায়েরীর দ্বিতীয় ছড়ার সেই লাইন দুটো মনে পড়ে গেল—

তীর থেকে বারো হাত এগোলেই হাঁড়ি
উপকরণ আছে সব ভেতরে তারই।

সেলার থেকে কোদালটা নিয়ে দীঘির উত্তরে ছুটল শিশির। বিকেলের আগেই কাজ সারতে হবে। কেউ দেখে ফেললে ভণ্ডুল হয়ে যাবে সব।

ঝাঁকড়া মাথা প্রাচীন বট গাছটার নিচে নিপাট ছায়া। জ্বালাময় প্রচণ্ড দুপুরেও এখানে প্রাণ জুড়ানো আমেজ। চারদিক সুনসান।

এক হাত মাপের একটা কাঠি আগেই কোমরে গুঁজে রেখেছিল শিশির। গাছের গুঁড়ি থেকে কাঠি দিয়ে মেপে সোজা তিন হাত এগোল ও। তারপর খুঁড়তে শুরু করল মাটি।

মিনিট পনেরো লেগে গেল তিন হাত গভীরে পৌঁছুতে। কিন্তু হাঁড়ির হ-ও নেই ওখানে। ভুল জায়গায় খোঁড়া হয়েছে। এমনিতেই সেই কখন থেকে ঘামে ভিজে নেয়ে উঠেছে গা, তার ওপর অনভ্যস্ত হাতে একটানা কোদাল চালিয়ে বারোটা বেজে গেছে হাত আর পিঠের। এখন আবার কোদাল চালানো কি সহজ ব্যাপার?

কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না—মনটাকে এই বলে প্রবোধ দিয়ে আবার কোদাল ধরল শিশির। গর্তটা মাটি চাপা দিয়ে একটু বাঁয়ে সরে এসে নতুন করে

BanglaBook.org

খুঁড়তে শুরু করল।

নাহ্, এবারও কেষ্ট মিলল না। নতুন গর্তের তিন হাত গভীরে কিছুই নেই। ফক্কা! কোদালটা ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে করল ওর। হাত দুটো ভারি ভারি লাগছে এখন। কাঁধ আর পিঠ শক্ত হয়ে গেছে। আবার খোঁড়াখুঁড়ি করতে গেলে পরিশ্রমটা অমানুষিক হয়ে যাবে। তবু আবার কোদাল হাতে নিল শিশির। তবে এই-ই শেষ। এবার হাঁড়ির সন্ধান না মিললে পিশাচী দর্শনের পেতলা শখটাকে জলাঞ্জলি দেবে ও।

দ্বিতীয় গর্তটার ডানধারে খুঁড়তে শুরু করল শিশির। চাষী-মজুরদের কষ্টটা এ মুহূর্তে হাড়ে হাড়ে অনুভব করছে ও। কোদাল চালানো তো নয় যেন হাড়-মাংস আলাদা করার পদ্ধতি এটা।

শেষমেশ কষ্টের ফল পাওয়া গেল। নতুন গর্তের ঠিক তিন হাত গভীরেই পাওয়া গেল তীরটা। লম্বায় ইঞ্চিদশেক হবে। মাথা পুব দিক বরাবর। কপালের ঘাম মুছে নিয়ে কোমর থেকে কাঠিটা আবার বের করল শিশির। তীরের মাথা থেকে পুব দিকে সোজা বারো হাত এগোল। একটা কথা মনে পড়তেই ভেতরে ভেতরে খানিকটা দমে গেল ও। ঠিক কত গভীরে হাঁড়িটা আছে তা বলা হয়নি ডায়েরীর ছড়ায়। যদি অনেক নিচে থাকে তাহলে ওর শরীরে কুলোবে না, তাছাড়া সময়ও একটা ব্যাপার। আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই বিশ্রাম সাঙ্গ হবে বাড়ির সবার। কাজেই সময় নষ্ট করা চলবে না।

হতাশা ঝেড়ে ফেলে আবার হাত লাগাল শিশির। চরম দুর্যোগের মাঝেও মানুষ আশার স্বপন দেখে, আর এ তো সামান্য একটা কৌতূহল।

বেশি খুঁড়তে হলো না। মাত্র হাত দেড়েক গভীরেই পাওয়া গেল পেতলের ছোট হাঁড়িটা। মুখে ঢাকনা লাগানো। কোদাল রেখে দিয়ে ঝটপট ঢাকনাটা খুলে ফেলল শিশির। পেতলের একটা চাবি, একখণ্ড ভাঁজ করা রাঙতা, ক্যানভাসের ছোট থলে আর একটা পেতলের বাঁশি ছাড়া আর কিছু নেই হাঁড়িতে। বাঁশিটা দেখতে প্রায় পুলিসের হুইস্‌ল-এর মত, তবে নিচের দিকে একটু বাঁকানো। থলেটা কড়া আলকাতরা লাগানো রশি দিয়ে বাঁধা, ভেতরে কি একটা নরম জিনিস। জিনিসগুলো সব বের করে নিয়ে হাঁড়িটা আবার মাটি চাপা দিল ও। কোদালটা সেলারে রেখে দিয়ে ফিরে এল নিজের ঘরে। জিনিসগুলো লুকিয়ে রাখল বুকশেলফের একসারি বইয়ের আড়ালে।

BanglaBook.org

চার

রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে বইয়ের আড়াল থেকে জিনিসগুলো বের করল শিশির। প্রথমে রাঙতাটাই তুলে নিল। ভাঁজগুলো একে একে খুলতেই বেরিয়ে এল সেই কাগজ। কাগজটা হাঁড়ির ভেতর রাঙতা মোড়া ছিল বলে সময়ের কোন প্রভাব

পড়েনি ওতে। এখনও নতুনের মতই ঝকঝকে। তবে একবর্ণ লেখাও নেই কাগজে। শিশিরের যেমন রাগ হলো তেমনি হাসিও পেল। এত কষ্টের ফল শেষমেশ এই! আফতাব চৌধুরীর এমন নির্মম রসিকতার মানেটা কি?

কাগজটা ভাঁজ করে হারিকেনের চিমনিতে গুঁজে দিয়ে আলো আড়াল করে শুয়ে পড়ল শিশির। নিজের ওপর রাগ হচ্ছে ওর। অলীক একটা জিনিসের পেছনে ছুটতে যাওয়াটাই আসলে বোকামি হয়েছে। আচ্ছা, কাগজটার মাঝে কোন কৌশল লুকিয়ে নেই তো? দ্বিতীয় ছড়ার শুরুতেই তো বলা হয়েছে—

যদি তুমি হও ধীমান
রাখো এবার তার প্রমাণ।

দেখাই যাক না আবার পরীক্ষা করে। চিমনি থেকে কাগজটা উঠিয়ে আনতেই শিশিরের চক্ষুস্থির। গোটা গোটা কালো অক্ষরে ভরে গেছে কাগজটা। এতক্ষণে পরিষ্কার হলো ব্যাপারটা। আসলে চোরাকালি দিয়ে লেখা হয়েছিল। চিমনির তাপে আকৃতি ফিরে পেয়েছে অক্ষরগুলো। এই কালির কথা দাদুর কাছে অনেকবার শুনেছে শিশির। আগেকার দিনের সামন্ত শ্রেণীর মানুষেরা গুরুত্বপূর্ণ গোপন চিঠিগুলো এই কালিতে লিখতেন। ভাগ্যিস, কাগজটা চিমনিতে গুঁজে দিয়েছিল! নইলে অক্ষরগুলোকে বের করে আনতে কম ঝামেলা পোহাতে হত না।

লেখাটা এক নিঃশ্বাসে পড়ে নিল শিশির। মাঝরাতের আগেই গুপ্ত কুঠুরিতে যেতে হবে। ময়ূর কোঠার দেয়ালের সেই কী-হোলে চাবি ঢুকিয়ে মোচড় দিলেই খুলে যাবে গুপ্ত কুঠুরির প্রবেশদ্বার। ভেতরে ঢুকে সুরঙ্গ ধরে সোজা এগোলে শেষ মাথায় একটা শান-বাঁধানো মাচান। মাচানের ওপর একটা কফিন। এই কফিনের ভেতরেই ঘুমিয়ে আছে পিশাচী। পিশাচীকে জাগাতে হলে কাগজে দেয়া মন্ত্রটা একখণ্ড কাঠের গায়ে লিখে কাঠটা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। তারপর সেই কাঠ-কয়লা দিয়ে কাগজে আঁকা ছকটা আঁকতে হবে কফিনের বৃত্তে। এবার জিয়ান বাঁশিটা নিয়ে দাঁড়াতে হবে কফিনের মুখোমুখি। রাত ঠিক বারোটায় ফুঁ দিতে হবে জিয়ান বাঁশিতে। বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গে খুলে যাবে কফিনের ডালা, জেগে উঠবে পিশাচী। থলের মন্ত্রপড়া ধুলো আগে থেকেই হাতের মুঠোয় রাখতে হবে, যাতে পিশাচী উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে ওটার গায়ে ছিটিয়ে দেয়া যায়। গায়ে ধুলো পড়লেই আবার আগের মত ঘুমিয়ে পড়বে পিশাচী। ধুলো ছিটিয়ে দিতে যেন এক মুহূর্তও দেরি না হয়। পিশাচী কফিনের বাইরে পা দিলেই সর্বনাশ!

পড়া শেষ হতেই শিশির লক্ষ করল ওর গায়ের রোমগুলো সজারু-কাঁটার মতন দাঁড়িয়ে গেছে। বিষয়টাকে এখন আর অত তুচ্ছ মনে হচ্ছে না। আফতাব চৌধুরীর এত আয়োজন, এত রাখঢাক নিছকই কৌতূহলোদ্দীপক হেলাফেলার কিছু হতে পারে না। নিস্তব্ধ নিশুতি রাতে এক অন্ধকুঠুরিতে জিয়ান বাঁশির সুরে জেগে উঠবে যুগের পর যুগ ঘুমিয়ে থাকা এক পিশাচী—দৃশ্যটা কল্পনা করতেই বুকটা কেমন হিম হয়ে আসছে। কিন্তু এতদূর এসে পিছিয়ে যেতেও ইচ্ছে করছে না। মনটাকে সাহস দিল শিশির—ভয় কি, মন্ত্রপড়া ধুলো তো থাকছেই সাথে।

সাড়ে এগারোটার দিকে উপকরণগুলো নিয়ে ঘর থেকে বেরোল শিশির।

BanglaBook.org

করিডরে দেয়ালের ব্র্যাকেটে ঝুলে থাকা দু'ব্যাটারির টর্চটা নিয়ে নিচের রান্নাঘরের দিকে এগোল।

রান্নাঘরের ভেতরের দিককার দরজাটা সারাক্ষণ খোলা থাকে। আলো ফেলে স্বচ্ছন্দে ঢুকে পড়ল শিশির। হাতের জিনিসগুলো মেঝেতে নামিয়ে রেখে চ্যাপ্টামত একটা চেলাকাঠ তুলে আনল। বলপেন দিয়ে অনেক কসরত করে কাঠের গায়ে লিখে ফেলল চার লাইনের উদ্ভট মন্ত্রটা। কেরোসিনের ক্যান থেকে খানিকটা কেরোসিন কাঠের গায়ে ঢেলে আগুন জ্বেলে দিল।

মিনিট বিশেক লাগল কাঠটা পুড়ে কয়লা হতে। কয়লা শীতল হবার জন্যে আরও মিনিট পনেরো বসে থাকতে হলো। শিশিরের চোখের সামনে এমুহূর্তে কফিনে শায়িত পিশাচীর কাল্পনিক মুখচ্ছবি ছাড়া আর কিছু নেই।

পাঁচ

ময়ূর কোঠায় এসে দেয়ালের কী-হোলটায় চাবি ঢোকাল শিশির। মোচড় দিতেই ক্লীক্ করে দেয়ালের নিচের দিকের একটা অংশ ফাঁক হয়ে গেল। আসলে এটা একটা ধাতব দরজা। দেয়ালের সাথে নিখুঁতভাবে সেঁটে দিয়ে একই রঙ লাগানো হয়েছে বলে বোঝা যায়নি আগে।

দরজায় একটাই কবাট। ভেতরের দিকে ঠেলতেই কবাট সরে গিয়ে বর্গাকার প্রবেশ-মুখ বেরিয়ে এল। সিঁড়ি ভেঙে সুরঙ্গে নেমে এল শিশির। টর্চের আলোতে চারপাশটা ঘুরে ফিরে দেখল। এতদিন যেটাকে ভূ-গর্ভস্থ নর্দমা বলে জেনে এসেছে সেটাই আসলে সুরঙ্গ তথা গুপ্ত কুঠুরি।

সদর বাড়ি থেকে অন্দর বাড়িতে যাবার খিলান ঢাকা প্যাসেজটার পাশেই এর অবস্থান। লম্বা হয়ে সদর আর অন্দর বাড়ি স্পর্শ করে আছে। দুর্গন্ধের ভয়ে কখনও এটার শিক লাগানো খুদে জানালা দুটোর ধারে কাছে যায়নি ও। দৈর্ঘ্যে ষাট ফুটের কম হবে না কুঠুরিটা। উচ্চতা আর প্রস্থে ফুট ছয়েক করে হবে।

হৃৎকম্পন বেড়ে গেল শিশিরের। আর ক'মিনিট পরেই প্রপিতামহের সাধনা-লব্ধ গোপন কীর্তি উন্মোচিত হবে চোখের সামনে।

টর্চের আলো ফেলে পা বাড়াল ও। সারা কুঠুরি জুড়ে সোঁদা গন্ধ। তবে জানালা দুটোর জন্যে ভেতরে ভাপসা ভাবটা নেই।

দেয়ালের এক জায়গায় টর্চের আলো পড়তেই ঝিম মেরে থাকা তিনটে চামচিকে কিচমিচ করে ওড়াউড়ি শুরু করল। আলো সরিয়ে নিতেই আবার শান্ত হলো তারা।

সিমেন্টের পাকা মেঝে বছরের পর বছর অব্যবহৃত থাকায় ছ্যাতলা পড়ে গেছে। এখানে-ওখানে ইঁদুরের গর্ত। গর্তগুলোতে সাপ-টাপ থাকাও বিচিত্র কিছু নয়। পা সরছে না শিশিরের। যেন নিজের ভেতর নেই ও, হারিয়ে গেছে দূর

BanglaBook.org

অজানায়, আর ওর দেহটাকে মন্ত্রবলে টেনে নিচ্ছে অদৃশ্য এক শক্তি।

শান বাঁধানো মাচানটা ফুট খানেক উঁচু। তার ওপর আড়াআড়ি পড়ে আছে কফিনটা। কফিনের কালো বার্নিশে ধুলো জমে আছে। ডালার ঠিক মাঝখানটায় সাদা রঙের একটা বৃত্ত। এই বৃত্তের মাঝেই ছকটা আঁকতে হবে।

মাচানে উঠে কফিনের ধুলো ঝাড়ল শিশির। তারপর ঘুরেফিরে দেখে নিল কফিনটা। কোথাও কোন লক-সিস্টেম নেই। শুধু ডালার মাঝ বরাবর সূক্ষ্ম একটা সরলরেখা আড়াআড়ি চলে গেছে। প্যান্টের পকেট থেকে কাগজটা বের করে কাঠকয়লা দিয়ে বৃত্তের ভেতর ছকটা এঁকে নিল ও। তারপর বাঁশিটা বের করে মাচান থেকে নেমে কফিনের মুখোমুখি দাঁড়াল। এবার শুধু ফুঁ দেয়াটা বাকি।

গলার ভেতরটা কেমন শুকিয়ে আসছে শিশিরের। কে যেন কানের কাছে ফিসফিস করে বলছে, ফিরে যাও! ফিরে যাও!! ফিরে যাও!!!

শিশির উপলব্ধি করল মনোবল ভেঙে যাচ্ছে। আর সময়ক্ষেপণ নয়, যা করার এক্ষুণি করতে হবে।

তীরবিদ্ধ শিকারী পাখির আর্তকূজনের মত সুর বেরোল বাঁশির বুক চিরে। অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল শিশিরের। মুহূর্ত কয়েকের জন্যে বাস্তব থেকে দূরে সরে গেল ও, তারপর যখন সংবিৎ ফিরে এল, তখন চারদিকে শুধু অখণ্ড নীরবতা। কফিনটা তেমনি পড়ে আছে স্থির। অবাস্তব কোন ঘটনায় সাড়া দেয়ার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না ওটার মাঝে।

মনটাই খারাপ হয়ে গেল শিশিরের। একরাশ হতাশা নিয়ে ফিরতে যাবে, ঠিক তখুনি খুট্ করে অস্পষ্ট একটা শব্দ হলো কফিনে। ঘুরে দাঁড়িয়ে টর্চের আলো ফেলল শিশির। ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ তুলে দু'দিকে সরে যাচ্ছে কফিনের ডালা। ভেতরকার কালো গহ্বর বেরিয়ে এসেছে। এখুনি উঠে দাঁড়াবে সেই পিশাচী। ঝাঁ করে মন্ত্রপড়া ধুলোর কথা মনে পড়ল। আরে, সেই থলেটা গেল কোথায়? রক্ত হিম হয়ে এল ওর। আসল জিনিসটাই ফেলে এসেছে। কাঠ পোড়াবার সময় থলেটা রান্নাঘরের মেঝেতে রেখেছিল। পরে আর তোলা হয়নি। এখন উপায়?

উল্টোদিকে ঘুরে দৌড় দিল শিশির। টর্চটা ধরে রাখল শক্ত হাতে। দরজা পেরোবার সময় ধাতব ফ্রেমে মাথা ঠুকে গেল ভীষণভাবে। তীব্র একটা ব্যথা চিড়িক দিয়ে উঠল কপালের চুড়োয়। দু'সেকেণ্ডের মধ্যে নিজেকে সামলে নিল ও। দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথাটা হজম করতে করতে দরজা পেরোল। কী-হোলে ঢোকানোই আছে চাবি, ঝট করে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে লক করল ও। তারপর আবার দৌড়।

প্যাসেজ ধরে ছুটবার সময় গুপ্ত কুঠুরির তালাবদ্ধ দরজায় করাঘাতের শব্দ শুনতে পেল শিশির। ক্রমেই উচ্চকিত হচ্ছে।

অন্দর বাড়িতে প্রবেশ করেই প্যাসেজে ঢোকার দরজাটা বন্ধ করে দিল শিশির। দম নিতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে ওর। হাপরের মত ওঠানামা করছে বুক। সারা শরীর ঘামে ভিজে জ্যাব জ্যাব।

রান্নাঘরের মেঝেতে মন্ত্রপূত ধুলোর থলেটা নেই। টর্চের আলোতে দ্রুত বেশ

BanglaBook.org

ক'বার খুঁজে দেখল ও। না, নেই। ওর স্পষ্ট মনে আছে মেঝেতেই রেখেছিল থলেটা। গেল কোথায়?

আসলে ব্যাপারটা ঘটেছে শিশিরের অলক্ষে। ক্যান থেকে কাঠে কেরোসিন ঢালবার সময় ক'ফোঁটা কেরোসিন থলেটার ওপর পড়েছিল। শিশির যখন কাঠটাতে আগুন ধরিয়ে জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠি ডান দিকে ছুঁড়ে দেয়, তখন ওটা সোজা গিয়ে পড়ে থলেটার ওপর। এদিকে শিশির একদৃষ্টে জ্বলন্ত কাঠটার দিকে তাকিয়ে পিশাচীর কাল্পনিক মুখচ্ছবি আঁকছিল, তাই সর্বনাশটা আর চোখে পড়েনি। পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে গেছে থলেটা।

প্যাসেজের দরজায় করাঘাতের শব্দ হচ্ছে। অমিত বিক্রমে গুপ্ত কুঠুরির দরজা ভেঙে বেরিয়ে এসেছে পিশাচী। এখন প্যাসেজের দরজাটা ভাঙবে।

শিশিরের মনে হলো, জীবন্ত এক নরক যেন এগিয়ে আসছে ওর দিকে। রাগে-দুঃখে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করল ওর। কেন যে দুঃসাহস দেখিয়ে এই মরণ খেলায় ও নামল!

দ্রুত উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছে শিশির। কোন পথই চোখে পড়ছে না। সেরকম দোয়া-দরূদ জানা থাকলেও একটা ভরসা পাওয়া যেত। সহসাই কথাটা উঁকি দিল মনে। বাঁশিতেই যদি পিশাচীর জীবন লুকিয়ে থাকে, তাহলে বাঁশিতেই ওর মরণ। যদিও নির্দেশিকায় এরকম কোন কথা লেখা নেই, তবু বাঁশিটা বিনষ্ট করার চিন্তা বাঁচার শেষ অবলম্বনের মত শেকড় গাড়ল মনে।

দেশলাইটা শার্টের পকেটেই। বাঁশিটা ক্যানের কেরোসিনে ভিজিয়ে নিয়ে মেঝেতে রাখল শিশির। টর্চ মেঝেতে রেখে কাঁপা হাতে দেশলাইটা বের করল পকেট থেকে। পিশাচীর প্রচণ্ড করাঘাত চড়্ চড়্ আওয়াজ তুলেছে দরজায়। হুড়কো এই ভাঙল বলে। পর পর কয়েকটা কাঠি নষ্ট করে ফেলল শিশির। শেষ কাঠিটা হাতে নিতে না নিতেই চড়াৎ করে দু'ভাগ হলো হুড়কো। পরমুহূর্তে দড়াম করে খুলে গেল দরজা। যেন প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরেই জ্বলে উঠল কাঠিটা। মুহূর্ত মাত্র দেরি না করে বাঁশির ওপর জ্বলন্ত কাঠিটা রাখল ও। ফাঁৎ করে বাঁশিটাকে গ্রাস করল আগুন। পরক্ষণে সুতীব্র এক মরণ আর্তনাদ খোলা দরজার ওপার থেকে বিদ্যুৎ গতিতে প্যাসেজ পেরিয়ে মিলিয়ে গেল অনেক দূরে, অন্য কোন ভুবনে। অথৈ জল থেকে খাবি খেতে খেতে যেন উদ্ধার পেল শিশির। হাঁফ ছেড়ে বুক ভরে টেনে নিল জীবনের স্বাদ। চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ল ক'ফোঁটা অশ্রু।

পরদিন ফাঁস হয়ে গেল শিশিরের নিশুতি রাতের কাণ্ড কারখানা। ওর কপালের শীর্ষদেশে নাড়ুর মত ফুলে থাকা আঘাতের চিহ্ন, রান্নাঘরের মেঝেতে পড়ে থাকা কাঠকয়লা, ছাই, রঙজ্বলা বাঁশি, ময়ূর কোঠার ঝুলকালো দেয়াল—এরা সবাই সাক্ষী। দিদা জোঁকের মত চেপে ধরলেন ওকে। না বলে নিস্তার নেই। শুরু থেকে শেষ অবধি সব বলে গেল শিশির। শুনে সবারই বিস্মিত হবার কথা, কিন্তু শিশিরই উল্টো স্তম্ভিত। রাজিয়ার মা জানাল অন্দর বাড়ির প্রবেশ দরজা অক্ষত অবস্থায় ভেজানো ছিল। সকালে নিজহাতে হুড়কো খুলেছে সে। আর হারিস আলী বলল গুপ্ত কুঠুরির দরজাটাও তালাবদ্ধ।

দৌড়ে নিচে নেমে গেল শিশির। ওদের কথার সত্যাসত্য যাচাই করে দেখল। একবর্ণও মিথ্যে বলেনি তারা। মাথাটা কেমন গুলিয়ে গেল ওর। ভাঙা দরজাগুলো আবার আগের অবস্থায় ফিরে গেল কি করে?

দাদু এতক্ষণ নীরবে দিদার ভর্ৎসনা হজম করছিলেন। একতরফা বাক্‌যুদ্ধে দিদা আশাব্যঞ্জক সাড়া না পেয়ে অতৃপ্তিকর বিজয় নিয়ে সরে গেলেন। শিশিরকে এবার ডাকলেন দাদু। ওকে অবাক করে দিয়ে বললেন, 'আসলে রাতে কোন পিশাচীই জেগে ওঠেনি। তুমি যা শুনেছ বা দেখেছ—সব ভুল। সীমাহীন ভয় থেকেই ওরকম হয়েছিল। তোমার জাগ্রত মনকে দখল করে নিয়েছিল অবচেতন মন। আর অবচেতন মন সেই কাল্পনিক পিশাচীকে লেলিয়ে দিয়েছিল তোমার পেছনে। অবশ্যি এ বিষয়ে আমার তেমন পড়াশোনা নেই। মনস্তত্ত্ববিদরা এর ভাল ব্যাখ্যা দিতে পারবেন। পিশাচী যদি সত্যিই জেগে উঠে তোমার পিছু নিত, তাহলে অবশ্যই তোমার বর্ণনার সাথে ঘটনার মিল থাকত।'

দাদুর কথায় আহত বোধ করল শিশির। কষ্ট করে কত বড় একটা দুঃসাহসিক অভিযান চালাল, আর পরিণতিতে সাজতে হলো কিনা ভীতুর ডিম! দাদুর কথাগুলো মন থেকে মেনে নিতে পারল না ও। বলল, 'তাহলে কি তুমি বলতে চাও, কফিনটার ভেতর পিশাচীর কোন অস্তিত্ব নেই?'

শিশিরের মনোভাব টের পেয়ে দাদু হেসে বললেন, 'তা বলতে পারব না। হয়তো আছে, হয়তো নেই। আমার ব্যক্তিগত ধারণা কফিনটার ভেতর বড় জোর একটা কঙ্কাল পাওয়া যেতে পারে, যা ডাক্তারী বিদ্যা ছাড়া আর কোন কাজে আসবে না। ওসব ভূত-প্রেতের ব্যাপার আসলে কিছু না। বোগাস। তবে এ নিয়ে তোমার মন খারাপ করার কারণ নেই। তোমার মত বয়সে আমারও বহুবার এরকম কৌতূহল হয়েছে, কিন্তু ওদিকে পা বাড়াবার সাহস হয়নি কখনও। আর তুমি যা দেখালে!' কথা শেষ না করে কাঁধ ঝাঁকালেন দাদু।

তাঁর ভঙ্গি দেখে হেসে ফেলল শিশির। মনের মেঘ কেটে গেল অনেকটা। বলল, 'চলো, দাদু, দরজাগুলোর মত কফিনটাও অক্ষত আছে কিনা দেখে আসি। আর যদি অক্ষত থাকে ওটা ভেঙে—'

'উঁ হুঁ হুঁ,' হাত তুলে বাধা দিলেন দাদু। 'ওকাজটি আর হতে দিচ্ছি না। এমনিতেই অনেক সাহস দেখিয়ে ফেলেছ। গুপ্ত জিনিস গুপ্ত জায়গায়ই থাক।'

শিশিরের কাছ থেকে ডায়েরীটা নিয়ে পুড়িয়ে ফেললেন দাদু। গুপ্ত কুঠুরির দরজাটাও চিরতরে সিল করে দেয়া হলো। তবে বাঁশিটা হাতছাড়া করল না শিশির। এক রোমাঞ্চকর অভিযান আর ভয়াল রাতের স্মৃতি হিসেবে রেখে দিল নিজের কাছে। আর বাঁশিটার নতুন নাম দিল মরণ বাঁশি।

BanglaBook.org

তান্ত্রিকের মূর্তি

বাড়িটা খুব পছন্দ হয়েছে লিনার। শ্যামলপুরের শেষ বাড়ি এটা। নির্জন প্রান্তে, পাহাড়ের কোল ঘেঁষে সবুজ উপত্যকার বুকে লাল ইঁটের দালান। সামনের উন্মুক্ত বিরাট উঠন। উঠনের ঘেসো জমিতে চোখ জুড়ানো ফুলের বাগান। গোলাপ, জুঁই, সূর্যমুখী, ডালিয়া, জবা, রঙ্গন—হরেকরকম ফুল ফুটে আছে বাগানে। সারা বাড়িতে অনেকগুলো ছোট-বড় রুম। বেডরুমটা দেখে ছোট্ট খুকির মত লাফিয়ে উঠল লিনা। পেছনের জাফরি-কাটা সেগুন কাঠের জানালাগুলো পশ্চিমে লেকের দিকে মুখ করা। জানালায় দাঁড়ালে মসৃণ সমতল পেরিয়ে সরাসরি লেকে গিয়ে পড়ে দৃষ্টি। সত্যিই, একেবারে মনের মত হয়েছে বাড়িটা।

লিনার আনন্দ-উচ্ছ্বাস দেখে বুকটা দুরুদুরু করছে সুমনের। লিনাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে ও। বাড়িটা কিনতে না পারলে মুষড়ে পড়বে বেচারি। সুযোগ বুঝে মালিক এখন চড়া দাম হেঁকে না বসলেই হয়।

নিরিবিলিতে একটা বাড়ি কেনার শখ লিনার অনেকদিনের। একদিকে থাকবে উদ্ধত পাহাড়, মাঝখানে মাথা নোয়ানো সমতল, সবশেষে মনোরম জলাধার। এমন একটা জায়গা এই শ্যামলপুর। শহরতলি থেকে বেশি দূরে নয় গ্রামটা। ছুটি কাটাবার জন্যে নন্দন কানন হবে এ স্থান।

বছর তিনেক আগে লিনাকে ভালবেসে বিয়ে করেছে সুমন। বিয়ের পর হানিমুনে যায়নি ওরা। লিনাই বাদ সেধেছে। ওর কথা, এতগুলো টাকা খরচ করে দু'দিনের জন্যে আনন্দফুর্তি করে কি লাভ? এরচে' টাকাগুলো জমিয়ে পছন্দসই জায়গায় মনের মত একটা বাড়ি কেনা ভাল। তাহলে প্রতিবছরই মধুচন্দ্রিমার স্বাদ নেয়া যাবে। গত তিন বছরে তিল তিল করে টাকা জমিয়েছে ওরা। লিনা একটা কিণ্ডার গার্টেনে বাচ্চাদের পড়ায়, আর সুমনের পেশা আঁকাআঁকি। একটা এনজিও-তে আছে ও। ভাল বেতন। তাছাড়া বিয়ের পর বেশ ক'টা অয়েল পেইন্টিং করেছে সুমন। দুটো একক চিত্র-প্রদর্শনীতে সেগুলো বিক্রিও হয়েছে ভাল দামে। দু'জনের আয় থেকে মোটামুটি একটা অঙ্ক দাঁড়িয়েছে সঞ্চয়ের কোঠায়। এখন নির্বিঘ্নে বাড়িটা কিনতে পারলেই এতদিনের কষ্ট সার্থক হবে।

BanglaBook.org

সুমনকে অবাক করে দিয়ে সহজেই বাড়িটা ছেড়ে দিলেন মালিক। অবশ্যি এ বাড়ির প্রতি ভদ্রলোকের টান না থাকবারই কথা। রাজধানীতে জমজমাট ইণ্ডেন্টিং ব্যবসা তাঁর। ভীষণ ব্যস্ত থাকতে হয়। তাছাড়া এদিককার বাড়িটা বড় বেশি

নিরিবিলিতে বলে ভাড়াটেও তেমন জোটে না। সম্ভবত এ কারণেই সস্তায় বেচে দিলেন বাড়িটা।

শহরে দু'দিন খুব ব্যস্ততার ভেতর দিয়ে কাটল। লিনাকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে নতুন বাড়ির জন্যে প্রয়োজনীয় আসবাব এবং তৈজসপত্র কিনল সুমন। তারপর একদিন সকালে ট্যাক্সি ভাড়া করে রওনা হলো ওরা। সাথে মালপত্তর নিয়ে চলল ভাড়া করা একটা মিনি ট্রাক।

খুঁজে পেতে এক মহিলাকে পরিচারিকা হিসেবে পাওয়া গেল। নাম মরিয়ম বানু। সবাই মরিয়ম খালা বলে ডাকে। মহিলা নিঃসন্তান এবং বিধবা। এখানে সেখানে কাজ করে পেট চালায়। বয়স পঞ্চাশের ওপর। উচ্চতায় মাঝারি, গোলগাল চেহারা, শক্তপোক্ত গড়ন। ঠোঁটে সারাক্ষণ হাসি লেগে আছে। মহিলা কথাবার্তায়ও চোস্ত। অন্য দশটা কাজের লোকের মত আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে না। পরিচারিকা হিসেবে ভালই হবে সে।

অনেক দেরিতে হলেও ভালই জমে উঠল হানিমুন। ভোরে বিছানা ছেড়েই বেড়াতে বেরোয় দু'জন। পাহাড় কিংবা লেকের ধারে হাঁটাহাঁটি করে ঘণ্টাখানেক। ফিরে এসে নাশতা সেরে রঙ-তুলি নিয়ে বসে সুমন। লিনার একটা পোর্ট্রেট আঁকছে ও। প্রতিদিনই যথেষ্ট সময় নিয়ে একটু একটু আঁকে। লিনা হাত দিয়েছে উলের কাঁটায়। আসছে শীতে বাচ্চা আসবে ওর কোলে। উল বোনার সময় আনমনে গুনগুন করে লিনা। দৃশ্যটা বড় ভাল লাগে সুমনের। ওই মুহূর্তে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ মনে হয় নিজেকে।

দুপুরটা কাটে বিছানায় গড়াগড়ি দিয়ে, হালকা বিশ্রামের ভেতর। বিকেলের দিকে গাড়ি নিয়ে শহরতলিতে যায় দু'জন। প্রয়োজনীয় কেনাকাটা সেরে ফিরে আসে সন্ধের আগেই। সন্ধের পর চায়ের কাপ আর বই নিয়ে বসে সুমন। প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের প্রাচীন চিত্রকর্মের ওপর কিছু বই এনেছে ও। দারুণ ইন্টারেস্টিং। ডিনারের আগে পর্যন্ত বইয়ের ভেতর ডুবে থাকে সুমন। লিনা ওদিকে দু'একটা রান্না শিখে নেয় মরিয়ম খালার কাছ থেকে। রান্নার ব্যাপারে বেচারি একেবারেই আনাড়ি।

ডিনার সেরে প্রশস্ত ডাইনিং রুমে আড্ডা জমায় তিনজন। আড্ডার কেন্দ্রবিন্দু মরিয়ম বানু। সে বলে, ওরা শোনে। অনেক গল্প মহিলার ঝুলিতে। প্রাচীন জলদস্যুদের গল্প, হলুদ মাঠের রোদে পোড়া কৃষকের গল্প, যাযাবর পথিক আর তান্ত্রিকদের গল্প—অফুরন্ত ভাণ্ডার তার।

জোছনা ভেজা রুপোলি রাতে বেরিয়ে পড়ে তিনজন। গাল-গল্পের পাশাপাশি এখানকার বিভিন্ন জায়গার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় মরিয়ম বানু। শুধু সেই প্রাচীন মন্দিরটার প্রসঙ্গ কৌশলে এড়িয়ে যায় সে। লিনা অবশ্যি এ ব্যাপারে তেমন কৌতূহলী নয়। সুমনের সামান্য কৌতূহল হলেও বুয়াকে চেপে ধরতে কেমন বাধো বাধো ঠেকে।

মন্দিরটা সুমনদের বাসা থেকে তেমন দূরে নয়। পুব দিকে বড় একটা মাঠ পেরোবার পর শাল-গজারির বন। সেই বনের ভেতর মন্দির। বাইরে থেকে

BanglaBook.org

গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে মন্দিরের চুড়ো দেখা যায়। সময় করে একদিন ওখানে ঢুঁ মেরে আসবে বলে ঠিক করেছে সুমন।

আজ শুক্রবার। নাশতা সেরে ছবির সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে লেকের ধারে গিয়েছিল সুমন। লিনার পোর্ট্রেটের ব্যাকগ্রাউণ্ডে এঁকেছে নীল সাগর আর গাংচিল। পোর্ট্রেটটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ফিনিশিং টাচটা একটু ভেবেচিন্তে দিতে চাইছে ও। তুলির শেষ আঁচড়ের ওপরই নির্ভর করছে ছবির প্রাণ।

ঘরে ফিরে অবাক হয়ে গেল সুমন। জানালার ধারে মুখ ভার করে বসে আছে লিনা। হঠাৎ কি হলো ওর?

'জানো, মরিয়ম খালা চলে গেছে,' অভিমান ঝরে পড়ল লিনার কণ্ঠে।

'চলে গেছে!' ভুরু কোঁচকাল সুমন। 'হঠাৎ?'

'তার কোন্ ভাগ্নের নাকি অসুখ।'

'ভাগ্নে! আমি তো জানি তিনকুলে তার কেউ নেই। তাছাড়া তাকে খবরটাই বা দিল কে?'

'এ প্রশ্ন তো আমারও। খুব তাড়াহুড়ো করে চলে গেল সে। মাইনের টাকাটা পর্যন্ত চাইল না।'

'মাইনে নিয়ে ভেব না। যা পায় দিয়ে দেব। কিন্তু প্রশ্ন তো অন্যখানে। হুট করে সে চলে গেল কেন? আমার ধারণা তার ভাগ্নের অসুখের অজুহাতটা মিথ্যে। চলে যাবার আসল কারণটা গোপন করেছে সে। দাঁড়াও, এখুনি তার বাড়িতে গিয়ে খবর নিচ্ছি।'

দরজায় তালা ঝুলিয়ে ছোট্ট বারান্দায় বসে আছে মরিয়ম বানু। পাশেই গাঁটরি-বোঁচকা। সুমনকে দেখে উঠে দাঁড়াল সে। বলল, 'আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি, স্যার। জানতাম আসবেন।'

'হঠাৎ চলে এলে যে? আমাকে পর্যন্ত বলার প্রয়োজন মনে করলে না! তোমার কোন ক্ষতি করেছি আমরা? কিংবা মনে আঘাত দিয়েছি?'

দাঁতে জিভ কাটল মরিয়ম বানু। মাথা নিচু করে বলল, 'ওকথা বলে লজ্জা দেবেন না, স্যার। আজ পর্যন্ত যতগুলো বাড়িতে কাজ করেছি, আপনার বাড়ির মত সুখ আর কোথাও পাইনি।'

'তাহলে চলে এলে কেন?'

'যে কারণে আমি চলে এসেছি শুনলে হাসবেন আপনি। অতি তুচ্ছ মনে হবে কারণটা। যদি আপনাদের ওখানে কথাটা বলতাম, হেসে উড়িয়ে দিতেন। ছাড়তে চাইতেন না আমাকে। আপনার কথা আমি ফেলতেও পারতাম না। তাই মিথ্যে বলে চলে এসেছি। এজন্যে আমাকে ক্ষমা করবেন।'

'ভূমিকা থাক। আসল কথা বলো।'

'শালবনের সেই মন্দিরটাই আমার চলে আসার কারণ।'

'মন্দির!'

'হ্যাঁ, এক তান্ত্রিকের মূর্তি আছে ওই মন্দিরে। মূর্তিটা তিন যুগ পর পর জেগে ওঠে। জেগে ওঠার পর মানুষের রক্ত খায় ওটা।'

BanglaBook.org

মরিয়ম বানুর মন্দির প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাবার কারণ এতদিনে পরিষ্কার। বদ্ধমূল কুসংস্কার আর অমূলক ভীতি মানুষকে স্থান থেকে কতদূর অস্থানে টেনে নিয়ে যেতে পারে তার জ্বলন্ত উদাহরণ এই মহিলা। সুমন কৌতুকের সুরে বলল, 'তুমি তো এদিককারই স্থায়ী বাসিন্দা?'

'জী।'

'তোমার জানামতে কেউ কি কখনও সেই তান্ত্রিককে মানুষের রক্ত পান করতে দেখেছে?'

'কেউ দেখেছে কিনা জানি না। তবে একটা ঘটনা ঘটেছিল। আজ থেকে তিন যুগ আগে, তখন আমার বয়স পনেরো কি ষোলো, শুনলাম তান্ত্রিক জেগে উঠবে। শ্যামলপুরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। যে যেমন পারল দূরে পালিয়ে যেতে লাগল। যাদের দূরে যাবার উপায় ছিল না, তারা দরজা-জানালায় খোদার পাক কালাম ভরা কবচ আর রসুনের মালা ঝুলিয়ে দিল। অমাবস্যা কেটে যাবার পর শ্যামলপুরে ফিরলাম আমরা। শুনলাম কৃষ্ণপক্ষের শেষরাতে লেকের ধারে অজ্ঞাত এক লোকের লাশ পাওয়া গেছে। ছিন্নভিন্ন লাশটা চেনার কোন উপায় ছিল না। সবাই ধরে নিল সেই তান্ত্রিকের কাজ। রক্ত খেয়ে লাশটা তার অনুচর শেয়ালদের উপহার দিয়েছিল।'

'কিন্তু এটা তো শুধুই অনুমান। নিশ্চিত কোন প্রমাণ নেই এতে। এমনও তো হতে পারে, সেই লোকটাকে তার কোন শত্রু খুন করে ফেলে গেছে লেকের ধারে। আর খুনটা এমনভাবে করেছে যাতে সবাই ধরে নেয় ওটা তান্ত্রিকেরই অপকর্ম।'

'শ্যামলপুরের ইদানীংকার ছেলেপুলেরা অবশ্যি তাই বলে। আমিও প্রায় ভিড়ে গিয়েছিলাম ওদের দলে, কিন্তু কাল রাতে—'

'কাল রাতে! কি?'

'একটা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখলাম,' বেশ নার্ভাস দেখাচ্ছে মরিয়ম বানুকে। শাড়ির আঁচল দিয়ে কপালের স্বেদবিন্দু মুছল সে। সশব্দে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'দেখি একটা খেপা শেয়াল তাড়া করেছে আমাকে। যেখানেই যাই শেয়ালটাও যায় পিছু পিছু। দৌড়তে দৌড়তে হঠাৎ একটা পাথরে পা বেধে পড়ে গেলাম। আর অমনি—ওহ্, খোদা, মনে পড়লে এখনও আমার গা শিউরে ওঠে!'

'থাক থাক, আর মনে করতে হবে না। তুমি সত্যিই একটা বোকা মেয়ে। দুঃস্বপ্ন তো সবাই দেখে, তাই বলে ভয়ে কেউ বাড়ি ছাড়া হয় না। তাছাড়া তোমার স্বপ্নের সাথে ওই রক্তলোভী তান্ত্রিকের কোন সম্পর্ক তো নেই।'

'সম্পর্ক আছে। ঘুম ভাঙার পর ভীষণ তেষ্টা পায় আমার। রাত বুঝি তখন দুটো-তিনটে। গরম পড়েছিল বলে শিয়রের জানালাটা খোলা রেখেছিলাম। পানির জন্যে বিছানা থেকে নামতেই জানালায় চোখ পড়ল। দেখি স্বপ্নে দেখা সেই শেয়ালটা জানালায় দু'পায়ে ভর দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে। ভাবলাম স্বপ্নের ঘোরটা কাটেনি। দু'চোখ কচলে নিয়ে আবার তাকালাম। একই দৃশ্য। একটা লাঠি দিয়ে খোঁচা দিতে গেলাম শেয়ালটাকে। দাঁত খিঁচিয়ে ভেংচাল ওটা। চাপা স্বরে গর্জাতে লাগল—যেন আমাকে নাগালের ভেতর পেলে ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলবে।

BanglaBook.org

আমি তখন ভয়ে প্রায় আধমরা। লাঠিটা কখন হাত থেকে পড়ে গেছে টেরই পাইনি। কতক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম মনে নেই। একসময় দূর থেকে আজান ভেসে এল। ভোরের পাখিরা বেরিয়ে এল বাসা ছেড়ে। আর সেই শেয়ালটা যেন হঠাৎ ভোজবাজির মত মিলিয়ে গেল।'

'হ্যালুসিনেশন হয়েছিল তোমার,' বোঝাবার ভঙ্গিতে বলল সুমন। 'এরকম মতিভ্রম হতেই পারে। ঘুম ভাঙলেও স্বপ্নের ঘোরেই ছিলে তুমি। আসলে জানালায় কোন শেয়ালই আসেনি।'

'আমি দিব্যি দেখলাম।'

'ভুল দেখেছ। আচ্ছা, শেয়ালটার সাথে তোমাদের সেই তান্ত্রিকের সম্পর্কটা কি?'

সুমন বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বললেও মরিয়ম বানু এতটুকু অপ্রস্তুত হলো না। সে সহজভাবেই বলল, 'তান্ত্রিক জেগে ওঠার ক'দিন আগে থেকে ওরকম কতগুলো শেয়ালের আনাগোনা বাড়ে। শ্যামলপুরের গুণিনদের ধারণা ওই শেয়ালগুলো আসলে তান্ত্রিকের ঘনিষ্ঠ অনুচর। গুরুর জন্যে শিকার খুঁজতে বেরোয়। ওরা যাকে বাছাই করে তান্ত্রিক তারই রক্ত খায়।'

'তোমার কি ধারণা ওরা তোমাকেই শিকার হিসেবে বাছাই করেছে?'

কোন জবাব দিল না মরিয়ম বানু। আঁচল দিয়ে কপাল আর নাকের ঘাম মুছল। মুহূর্ত কয়েক নীরব থেকে হঠাৎ খপ করে সুমনের একটা হাত ধরে ফেলল সে। কাতর কণ্ঠে মিনতি করে বলল, 'আম্মা বেগমের ওপর আমার বড় মায়া পড়ে গেছে, স্যার। তাঁর কোন অমঙ্গল আমি সইতে পারব না। দয়া করে তাঁকে নিয়ে দূরে কোথাও চলে যান, স্যার। অন্তত এই অমাবস্যাটা কাটিয়ে আসুন।'

ভীতু মহিলা হঠাৎ এভাবে সীন-ক্রিয়েট করে বসবে ভাবেনি সুমন। রাস্তায় তেমন লোকজন না থাকলেও অল্প যে ক'জন পথচারী আসা-যাওয়া করছে তাদের কৌতূহলী দৃষ্টি এদিকে স্থির। বিব্রত বোধ করতে লাগল সুমন, খানিকটা বিরক্তও হলো। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'দেখো, আমি একজন শিল্পী। আমার চিন্তাভাবনা পৃথিবীর সব সুন্দরকে ঘিরে। অসুন্দর কোন কিছু নিয়ে মাথা ঘামাবার আগ্রহ আমার নেই। তুমি আমার সঙ্গে যাবে কিনা বলো?'

ফোঁস করে চেপে রাখা দীর্ঘশ্বাসটা ছেড়ে দিল মরিয়ম বানু। মাথা নিচু করে মুহূর্ত কয়েক ভেবে নিয়ে বলল, 'অমাবস্যাটা যাক, স্যার।'

মরিয়ম বানুর পাওনা মিটিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল সুমন। পথে ডাক্তার মুস্তাফিজের সাথে দেখা। এক বাড়িতে কলে যাচ্ছেন তিনি। শ্যামলপুরের তিন ডাক্তারের ভেতর সবচেয়ে প্রবীণ মুস্তাফিজ সাহেব। নিজস্ব ডিসপেনসারি আছে তাঁর। লোক হিসেবে খুবই অমায়িক। এর আগেও তাঁর সাথে দু'তিনবার আলাপ হয়েছে সুমনের। প্রতিবারই ওকে নিজের ডিসপেনসারিতে দাওয়াত করেছেন ডাক্তার। সুমন মুখে যাব যাব বলেছে, কিন্তু যায়নি কখনও। ছুটি কাটাতে এসে ডাক্তারখানায় যেতে কার ভাল লাগে?

হালকা দু'একটা মামুলি আলাপের পর মন্দিরের প্রসঙ্গটা তুলল সুমন।

BanglaBook.org

জিজ্ঞেস করল, 'আপনি বিশ্বাস করেন এসব?'

'দেখুন,' টাক মাথা চুলকালেন ডাক্তার, 'পৃথিবীতে কিছু কিছু ব্যাপার ঘটে যেগুলো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের উর্ধ্বে। আমার নিজের দেখা একটা ঘটনা শুনুন।'

বিরক্তি বোধ করল সুমন। মেজাজ সংযত করে বলল, 'দুঃখিত, ব্যাখ্যার অতীত কিছু শোনার আগ্রহ আমার নেই। তান্ত্রিকের ব্যাপারটা আপনি বিশ্বাস করেন কিনা সোজাসুজি বললে খুশি হব।'

'আমি এই গ্রামে আছি প্রায় বিশ বছর। ওই মন্দির সম্পর্কে আজগুবি অনেক কিছুই শুনেছি। যেহেতু ঘটনাগুলো সম্পর্কে নিশ্চিত কোন প্রমাণ পাইনি, কাজেই ওসব বিশ্বাস করার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু ওই মন্দির নিয়ে বাস্তবে এমন কিছু ঘটেছে যা একেবারে উড়িয়েও দেয়া যায় না।'

'যেমন?' আগ্রহী হলো সুমন।

'একবার তিনজন গুণিন মিলে ঝাড়ফুঁক দিয়ে মন্দিরটা বেঁধে দিয়ে এল, যাতে তান্ত্রিকের অশুভ প্রভাব বাইরে আসতে না পারে। গুণিন তিনজন এক বছরের মধ্যেই মারা গেল। তিনজনেরই মৃত্যু হলো অপঘাতে। একজন মরল সাপের ছোবলে, দ্বিতীয়জন মরল গাছ চাপা পড়ে, তৃতীয়জন পানিতে ডুবে। আরেকটা ঘটনা বলি, একবার এক সাহসী যুবক কুড়ুল নিয়ে ভাঙতে গেল তান্ত্রিকের মূর্তি। দু'তিন কোপ চালাবার পর হঠাৎ কুড়ুলের ফলা পাথরে বাড়ি খেয়ে বাঁট থেকে ছিটকে এল। আর সেটা লাগল গিয়ে সরাসরি যুবকের কপালে। খুলি ভেদ করে ঢুকে গেল অনেকটা। সাথে সাথে মৃত্যু হলো যুবকের।'

সুমন বুঝল মরিয়ম বানুর মত এই ডাক্তারও একজন কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ। শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান বলে তাঁর বলার ভঙ্গিটা অন্যরকম। একটা নিষ্প্রাণ পাথরের মূর্তি তিন যুগ পর পর মানুষের রক্ত পান করার জন্যে জেগে ওঠে—এ যে কল্পনাকেও হার মানায়!

'তবে একটা কথা আমি বিশ্বাস করি না,' নীরবতা ভাঙলেন ডাক্তার।

'কি কথা?'

'তান্ত্রিক মূর্তির জীবন লাভ। মূর্তিটার অদৃশ্য কোন ক্ষমতা থাকতে পারে। অকাল্ট সায়েন্সের সাথে তুলনা করেই বলছি—আংটির পাথর যদি মানুষের ভাগ্য বদলাতে পারে, তাহলে ওই প্রস্তর মূর্তিরও অলৌকিক কোন ক্ষমতা থাকা বিচিত্র কিছু নয়। কিন্তু তাই বলে মূর্তিটা অকস্মাৎ রক্তমাংসের শরীর নিয়ে জেগে উঠবে—এটা তো পুরোপুরি অবাস্তব। এসব কথা শুধু কল্পকাহিনীতেই শোভা পায়। আর শেয়ালের ব্যাপারটাও অস্বাভাবিক কিছু নয়। গরমের সময় গাঁয়ে শেয়ালের উপদ্রব একটু বেড়েই থাকে।'

ডাক্তারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ভাবটা দূর হয়ে গেল সুমনের। আসলে ডাক্তারকে ভুল বুঝেছিল ও। যুক্তি দিয়ে যতটুকু গ্রহণ করা সম্ভব শুধু ততটুকুই গ্রহণ করেছেন তিনি, বাকিটুকু ঝেড়ে ফেলেছেন নির্দ্বিধায়। ডাক্তারকে বাসায় নিমন্ত্রণ করল সুমন। অখণ্ড অবসরের অলস আড্ডাগুলো ভালই জমবে ডাক্তারকে পেলে। অন্তত মরিয়ম বানুর অভাবটা পুষিয়ে নেয়া যাবে।

BanglaBook.org

লিনাকে দেখে দু'রকম প্রতিক্রিয়া হলো সুমনের। হাসি পেল আবার দুঃখও হলো। লাঞ্চ তৈরি করতে গিয়ে বিতিকিচ্ছি কাণ্ড করে বসেছে মেয়ে। নীল ডুরে শাড়িটায় তেল-মশলা লেগে আছে। গালের এখানে-ওখানে কালির পোঁচ। ধোঁয়ার ক্রিয়ায় চোখ দুটো এমন লাল হয়েছে যেন হাপুস নয়নে কাঁদতে বসেছিল। সুমন নিজে যতটুকু রান্না জানে তার অর্ধেকও জানে না লিনা।

'তুমি আবার রান্নাঘরে ঢুকেছিলে কেন?' মৃদু হেসে অনুযোগ করল সুমন। 'মেয়ে হলেও একাজ তোমার জন্যে নয়।'

'তুমি আমাকে কি ভাব, সুমন?' অভিমান ঝরল লিনার কণ্ঠে। সাংঘাতিক টাচি মেয়ে ও।

'আহা, ঠোঁট ফোলাচ্ছ কেন? আমি তো ওভাবে বলিনি। এখন তোমার কমপ্লিট রেস্টে থাকা দরকার, নাকি?'

'হয়েছে, আর কথা ঘোরাতে হবে না। যাও, তাড়াতাড়ি গোসল করে এসো। টেবিলে খাবার দিচ্ছি।'

খেতে বসে মরিয়ম বানুর অভাবটা হাড়ে হাড়ে টের পেল সুমন। মুরগির ঝোলটা যাও খাওয়া যাচ্ছিল, ডাল নিতেই কম্মো কাবার। এত লবণ যে মুখে দেয়াই দায়।

'কি ব্যাপার, অমন করছ কেন? ডাল ভাল হয়নি?'

'না না, খুব ভাল হয়েছে,' বলেই ডাল মাখানো ভাত মুখে দিল সুমন। পরমুহূর্তে বিষম খেতে শুরু করল।

সুমনের অবস্থা দেখে লিনার মুখ শুকিয়ে এতটুকু। চেখে দেখার জন্যে আঙুলে একটু ডাল নিয়ে জিভে ছোঁয়াল।

'ও মা, এ যে সাগরের জল!' পাঁচ হয়ে গেল লিনার চেহারা।

হাসি আর চেপে রাখতে পারল না সুমন।

'মরিয়ম খালার সাথে দেখা হলো কিনা কিছু বললে না তো?' থালাবাসন ধুয়ে সব গোছগাছ করে ফ্রেশ হয়ে এসেছে লিনা।

সুমন বিছানায় উপুড় হয়ে পাতা ওল্টাচ্ছে একটা কালচারাল ম্যাগাজিনের। লিনাকে কি বলবে আগেই ঠিক করে রেখেছে ও। ওকে মন্দিরের আজগুবি গল্প শুনিয়ে ছুটির আনন্দ মাটি করার কোন ইচ্ছেই নেই ওর।

'ঠিকই বলেছে তোমার মরিয়ম খালা,' সুমন বলল, 'তার দূর সম্পর্কের এক ভাগ্নের অসুখ। দিন কয়েক পরেই আবার চলে আসবে।'

'কিন্তু খবরটা তাকে দিল কে? কেউ তো আসেনি এখানে।'

'এসেছিল, তুমি দেখোনি। লোকটা দেরি করেনি। বুয়াকে খবরটা দিয়েই চলে গেছে।'

সুমনের মিথ্যে কথাগুলো নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করে ফেলল লিনা। লিনার এই গুণটাই সবচে' বেশি মুগ্ধ করে সুমনকে। আবার ভয়ও হয়। পাছে ওর কোন ভুল লিনার অন্তরের সাদা জমিনে সন্দেহের বীজ বুনে দেয়, এই ভয়টা প্রায়ই

BanglaBook.org

অস্বস্তিতে ভোগায়। এরকম সরল মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না।

বিকেলের দিকে ডাক্তার মুস্তাফিজ এলেন। লনে চেয়ার পেতে চা নিয়ে বসল তিনজন। দু'মিনিটেই আসর জমে উঠল। গল্প বলায় ডাক্তার মরিয়ম বানুর এক কাঠি ওপরে। তবে তাঁর ভাণ্ডারে কল্পকাহিনীর সঞ্চয় কম। শ্যামলপুরে শেকড় গাড়ার আগে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। সে সময়কার অনেক রোমহর্ষক ঘটনা ডাক্তারের স্মৃতিপটে উজ্জ্বল। ডাক্তার শুরু করলেন তাঁর এক বিস্ময়কর বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী।

'মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়ার আগে পাকিস্তান আর্মিতে ছিলাম আমি,' একটা চুরুট ধরিয়ে আয়েশ করে বসলেন ডাক্তার। 'ক্যাম্প থেকে পালাবার ঠিক দু'দিন আগের ঘটনা এটা। বলতে পারেন এই ঘটনাটাই ক্যাম্প থেকে পালাতে আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। সেদিন সন্ধ্যায় তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে। হাতে তেমন কাজ না থাকায় চিঠি লিখতে বসেছি। হঠাৎ চাপা আর্তনাদ শুনতে পেলাম-তীব্র যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে কেউ। বাইরে এসে দেখি একটা যুবক উপুড় হয়ে পড়ে আছে। কাদা আর রক্তে সারা শরীর মাখামাখি। সেন্ট্রিকে পাঠিয়েছিলাম সিগারেট আনতে। তাই লোকটাকে নিজেই টেনেহিঁচড়ে তাঁবুর ভেতর নিয়ে এলাম। গার্ডদের কড়া পাহারা ভেদ করে যুবকটা ক্যাম্পে ঢুকল কি করে বোধগম্য হলো না। যা হোক, যুবকের সেবা-শুশ্রূষায় লেগে গেলাম। বুকের বাঁ দিকে হৃৎপিণ্ড বরাবর তিনটে গুলি খেয়েছে সে। সঙ্গে সঙ্গে মারা যাবার কথা, কিন্তু দিব্যি বেঁচে আছে। শুধু তাই নয়, গার্ডদের সতর্ক দৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে ঠিক ঠিক ডাক্তারের তাঁবুতে এসে পৌঁচেছে। ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে ব্যাণ্ডেজ বাঁধছি আর অবাক হয়ে পুরো ব্যাপারটা তলিয়ে দেখছি, এমন সময় যুবক প্রবল শ্বাসকষ্ট নিয়ে বলল, "আমার একটা উপকার করবেন, স্যার?"

' "কি?"

"আমি যে গুলি খেয়েছি এটা আমার বাড়ির কেউ জানে না। দয়া করে আমার মৃত্যুর খবরটা বাড়িতে পৌঁছে দেবেন?"

' "মৃত্যুর খবর! আপনি তো দিব্যি বেঁচে আছেন।"

"খবরটা ওদের কাছে পৌঁছুতে পৌঁছুতে আমি মারা যাব, স্যার। হাতে সময় বেশি নেই। দয়া করে ঠিকানাটা তাড়াতাড়ি লিখে নিন।"

'যুবকের কথামত দ্রুত ঠিকানা লিখে নিলাম। যুবক এবার পানি খেতে চাইল। খাবারের সব সরঞ্জাম ছিল তাঁবুর পর্দা ঝোলানো আরেকটা অংশে। সেখান থেকে পানি এনে দেখি ছেলেটা বেমালুম হাওয়া। বিস্ময়ের সীমা রইল না আমার। তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলাম। নেই। মিনিট দশেকের ভেতর বারোশো সৈন্যের পুরো শিবির জানল খবরটা। কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলায় বাঁধা একঘেয়ে পরিবেশে বেশ রস সৃষ্টি করল ব্যাপারটা। অধস্তনেরা আড়ালে হাসাহাসি করতে লাগল। কলিগরা ঠাট্টাচ্ছলে কাঁধ চাপড়ে বলল, "ক'বোতল মেরেছিলে হে?"

'সবাই আমাকে যেভাবে বোকা সাজাল তাতে আমিও হয়তো ব্যাপারটাকে একটা ধাঁধা কিংবা ঘোর বলেই ধরে নিতাম, কিন্তু ঠিকানাটাই বাধাল বিপত্তি। এটা

অবিশ্বাস করি কি করে? ঠিকানামত লোক পাঠিয়ে দিলাম। সে ফিরে এসে বলল ওই বাড়ির বড় ছেলে নিখোঁজ। ছেলেটার নাম এবং নিখোঁজ হবার দিন আমার বর্ণনার সাথে হুবহু মিলে গেল। এবার আর ঘটনাটা উড়িয়ে দিতে পারল না কেউ। আমার ইমিডিয়েট বস্ নিজে সাজাপ্রাপ্ত বাঙালীদের তালিকা ঘাঁটার নির্দেশ দিল। পাওয়া গেল নাম-ঠিকানা। যুবককে ফায়ারিং স্কোয়াডের সৈনিকেরা গুলি করে হত্যা করেছে। আমি এই ঘটনার আজ অবধি কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাইনি।'

আর কেউ এ ধরনের কাহিনী শোনালে তাঁকে গাঁজাখোর গুলবাজ ঠাওরাত সুমন। যুদ্ধ ফেরত সৈনিকদের সম্পর্কে প্রবাদই আছে একটা—বাড়ি ফেরার সময় ঝোলায় করে অনেক আজগুবি গল্প নিয়ে আসে তারা। কিন্তু ডাক্তার সাহেবের বলার ভঙ্গিতে এক ধরনের হতাশা রয়েছে। বাস্তবে ঘটা একটা অবিশ্বাস্য ঘটনাকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেনে নিতে হচ্ছে বলেই এই হতাশা। সুমন এই প্রথমবারের মত হোঁচট খেলো। বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের দোলায় দুলতে দুলতে ভাবল, কি জানি, সেরকম কিছু ঘটতেও পারে?

সন্ধের পর যথারীতি বই নিয়ে বসল সুমন। আর লিনা ওদিকে রাতের রান্না নিয়ে ব্যস্ত। সুমন অনেক অনুনয় করেও নিরস্ত করতে পারেনি ওকে।

লিনার তীক্ষ্ণ চিৎকার পড়া থেকে মনোযোগ বিচ্ছিন্ন করল সুমনের। দৌড়ে কিচেনে চলে এল ও। পেছনের খোলা জানালার দিকে তাকিয়ে আছে লিনা। ডান হাতের মুঠো কামড়ে ধরে অদম্য ভীতি সামলাচ্ছে। মৃদু কাঁপছে সারা শরীর।

'কি হয়েছে?' লিনার কাঁধে আলতো করে নাড়া দিল সুমন। 'চিৎকার দিলে কেন?'

'একটা শেয়াল,' প্রায় ফুঁপিয়ে উঠল লিনা। 'জানালায় দু'পা রেখে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল।'

'তুমি দেখছি ডোবাবে,' হাসল সুমন। 'শেয়াল দেখে কেউ ভয় পায়?'

'তুমি জানো না কি ভয়ঙ্কর ওটার চেহারা! আমাকে দাঁত খিঁচিয়ে ভেংচাল!'

'ভেংচাক বা যাই করুক, তোমার নাগাল তো আর পাচ্ছে না ওটা। বাইরের সব দরজা বন্ধ। যাও, মুখহাত ধুয়ে বিশ্রাম নাও গে। এই শরীরে এত ধকল সইবে না তোমার। বাকি কাজগুলো আমিই সারছি।'

ঘুমোবার আগে সবগুলো জানালা বন্ধ করে দিল সুমন। ভীষণ ভয় পেয়েছে লিনা। রাতে হয়তো ঘুমই হবে না বেচারির।

বাস্তবে ঘটল উল্টোটি। লিনা গভীর ঘুমে অচেতন থাকল, আর সুমন থাকল সারারাত জেগে। শেষরাতের দিকে ছাড়া ছাড়া উদ্ভট স্বপ্ন দেখল তন্দ্রার ঘোরে।

সকালে নাশতা সেরে সুমন ঠিক করল শালবনের মন্দিরটা দেখে আসবে। স্রেফ কৌতূহল মেটাবার জন্যেই যাবে ও। টর্চ এবং পয়েন্ট থ্রী এইট দ্য স্মীথ অ্যাণ্ড ওয়েসন স্পেশাল রিভলভারটা সাথে নিয়ে বেরোল সুমন। শিল্পীর হাত সবসময় কোমল আচরণ করবে এই নীতিতে বিশ্বাসী নয় ও। অশুভ শক্তিকে রুখতে গিয়ে সময়ে সময়ে শিল্পীদেরও কঠোর হতে হয়। এজন্যেই রিভলভারটা সাথে করে এনেছে সুমন। বনের ভেতর খেপা শেয়াল কিংবা ও ধরনের কোন

BanglaBook.org

হিংস্র জন্তু হঠাৎ সামনে পড়তে পারে।

সুমন যেরকম ভেবেছিল সেরকম অন্ধকার নয় বনের ভেতরটা। বৃক্ষরোপণ অভিযানের সাথে পাল্লা দিয়ে চলছে বৃক্ষনিধন অভিযান। ফলে গাছগুলোর মাঝে মাঝে ফাঁক সৃষ্টি হয়েছে। ফাঁকগুলো দিয়ে যতটুকু সূর্যের আলো আসছে তাতে দিব্যি পথ চলা যায়।

মন্দিরের চারপাশে গাছগাছালির ঘনত্ব একটু বেশি। এদিকটায় সচরাচর মানুষের পা পড়ে না বলেই হয়তো এ অবস্থা। একসময় মন্দিরের সামনে খোলা উঠন ছিল। সেই উঠন এখন ঝোপঝাড়ে পরিপূর্ণ।

উঠনের মাঝ দিয়ে সরু একটা পথ পেয়ে গেল সুমন। মন্দিরে নিয়মিত আসা-যাওয়ার ফলে তৈরি হয়েছে পথটা। কে আসে মন্দিরে?

সতর্কতার সাথে সরু পথ ধরে এগোল সুমন। সর্ সর্ করে সরীসৃপ জাতীয় কিছু ঝোপের ভেতর দিয়ে দৌড়ে পালাল বার তিনেক। উঁচু পোর্টিকোয় উঠে দাঁড়াতেই দুটো শেয়াল লাফিয়ে নামল উঠনে, তারপর ঝোপঝাড় ভেঙে ভোঁ দৌড়।

অনেক দিনের পুরানো মন্দির এটা। লোহার ফ্রেমে বসানো শাল কাঠের ভারি কবাট আর খিলানের কারুকাজগুলো মোগলদের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। অর্থাৎ এ মন্দির টিকে আছে কয়েক শতাব্দী ধরে। কিন্তু বয়সের তুলনায় তেমন জরাগ্রস্ত হয়নি পাথরের দালান। বারান্দার মোটা মোটা থামগুলো এখনও অক্ষত, অবিচল। শুধু কালচে সবুজ শেওলা আর সাপের মত পেঁচিয়ে থাকা সবুজ লতাগুলো সৌন্দর্য ঢেকে রেখেছে থামগুলোর।

মন্দিরের প্রবেশ দ্বার তিনটে। দুটো বন্ধ, একটা খোলা। খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল সুমন। শেওলা পচা সোঁদা গন্ধ ধাক্কা মারল নাকে। ভাপসা একটা ভাব আছে ঘর জুড়ে। গাঢ় অন্ধকার ফুটো করে টর্চের আলো ফেলল সুমন। ছত্রাক পড়া স্যাতসেঁতে মেঝেতে পিছলে পড়তে লাগল আলো। কারুকাজ খচিত দেয়ালগুলোর খাঁজে খাঁজে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে মস আর গুল্মলতা। প্রশস্ত হলঘর মত মাত্র একটা রুম নিয়েই এই মন্দির। শেষ প্রান্তে উঁচু বিরাট একটা বেদীর ওপর মূর্তি।

সুমন যেরকম কল্পনা করেছে সেরকম ভয়ঙ্কর কিছু নেই মূর্তিটার মাঝে। কালো কষ্টি পাথরের খুব সাধারণ একটা মূর্তি। ছ'ফুটের মত লম্বা, পেশল দেহের বাঁক এবং ভাঁজগুলো ফুটে আছে নিখুঁতভাবে। যিনি গড়েছেন, তিনি নিঃসন্দেহে একজন নিপুণ ভাস্কর। মুষ্টিবদ্ধ ডান হাত উঁচিয়ে কিছু একটা ঘোষণা দেয়ার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে মূর্তিটা। মাথাটা ঈষৎ উঁচু হয়ে আছে ঔদ্ধত্য নিয়ে। দাঁড়াবার ভঙ্গিতে ফুটে আছে আত্মবিশ্বাস। মূর্তিটাকে তান্ত্রিকের কোন চরিত্রের সাথেই মেলানো যাচ্ছে না, বরং মনে হচ্ছে এ যেন কোন যুদ্ধজয়ী বীর। আশ্চর্যের ব্যাপার, মূর্তিটার গায়ে কোন শেওলা বা ছত্রাক পড়েনি। দিব্যি নতুনের মত চক্চক্ করছে। যেন এইমাত্র মূর্তিটাকে বেদীর ওপর স্থাপন করা হয়েছে। ডাক্তারের সেই কথাগুলো মনে পড়ল সুমনের, 'অকাল্ট সায়েন্সের সাথে তুলনা করেই বলছি—আংটির পাথর যদি মানুষের ভাগ্য বদলাতে পারে, তাহলে এই

BanglaBook.org

প্রস্তর মূর্তিরও অলৌকিক কোন ক্ষমতা থাকা বিচিত্র কিছু নয়··· ।'

আবার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব এসে ভর করল মনে। সত্যিই তাহলে এই প্রস্তর মূর্তির অদৃশ্য ক্ষমতা আছে?

সুমনকে চমকে দিয়ে অকস্মাৎ একটা কালো ছায়ার আবির্ভাব ঘটল। টর্চের আলো ফেলতেই একজোড়া ধূর্ত চোখ ঝিলিক দিয়ে উঠল। মাত্র ফুট চারেক সামনেই একটা শেয়াল। খুব সম্ভব বেদীর পেছনে আত্মগোপন করে ছিল। ভয় পাবার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না ওটার মাঝে। বরং আলো সইতে না পেরে বিরক্তি দেখাচ্ছে। তীক্ষ্ণ দাঁত বের করে চাপা স্বরে গর্জে উঠল শেয়ালটা। সম্ভবত এই শেয়ালটাই গত রাতে ভয় দেখিয়েছে লিনাকে।

'যাহ্, ভাগ এখান থেকে,' ধমকে উঠল সুমন। মন্দিরের পাষাণ দেয়ালে ভারি প্রতিধ্বনি তুলল ওর রূঢ় কথা। গা ছমছমে একটা আবহ তৈরি হলো।

কিন্তু শেয়ালটার মাঝে নড়বার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। চাপা স্বরে গর্ গর্ করে আরও দু'পা এগোল ওটা—যেন উল্টো সুমনকেই ভাগতে বলছে। কোমরে গুঁজে রাখা রিভলভারটা বের করল ও। তাক করল শেয়ালের মাথা বরাবর। বিপদ টের পেয়ে গেল ধূর্ত জীবটা। সুমনের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে পিছু হটতে লাগল, তারপর সহসাই মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

ফেরার তাগিদ অনুভব করল সুমন। কৌতূহল যথেষ্ট মেটানো হয়েছে। এবার ভালয় ভালয় বাড়ি ফেরা যাক। খেপা শেয়ালটা আবার কোন্ মূর্তি নিয়ে হাজির হবে কে জানে? ওটার কামড় খেয়ে বাড়ি ফিরলে আরেকটা কাহিনী সৃষ্টি হবে মন্দিরকে নিয়ে।

নির্বিঘ্নেই বন থেকে বেরিয়ে এল সুমন। পথে শেয়াল দূরের কথা, একটা বনবেড়ালও চোখে পড়েনি। নতুন একটা আইডিয়া এসেছে সুমনের মাথায়। সরকারের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের সাথে যোগাযোগ করবে ও। কয়েক শতাব্দীর এই প্রাচীন মন্দির নিয়ে গবেষণা হওয়া দরকার। তাহলেই এটার আদি অন্ত বেরিয়ে আসবে। এতদিনেও মন্দিরটা সরকারের নজরে পড়েনি কেন এটাই আশ্চর্যের ব্যাপার। এমনি আরও কত পুরাকীর্তি দেশের আনাচে-কানাচে অনাদরে পড়ে আছে কে বলবে?

বাড়ি ফিরে অবাক হয়ে গেল সুমন। সব ক'টা দরজা-জানালায় কোরানের আয়াত লেখা হয়েছে, আর ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে একটা করে রসুনের মালা। লিনা মন্দিরের কথা জেনে ফেলেছে নাকি? কে জানাল ওকে?

লিনার সুন্দর মুখখানা শুকিয়ে কাঠ। বোঝাই যাচ্ছে প্রচণ্ড মানসিক চাপে ভুগছে ও। কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই গড়বড়িয়ে সব বলে ফেলল লিনা।

এক গুনিনকে পাঠিয়েছিল মরিয়ম বানু। সেই সব ব্যবস্থা করেছে। আজ ঘোর অমাবস্যা। মধ্যরাতে জেগে উঠবে তান্ত্রিক। তাই শ্যামলপুরের সব বাড়িতেই প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

মরিয়ম বানুর প্রতি প্রচণ্ড রাগ হলো সুমনের। বোকা মহিলা শেষমেশ অঘটন ঘটালই। এখনই লিনার যে চেহারা হয়েছে রাতে গুরুতর কিছু না বাধালেই হয়।

BanglaBook.org

এমনিতেই শরীরটা ভাল নয় ওর।

'এটা তাড়াতাড়ি গলায় পরে নাও,' লিনার হাতে একটা কবচ।

'নিশ্চয়ই গুণিনের কাজ?'

'হ্যাঁ, একটা আমার, আরেকটা তোমার।'

'তুমি তো জানো, আমি আস্তিক নই, আবার নাস্তিকও নই। দুইয়ের মাঝামাঝি একটা মানুষ। তারপরেও—'

'তারপরেও তোমাকে পরতে হবে,' সুমনের মুখের কথা কেড়ে নিল লিনা। অনেকটা জেদের ভঙ্গিতে বলল, 'আহ্, দেরি করছ কেন? তাড়াতাড়ি গলায় পরো।'

'কি ছেলেমানুষি করছ! বাদ দাও তো।'

'সৃষ্টিকর্তার ওপর তোমার বিশ্বাস না থাক, আমার তো আছে। আমার বিশ্বাস আর ভালবাসার দাম দেয়ার জন্যেই না হয় গলায় পরলে এটা!'

লিনার আর্দ্র কণ্ঠ মনটা ভিজিয়ে দিল সুমনের। আর একটি কথাও না বলে কবচটা গলায় পরে নিল ও।

দুপুরের পর আকাশে মেঘ জমতে শুরু করল—অনেকটা বিনা নোটিসে। সকালে দিব্যি পরিষ্কার ছিল আকাশ। সুমন ভেবেছিল লেকের ধারে গিয়ে লিনার পোর্ট্রেটটা শেষ করবে আজ, তা আর হলো না।

বিকেলটা কাটল নিরানন্দে। লিনা সেই যে মুখ কালো করেছে আর স্বাভাবিক হবার নাম নেই। সুমনের সাথে অবশ্যি হেসে হেসেই কথা বলছে। কিন্তু প্রাণ নেই সে হাসিতে।

কিচেনের যাবতীয় কাজ সুমনই সারল আজ। রাতের রান্না বিকেলেই সেরে নিল। সন্ধের পর লিনাকে জোর করে চারটে খাইয়ে পাঠিয়ে দিল বিছানায়। লিনার জন্যে এখন একমাত্র ওষুধ হচ্ছে ঘুম। এক ঘুমে রাতটা কাটাতে পারলেই ভয় আর দুশ্চিন্তার অবসান ঘটবে।

রিডিং রুমে রকিং চেয়ারে বসে দোল খাচ্ছে সুমন। চোখ দুটো বন্ধ, হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। সিগারেটটা শেষ হলেই বিছানায় যাবে ও। বিচ্ছিন্ন কিছু হালকা চিন্তা খেলা করছে মাথায়। একসময় লেখালেখির অভ্যেস ছিল ওর। আর্ট কলেজে ভর্তি হবার পর অভ্যেসটা মরে গেছে। মন্দির নিয়ে রসাত্মক কিছু ফেঁদে বসলে কেমন হয়—ভাবছে ও। সাফল্য-বৈফল্য বড় কথা নয়, চেষ্টা করতে দোষ কি? অন্তত ছুটির আনন্দের ঘাটতিটুকু পুষিয়ে নেয়া যাবে।

সুমন টের পেল ওর ঘাড়ের চুলগুলো কাঁটার মত দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের অ্যালার্ম! ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে পেছনের খোলা জানালার দিকে তাকাল সুমন। সেই শেয়াল, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

চেয়ার থেকে উঠে এসে মারবার ভঙ্গিতে হাত তুলল সুমন। একটুও ভয় পেল না জানোয়ারটা। তাকিয়েই রইল নির্বিকারভাবে। যেন দৃষ্টি দিয়ে জাদুকরের মত সম্মোহন করতে চাইছে ওকে। খুঁজেপেতে একটা লাঠি নিয়ে এল সুমন। জাফরির

BanglaBook.org

ফোকর দিয়ে খোঁচা দিল শেয়ালটার মাথায়। নিপুণভাবে আঘাত এড়াল শেয়ালটা, পরমুহূর্তে লাঠিটা কামড়ে ধরে ঝটকা মেরে ছিনিয়ে নিল সুমনের হাত থেকে। তারপর চাপা রাগ দেখিয়ে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

মাথায় জেদ চেপে গেল সুমনের। সামান্য একটা শেয়ালের এতদূর স্পর্ধা— একের পর এক সবাইকে ভয় দেখিয়ে বেড়াচ্ছে! শয়তানটাকে শিক্ষা না দিয়ে ছাড়বে না ও। অকস্মাৎ একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সুমন। আজ রাতে মন্দিরে যাবে ও। দেখবে তান্ত্রিকের জেগে ওঠা। একটা প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাসকে গুঁড়িয়ে দেয়ার এই হচ্ছে সুবর্ণ সুযোগ।

খোলা জানালাটা বন্ধ করে দিল সুমন। হাতঘড়িতে সময় দেখে নিল। এগারোটা চল্লিশ। ওয়্যারড্রোবের ড্রয়ার থেকে বড় টর্চ আর রিভলভারটা বের করল ও। বিছানায় গভীর ঘুমে অচেতন লিনা। আপাতত ভয় আর দুশ্চিন্তা থেকে সে মুক্ত। সদর দরজা লক করে বেরিয়ে এল ও।

আকাশের অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। একটা তারাও চোখে পড়ছে না। সারা আকাশ ছেয়ে গেছে কালো মেঘে। ঘন ঘন বিজলী চমকাচ্ছে। একটুও বাতাস নেই। চারদিক থমথমে।

মাঠে দাঁড়িয়ে মুহূর্ত কয়েক সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগল সুমন। রাত করে বনে যাওয়াটা কি ঠিক হবে? তার ওপর পাথর কয়লার মত মসৃণ অন্ধকার আজ, আকাশে মেঘের ঘনঘটা। শেষমেশ ভ্রান্ত বিশ্বাস ভাঙার দুর্নিবার ইচ্ছে টেনে নিয়ে চলল ওকে।

বনের গাছগুলোকে অদ্ভুত লাগছে আজ। পাতাগুলো সব ছবির মত স্থির। যেন অনাহূত কারও ভয়ে সিঁটিয়ে আছে সারাটা বন। লতাপাতায় ঢাকা পাথুরে রাস্তায় সপ্ সপ্ করে পা পড়ছে সুমনের। নিজের পদশব্দ নিজের কাছেই কেমন বেমানান লাগছে।

মন্দিরের কাছাকাছি এসে ভয় অনেকটা কমে গেল সুমনের। এ পর্যন্ত অস্বাভাবিক বা ভীতিজনক কোন কিছুই নজরে পড়েনি। এমনকি একটা শেয়ালও না। উঠনের সরু পথ ধরে পোর্টিকোয় উঠে এল ও। টর্চ বাঁ হাতে আর রিভলভারটা ডান হাতে। খেপা শেয়ালটা আজও বেদীর আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারে।

সকালে বাঁ দিকের দরজা দিয়ে ঢুকেছিল সুমন, বাকি দুটো ছিল বন্ধ। এখন দেখা যাচ্ছে মাঝখানেরটা হাট করে খোলা, অন্য দুটো বন্ধ। তবে কি আর কেউ এসেছিল এখানে?

চকিতে একটা সন্দেহ উঁকি দিল মনে। কোন দুষ্কৃতকারীদলের গোপন আড্ডাখানা হতে পারে এই মন্দির। হয়তো ওরাই কৌশলে গুজব ছড়িয়ে গ্রামবাসীদের মনে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে, আর এই সুযোগে মন্দিরটাকে বানিয়েছে নিজেদের মন্ত্রণাকক্ষ। উঠনের সরু পথটা হয়তো ওদেরই তৈরি।

মিনিট তিনেক পর সন্দেহটা দূর হয়ে গেল সুমনের। শ্যামলপুরে চোরডাকাতের উপদ্রব নেই। থাকলে মরিয়ম বানু নিশ্চয়ই বলত। তাছাড়া

BanglaBook.org

মন্দিরভীতি তো সাম্প্রতিক কোন ঘটনা নয়, যুগ যুগ ধরে চলছে।

আর দ্বিধা-দ্বন্দ্ব না করে ভেতরে ঢুকে পড়ল সুমন। প্রথমে মেঝে আর দেয়ালগুলোতে আলো ফেলল। সকালের মতই সব স্বাভাবিক। এবার মূর্তিটার ওপর টর্চ ধরল। পরমুহূর্তে বিচ্ছিরি একটা ঝাঁকুনি খেলো ও। হাত থেকে টর্চটা পড়ে গড়িয়ে গেল একদিকে। বাল্ব গুঁড়িয়ে নিভে গেছে আলো।

ভয় যেন আকণ্ঠ গিলে খেতে চাইছে সুমনকে। বেদীর ওপর মূর্তিটা নেই। আপাদমস্তক উধাও। সত্যিই তাহলে জেগে উঠেছে তান্ত্রিক? ভাবনাটা যেন বিষাক্ত কাঁটা ফোটাল সুমনের বোধশক্তিতে। অবশ হয়ে আসছে ওর শরীর। কপাল আর হাতের তালুতে ঘাম জমছে বিন্দু বিন্দু। এখুনি দুটো কঠিন হাত শক্ত করে চেপে ধরবে ওকে। তীক্ষ্ণ দাঁত শরীর ফুটো করে শুঁষে নেবে সব রক্ত। রক্তশূন্য দেহটা ছুঁড়ে দেয়া হবে এক ঝাঁক শেয়ালের মাঝে। তারপর···আর ভাবতে পারছে না সুমন।

রিভলভারের ব্যারেল মাথায় ঠেকাল ও। তান্ত্রিকের হাতে পড়বার আগেই নিজেকে শেষ করে দেবে। মনে মনে গুনতে শুরু করল সুমন—এক, দুই, তিন···আট, নয়, দশ! আশ্চর্য, আসছে না কেন তান্ত্রিক? তবে কি এখানে পৌঁছুবার আগেই বেরিয়ে গেছে সে?

দেয়াল হাতড়ে হাতড়ে দরজার দিকে এগোল সুমন। বিজলীর ঘন ঘন চমক দরজা চিনে নিতে সাহায্য করল ওকে। রিভলভারটা সামনে বাগিয়ে ধরে উঠনের সরু পথ ধরে এগোল ও।

আকাশ এখন আর শান্ত নেই। থেকে থেকে গর্জন করে উঠছে। গাছের পাতাগুলোতে কানাকানি করছে বাতাস। যেন সারা বনটাই তটস্থ হয়ে উঠেছে কারও ভয়ে।

বন শেষ হতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল সুমন। সামনের বড় মাঠটা পেরোলেই বাড়ি। বোঝার মত ভারি লাগছে শরীর। শরীরের প্রতিটা ইঞ্চিতে ক্লান্তি।

মাঠের মাঝামাঝি এসে থমকে দাঁড়াল সুমন। অনেকগুলো জ্বলজ্বলে চোখ বিজলীর আলোতে বার বার ঝিলিক দিয়ে উঠছে। এক ঝাঁক কালো অবয়ব এগিয়ে আসছে চক্রাকারে। কি ওগুলো?

রাতের অশান্ত বাতাস কাঁপিয়ে হাঁক ছাড়ল জীবগুলো। শেয়ালের হাঁক যে এত ভয়ঙ্কর হতে পারে এই প্রথম জানল সুমন। রক্তের অণু-পরমাণুতে কাঁপন ধরিয়ে একেবারে মর্মমূলে গিয়ে পৌঁচেছে এই হাঁক।

অনেকটা কাছে চলে এসেছে শেয়ালগুলো। বিজলীর প্রতিটা চমকের সাথে ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে ওদের চেহারা। তীক্ষ্ণ দাঁতের ফাঁকে দেখা যাচ্ছে লালায় ভেজা টুকটুকে জিভ। একটা রিভলভার এতগুলো শেয়ালের জন্যে কিছুই নয়।

আতঙ্কে চোখ বুজে এল সুমনের। কি ঘটবে বা ঘটতে যাচ্ছে এ নিয়ে ভাবছে না ও। বিধাতার অভিন্ন সত্তার মত প্রচণ্ড একটা বিশ্বাস ওর সমস্ত সত্তাকে ছিন্নভিন্ন করে হৃদয় ফুঁড়ে জেগে উঠেছে। শক্ত করে বুকের কবচটা ডান হাতে চেপে ধরল ও। বিড়বিড় করে আবেগ মথিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'হে আল্লাহ, আমাকে রক্ষা

করো!'

'আরে, সুমন সাহেব, আপনি এখানে কি করছেন?'

চোখ মেলল সুমন। ডাক্তার মুস্তাফিজ ওর সামনে দাঁড়িয়ে। শেয়ালগুলো ভোজবাজির মত উধাও। তবে কি ভুল দেখেছে ও। কিন্তু শেয়ালগুলোর মিলিত হাঁক যে এখনও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ওর কানে।

'এই দুর্যোগের রাতে মাঠে একাকী দাঁড়িয়ে আছেন কেন?' আবার শুধোলেন ডাক্তার। 'একটা সিরিয়াস রোগী দেখতে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে ভাবলাম আপনার বাড়িতে একটা ঢুঁ মেরে যাই। কিন্তু ডাকাডাকি করে কোন সাড়া পেলাম না। দরজায় তালা দেখে ভাবলাম তান্ত্রিকের ভয়ে পালিয়েছেন দু'জনে।'

ডাক্তারের কথাগুলো কানে গেল না সুমনের। ও এখন নিজের কথা বলার জন্যে উদগ্রীব। লম্বা করে দম নিয়ে বলল, 'সেই মন্দিরে গিয়েছিলাম। জানেন, মূর্তিটা নেই। সকালে দিব্যি ছিল।'

'কি যা তা বলছেন!'

'যা তা নয়, নিজ চোখে স্পষ্ট দেখেছি।'

'আপনার হাতে তো কোন টর্চ বা ল্যাম্প নেই। অন্ধকারে দেখলেন কিভাবে?'

'টর্চ নিয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেল।'

'টর্চটা কতক্ষণ ধরেছিলেন মূর্তিটার ওপর?'

'মুহূর্ত কয়েকের জন্যে।'

'বুঝেছি। যা দেখেছেন সব ভুল। আপনার বিক্ষিপ্ত মন ভুল দেখিয়েছে আপনাকে। চলুন, আরেকবার দেখে আসি।'

'আপনি একটু দাঁড়ান, আমি বাসা থেকে এখুনি একটা ল্যাম্প নিয়ে আসছি।'

তালা খুলে ভেতরে ঢুকল সুমন। অমনি ছুটে এসে ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল লিনা। পাগলের মত চিৎকার করে বলল, 'দরজাটা বন্ধ করো, শিগগির বন্ধ করো।'

সুমন দরজা বন্ধ করল। লিনা এখনও কাঁপছে। চোখ দুটো অশ্রুতে টলমল।

'হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল,' বলল লিনা। 'শুনি, কে যেন ডাকছে তোমার নাম ধরে। তোমাকে বিছানায় না দেখে এঘর-সেঘর খুঁজলাম। দেখি কোথাও নেই তুমি। যা ভয় পেয়েছিলাম!'

'ভয় পাবার কিছু নেই। আমি একটু বাইরে গিয়েছিলাম। আর ডাকাডাকি করেছেন ডাক্তার। তাড়াতাড়ি একটা ল্যাম্প এনে দাও তো। এক্ষুণি আবার বেরোতে হবে। মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন ডাক্তার।'

'কোথায় যাবে?'

'ফিরে এসে সব বলব।'

ল্যাম্প আনতে গিয়ে আবার ফিরে এল লিনা। 'আচ্ছা, ডাক্তার সাহেব না সকালে ওষুধ আনতে শহরে গেলেন! বললেন আজ শহরেই থাকবেন—আরও কি একটা কাজ আছে তার।'

'হয়তো কাজটা হয়ে গেছে। এজন্যেই ফিরে এসেছেন।'

BanglaBook.org

'আরেকটা কথা। এতরাতে রোগী দেখতে বেরিয়ে তিনি সাথে টর্চ আনলেন না কেন?'

মরিয়ম বানুর ওপর আবার রাগ হলো সুমনের। সরলমতি মেয়েটার মনে ভয় আর সন্দেহের বীজ বুনে দিয়েছে সে। ডাক্তারকে নির্ঘাত ভূত-প্রেত ঠাওরেছে লিনা।

'ডাক্তার আত্মভোলা মানুষ, হয়তো টর্চ আনতে ভুলে গেছেন।' সুমন নিজেই ভেতর থেকে একটা ল্যাম্প নিয়ে এল।

'এই দুর্যোগের রাতে বাইরে না গেলেই কি নয়?' লিনার কণ্ঠে মিনতি ফুটে উঠল।

'বাধা দিয়ো না, লক্ষ্মীটি! শুধু যাব আর আসব।' দরজা খুলে বেরিয়ে এল সুমন। লিনা ওর পিছু পিছু এগোল।

'যেয়ো না, কথা শোনো, সুমন!'

সুমন ইতিমধ্যে বারান্দা পেরিয়ে উঠনে নেমেছে।

'ঘরে গিয়ে দরজা লাগাও, লিনা,' এগোতে এগোতে চেঁচাল ও।

এদিকে ভয়ে লিনার প্রাণ ওষ্ঠাগত। যে করেই হোক সুমনকে ফেরাবে ও। দরকার হলে পায়ে পড়বে। দৌড়তে শুরু করল লিনা। অন্ধকার সিঁড়িতে পা পিছলে পড়ে গেল ও। ব্যথায় ককিয়ে উঠল। সুমন ততক্ষণে অনেকদূর চলে এসেছে। লিনার আর্তস্বর কানে পৌঁছুল না ওর।

ল্যাম্প হাতে সুমন আগে আগে এগোচ্ছে, পেছনে ডাক্তার। উত্তেজনায় দু'জনেই টান টান, কথা নেই কারও মুখে।

বাতাসের বেগ আরও বেড়েছে। সারা বন জুড়ে ফিসফিস শব্দ। যেন অশরীরী জীবেরা নিজেদের ভেতর গোপন পরামর্শে লিপ্ত। ভেতরে ভেতরে শঙ্কা হচ্ছে সুমনের, এই বুঝি এক ঝাঁক শেয়াল এসে পথ আগলে দাঁড়ায়। কিন্তু মন্দিরে পৌঁছা অবধি সেরকম কিছুই ঘটল না। শেয়ালের ব্যাপারটা ইচ্ছে করেই ডাক্তারের কাছে চেপে গেছে সুমন। জানে, সব শুনে ডাক্তার কৌতুকের হাসি দিয়ে ব্যাপারটা উড়িয়ে দেবেন। বলবেন, 'ওটাও ভুল দেখেছেন। প্রচণ্ড ভীতি থেকে হ্যালুসিনেশন হয়েছিল।'

পোর্টিকোতে পা রাখতেই কি একটা লতা পায়ে জড়িয়ে গেল সুমনের।

'ল্যাম্পটা একটু ধরুন তো, পায়ে লতা জড়িয়ে গেছে।' বলে পেছন ফিরল সুমন। কিন্তু ডাক্তার উধাও। গেলেন কোথায় তিনি? উচ্চস্বরে তাঁর নাম ধরে ডাকল সুমন। নিশুতি রাতকে চমকে দিয়ে বন জুড়ে তোলপাড় করে বেড়াল প্রতিধ্বনি। কিন্তু ডাক্তারের কোন সাড়া নেই। তাহলে কি ভয়ে সটকে পড়েছেন তিনি? নাকি তান্ত্রিক তাঁকে ধরে নিয়ে গেছে?

এত কিছু ভাববার সময় নেই সুমনের। লিনা বেচারি ওদিকে একা পড়ে আছে। নিজেকে ভর্ৎসনা করল সুমন—ছি ছি, এতটা ভয় পেয়েছিল ও!

ডাক্তারের পলায়ন সম্পর্কে নিশ্চিত হলো সুমন। বুড়োকে কাল ধরবে ও। এত সাহস দেখিয়ে শেষমেশ গর্তে সেঁধুনো খরগোশ! খুব মজা করা যাবে।

BanglaBook.org

বন থেকে দ্রুত বেরিয়ে এল সুমন। লিনার জন্যে ভেতরটা অস্থির হয়ে উঠেছে ওর। জেদ করে বেরিয়ে আসার জন্যে কিছুটা অনুশোচনাও হচ্ছে। নিশ্চয়ই মনে খুব আঘাত পেয়েছে ও। কিন্তু ওভাবে বেরিয়ে না এলে তো যুগ যুগ ধরে প্রতিষ্ঠিত ওই অলীক মিথটাকে গুঁড়িয়ে দেয়া যেত না।

সিঁড়ির কাছাকাছি লিনার চপ্পল পড়ে আছে—ল্যাম্পের আলোয় দেখল সুমন। চপ্পল তুলতে গিয়ে কবচটা চোখে পড়ল। সুতো ছিঁড়ে গেছে কবচের। চপ্পল, কবচ এখানে এভাবে পড়ে আছে কেন—বুকটা ধক করে উঠল ওর। দৌড়ে ভেতরে ঢুকল। সব ক'টা ঘর খুঁজে দেখল। কোথাও নেই লিনা।

বাইরে খুঁজতে যাবে, এমন সময় ঝড় শুরু হয়ে গেল। বৃষ্টি নামল মুষলধারে। বাতাসের মুহুর্মুহু জোরাল ঝাপ্টায় দরজা-জানালা উড়ে যাবার জোগাড়। অনেকদিন এমন ঝড় হয়নি শ্যামলপুরে।

রাতের শেষবিন্দু পর্যন্ত একটানা চলল ঝড়বৃষ্টি। যখন দিনের আলো ফুটল প্রকৃতি তখন শান্ত-সমাহিত। শ্যামলপুরের লোকজন একে একে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। তারা দেখল লেকের ধারে ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে আছে একটা মানুষ। রাতে শেয়ালেরা ভোজের উৎসবে মেতেছিল তাকে নিয়ে।

ডাক্তার মুস্তাফিজ এই মর্মন্তুদ ঘটনার কথা জানতে পারলেন না। কারণ তিনি এখনও শহর থেকে ফেরেননি।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

কেবিন নাম্বার ৩০৫

প্রথম প্রকাশঃ ২০১৫

শিগব

এক

প্রায় এক ঘণ্টা মেয়েদের হলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা খুব সুখকর কিছু নয়। তবু স্বপনকে পঞ্চান্ন মিনিট শামসুন্নাহার হলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হলো। পঞ্চান্ন মিনিটে স্বপন সতেরো বার ঘড়ি দেখল। সময় যেন কাটতে চায় না। ঘড়ির কাঁটা যত এগোতে থাকে স্বপনের মেজাজ তত নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে থাকে। স্বপন দাঁড়িয়ে আছে তিশার সাথে দেখা করার জন্য।

তিশা এমনিতে খুব গোছানো একটা মেয়ে। তবে একটুও সময় মেনে কোনও কাজ করতে পারে না। স্বপন অনেক চেষ্টা করেও তিশার এই অভ্যাস পরিবর্তন করতে পারেনি।

তিশা হল থেকে বেরুতেই স্বপনের রাগটা লাগামছাড়া হয়ে যায়। স্বপন রেগে গেলে তিশা সাধারণত মিষ্টি একটা হাসি দেয়। তারপর বারবার সরি বলতে থাকে। তাতেই রাগ কমে যায় স্বপনের। এত মিষ্টি মেয়ের উপর রাগ করে থাকা যায় না। কিন্তু আজ স্বপনের প্রচণ্ড রাগ দেখেও তিশা চুপচাপ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। স্বপন যতই কথা বলতে থাকে তিশার মাথা ততই নিচু হতে থাকে। এক সময় স্বপন লক্ষ করল তিশার চোখে পানি। খুব সাবধানে চোখের পানি মুছল তিশা। দৃশ্যটা দেখে বুকটা হাহাকার করে উঠল স্বপনের। তিশাকে এতটা বলা উচিত হয়নি!

স্বপন বলল, 'সরি, তিশা। তোমার চোখে পানি কেন? বোকা মেয়ে! চলো টি.এস.সি.-তে বসি।' তিশার দিকে ভালভাবে তাকিয়ে স্বপন চমকে উঠল। তিশার গলায় বড়সড় একটা ক্ষতচিহ্ন। কপালেও কাটা দাগ। কেন জানি তিশাকে বিপর্যস্ত মানুষ বলে মনে হচ্ছে। চোখে মুখেও কেমন একটা আতংকের ছাপ। স্বপন উদ্বিগ্ন গলায় বলল, 'তিশা, কী হয়েছে তোমার? গলায় কেটেছে কীভাবে?' তিশা জবাব দিল না। স্বপন আবারও তিশার চোখে পানি দেখল। তিশার হাত দুটো শক্ত করে ধরে বলল ও, 'প্লিজ, বলো, কী হয়েছে?'

তিশা ফিসফিস করে বলল, 'কাল রাতে ও এসেছিল।'

'কে?!!'

'সেই শয়তানটা।'

'তিশা, আমি তোমাকে বারবার বলেছি এসব তোমার কল্পনা।'

Banglapdf.com

'না, স্বপন, না। গত রাতে ও আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল।' তিশা জোরে কেঁদে উঠল।

স্বপন তিশাকে শক্ত করে ধরে বলল, 'প্লিজ, তিশা, শান্ত হও। আমাকে বলো কাল রাতে তোমার কী হয়েছিল।'

বেশ কিছুক্ষণ পর তিশা শান্ত হলো। তিশা বলতে শুরু করল, 'কাল রাতে রুমে আমি একা ছিলাম। নীলার বাসা থেকে খবর আসায় ও বরিশাল চলে গেছে। একা থাকতে আমার ভাল লাগে না। এজন্য সোহানার রুমে চলে যাই। রাত একটা পর্যন্ত দুজনে গল্প করি। এরপর আমি আমার রুমে চলে আসি। রুমে ঢুকতেই আমার কেমন যেন অন্যরকম লাগতে থাকে। গায়ে কাঁটা বিঁধতে থাকে। আমি বুঝতে পারি আজ ওই শয়তানটার সাথে আমার দেখা হবে। আমি লাইট জ্বেলে শুয়ে পড়লাম। সারাদিন বেশ ব্যস্ত ছিলাম। তাই অনেক টেনশনের মধ্যেও ঘুম এসে গেল। কতক্ষণ পরে হয়েছে জানি না, হঠাৎ মনে হলো আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে আমার বুকের উপর পাথর চাপা দেয়া। আমি চোখ মেলে দেখলাম বদমাশটা আমার বুকের উপর বসা। এক হাত দিয়ে আমার গলা চেপে ধরে আছে। হাত ভর্তি লোম। মুখটা কালো কাপড়ে ঢাকা। শরীর হিম শীতল। সে বলল, "চল, আমার সাথে চল।" আমি নিজেকে ছাড়াতে চাইলাম। অসহ্য যন্ত্রণা হতে লাগল। তখন ওই শয়তানটা আমার গলায় এবং কপালে আঘাত করে। রক্ত ছিটকে যায়। শয়তানটা ঠোঁট দিয়ে রক্তটুকু চুষে নেয়। আমি প্রচণ্ড গোঙাতে থাকি। চিৎকারও করেছিলাম বোধহয়। পাশের রুম থেকে বিপাশা ছুটে আসে। শয়তানটা হঠাৎ করেই যেন কোথায় মিলিয়ে গেল। বিপাশা সারারাত আমার রুমে বসে থাকল।'

তিশা আর কিছু বলতে পারছে না। প্রচণ্ড ক্লান্তি যেন ওকে ঘিরে ধরেছে। স্বপন তিশাকে বলল, 'এসব চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেল, প্লিজ। এসব তোমার মনের কল্পনা। তুমি নিজেই নিজেকে আঘাত করেছ। তুমি বড় কোনও মানসিক অসুখে ভুগছ।'

কথাগুলো শুনে প্রচণ্ড রেগে গেল তিশা। বলল, 'তুমি যখন আমাকে বিশ্বাস করো না, আমি তোমার সাথে আর কথা বলতে চাই না।' তিশা উঠে দাঁড়াল। হাঁটতে শুরু করল।

স্বপনও তিশাকে থামাতে দ্রুত ওর পিছনে হাঁটতে লাগল। হঠাৎ তিশা দাঁড়িয়ে পড়ল। চোখ বড় বড় হয়ে গেল ওর। চিৎকার করে উঠল, 'স্বপন, ওই যে, ওই যে বদমাশটা।' তিশা আঙুল দিয়ে দূরের একটা লোককে দেখাল।

স্বপন দৌড়াতে শুরু করল, কিন্তু লোকটার চেহারা দেখা যাচ্ছে না। কালো কাপড় দিয়ে মাথা ঢাকা। স্বপনের দৌড় দেখে লোকটাও দ্রুত হাঁটতে লাগল। হঠাৎ স্বপনের চোখের সামনেই লোকটা মানুষের মধ্যে মিশে গেল। অনেকটা অদৃশ্যই হয়ে গেল। স্বপন আবার তিশার কাছে ফিরে এল। তিশা স্বপনকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'প্লিজ, স্বপন, আমাকে বাঁচাও। শয়তানটা আমাকে মেরে ফেলবে।'

স্বপনের বুকটা ভেঙে চলেছে। কী করা উচিত বুঝতে পারছে না। তিশার

কানে ফিসফিস করে বলে উঠল, 'কেউ তোমার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না, আমি বেঁচে থাকতে না।'

দুই

স্বপনের একটা চাকরি খুব দরকার। গত বছর অর্থনীতিতে মাস্টার্স কমপ্লিট করেছে স্বপন। এখন একটা চাকরি হলেই তিশাকে ঘরে তুলে নিতে পারে। দুই পরিবারই সম্মত। শুধু স্বপনের চাকরির অপেক্ষা। প্রতিদিনই কোনও না কোনও জায়গায় সিভি ড্রপ করছে স্বপন। সপ্তাহে দু'একটা ইন্টারভিউও দিচ্ছে, কিন্তু সোনার হরিণ চাকরি মিলছে না। এসব নিয়ে মনটা বেশ খারাপ থাকে স্বপনের। তার উপর তিশার এই ভয়াবহ সমস্যায় নিজেকে আরও বেশি অসহায় লাগে। কী করবে ভাবতে ভাবতে হঠাৎই আনোয়ারের কথা মনে পড়ে। আনোয়ারও ঢাবি থেকে অর্থনীতিতে মাস্টার্স করেছে। তবে স্বপনের মত চাকরি খোঁজার সময় তার নেই। তার জীবনটা পুরো অন্যরকম। অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় আনোয়ার রহস্যের পিছে ছুটে ছুটে জীবনটা কাটিয়ে দিচ্ছে। ইউনিভার্সিটিতে পড়াকালীন সময়ে সে প্রায়ই দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ঘুরে বেড়াত। যেখানেই রহস্যের সন্ধান পেত সেখানেই ছুটে যেত। আনোয়ারের বাবার অর্থকড়ির অভাব নেই। তাই তার অ্যাডভেঞ্চার কখনোই বাধাগ্রস্ত হয়নি।

আনোয়ারকে বাসায় পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার এটা স্বপন জানে। তবু ওকে ফোন না করেই ওদের বাসায় গেল স্বপন। আনোয়ারদের বিশাল তিনতলা বাড়ি। আনোয়ার অবশ্য বেশিরভাগ সময়ই ছাদের চিলেকোঠায় থাকে। স্বপন তাই সরাসরি ছাদে চলে গেল। আনোয়ার রুমে বসে আয়েশ করে সিগারেট টানছে। স্বপনকে দেখে ওর মুখ হাসিহাসি হয়ে গেল।

'স্বপন, দোস্ত। কেমন আছিস?' হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল আনোয়ার।

'এই আছি ভালই।'

'তোর তো ভাল থাকারই কথা। তিশার মত মেয়ের সাথে প্রেম করিস। ভাবাই যায় না! অসাধারণ মেয়ে। আমার কপালটাই খারাপ। প্রেম হলো না।'

'তুই তো প্রেম করিস রহস্যের সঙ্গে, অ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গে।'

'হা হা হা। ভাল বলেছিস।'

'তা এখন তুই কী নিয়ে আছিস?'

'মাগুরায় একটা অনেক পুরোনো জমিদার বাড়ির সন্ধান পেয়েছি। ওখানে যাওয়ার ধান্ধায় আছি।'

একটু থেমে আনোয়ার বলল, 'দোস্ত, তা তুই কী মনে করে? এই অধমের কাছে তো কেউ সমস্যায় না পড়লে আসে না।'

'হ্যাঁ, দোস্ত। আসলেই একটু সমস্যায় আছি। তোকে কীভাবে বলব ঠিক

BanglaBook.org

বুঝতে পারছি না।'

'ধীরে সুস্থে বল। আমার কোনও তাড়া নেই। সিগারেট খাবি?'

'খাব।' স্বপন সিগারেট নিয়ে ধরিয়ে নিল।

'দোস্ত, সমস্যাটা তিশাকে নিয়ে। ও আমাকে যা বলে তা আমি বিশ্বাসও করতে পারি না, আবার ফেলতেও পারি না।'

'কী সমস্যা?? ঝেড়ে কেশে ফেল।'

'তিশা মাঝে মাঝে একটা মানুষকে দেখতে পায়। কালো কাপড় পরা। মানুষটা তিশাকে কোথায় যেন নিয়ে যেতে চায়। তিশা ইউনিভার্সিটিতে ফার্স্ট ইয়ারে পড়া অবস্থায় প্রথম লোকটা আসে। প্রথম প্রথম তিশা বিষয়টা স্বপ্ন বলে উড়িয়ে দিত। কিন্তু প্রায় প্রতি পূর্ণিমা অমাবস্যার রাতে লোকটা তিশার কাছে আসতে থাকে। অনেক সময় দূর থেকে তিশাকে লক্ষ করে। সেদিন তিশাকে আঘাত করেছে শয়তানটা।'

'লোকটা কি তিশাকে কখনও কিছু বলেছে?'

'লোকটা কথা বলে অল্প। প্রায় দিনই বলে, "আমার সাথে চল। আমি মরিনি। মরিনি। কবরে যাব না। যাব না। তুই যাবি।" আর একদিন বলেছে, "আমার নাম আসগর। এসেছি। এসেছি। তুই চল। চল।"'

আনোয়ার চিন্তিত মুখে বলে, 'তার মানে লোকটা বলতে চায় সে মরেনি। সে কবরে যেতে চায় না। তিশাকে নিয়ে যেতে চায়।' হঠাৎই আনোয়ার চমকে স্বপনের দিকে তাকায়।

'স্বপন, তিশার খুব বিপদ। খুব বড় বিপদ।'

'মানে?'

'এমন ঘটনার সাথে আমি অনেক আগে থেকেই পরিচিত। তোকে বিষয়টা বলছি, মন দিয়ে শোন। ঘটনাটা আজ থেকে পাঁচ/ছয় বছর আগের। ইউনিভার্সিটিতে সবে মাত্র ভর্তি হয়েছি। হঠাৎ জানতে পারলাম যশোর সীমান্তবর্তী একটা গ্রামে একজন মৃত মানুষ ফিরে এসেছে। দুজনকে নাকি মেরেও ফেলেছে। বেশ নির্ভরযোগ্য সূত্রে সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে আমি রওনা দিই। সাথে ছিল আমার এক চাচাতো ভাই রাকিব। গ্রামে গিয়ে ভয়াবহ এক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হলাম। গ্রামের সবার মধ্যেই আতংক। সন্ধ্যার পর কেউ ঘর থেকে বের হয় না। মৃত ওই মানুষটার নাম সেলিম। বেঁচে থাকতেও নানাভাবে মানুষকে যন্ত্রণা দিত লোকটি। লোকমুখে জানতে পারলাম বেঁচে থাকতে সেলিম তার দুই বউকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল। গ্রামের মানুষের ভাষ্য অনুযায়ী সেলিম বদমাশ ফিরে এসেছে। মৃত মানুষ অনেক বছর পর ফিরে এলে তাদের বলা হয় জোম্বি। তবে এখানে পরিস্থিতি অন্যরকম। এই সেলিম জোম্বি নয়। তার থেকেও ভয়ংকর। প্রায় প্রতি পূর্ণিমা অমাবস্যার রাতে সেলিম বের হয়। বের হওয়ার পর তার চেষ্টা থাকে মানুষকে ধরে নিয়ে জীবন্ত কবর দেয়ার। সেলিম সবচেয়ে বেশি আক্রমণ করেছে গ্রামের লীনা নামের এক তরুণীকে। প্রায়ই লীনার ঘরে আসে সেলিম। ওর সাথে যেতে বলে। পাশের গ্রামের এক তান্ত্রিকের সাথে আমার কথা

BanglaBook.org

হলো। সে আমাকে জানাল, "এটা এক ধরনের অপদেবতা। এদের নাম শিগব। এই অপদেবতারা কবর থেকে মুক্তি চায়। এজন্য কোনও বিশেষ তরুণীর দিকে এরা হাত বাড়ায়। ওই তরুণীকে জীবন্ত কবর দিতে পারলেই শিগবের মুক্তি ঘটবে। তখন এটি হবে আরও শক্তিশালী। আরও ভয়ানক। এদের মারার একটা পদ্ধতি আছে। প্রথমে শিগবটার কবর দুই-তৃতীয়াংশ খুঁড়তে হবে। তারপর কিছু কাঠ রাখতে হবে। এরপর কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বালতে হবে।" আমি বেশ বুঝতে পারলাম কবরটাই শিগবের শক্তি। তাই বারবার বেরিয়েও কবরেই ফিরে আসতে হয়। তাই কবরটায় তান্ত্রিকের কথা অনুযায়ী আগুন দিতে হবে। পরের ঘটনা সংক্ষেপে বলি। কোনও এক পূর্ণিমার রাতে গ্রামের কিছু সাহসী মানুষকে নিয়ে আমি সেলিমের কবরের কাছে যাই। সাথে নিই কাঠ, কেরোসিন, কোদাল, শাবল আর সবার হাতেই ছিল ছোটখাট অস্ত্র। আমরা কাছে গিয়ে দেখি একটা লোক কালো কাপড় পরে বসে আছে। আমরা কাছে যেতেই লোকটা কীভাবে যেন কবরের ভিতরে ঢুকে গেল। তখন আমরা দ্রুত কবর খুঁড়তে লাগলাম। শিগবটা বাধা দিতে লাগল নানাভাবে। আমরা সংখ্যায় ছিলাম অনেক। তবু বেশ কয়েকজন আহত হলো। কবর অনেকখানি খুঁড়ে আমরা কাঠ, কেরোসিন দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিই। হঠাৎই কবরটা যেন কেঁপে ওঠে। কেউ একজন চিৎকার করতে থাকে। মাংস পোড়া গন্ধে চারদিক ভরে যায়। সেলিম বদমাশটা এভাবেই ধ্বংস হয়।'

'আনোয়ার, অবিশ্বাস্য! ভয়ানক!'

'একটা ব্যাপার হচ্ছে শিগবদের বিশেষ এক প্রকার তরুণীর প্রতি আকর্ষণ থাকে। এদের ধারণা ওই তরুণীকে জীবন্ত কবর দিলেই তারা মুক্তি পাবে। তিশাও হয়তো সেই বিশেষ তরুণী। আসগর নামের শিগবটাও হয়তো তিশার মাধ্যমে মুক্তি পেতে চায়।'

'কিন্তু এ যুগে বসে এসব বিশ্বাস করি কীভাবে!...'

'এই তোর এক সমস্যা।'

'সরি, দোস্ত। আমি বিশ্বাস করছি। তুই তিশাকে বাঁচা।'

'শোন, তিশাকে বলবি সাহস নিয়ে শিগবটার সাথে কথা বলতে। শিগবটার কবর কোথায় তা জানা প্রয়োজন।'

'আচ্ছা, আনোয়ার, তুই যে বললি বিশেষ এক ধরনের তরুণী। এই বিশেষ তরুণীর বৈশিষ্ট্য কী?'

'এটা আমি জানি না। কোটি কোটি মানুষ থেকে এরা একজন তরুণী বা কিশোরী বেছে নেয়। কীভাবে বেছে নেয় তা আমি জানি না। স্বপন, আজ থেকে তুই খুব সাবধানে থাকবি।'

'কেন?'

'তুই তিশাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিস। তার মানে তুইও শিগবটার শত্রু হয়ে গেছিস। শিগবটা তোর কাছেও আসতে পারে।'

'কী বলছিস? সত্যি!'

'হ্যাঁ।'

BanglaBook.org

‘তোর কোনও বিপদ হতে পারে না?’

‘আরে ধূর। আমি মানসিকভাবে খুবই শক্তিশালী। আর আমার শ’খানেক মন্ত্র মুখস্থ। আমার হাতে কতরকম তাবিজ দেখেছিস? শিগবটা আমার কাছে আসতে সাহস পাবে না।’

‘আনোয়ার, আমার খুব টেনশন হচ্ছে। খুব ভয় লাগছে।’

‘ভয় পাওয়া কোনও কাজের কথা না। মনে সাহস রাখ। এখন থেকে কালো কোনও কাপড় পরবি না। পূর্ণিমা, অমাবস্যার রাতে বাসা থেকে বের হবি না। আয়নায় মুখ দেখবি না। সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবি।’

স্বপন মাথা নিচু করে থাকে। কথাগুলো ঠিক মাথায় ঢুকতে চায় না। এমন বিপদের মাঝে পড়েছে বুঝতেই পারেনি। সত্যিই যদি শিগব আসে? কী হবে তখন? চিন্তা করার শক্তি যেন হারিয়ে যায় স্বপনের।

‘আচ্ছা, আনোয়ার, শিগব-সম্পর্কে আর কিছু জানিস?’

‘হুঁ। ইন্টারনেটেও এদের সম্পর্কে অনেক তথ্য পেয়েছি। শিগবের গন্ধ শক্তি প্রবল। এরা কয়েক মাইল দূর থেকেও গন্ধ পায়। অর্থাৎ তোর শরীরের গন্ধ একবার শুঁকে থাকলে অনেক দূর থেকেও বুঝতে পারবে তুই কোথায় আছিস। প্রচণ্ড জোরে দৌড়াতে পারে। ক্ষুধা-তৃষ্ণা কিছু নেই। যে কোনও জিনিস ভেদ করে যেতে পারে।’

‘শিগব কি অদৃশ্য হতে পারে?’

‘না। তবে যে কোনও জিনিসের সাথে মিশে যেতে পারে। অনেকটা অক্টোপাসের মত রং বদলায়। কোনও জিনিসের সাথে মিশে গেলে তুই কোনওভাবে একে আলাদা করতে পারবি না। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে অনেক সময় এরা যানবাহনের সাহায্য নেয়।’

‘তার মানে সেদিন তিশাদের হলে শিগবটা রং বদলে ঢুকেছিল।’

‘হ্যাঁ। হতে পারে।’

‘আচ্ছা, আনোয়ার, আজ যাই। মাথা কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।’

‘চিন্তা করিস না। আমি তো আছি। যে কোনও সমস্যায় ফোন করিস।’

আনোয়ারের বাসা থেকে বেরিয়ে নিজের বাসার দিকে রওনা হলো স্বপন। বাসস্ট্যাণ্ডে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অধৈর্য হয়ে উঠল। হঠাৎ ডানদিকে একটু তাকাতেই সে দেখতে পেল একটা কালো কাপড় পরা লোক দাঁড়িয়ে আছে। লোকটার মুখ দেখা যাচ্ছে না। স্বপনের বুকটা কেঁপে ওঠে। আজই কি শিগবের সাথে দেখা হয়ে যাবে? স্বপন নিজেই নিজেকে সাহস দেয়। এই দিনের আলোতে তার কী করবে বদমাশটা? কালো কাপড় পরা লোকটির দিকে এগিয়ে যায় সে। তখনই লোকটা একটা চলন্ত বাসে উঠে পড়ল। স্বপন নিচু স্বরে বলল, ‘আমি তোমাকে চ্যালেঞ্জ করছি, শিগব। তুমি আমার বা তিশার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।’

BanglaBook.org

তিন

পরদিন বিকালে তিশার সাথে দেখা করল স্বপন। তিশার চেহারায় কেমন যেন একটা অসুস্থ ভাব চলে এসেছে। হাঁটছে এলোমেলো পদক্ষেপে। দেখে মনে হচ্ছে দাঁড়াতেও যেন খুব কষ্ট হচ্ছে।

'কী হয়েছে তোমার?' জানতে চাইল স্বপন।

'মৃত্যুর প্রহর গুনছি।'

'ছিঃ! কী বলছ এসব!'

'বদমাশটা আবার এসেছিল। বলেছে আমি ওর সাথে না গেলে আমাকে আর বাঁচিয়ে রাখবে না।'

'ও তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবে, তিশা। কারণ তোমার মাধ্যমেই ও মুক্তি চায়। তোমাকে সাধারণভাবে মেরে ফেললে শয়তানটা মুক্তি পাবে না।'

'ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'আমি আনোয়ারের কাছে গিয়েছিলাম। তুমি তো জান এসব বিষয়ে আনোয়ারের আগ্রহের কথা।'

'তুমি আনোয়ার ভাইয়ের কাছে গিয়েছিলে?'

'হ্যা।' স্বপন তিশাকে সবকিছু খুলে বলল। কথাগুলো শুনে তিশা বারবার চমকে উঠল।

স্বপন বলল, 'তিশা, তুমি একদম চিন্তা করবে না। আমি তোমাকে জীবন দিয়ে হলেও রক্ষা করব। আর আনোয়ার তো আছেই। তোমাকে এখন শক্ত হতে হবে। শিগবটার সাথে কথা বলতে হবে।'

'এটা কীভাবে সম্ভব?'

'অবশ্যই সম্ভব। তুমি শিগবটার সঙ্গে কথা বলে বের করবে ওর কবরটা কোথায়।'

'আমি পারব না। আমার ভয় করে।'

'তোমাকে পারতেই হবে, তিশা। পারতেই হবে।'

স্বপনের বুকে মাথা রেখে তিশা বলল, 'আমি চেষ্টা করব, স্বপন। আমি চেষ্টা করব।'

সেদিন বিকালটা ওরা খুব ভাল কাটাল। সমস্ত দুঃস্বপ্নকে দূরে ঠেলে দেয়ার চেষ্টা করল। হলে ফেরার পথে হঠাৎ তিশা স্বপনকে ফিসফিস করে বলে উঠল, 'আমি না তোমাকে খুব ভালবাসি।'

'আমি জানি।' হাসতে হাসতে বলল স্বপন।

'এভাবে সারাজীবন আমাকে আগলে রাখবে। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে।'

BanglaBook.org

চার

তিশা তার রুমের সামনের বারান্দায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ বিপাশার সাথে দেখা হলো। বিপাশা উৎফুল্ল গলায় বলল, 'তিশা, জানিস তো আজ পূর্ণিমা। আজ সারারাত অনেক মজা করব। সাদিয়া, রূপা, সাথী, শিমু সবাই মিলে। আজ সিগারেট খাওয়ার ট্রাই করা হবে।'

বিপাশার কথা শুনে বুকের ভিতর ধক করে উঠল তিশার। 'আজ পূর্ণিমা?' তবে কি আজ শিগবটা আসবে? তিশা যদি বেশি মানুষের সাথে থাকে তবে শিগবটা নিশ্চয়ই আসবে না। বিভিন্ন চিন্তায় আচ্ছন্ন হলো তিশা। যে করে হোক শিগবের সাথে দেখা করে জানতে হবে ওর কবর কোথায়। এই প্রথম শিগবের সাথে দেখা করার ব্যাপারে এক ধরনের উত্তেজনা কাজ করছে তিশার মধ্যে। বিপাশার দিকে তাকিয়ে তিশা বলল, 'না রে, বিপাশা। আজ রাতে কোনও মজায় আমি নেই। আমার শরীরটা একটুও ভাল নেই। আমি নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে ঘুমোব।'

সন্ধ্যা হতেই নিজের রুমে চলে এল তিশা। রক্তে রক্তে শিহরণ বইছে। স্বপনকে ফোন করল তিশা।

'স্বপন, আজ না পূর্ণিমা।'

'আমি জানি, তিশা।'

'ভয় লাগছে, স্বপন।'

'কোনও ভয় নেই, তিশা।'

'যদি আমার কিছু হয়ে যায় তবে তুমি...'

'ছিঃ! বোকা মেয়ে! এসব বোলো না। তোমার কিচ্ছু হবে না। উল্টো ওই শয়তানটা মরবে।'

রাত বারোটার বেশি বাজে। তিশা তার রুমে খাটে বসে বই পড়ছে। পড়া মাথায় ঢুকছে না। কোনও একটা কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকার চেষ্টা করছে। হঠাৎ কেউ তিশার কাঁধে হাত রাখল। শীতল একটা হাত। তিশার সমস্ত শরীর কাঁপুনি দিয়ে উঠল। পিছনে ফেরার সাহস পেল না তিশা। শিগবটা সামনে এসে বসল। 'চলো...যেতে হবে...'

'কে তুমি? কে???'

'আসগর। আসগর আমি। আসগর...'

'কোথায় থাকো তুমি?'

'কেন? কেন?'

'তোমার সাথে যেতে বলছ অথচ আমাকে কিছুই বলবে না।'

BanglaBook.org

'পিরোজপুর। মঠবাড়িয়া, পাতাকাটা গ্রাম। মঠবাড়িয়া...পাতাকাটা...'

'না, না, আমি যাব না।'

শিগবটা প্রচণ্ড জোরে তিশাকে আঘাত করল। তিশার ঠোঁট কেটে রক্ত পড়তে লাগল। শিগবটা গলা চেপে ধরল। উঁচু করে ফেলল তিশাকে। যন্ত্রণায় চিৎকার করতে চাইল তিশা। কিন্তু গলা দিয়ে কোনও শব্দ বেরুল না। শিগবটা বলতে লাগল, 'মেরে ফেলব। মেরে ফেলব...চল...চল।' তিশাকে দেয়ালের উপর আছড়ে ফেলল শিগব।

প্রচণ্ড ব্যথায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলল তিশা। রাত দুটোর দিকে তিশার ঘরে আলো জ্বলতে দেখে উঁকি দিল বিপাশা। চমকে গেল ও। তিশার মাথা, শরীর রক্তাক্ত। চিৎকার শুরু করল বিপাশা। তিশাকে নিয়ে যাওয়া হলো ঢাকা মেডিকেলে।

ঠিক রাত তিনটায় স্বপনের ঘুম ভেঙে গেল। ঘরে একটা বোটকা গন্ধ। ঘরটা কেমন যেন আশ্চর্য রকম শীতল। স্বপনের কেমন যেন একটা আতংকের অনুভূতি হলো। ডিমলাইটের আবছা আলোয় স্বপন দেখতে পেল কেউ তার খাটের দিকে এগিয়ে আসছে। মূর্তির মত স্থির হয়ে গেল স্বপন। নিঃশ্বাস আটকে রেখেছে। বুঝতে পারল শিগবটা এসেছে। স্বপন কিছু বুঝে উঠার আগেই শিগবটা ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

স্বপন শক্তি খাটাতে চাইল। কিন্তু শিগবের শক্তির সাথে পেরে উঠছে না। স্বপনকে এলোপাথাড়ি আঘাত করছে শিগব। যেন একটা আক্রোশের বিস্ফোরণ ঘটেছে।

'শিগব, দূর...। চলে যা...' ঝটকা মেরে শিগবটাকে সরিয়ে দিল স্বপন। উঠে দাঁড়াল শিগবটা। স্বপনও লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। টেবিলের উপর রাখা টেবিল ল্যাম্পটা হাতে তুলে নিল। সজোরে শিগবের মাথায় আঘাত করল।

কিছুটা পিছু হটল শিগব। এমন সময় স্বপনের মায়ের কণ্ঠ শোনা গেল। 'স্বপন, বাবা, তোর কী হয়েছে? এত শব্দ কীসের?'

শিগবটা হঠাৎ কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। শিগবটা এই ঘরেই আছে অনুভব করছে স্বপন। কী শক্তি শিগবের! পুরো শরীরটা ঝাঁকিয়ে দিয়ে গেছে। প্রচণ্ড দুর্বল লাগছে স্বপনের। দরজা খুলে দিল সে। মার সঙ্গে কথা বলল, গলা কাঁপছে। বলল, আজ মার পাশে ঘুমাতে চায়।

উনি বললেন, 'ঠিক আছে, বাবা, এই তো আমি তোর পাশেই থাকব।' রাতটা মায়ের কোলে মাথা রেখে কাটাল স্বপন।

ছেলের কী হয়েছে বুঝতে পারলেন না মা। তবে এটুকু বুঝলেন তাঁর ছেলে বড় কোনও বিপদে পড়েছে।

সকালে বিপাশার ফোন পেয়ে পাগলের মত ঢাকা মেডিকেলে ছুটল স্বপন। তিশার কীভাবে এতবড় জখম হলো হলের কোনও মেয়ে তা বুঝতে পারেনি। তবে স্বপন পুরো ব্যাপারটাই বুঝতে পারছে। নিশ্চয়ই কাল রাতে তিশার কাছে

BanglaBook.org

শিগবটা এসেছিল।

তিশার মাথায়, হাতে, পায়ে ব্যাণ্ডেজ। কথা বলার শক্তি নেই। স্বপন তিশার কাছে গিয়ে বসল। 'তিশা, একী অবস্থা তোমার।' চোখে পানি চলে এল স্বপনের।

তিশা হাসার চেষ্টা করল। বহু কষ্টে স্বপনকে ডাকল তিশা, 'স্বপন...'

'বলো, তিশা।'

'পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ার পাতাকাটা গ্রাম...'

'মানে?!'

'ওখানেই শিগবটার কবর।'

'কী বললে? সত্যি?!!'

'হ্যাঁ। কাল রাতে আমি জেনেছি...'

'আচ্ছা। তোমার আর কথা বলার দরকার নেই। বিশ্রাম নাও।'

ডাক্তারের সাথে কথা হলো স্বপনের। ডাক্তার অভয় দিয়ে বললেন, 'ভয়ের কিছু নেই। দুদিন পরেই রিলিজ করে দেব।'

পাঁচ

আনোয়ার এবং স্বপন পাতাকাটা গ্রামে এসে হাজির হয়েছে। অন্য দশটা গ্রামের মতই একই রকম চেহারা পাতাকাটা গ্রামের। স্বপন গত কয়েক রাত ঠিকমত ঘুমাতে পারেনি। মনের ভিতর সবসময় শংকা কাজ করছে শেষ পর্যন্ত কি শিগবের সাথে ওরা পারবে? তিশা এখন শারীরিকভাবে সুস্থ। তবে মানসিকভাবে অসুস্থ। কড়া ঘুমের ওষুধ ছাড়া ঘুম আসতে চায় না। ঘুমালে ভয়াবহ সব দুঃস্বপ্ন দেখে। তিশা নারায়ণগঞ্জে ওদের বাসায় চলে গেছে। স্বপন নিজেকে নিয়ে যতটা না চিন্তা করে তার চেয়ে বেশি চিন্তিত তিশাকে নিয়ে। শিগবটার কবর পাতাকাটা গ্রামে এই তথ্য শুনে স্বপন খুব অবাক হয়েছে। কারণ তিশার শৈশব এবং কৈশোরের অনেকটা দিন কেটেছে পাতাকাটা গ্রামে। ক্লাস সেভেন পর্যন্ত তিশা এই গ্রামে তার দাদাবাড়িতে থাকত। ক্লাস সেভেনে ওঠার পর তিশা নারায়ণগঞ্জে তার বাবা-মার কাছে ফিরে যায়। তিশা পাতাকাটা গ্রামে বড় হলেও সে আসগর নামে কাউকে চেনে বলে মনে করতে পারে না। সবকিছু শুনে আনোয়ার বলে, 'দেখেছিস, সব মিলে যাচ্ছে। শিগবটা হয়তো অনেক আগে থেকেই তিশাকে চেনে।'

'হতে পারে। এখন আমাদের করণীয় কী?'

'আগে আমাদের জানতে হবে গ্রামে শিগবের কোনও উৎপাত আছে কিনা। যদি শিগবের উৎপাত থাকে তবে গ্রামবাসীকে সঙ্গে নিয়ে শিগবটাকে ধ্বংস করব।'

আনোয়ার আর স্বপন গ্রামের চেয়ারম্যানের বাড়িতে থাকার সুযোগ পেল। চেয়ারম্যান কাশেম মোল্লা হাসি-খুশি মানুষ। বয়স পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্নের মধ্যে।

BanglaBook.org

গ্রামের মানুষের সেবায় সর্বদা নিয়োজিত।

আনোয়ার তাঁকে বলল, 'চেয়ারম্যান সাহেব, আপনাদের গ্রামে কি কোনও সমস্যা হচ্ছে?'

'সমস্যা মানে, কী সমস্যা?'

'মানে, কোনও রহস্যজনক কিছু? ভূত-প্রেত?'

'না, না। আমরা খুব শান্তিতে আছি। আমাদের এখানে ভূত-প্রেতের কোনও সমস্যা নেই। তবে বিদ্যুৎ না থাকায় অনেক সমস্যায় আছি।'

স্বপন জানতে চাইল, 'আমরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে বিভিন্ন জরিপের কাজ করি। এখানেও জরিপের কাজ নিয়ে এসেছি।'

'সে আপনারা যে কাজেই আসেন, কোনও সমস্যা নেই। যতদিন ইচ্ছা থাকেন।'

'আচ্ছা, চেয়ারম্যান সাহেব, আপনাদের গ্রামে আসগর নামে কাউকে চেনেন?'

'আসগর?!!!'

'জি।'

'আসগর নামে তো আগেও অনেকে ছিল, এখনও অনেকে আছে। এক আসগর ছিল ডাকাত এবং ভাড়াটে খুনি। একবার ডাকাতি করতে গিয়ে গণপিটুনিতে মারা পড়ল। ওর জানাজাও গ্রামবাসী পড়েনি। জানাজা ছাড়াই ওকে কবর দেয়া হয়। আরেক আসগর ছিল কাপড়ের ব্যবসা করত।'

আনোয়ার স্বপনকে ফিসফিস করে বলল, 'সম্ভবত ওই খুনি ডাকাত আসগরই শিগব হয়েছে।'

স্বপন চেয়ারম্যানের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আচ্ছা, চেয়ারম্যান সাহেব, ওই ডাকাত আসগরের কবরটা কোথায়?'

'ওটা তো বটতলার কবরস্থানে। তা আসগরকে নিয়ে কোনও সম্যসা নাকি? হঠাৎ আসগরকে নিয়ে এত প্রশ্ন? আমাকে বলতে পারেন।'

স্বপন চেয়ারম্যানের হাত ধরে বলল, 'চেয়ারম্যান সাহেব, আপনার সাহায্য আমাদের দরকার। খুব বেশি দরকার।'

'ছিঃ ছিঃ এভাবে বলছেন কেন? আপনাদের জন্য আমি সবকিছু করব।'

'আমরা খুবই দুঃখিত, আমরা আপনাকে মিথ্যা বলেছি। আমরা আসলে জরিপের কাজে আসিনি। ঘটনাগুলো আপনাকে বলছি...'

স্বপন এবং আনোয়ার চেয়ারম্যান সাহেবকে সব বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করল। ওদের ধারণা ছিল চেয়ারম্যান সাহেব হয়তো সব বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু চেয়ারম্যান সাহেব সব বিশ্বাস করলেন।

চেয়ারম্যান সাহেব বললেন, 'তিশা মাকে তো আমি চিনি। জামিল সাহেবের নাতনি। আগে তো মেয়েটা গ্রামে অনেক আসত। কিন্তু দাদা-দাদীর মৃত্যুর পর আর গ্রামে আসে না। আসগরের বাচ্চা মরে গিয়েও মানুষকে শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না। আপনারা চিন্তা করবেন না, এবার ওকে শেষ করব আমরা।'

BanglaBook.org

আনোয়ার বলল, 'প্রথমে আমাদের আসগরের কবরটা দেখতে হবে। আর অমাবস্যা বা পূর্ণিমার দিনে কবর খুঁড়ে আগুন দিতে হবে।'

'অমাবস্যার তো দেরি নেই। আগামীকালই অমাবস্যা।'

স্বপন এবং আনোয়ার দুজনেই মাথা নাড়ল। কাল কী হবে কে জানে!

ছয়

পরদিন রাতে আনোয়ার, স্বপন এবং চেয়ারম্যানের পাঁচজন লাঠিয়াল রওনা দিল বটতলার কবরস্থানের দিকে। সবার হাতেই ছোটখাট অস্ত্র। আনোয়ারের হাতে বড় মশাল। ও বলল, 'আমাদের সবার চেষ্টা থাকবে খুব সাবধানে কবর খুঁড়ে আগুন জ্বালানো।'

সবাই সম্মতি দিয়ে মাথা নাড়ল।

কবরস্থানে এসে সবার লোম দাঁড়িয়ে গেল। ভয়টা বেশি ছড়িয়ে পড়ল লাঠিয়ালদের মধ্যে। একজন হঠাৎ বলে উঠল, 'আমরা এসব ঝামেলার মধ্যে নেই। আমরা ফেরত যাব। যা করার আপনারা করেন। কবর খোঁড়াখুঁড়ি, কবরে আগুন দেয়া এসব কাজে আমরা নেই।'

আনোয়ার খেপে উঠে বলল, 'চেয়ারম্যান সাহেব না আপনাদের পাঠিয়েছেন।'

'আমরা আসতে চাইনি। আমাদের জোর করে পাঠিয়েছেন।'

'আচ্ছা, আপনাদের থাকা লাগবে না। জিনিসপত্রগুলো দিয়ে চলে যান।'

সবাই আনোয়ার এবং স্বপনকে ফেলে চলে গেল।

স্বপন বলল, 'শুধু আমরা দুজন যাব।'

'হ্যাঁ, এতদূর এসে পিছিয়ে যাওয়া যায় না। চল কবরটার কাছে যাই।'

অমাবস্যার রাত। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। ভাল করে কিছু দেখা যায় না। মশালের আলোতে কবরস্থানকে অপার্থিব কোনও জগৎ মনে হলো। দূর থেকে কুকুরের ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা গেল। স্বপনের বুকটা কেঁপে উঠল।

আনোয়ারের হাতে শাবল, মশাল এবং কেরোসিনের বোতল। আর স্বপনের হাতে কোদাল, দিয়াশলাই এবং বেশ কিছু কাঠ।

সকালবেলায় স্বপন এবং আনোয়ার আসগরের কবরটা খুঁজে বের করেছে। তবু এই অন্ধকারে কবরটা খুঁজে পেতে বেশ কষ্ট হলো ওদের।

কবরটার সামনে দাঁড়িয়ে আনোয়ার বলল, 'আমি কবর খুঁড়ছি। তুই মশাল ধরে দাঁড়িয়ে থাক।' আনোয়ার বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়তে লাগল। প্রচণ্ড ঘাম হচ্ছে ওর। নিঃশ্বাস দ্রুত থেকে দ্রুততর হলো। আনোয়ারের মন্ত্র পড়ার গতি বাড়ছে। কবর খুঁড়ছে।

হঠাৎ চারদিক কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। আনোয়ার বলশালী পুরুষ। দ্রুত

BanglaBook.org

কবর খুঁড়ছে। গতকাল বৃষ্টি হওয়াতে মাটি বেশ নরম। বেশ কিছুক্ষণ পর আনোয়ার বলল, 'সাবধান, স্বপন। আমি টের পাচ্ছি। শিগবটা কবরের মধ্যেই আছে।'

কবরটা আরও অনেকটা খুঁড়তেই কিছু একটা যেন লাফিয়ে কবর থেকে বেরুল। জিনিসটা এক ঝটকায় আনোয়ারকে কয়েক হাত দূরে ছিটকে ফেলল। স্বপন অসহায় বোধ করছে। ওর ইচ্ছা হলো পালিয়ে যেতে।

আনোয়ার উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। শিগবটা এবার স্বপনের দিকে আসতে শুরু করেছে। স্বপন জ্বলন্ত মশাল দিয়ে শিগবকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করল।

শিগবটা কয়েক পা পিছনে সরে গেছে। হঠাৎই শিগবটা রক্ত হিম করা শব্দ করে উঠল। আনোয়ার পিছন থেকে শাবল দিয়ে শিগবটাকে আঘাত করল। আনোয়ারকে শূন্যে তুলে নিল শিগবটা।

চিৎকার করে আনোয়ার বলল, 'স্বপন, তুই কবরটার কাছে থাক। আগুন জ্বালা। শিগবটাকে কবরে ফিরতেই হবে। তাড়াতাড়ি কর। আমি ওকে ব্যস্ত রাখছি।'

শিগবটা আনোয়ারকে মাটিতে ফেলে দিয়েছে। উঠে দাঁড়িয়ে অন্ধকারে আন্দাজের উপর ভর করে দৌড়ানোর চেষ্টা করল আনোয়ার। শিগবটা ওর পিছু নিল।

হঠাৎ একটা নতুন খোঁড়া কবরের মধ্যে পড়ে গেল আনোয়ার। শিগবটা হঠাৎ খুশি হওয়ার মত একটা আওয়াজ করল। দ্রুত মাটি ফেলতে শুরু করেছে। আনোয়ার বুঝতে পারছে এই কবরটা শিগব খুঁড়েছে। চেষ্টা করছে তাকে জীবন্ত কবর দিতে।

এদিকে উত্তেজনায়, ভয়ে হাত-পা কাঁপছে স্বপনের। কাঠগুলো কবরের মধ্যে রেখে কেরোসিন ঢেলে দিল সে। এবার আগুন দেয়ার পালা। জ্বলন্ত মশালটা দিয়ে আগুন লাগিয়ে দিল স্বপন। হঠাৎ শিগবটা থমকে দাঁড়াল। কেমন যেন পাগলের মত হয়ে গেছে। গুলির বেগে কবরের দিকে আসতে শুরু করল।

কবরের মধ্যে ঢুকে গেল শিগবটা।

মাংস পোড়ার গন্ধে চারদিক ভারী হয়ে উঠছে। শিগবটা আর্তনাদের পর আর্তনাদ করছে। একবার বলে উঠল, 'মারিস না। ...মারিস না...আমারে বাঁচা...'

স্বপন আনোয়ারের কাছে ছুটে গেল। হাতড়ে হাতড়ে কবর থেকে উঠে এসেছে আনোয়ার। হাতে-পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা ওর। রক্তে ভেসে যাচ্ছে শরীর। স্বপনের কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়াল আনোয়ার, বলল, 'বর্তমানে কবরটাই শিগবটার শক্তির উৎস। কবরটার কোনও ক্ষতি হলে শিগবটা বাঁচতে পারবে না। এজন্য শিগবটা দ্রুত কবরের কাছে ফিরেছে। আমরা পেরেছি স্বপন। আমরা পেরেছি।'

ওরা দ্রুত কবরস্থান থেকে বেরিয়ে এল। হঠাৎ কেউ যেন চিৎকার করে বলে উঠল, 'আমি ফিরে আসব... । আসব...আসব! প্রতিশোধ নেব...প্রতিশোধ।'

প্রচণ্ড আর্তনাদের শব্দে বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল ওদের।

BanglaBook.org

পরিশিষ্ট

একটা ফোন কোম্পানিতে বেশ ভাল একটা চাকরি পেয়েছে স্বপন। স্বপন আর তিশার বিয়ের তারিখ ঠিক হয়েছে। স্বপন আর তিশা এখন বিয়ের কেনাকাটা নিয়ে খুব ব্যস্ত। একদিন আনোয়ারের সাথে বসুন্ধরা সিটিতে দেখা হলো স্বপন এবং তিশার। দু'একটা ভদ্রতার কথা বলে চলে গেল স্বপন এবং তিশা। যেন আনোয়ারকে ওরা ভালভাবে চেনেই না। আনোয়ার বুঝতে পারে ওদের জীবনে তার কোনও স্থান নেই। কিংবা হয়তো অতীতের দুঃস্বপ্ন ওরা আর মনে করতে চায় না। আনোয়ারের মনটা একটু খারাপ হলো। জীবনে কিছুই পাওয়া হলো না ওর। রহস্যের পিছনে ছুটতে ছুটতেই জীবনটা শেষ হবে তার। আগামীকাল আনোয়ার কুয়াকাটা চলেছে। সেখানে নাকি তিন মাথাওয়ালা এক অদ্ভুত জন্তুর আগমন ঘটেছে। সত্যি মিথ্যা যাই হোক, আনোয়ার যাবেই। তবে স্বপন এবং তিশার আনোয়ারকে আবার প্রয়োজন পড়বে। কারণ শিগবটা আবার ফিরে আসবে। ফিরে আসবে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য। নির্মম প্রতিশোধ!

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

সন্দেহ

অফিস থেকে একটু আগেভাগেই বেরিয়ে পড়েছে সজল। উদ্দেশ্য মোহিতাকে নিয়ে ঘুরতে যাওয়া। মোহিতা সজলের বিয়ে হয়েছে এগারো মাস হলো। তাই সজল একটু বেশি সচেতন থাকে যেন মোহিতা বলতে না পারে যে বিয়ের পর সজলের ভালবাসা কমে গেছে।

সজলের বাবা মারা গেছেন বছর সাতেক হলো। সজলরা তিন ভাই বোন। বড় ভাই অস্ট্রেলিয়ায় স্থায়ী হয়েছেন, এখনও প্রায় প্রতি মাসেই মাকে টাকা পাঠান। মেঝ সজল। ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে এম.বি.এ কমপ্লিট করেছে। একটা বেসরকারি এনজিওতে চাকরি করছে। সবার ছোট বোন সেঁজুতি নারায়ণগঞ্জে তার শ্বশুরবাড়ি থাকে। সজল তার গচ্ছিত টাকা এবং গ্রামের জমি বেচে ছোট্ট একটা ফ্ল্যাট কিনেছে। মাকেও গ্রাম থেকে এনে তার কাছে রেখেছে। মোহিতা এবং মাকে নিয়ে সজলের সুখের সংসার।

ফার্মগেটে বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল সজল। হঠাৎ দেখল এক লোক ফুটপাতে শার্ট, গেঞ্জি, আণ্ডারওয়্যার বিক্রি করছে। সজল এগিয়ে গেল। মাঝে মাঝে ফুটপাত থেকে দু'একটা কাপড় কিনতে ভালই লাগে সজলের। কোনও কাপড়ই পছন্দ হলো না ওর। কিন্তু হঠাৎ একটি সাদা শার্টের দিকে চোখ আটকে গেল। সাধারণ সাদা শার্ট, কিন্তু সজলের মনে হলো এই শার্টটা তাকে কিনতেই হবে। সজল বলল, 'ভাই, এই শার্টটা কত?'

বিক্রেতা কেন জানি একটু অবাক হয়ে বলল, 'এই শার্টটা নিবেন!!! এইটা দেড় শ' টাকা।'

শেষ পর্যন্ত এক শ' পঁচিশ টাকায় শার্টটা কিনে নিল সজল। শার্টটা কিনে বেশ খুশিও হলো। তবে ফার্মগেটের এই জায়গায় কখনও কাউকে জামা কাপড় বিক্রি করতে দেখেনি।

দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকার পর বাসে উঠে পড়ল সজল। ওর গন্তব্য খিলক্ষেত। যা জ্যাম! যেতে কমপক্ষে দেড়-দুই ঘণ্টা লাগবে। ভেবে বিরক্ত হলো সজল। আজ আর মোহিতাকে নিয়ে বাইরে যাওয়া হলো না।

বাসায় ফিরলে মোহিতা ব্যস্ত হয়ে পড়ল। প্রথমত সজলকে লেবুর শরবত খেতে হলো। তারপর মোহিতার হাতের বিভিন্ন এক্সপেরিমেণ্টাল রান্না খেতে হলো। মোহিতার কোনও কিছুই খারাপ লাগে না সজলের। মোহিতা এত সুন্দর করে ঘর-বাড়ি সাজিয়ে রাখে যে অবাক হয়। বিছানার চাদর এতটুকু এদিক

BanglaBook.org

ওদিক করা নেই। শেলফে বইগুলো সুন্দর করে গোছানো আছে, অ্যাকুরিয়ামের গোল্ডফিশগুলো নিয়মিত খাবার পাচ্ছে, মা আর ওষুধ খেতে ভুল করেন না। ভেবেই মনটা আরও ভাল হয়ে যায় সজলের। মোহিতার মুখটা ধরে বলে, 'আমার বউটা এত লক্ষ্মী কেন?'

'আমার বরটা খুব লক্ষ্মী, এজন্য।'

সারাদিন পর কাঙ্ক্ষিত পুরুষের স্পর্শ পেয়ে খুব ভাল লাগে মোহিতার। সমস্ত দিনের জমিয়ে রাখা কথাগুলো হড়বড় করে বলতে থাকে। সজল জবাব দেয় কদাচিৎ। শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে মোহিতার দিকে।

'অ্যাই সজল, শুনছ, কাল কিন্তু অপলার জন্মদিন।'

'আচ্ছা।'

'কাল একটু আগেভাগে চলে এসো। গিফট অবশ্য তোমার কেনা লাগবে না। কাল সকালে আমি রাজউক মার্কেট থেকে কিনে নেব।'

'আচ্ছা।'

'ও, আর একটা কথা, বাজার করতে হবে। ফ্রিজে মাছ মাংস একদম নেই। শাকসবজিও তেমন নেই।'

'ঠিক আছে।'

মোহিতার কোনও কথা কানে ঢোকে না সজলের। শুধু মোহিতার দিকে তাকিয়ে থাকতে ভাল লাগে।

পরদিন সকালে অফিসের জন্য তৈরি হয়ে গিয়ে গতকালের কেনা শার্টটার কথা মনে পড়ে সজলের। শার্টটা এত সুন্দর যে যে-কোনও জায়গায় পরে যাওয়া যাবে। প্যাকেট খুলে শার্টটা হাতে নিল সজল। হঠাৎ একটা মিষ্টি সুবাস পেল সে। এক অজানা আনন্দ ভর করল ওর উপর। শার্টটির দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারল না। শার্টটি পরার পর শরীরটা কেমন যেন শীতল হয়ে গেল সজলের। মনটা বেশ ফুরফুরে হয়ে গেল। মনে হলো কোনও অশরীরী শক্তি ওর উপর ভর করেছে। মোহিতা চা নিয়ে ঘরে ঢুকল। বলল, 'অফিস থেকে তাড়াতাড়ি চলে এসো কিন্তু। অপলার জন্মদিনের কথা মনে আছে তো?'

'হ্যাঁ, আছে।'

'গিফট আমি কিনে আনব। তুমি অফিসে যাওয়ার পরই বাইরে বেরুব।'

সজল অবাক হয়ে লক্ষ করল যে ও মোহিতার মনের কথা বুঝতে পারছে। মোহিতা ভাবছে, 'তুই তাড়াতাড়ি অফিসে যা তো। আমার জান সেলিম আমার জন্য অপেক্ষা করছে। কতদিন ওকে দেখি না। আজ সারাদিন ওর সাথে থাকব। তুই তো একটা ছাগল। তাই আমাকে এত বিশ্বাস করিস। আমার ভালমানুষী রূপ দেখে পাগল হয়ে থাকিস। আমি কী জিনিস তা টের পাবি। আর কয়েকটা দিন যাক, তারপর তোর মুখে লাথি মেরে সেলিমের সাথে চলে যাব।'

সজল বিছানার উপর ধপ করে বসে পড়ে। এসব উল্টাপাল্টা চিন্তা কেন মাথায় আসছে বুঝতে পারে না সজল। এসব নিশ্চয়ই তার কল্পনা। কাল রাতে ভাল ঘুম হয়নি। তাই এমন উদ্ভট কল্পনা মাথায় আসছে। সেলিম ভাইকে সজল

BanglaBook.org

খুব ভালভাবে চেনে। মোহিতার দূরসম্পর্কের আত্মীয়। এ বাড়িতেও অনেকবার এসেছে সেলিম ভাই। কখনোই মোহিতার সাথে সেলিম ভাইয়ের সম্পর্ক ভাই-বোনের বেশি কিছু মনে হয়নি।

মোহিতা বলল, 'কি সজল, কোনও সমস্যা? শরীর খারাপ লাগছে?'

'না। ঠিক আছি।'

সজল আবারও অবাক হয়। মোহিতা উদ্বিগ্ন মুখে তাকিয়ে আছে। কিন্তু মনে মনে ভাবছে, 'তোর শরীর খারাপ হলে তো ভালই হত। কবে যে তুই মরবি! আজ চায়ের সাথে কয়েকটা ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছি। হা হা হা।'

মাথা চেপে ধরে সজল। চা না খেয়েই তাড়াতাড়ি বাসা থেকে বেরিয়ে পড়ে।

বাসে উঠে অন্যের মনের কথা বুঝতে চেষ্টা করে সজল। কিন্তু একবারও কারও মনের কথা বুঝতে পারে না। তা হলে ব্যাপারটা সজলের উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনা। স্বস্তির শ্বাস ফেলে সজল।

অফিসে সজলের পাশের ডেস্কে বসে তৌফিক। তৌফিকের সাথে সজলের চমৎকার একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক আছে। সজল একবার চিন্তা করল মনের কথা বুঝতে পারার ব্যাপারটা তৌফিককে বলবে কি না। শেষ পর্যন্ত না বলার সিদ্ধান্ত নিল।

তৌফিক বলল, 'সজল, শুনেছ অফিসে ছাঁটাই শুরু হবে।'

'কী বলছ!!!'

'হ্যাঁ। এই মাসের শেষেই তো সম্ভবত অডিট হবে। তারপর বিশাল আকারের ছাঁটাই হবে। তবে তোমার তো অত চিন্তা নেই। বস তো তোমার কাজে খুবই খুশি।'

সজল চমকে উঠল। তৌফিকের মনের কথা স্পষ্ট বুঝতে পারছে ও। তৌফিক ভাবছে, 'সজল, বস তোমাকে আর পছন্দ করবে না। গতকালই তোমার নামে বসের কাছে অনেক উল্টাপাল্টা কথা বলেছি। তুমি আমার চেয়ে উঁচুতে উঠতে পারবে না, সজল। তোমাকে আমি শেষ করে দেব। তোমার চাকরি আমি খাব। তোমার বউটাকেও আমার খুব মনে ধরেছে। এত সুন্দর মেয়েকে কি তোমার মত খাটাশের পাশে মানায়! তুমি তো এখনও ফাইলে হাত দাওনি। ড্রয়ারটা খুলে দেখো, বাবা। হলুদ রঙের ফাইলটি পাবে না। আর নতুন প্রজেক্টের এই দরকারি ফাইল হারালে তোমার চাকরিও যাবে। ফাইলটা গতকাল আমি একটা নর্দমার মধ্যে ফেলে দিয়েছি। হা হা হা।'

সজল কিছুটা লাফিয়ে উঠে ড্রয়ার খোলে। সব ফাইল ঠিক আছে। কিন্তু শুধু হলুদ ফাইলটি খুঁজে পায় না। সজলের মাথা এলোমেলো হয়ে যেতে থাকে। সজল তৌফিকের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট গলায় বলল, 'তৌফিক, নতুন প্রজেক্টের ফাইলটি কোথায়?'

'ঠিক বুঝতে পারলাম না। কোন্ ফাইল?'

'ন্যাকা সেজো না, তৌফিক। এ ফাইলটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ফাইলটা কোথায় ফেলেছ?'

Banglabook.org

'সজল, তোমার মাথা ঠিক আছে?'

'তৌফিক, আমি ভালভাবে বলছি ফাইলটি কোথায় ফেলেছ বলো এবং বসের কাছে গিয়ে সবকিছু স্বীকার করো!'

'সজল, কুল ডাউন। তুমি পাগলের মত এসব কী বলছ? আমি তোমার ফাইল ফেলে দেব কেন?!! তোমার এতবড় সর্বনাশ আমি কেন করব?'

সজল উঠে গিয়ে তৌফিকের কলার চেপে ধরে। বলে, 'আমাকে কালকের মধ্যে ফাইলটা না দিলে আমি তোকে খুন করব। আর আমার নামে বসের কাছে উল্টাপাল্টা বলে এখন সাধু সাজছিস?'

তৌফিক নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়। সজলের এমন ব্যবহারে অবাক হয় তৌফিক। চার বছর ধরে সজলের সাথে পরিচয়। কখনোই সজলকে এমন আচরণ করতে দেখেনি তৌফিক।

সজল মোহিতাকে ফোন করল।

'হ্যালো, মোহিতা, কোথায় তুমি?'

'এই তো রাজউক মার্কেটে। আর বোলো না, এখানে এসে সেলিম ভাইয়ের সাথে দেখা। উনি বলছেন লাঞ্চ না করিয়ে ছাড়বেন না।'

'ও আচ্ছা।'

'তুমি সময়মত লাঞ্চ করে নিয়ো কিন্তু।'

'আচ্ছা।'

সজল লাইন কেটে দিল। কিছুই ভাবতে পারছে না। তার জীবনে এমন কেন ঘটছে? আর কীভাবেই বা ও মানুষের মনের কথা বুঝতে পারছে? তৌফিক সারাদিনে অনেকবার সজলের সাথে কথা বলার চেষ্টা করল। কিন্তু প্রতিবারই সজল তৌফিকের সাথে খারাপ আচরণ করল।

আজ ইচ্ছাকৃতভাবে অনেক দেরি করে বাড়ি ফিরল সজল। মোহিতা মন খারাপ করে বসে আছে। সজলকে দেখে মোহিতা বলে উঠল, 'তোমাকে বারবার বললাম আজ অপলার জন্মদিন। একটু তাড়াতাড়ি এসো। আর তুমি কি না আজ আরও দেরি করলে। আমি কতক্ষণ রেডি হয়ে বসে আছি।'

'অফিসে আমার অনেক কাজ। তোমার মত সারাদিন ঘুরে বেড়ালে তো আমার চলে না।'

'আমি সারাদিন ঘুরে বেড়াই?!! কতদিন পর আজ বাইরে গেলাম।'

'আম্মার কাছে শুনলাম বিকাল করে বাড়ি ফিরেছ।'

'আর বোলো না, সেলিম ভাই লাঞ্চ করিয়ে বসুন্ধরা সিটিতে নিয়ে গেলেন। আমাদের বিবাহবার্ষিকী উপলক্ষে তোমাকে একটা পাঞ্জাবী আর আমাকে একটা শাড়ি গিফট করলেন।'

সজল হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'সেলিম ভাইয়ের কেনা জিনিস তুমি কেন আনলে? আর কেন তার সাথে সারাদিন ঘুরলে?... দেখলে মাথার ঠিক থাকে না?'

'কী বলছ এসব!'

'চুপ। ...তুই যা তোর সেলিমের কাছে। আমি তোকে মুক্তি দিলাম, যা

BanglaBook.org

সেলিমের কোলে উঠে বসে থাক।'

মোহিতার চোখে পানি এসে গেল। বলল, 'উনি তো আমার বড় ভাইয়ের মত। তুমি তো উনাকে অনেক আগে থেকেই চেনো। বাবার মৃত্যুর পর উনি এবং উনার পরিবারই আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। আর তাঁকে নিয়ে তুমি...ছিঃ!'

সজল হঠাৎ রাগে অন্ধ হয়ে যায়। মোহিতাকে সজোরে চড় মেরে বসে। মোহিতা অবাক বিস্ময়ে সজলের দিকে তাকিয়ে থাকে। সজল তার মায়ের রুমে চলে আসে। সজলের মা বলেন, 'কীরে সজল, এত চেঁচামেচি কীসের?'

সজল উত্তর দিতে গিয়ে থেমে যায়। সে তার মায়ের মনের কথা বুঝতে পারছে। মায়ের মনটাও এত কুৎসিত! শিউরে ওঠে সজল। তার মা ভাবছেন, 'আজকে ভাল প্যাঁচ বেধেছে। বউ নিয়ে সারাদিন মাতামাতি! খুব ভাল হয়েছে। তুই যে কত বোকা তাই আমি ভাবি। আমার মত মানুষকে সাধু মনে করিস। আমি তোর বীমার টাকার জন্য অপেক্ষা করছি। তুই মরলেই টাকাগুলো আমি পেয়ে যাব। প্রতিদিন আল্লাহর কাছে হাত তুলে বলি তুই যেন ফিরে না আসিস। গাড়ির তলে পড়ে যেন চ্যাপটা হয়ে যাস। আর কয়েকদিন দেখব। এরপরও তুই না মরলে আমিই ব্যবস্থা নেব। তোর না পায়েস খুব পছন্দ। পায়েসের সাথে খুব সুন্দর একটা জিনিস মিশিয়ে দেব। খাওয়ামাত্রই তুই শেষ। আর পায়েসটা পাঠাব তোর বউকে দিয়ে। তুইও মরবি, তোর বউও জেলে পচবে। হা হা হা।'

সজলের চোখে পানি চলে আসে। সবাই তার মৃত্যু চায়? যে মা সারাজীবন তার জন্য এত কষ্ট করেছেন, সেই মাও সামান্য কিছু টাকার জন্য তাকে মেরে ফেলতে চান? সজলের হঠাৎ চোখ যায় ফল কাটার ছুরির দিকে। ওর খুব ইচ্ছা হতে থাকে ছুরি দিয়ে মা এবং মোহিতার গলায় পোঁচ দিতে। শত্রুকে বাঁচিয়ে রাখতে নেই। অনেক কষ্টে ইচ্ছাটা দমন করল সজল। মাকে কিছু না বলেই রুম থেকে বেরিয়ে এল। নিজ ঘরে ঢুকে দেখে মোহিতা কাপড়-চোপড় ব্যাগে ভরছে।

সজল বলল, 'কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

মোহিতা জবাব দেয় না।

'কোথায় যাচ্ছ বললে না।'

'চলে যাচ্ছি। আমার মত মানুষের সাথে তোমার আর থাকা লাগবে না।'

'যাবেই তো, তোমার সেলিমকে কাছে পাওয়ার এই তো সুযোগ। তা তোমার সেলিম এখন কোথায়? নীচে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে?'

'ছিঃ! আমি ভাবতেই পারি না আমি কীভাবে তোমার মত ছোট মনের মানুষকে বিয়ে করেছি!'

মোহিতা ছোট একটা ব্যাগ নিয়ে বাসা থেকে বেরিয়ে পড়ে। সজল বাধা দেয় না। সজলের মা বাধা দেয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন।

সজল কাপড় বদলে নেয়। হাতমুখ ধুয়ে ঠাণ্ডা মাথায় বিষয়টি ভাবতে হবে। শার্টটা খুলতেই সজলের অন্যরকম অনুভূতি হয়। হঠাৎ তার মনে পড়ে অফিসের ফাইলটা গতকালই সে বাসায় নিয়ে এসেছে।

BanglaBook.org

শেলফের উপরই ফাইলটা পেয়ে যায় সজল। মনটা খারাপ হয়ে যায় তার। তৌফিকের সাথে কী খারাপ আচরণটাই না করেছে। সজলের মা রুমে এসে ঢুকল। সজল অবাক হয়ে লক্ষ করল মায়ের মনের কোনও কথাই বুঝতে পারছে না। সজলের আরও মনে পড়ে যায় যে মাকে তো কখনোই জীবন বীমা সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। তার মানে সকাল থেকে যা ঘটেছে সব তার কল্পনা? মিথ্যা?

কী মনে করে আবার শার্টটা গায়ে দেয় সজল। আবারও মায়ের মনের কথা বুঝতে শুরু করে সজল। কুৎসিত সব কথা! শার্টটা জোর করে খুলে ফেলে সজল। শার্টটির দিকে ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। ভয়ে ওর হাত-পা অল্প বিস্তর কাঁপছে।

সজলের মা বললেন, 'ছিঃ, সজল। তুই বউমার গায়ে হাত তুলেছিস! আরে, সেলিম ছেলেটা ফোন করে আমাকেও অনুরোধ করেছিল দুপুরে একসাথে খাওয়ার জন্য। আমি রাজি হইনি। আমার মনে হয় তুই বড় কোনও ভুল করছিস, সজল। বড় কোনও ভুল।'

মা রুম থেকে বেরিয়ে যেতেই মোহিতাকে ফোন করে সজল। কিন্তু মোহিতা ফোন রিসিভ করে না। মাথাটা আরও এলোমেলো হয়ে যায় ওর।

পরদিন অফিসে এসে প্রথমেই তৌফিকের কাছে ক্ষমা চায় সজল। তারপর তৌফিকের কাছে সবকিছু খুলে বলে সজল। খুঁটিনাটি একটি কথাও বাদ দেয় না।

সজল বলে, 'তৌফিক, তুমি কি আমার কথা বিশ্বাস করেছ?'

'হ্যাঁ, করেছি। পৃথিবীটা অনেক রহস্যময়, সজল। তোমার ওই শার্টটা কোথায়, সজল? বাসায়?'

'না, আমার ব্যাগে। ওটা আজ আর পরার সাহস হয়নি।'

'তুমি এই শার্টটা আমাকে দিয়ে দাও। এই শার্টের রহস্য আমাদের উদ্‌ঘাটন করতে হবে।'

'আচ্ছা। তৌফিক, তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ তো?'

'আরে ধুর। বন্ধুর কাছে ক্ষমা চাইতে নেই।'

সারাদিন মোহিতাকে অনেকবার ফোন করল সজল। কিন্তু, মোহিতা একবারও ফোন রিসিভ করল না। কিছু সময় পরে মোহিতার মাকে ফোন করল সজল। মোহিতার মা বেশ কিছু কড়া কথা শুনিয়ে দিলেন সজলকে এবং বলে দিলেন মোহিতাকে নিয়ে চিন্তা না করতে।

সজল কোনও কথারই বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ করল না।

পরদিন অফিসে এসে সজল দেখল তৌফিক এখনও এসে পৌঁছায়নি। তৌফিক তো সচরাচর অফিসে দেরি করে না। চিন্তিত হয়ে পড়ল সজল।

তৌফিক এসে পৌঁছাল সাড়ে দশটার পর। তৌফিকের দিকে অবাক দৃষ্টিতে চাইল সজল। তৌফিকের চোখদুটো কেমন যেন গর্তে ঢুকে গেছে। মাথার চুল এলোমেলো। দৃষ্টিও কেমন অন্যরকম।

'তৌফিক, কী খবর তোমার?'

'সজল, এই শার্টটা খুব ভয়ঙ্কর একটা জিনিস। অতি ভয়ঙ্কর। এই শার্টটা

BanglaBook.org

পরলে প্রিয়জন সম্পর্কে মনের ভিতর নানা সন্দেহ দানা বাঁধে। প্রথমেই আসি তোমার ওই ফাইলটার কথায়। তোমার মনে ছিল ফাইলটা তুমি বাসায় রেখেছ। কিন্তু শার্টটা পরার পর তুমি তা ভুলে গেলে। তোমার সন্দেহ হলো আমার উপর। এর আগে সকালে শার্টটা পরার সাথে সাথে তোমার অবচেতন মন জেনে গেল আজ সেলিম সাহেবের সঙ্গে মোহিতা ভাবীর দেখা হবে। আর এই বিষয়টিই তোমার মনে অন্যভাবে উপস্থাপিত হলো। মোহিতা ভাবী সম্পর্কে কুৎসিত একটা সন্দেহ হলো তোমার। তোমার মায়ের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটল। আমি যতদূর জানি সামনেই তোমার বীমার প্রিমিয়াম দিতে হবে। আর এই বীমা নিয়েই তোমার মায়ের সম্পর্কে একটা খারাপ সন্দেহ তোমার মধ্যে ঢুকে গেল। আবার একটা আশ্চর্য জিনিস হচ্ছে তুমি শুধু আমার, মোহিতা ভাবীর এবং তোমার মায়ের মনের কথা বুঝতে পেরেছ। কারণ এই তিনটা মানুষই তোমার অনেক আপন, অনেক প্রিয়। তুমি অনেক চেষ্টা করেও বাসের কারও মনের কথা বুঝতে পারোনি। এই শার্টটা পরলে শুধু কাছের মানুষ সম্পর্কে সন্দেহ হয় তাই নয়, এমনকী কোনও অঘটনও ঘটে যেতে পারে।'

'মানে?'

'আমি গতকাল বাসায় গিয়ে শার্টটা পরলাম। আমার শরীরে একটা শীতল ভাব ছড়িয়ে পড়ল। হঠাৎ আমি দেখলাম আমি আমার স্ত্রীর, বাচ্চার এবং বাবা-মায়ের মনের কথা বুঝতে পারছি। অবাক হয়ে লক্ষ করলাম সবাই-ই আমাকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করছে, আমাকে নানাভাবে ঠকাচ্ছে। এমনকী আমার দুবছরের বাচ্চাটিও আমার ক্ষতি করার চিন্তা করছে। আমার মনে হলো ওরা সবাই আমার শত্রু। ভাবলাম একে একে সবাইকে খুন করে ফেললে কেমন হয়? মনের একটা অংশ বারবার বলতে লাগল ওদের খুন করে ফেললেই আমি নিরাপদ হব। আমি হঠাৎই প্রচণ্ড ক্রোধে অন্ধ হয়ে গেলাম। আমার বাচ্চাটিকে লাঠি দিয়ে বাড়ি দিলাম। সবাই তো আমার আচরণে অবাক। আমার স্ত্রী ফারিয়াকে এবং মা-বাবাকে নানা বাজে কথা বললাম। ফারিয়া কান্নাকাটি শুরু করল। বাবারও বুকের ব্যথা বেড়ে গেল। রাতে কারও কিছু খাওয়া হলো না। আমি রাতে ঘুমানোর আগে বালিশের তলে একটা হাতুড়ি রেখে দিলাম। মনে মনে ভাবতে লাগলাম আমার বাচ্চা এবং ফারিয়ার মাথা হাতুড়ি দিয়ে থেঁতলে দেব। ভাবতেই অদ্ভুত আনন্দ এসে ভর করল আমার উপর। মাঝরাতে হঠাৎ ইলেকট্রিসিটি চলে গেল। গরমে আমি শার্টটা খুলে ফেললাম। হঠাৎই আমার সব সন্দেহ দূর হয়ে গেল। ঘুমন্ত বাচ্চাটাকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। সকালে রাতের আচরণের জন্য সবার কাছে ক্ষমা চেয়েছি। তবে কাউকে শার্টটির বিষয়ে বা আমার ভয়ঙ্কর চিন্তা সম্পর্কে কিছুই বলিনি। সজল, মাত্র দুদিনেই শার্টটা আমাদের ভয়ানক সর্বনাশ করতে যাচ্ছিল। আর একদিন দুইদিন থাকলে কী হত কে জানে! ভাগ্য ভাল পুরো ব্যাপারটা আমরা বুঝতে পেরেছি। তুমি কিন্তু কারও সাথে এই ব্যাপারটা শেয়ার করবে না। এমনকী মোহিতা ভাবীর সঙ্গেও নয়। কেউ তোমার কথা বিশ্বাস করবে না।'

সজল আর তৌফিক অফিস শেষে ফার্মগেটে চলে এল। ওরা সেই মানুষটিকে খুঁজতে থাকল যার কাছ থেকে সজল শার্টটি কিনেছিল। কিন্তু লোকটিকে খুঁজে পেল না ওরা। কেউ কিছু বলতেও পারল না। অনেকেই জানাল এখানে কাউকে জামা কাপড় বিক্রি করতে দেখেনি।

সজল বন্ধুকে বলল, 'এই শার্টটা কী করব, তৌফিক?'

'চলো, সামনের ওই বড় নর্দমার মধ্যে ফেলে দিই।'

তৌফিক শার্টটা নিয়ে নর্দমার মধ্যে ফেলে দিল। শার্টটা কেমন যেন জীবন্ত প্রাণীর মত নড়ে উঠল। তৌফিক এবং সজল দ্রুত পা চালিয়ে চলেছে। ওদের মনে হতে লাগল কেউ যেন খুব আস্তে চিৎকার করছে।

সজল আর তৌফিক মোহিতাদের বাসায় গেল।

স্বামী এসেছে কিন্তু মোহিতা সামনে আসতে চাইল না। কিছুক্ষণ পর এসে বলল, 'তুমি কেন এসেছ?'

সজল অনেকবার মোহিতার কাছে ক্ষমা চাইল। মোহিতা আরও রেগে গেল।

তৌফিক বলল, 'ভাবী, সজলের চাকরি নিয়ে কিছু সমস্যা হচ্ছিল। তাই হয়তো ওর মাথার ঠিক ছিল না। ও অনেক বড় ভুল করেছে। এবারের মত ওকে মাফ করে দিন।'

'এটা ভুল...? শুধু ভুল!! আমার এক বড় ভাইকে নিয়ে কুৎসিত সব কথা বলা, আমার গায়ে হাত তোলা, সব ভুল বললেই মিটে গেল?'

সজল বলল, 'মোহিতা, প্লিজ, আমাকে একটা সুযোগ দাও।'

কিন্তু মোহিতা কোনও কথা শুনতেই চাইল না।

সজল আর তৌফিক বাসা থেকে বেরিয়ে এল।

নিয়মিত মোহিতাকে ফোন করতে লাগল সজল। প্রথমে মোহিতা খারাপ আচরণ করলেও ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে এল।

ছয় মাসের মাথায় সজলের জীবনে ফিরে এল মোহিতা। সজল সব দুঃস্বপ্ন মুছে ফেলল। দিনগুলো ভালই কাটতে লাগল ওদের।

দ্বিতীয় বিবাহবার্ষিকীতে মোহিতা সজলকে একটা চমৎকার শার্ট গিফট করল। সজল প্যাকেট খুলে চমকে উঠল। সাদা রঙের একটা শার্ট। বলল, 'সাদা শার্ট!'

'আমি তো জানি তোমার প্রিয় রং সাদা। আর সাদা শার্টে তোমাকে মানায়ও খুব ভাল।'

'না, না। আমি সাদা শার্ট পরব না। পরব না।'

সজল রান্নাঘর থেকে কাঁচি নিয়ে এসে শার্টটা টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলল। ভীষণ অবাক হলো মোহিতা। কাঁচিটা সজল ছুঁড়ে ফেলল।

ওরা ভাল করে লক্ষ করলে দেখতে পেত কাঁচি থেকে চুইয়ে চুইয়ে কয়েক ফোঁটা রক্ত মেঝেতে পড়েছে!

BanglaBook.org

লাল বৃত্তে বন্দি

বাসায় ঢুকতেই নাদিয়ার মা জোলেখা বেগম ভুরু কুঁচকে বললেন, 'এ কেমন বাসা ঠিক করেছ? এ এলাকা বড্ড নির্জন। তার উপর শহরের এক মাথায়।'

নাদিয়ার বাবা ফারুক আহমেদ তাঁর স্ত্রীর কথা শুনে হাসলেন। বললেন, 'জানো, কত কষ্ট করে এ বাসাটা জোগাড় করেছি। শহরের এক পাশে হলেও বাসাটার অনেক সুবিধা।'

'কী সুবিধা?'

'প্রধান সুবিধা হলো বাড়িওয়ালা এখানে থাকেন না। পুরো বাড়িটায় নিজেদের মত করে থাকা যাবে। আর দেখেছ, সামনে কত খোলা জায়গা। মনে হয় স্বর্গ।'

'কিন্তু যদি ডাকাত আসে? আশপাশে তো তেমন কোনও বাড়ি-ঘর নেই। আমাদের মেরে ফেললেও কেউ জানবে না।'

'তোমার শুধু উল্টাপাল্টা কথা। কত বড় দেয়াল, দেখেছ? গেটে সবসময় দারোয়ান থাকে। আর কেয়ারটেকার তো আছেই।'

'বাড়ির মালিক কোথায় থাকেন?'

'বাড়ির মালিক কামালউদ্দিন সপরিবারে কানাডায় থাকেন। দুই বছরে একবার দেশে আসেন।'

'বাড়িটা মনে হয় বেশ আগের।'

'হুম। পঞ্চাশ বছর আগের বাড়ি। কামালউদ্দিনের বাবা বানিয়েছিলেন। অনেক যত্ন করে তৈরি করা।'

'এ বাড়ির খোঁজ দিল কে তোমায়?'

'আমার কলিগ রশিদ সাহেব।'

'শুধু আমি আর নাদিয়া এতবড় বাড়িতে থাকব! চিন্তা হচ্ছে।'

'চিন্তা কোরো না। নাদিয়ার এইচ.এস.সি পরীক্ষার জন্য তোমরা আটকে গেলে। নতুবা তোমাদের গাজীপুর নিয়ে যেতাম।'

'তোমার এই বদলির চাকরি আর সহ্য হয় না।'

'আমার তো বেশ ভালই লাগে। সারা বাংলাদেশ ঘুরে বেড়াই।'

'তোমার কি কালই গাজীপুর চলে যেতে হবে?'

'হ্যাঁ। শুধু বাসা বদলের জন্য এলাম।'

'আজ মোটামুটি বাসাটা সাজিয়ে ফেলব।'

BanglaBook.org

'আচ্ছা, ঠিক আছে। নাদিয়া কই? ওকে যে দেখছি না।'

'নাদিয়া...নাদিয়া...'

নাদিয়া বাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখছে। বাড়িটা দেখে তার মাথা ঘুরে গেছে। এত সুন্দর বাড়ি! সামনে-পিছনে গাছপালায় ভর্তি। শহরের কোলাহল নেই। পাখির ডাকে মন ভাল হয়ে যাচ্ছে। বাড়ির সবচেয়ে সুন্দর অংশটা হচ্ছে ছাদ। নাদিয়া ভাবল ছাদে বসে কত কিছু করা যাবে।

বন্ধুদের সাথে তুমুল আড্ডা দেয়া যাবে, ফুলের বাগান করা যাবে, রাতে তারা দেখা যাবে। ভাবতেই নাদিয়ার মনটা খুশিতে ভরে উঠল। দোতলায় উঠে গেল নাদিয়া। দোতলার সবগুলো ঘর তালাবদ্ধ। দোতলায় তেমন একটা কেউ আসে না বোঝা যাচ্ছে। হঠাৎ দোতলার বামদিকের শেষ ঘরটির সামনে এসে থমকে দাঁড়াল নাদিয়া। তার মনে হলো তালাবদ্ধ ঘরটির মধ্যে কেউ আছে। সে তালায় হাত দিতেই কারও হাসির শব্দ শুনল। অন্যরকম হাসি।

বাড়িটাতে খুব ভালভাবে মানিয়ে নিল নাদিয়া এবং তার মা। তাদের দেখে বোঝার উপায় নেই যে এ বাড়িটা তাদের নয়। বাড়ির পিছনে ফুলের বাগান করা হয়েছে। পুরো বাড়ি ঝকঝকে তকতকে করা হয়েছে। কেয়ারটেকার নজরুলকে খুব পছন্দ হয়েছে জোলেখা বেগমের। লোকটার মধ্যে বিনয় বলে একটা জিনিস আছে। লোকটা বি.এ. পাস। শুদ্ধ ভাষায় কথা বলে। সে সব কাজে নাদিয়া এবং জোলেখা বেগমকে সাহায্য করছে। নাদিয়ারও ইতিমধ্যে নজরুলের সাথে চমৎকার একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। যদিও নাদিয়া প্রথমে নজরুলকে দেখে চমকে উঠেছিল। কারণ নজরুলের বাম হাত কনুই থেকে কাটা। তবে ধীরে ধীরে সে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। নজরুলের বয়স ষাটের কাছাকাছি। অনেকদিন ধরে সে এ বাড়িতে আছে। এ বাড়িতে ভাড়াটিয়া খুব কম আসে। কারণ বাড়িটা শহরের শেষ মাথায়। তবু যারাই এ পর্যন্ত এসেছে নাদিয়াদের মত এত ভাল কাউকে সে পায়নি। বিশ বছর হলো বাস অ্যাক্সিডেন্টে নজরুল তার বউ আর মেয়েকে হারিয়েছে। নাদিয়ার মধ্যে সে তার মেয়ের ছায়া খুঁজে পেয়েছে। মেয়েটা এত সুন্দর করে চাচা ডাকে যে তার অন্তর জুড়িয়ে যায়। কলেজ থেকে এসে সারাদিন নজরুলের পিছনে ঘুরঘুর করে নাদিয়া। এই গল্প সেই গল্প বলে নজরুলের সঙ্গে।

একদিন নাদিয়া নজরুলকে জিজ্ঞেস করে, 'চাচা, দোতলার সব ঘরে তালা দেয়া কেন?'

'সাহেব পরিবার নিয়ে দেশে আসলে দোতলায় থাকেন।'

'আপনার কাছে সব ঘরের চাবি আছে?'

'হ্যাঁ, আছে। প্রতিমাসে একবার দোতলার ঘরগুলো খুলে পরিষ্কার করি।'

'এসব ঘরে কি কোনও আসবাবপত্র আছে?'

'থাকবে না কেন? সবই আছে।'

'চাচা, একটা কথা বলি?'

'বলো, মা।'

BanglaBook.org

'দোতলার বামদিকের একদম শেষ ঘরটায় কী আছে?'

'তুমি কি ওই ঘরটার সামনে গিয়েছ নাকি?'

'হ্যাঁ, গিয়েছি। ঘরটায় বিশাল একটা তালা দেখলাম। হঠাৎ মনে হলো কেউ যেন ঘরের ভিতর থেকে শব্দ করছে। কেমন যেন গোঙানির শব্দ।'

'ওই ঘরটার সামনে তুমি আর কখনও যাবে না।'

'কেন, চাচা?'

'ওই ঘরটা সবসময় তালাবন্ধ থাকে। আমি কোনওদিন ওঘরটা খুলতে দেখিনি। কামাল স্যারের বাবা একদিন ওই ঘর বন্ধ করে আদেশ দিয়ে গেছেন কেউ যেন ওই ঘর না খোলে। এমনকী, ওই ঘরের কাছে যেতেও নিষেধ করেছেন।'

'ওই ঘরে কী আছে, চাচা?'

'আমি জানি না, মা।'

'চাচা, আমি ওই ঘরে যেতে চাই।'

'ভুলেও একথা মুখে আনবে না।'

'আমি জানি, ওই ঘরের চাবি আপনার কাছে আছে।'

'তুমি ভুল জানো। ওই ঘরের চাবি আমার কাছে নেই। আর ওই ঘরের চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেল, মা। বড়দের কথা শুনতে হয়।'

কিন্তু নাদিয়া মাথা থেকে চিন্তা ঝেড়ে ফেলল না। সে ওই ঘরে ঢোকার উপায় খুঁজতে থাকল। তার মাথায় তখন নিষিদ্ধ কিছু করার ইচ্ছা ঘুরপাক খাচ্ছে। প্রচণ্ড কৌতূহল তাকে গ্রাস করেছে। সে জানে প্রতিদিন ১০.৩০ থেকে ১১টার মধ্যে নজরুল চাচা বাইরে যায়। এই সুযোগটাই সে নিতে চায়। চুপি চুপি নজরুল চাচার রুমে ঢুকে চাবি নিতে হবে।

পরিকল্পনামাফিক পরদিন নজরুলের ঘরে ঢুকল নাদিয়া। টেবিলের উপরেই একগোছা চাবি দেখতে পেল। দেরি না করে চাবিগুলো তুলে নিয়ে দোতলায় চলে গেল নাদিয়া। দোতলার সেই রহস্যময় ঘরটার সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। তালাটা অনেক পুরনো। তাই নাদিয়া খোলার সুবিধার জন্য গতকাল বিকালেই তালার উপর তেল দিয়ে এসেছে।

কিছুক্ষণ চেষ্টার পর সঠিক চাবিটা খুঁজে পেল নাদিয়া। টুক করে তালাটা খুলে গেল। উত্তেজনা, ভয়ে ওর বুকটা ধুকধুক করে উঠল। কী আছে ওই ঘরে? আস্তে আস্তে ঘরটায় ঢুকে পড়ল ও। পুরো ঘরটা ধুলো আর মাকড়সার জালে ভর্তি। আর পুরো ঘরজুড়ে একটা ভাপসা গন্ধ। ঘরে কোনও জানালা বা ঘুলঘুলি নেই। বাইরের কোনও আলো এ ঘরে এসে পৌঁছায় না। নাদিয়া অবশ্য বুদ্ধি করে টর্চ নিয়ে এসেছে। টর্চ জ্বালতেই পুরো ঘর দেখতে পেয়েছে। পুরো ঘরে এলোমেলো ছেঁড়া কাগজ, কাঁচসহ বিভিন্ন জিনিস ছড়ানো ছিটানো। আর তেমন কিছু চোখে পড়ল না। হঠাৎ একটা জায়গায় একটা আবছা লাল বৃত্ত দেখতে পেল নাদিয়া। বৃত্তের পাশের দেয়ালে বড় বড় করে কিছু লেখা। দেখেই বোঝা যায় অনেকদিন আগের লেখা। লেখাটা ভাল করে পড়ার জন্য বৃত্তের মধ্যে ঢুকে পড়ল নাদিয়া।

BanglaBook.org

দেয়ালে লেখা ছিল, 'সাবধান! কোনও অবস্থাতেই এই লাল বৃত্তের মধ্যে প্রবেশ করবে না। নতুবা তোমার মাধ্যমে পিশাচটা বাইরে চলে যাবে।'

আবছা ওই লেখাটা পড়ে নাদিয়া কেমন যেন চমকে উঠল। বৃত্ত থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু ঠিক তখনই পুরো ঘরটা যেন কেঁপে উঠল। কেউ একজন ক্রমাগত শব্দ করতে লাগল। নাদিয়ার প্রচণ্ড ভয় লাগল। তার মনে হলো যেন ভারী কিছু তার ঘাড়ে চেপে বসেছে। তার মুখের রগগুলো স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠল। কোনও ভয়ঙ্কর শক্তির বলে নাদিয়ার পুরো শরীর কাঁপতে লাগল। নাদিয়া সমস্ত শক্তি দিয়ে ঘর থেকে বের হলো। কাঁপা হাতে ঘরে তালা লাগাল। তারপর চাবিগুলো আবার নজরুলের ঘরে রেখে এল। শরীরের অস্বস্তিগুলো পিছু ছাড়ল না নাদিয়ার। সারাদিন প্রচণ্ড গরম লাগল। আর মনে হলো ওর পুরো শরীর যেন অপবিত্র হয়ে গেছে।

নাদিয়া গোসল করতে ঢুকেছে। রাতে গোসল করার বদঅভ্যাস আছে তার। আজ শরীরের অস্বস্তি দূর করতে গোসলটা খুব দরকার ছিল ওর। গায়ে পানি ঢালল নাদিয়া। পানি হিমশীতল। শরীরটা যেন জুড়িয়ে গেল। নাদিয়া গুনগুন করে গান গাইতে শুরু করল। এমন সময় ইলেকট্রিসিটি চলে গেল। নাদিয়া অবাক। কারণ ওদের আইপিএস রয়েছে। তাই ইলেকট্রিসিটি যাওয়ার কোনও কারণ নেই। তা হলে কি আইপিএস নষ্ট হয়ে গেছে? নানা চিন্তা ওর মাথায় ঘুরপাক খেল। নাদিয়া তোয়ালে খুঁজতে শুরু করল। অন্ধকারে দিকভ্রান্ত হয়ে গেল। তবু হাতড়ে হাতড়ে তোয়ালেটা পেয়ে গেল। এমন সময় তোয়ালেটার উপর অন্য একটি হাতের স্পর্শ পেল নাদিয়া। প্রচণ্ড জোরে চিৎকার করে উঠল। ঠিক তখন দুটি হাত নাদিয়ার পুরো শরীর জুড়ে বিচরণ করতে লাগল। নাদিয়া পাগলের মত বাথরুমের ছিটকিনি খুঁজতে থাকল। কিন্তু ছিটকিনি খোলার পরও দরজা খুলল না। নাদিয়া শরীরে কারও গরম নিঃশ্বাস অনুভব করল। হঠাৎ অন্ধকারেই একটা ভয়ঙ্কর মুখ দেখতে পেল। পুরো মুখটা ক্ষতে ভরা। চোখগুলো কোটর থেকে বেরিয়ে আসছে। জিভটা অনেক বড় এবং দু'ভাগে বিভক্ত। অনেকটা সাপের জিভের মত। সাপ যেমন জিভ দিয়ে শিকারের অবস্থান দেখে ঠিক তেমনি সেই ভয়ঙ্কর মুখটা তার তেলতেলে জিভ নাদিয়ার মুখে বুলিয়ে নিল। ঘৃণা, ভয়ে নাদিয়ার শরীর গুলিয়ে উঠল। এক সময় পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ভয়ঙ্কর জিনিসটা নাদিয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাথরুমে হুটোপুটির শব্দ শোনা গেল। শক্ত দুটি হাত নাদিয়ার মাথা পানি ভর্তি বালতির মধ্যে চেপে ধরেছে। নাদিয়ার শ্বাস বন্ধ হবার অবস্থা। এমন সময় মা এবং নজরুল চাচার কণ্ঠ শুনতে পেল নাদিয়া। তাঁরা দরজা ভাঙতে শুরু করলেন। কারণ অনেকক্ষণ পার হয়ে গেছে নাদিয়া বাথরুম থেকে বের হয়নি। জোলেখা বেগম অনেক ডেকেও সাড়া পাননি। দরজা ভেঙে নাদিয়াকে উদ্ধার করা হলো। নাদিয়া অজ্ঞান হয়ে বাথরুমের মেঝেতে পড়ে আছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে তার উপর দিয়ে বড় কোনও ঝড় বয়ে গেছে।

BanglaBook.org

নাদিয়ার প্রচণ্ড জ্বর এসেছে। মাকে সেই ভয়ঙ্কর জিনিসটার বিষয়ে কিছুই বলেনি

৮

নাদিয়া। মা এমনিতেই বেশি চিন্তা করেন। তাঁর চিন্তা আরও বাড়ানোর কোনও অর্থ হয় না। জোলেখা বেগম ধরে নিয়েছেন তাঁর মেয়ে বাথরুমে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিল। এর বেশি কিছু তাঁর মাথায় আসেনি।

নাদিয়ার মধ্যে আশ্চর্য সব পরিবর্তন এসেছে। প্রায়ই ও কেমন একটা পচা গন্ধ পায়। এছাড়া যে-কোনও ছোট জিনিসেরও তীব্র ঘ্রাণ পায়। অনেকটা কুকুরের ঘ্রাণ শক্তির মত। কয়েকদিনেই নাদিয়ার ওজন ৫/৬ কেজি কমেছে। খাবারে রুচি নেই। আর শরীরটা খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে। ইদানীং আরও একটা আজব ব্যাপার ঘটছে। কাঁচা মাছ, মাংস খেতে খুব ভাল লাগে নাদিয়ার। সেদিন জোলেখা বেগম বাসায় ছিলেন না। তখন নাদিয়া আধা কেজি কাঁচা খাসির মাংস খেয়ে ফেলল। মাংসটা খেয়ে সে খুব তৃপ্তি পেল। এমন তৃপ্তি সে অনেকদিন পায়নি। জোলেখা বেগম সেদিন মাংস খুঁজে না পেয়ে খুব অবাক হলেন। নাদিয়ার নীরবতায় ধরে নিলেন বিড়ালের কাজ। তবে তিনি বুঝতে পারছেন এ বাসার পরিবেশ কেমন যেন অন্যরকম হয়ে গেছে। সবসময় কেমন যেন একটা গা ছমছমে ভাব বিরাজ করে। নাদিয়াও কেমন যেন বদলে গেছে। রাতে ঘুমায় না, একটুতেই রেগে যায়। খাওয়া-দাওয়া করতে চায় না। জোলেখা বেগম সেদিন অবাক হয়ে লক্ষ করলেন পুরো বাড়িতে অসংখ্য লাল লাল ছোপ। আর সারা ঘর জুড়ে প্রায়ই একটা পচা গন্ধ বিরাজ করছে। জোলেখা বেগম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এ বাড়িতে আর থাকবেন না। এবার নাদিয়ার বাবা ছুটিতে এলেই বাসা বদলানোর চেষ্টা করবেন।

সেদিন জোলেখা বেগম ব্যাংকের কিছু জরুরি কাজে বাইরে গেছেন। নজরুলকে নাদিয়ার কাছে রেখে গেছেন। মেয়েটা এ লোকটিকে খুব পছন্দ করে। আর অসুস্থ একটা মেয়েকে তো একা রেখে যাওয়া যায় না।

নাদিয়া তার খাটের উপর বসে নজরুলের সাথে গল্প করছে। হঠাৎ নজরুল চিন্তিত গলায় বলল, 'মা, ঠিক করে বলো তো, তুমি কি ওই ঘরে ঢুকেছিলে?'

'হ্যাঁ, চাচা, ঢুকেছিলাম।'

'তোমাকে আমি নিষেধ করেছিলাম, মা। ওই ঘরে অশুভ একটা কিছু বন্দি ছিল। যা এখন তোমার মাধ্যমে খোলা বাতাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যে-কোনও সময় বড় কোনও অঘটন ঘটতে পারে।'

'কী বলছেন, চাচা!'

'হ্যাঁ, একদিন আমিও কৌতূহলের বশে ওঘরে ঢুকে পড়েছিলাম, আমার কাছে ওই ঘরের চাবি ছিল না। আমি তালাচাবিওয়ালা ডেকে এনে ওই ঘরের চাবি তৈরি করেছিলাম। তবে আমার ভাগ্য ভাল যে আমি লাল দাগের ভিতরে ঢুকিনি। সেদিন আমি একটা ভয়ঙ্কর মুখ দেখেছিলাম। সে মুখ কোনও মানুষের হতে পারে না। অনেকটা পশুর মুখের মত দেখতে। হিংস্র কিন্তু অসুস্থ কোনও পশু। হঠাৎ মনে হলো সে পশুটা আমার বাম হাত ধরে ফেলেছে। আমি ঝটকা মেরে সরানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু কোনও কাজ হলো না। সে আরও জোরে আমার হাত ধরে টান দিল। আমাকে লাল বৃত্তের মধ্যে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু দেয়ালের

BanglaBook.org

লেখাগুলো আমি আগেই লক্ষ করেছিলাম। হঠাৎ ওই পিশাচটা আমার বাম হাত কামড়ে ধরে। আমি ব্যথায় চিৎকার করতে থাকি। আর হিংস্র পিশাচটা আমার রক্ত চুষে চুষে খেতে থাকে। মনে হলো ও খুব তৃষ্ণার্ত। এরপর আমার বাম হাতের বিভিন্ন স্থানে খাবলে খাবলে মাংস খেতে চেষ্টা করে। আমি কোনওমতে নিজেকে ছাড়িয়ে নিই। হঠাৎ দেয়ালের অন্য পাশে কিছু লেখা চোখে পড়ল। ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলাম সেখানে লেখা: যদি পিশাচটা কখনও মুক্ত হয়ে যায় তবে এই কবজটা তোমায় রক্ষা করতে পারে। আমি দেয়ালে অনেক পুরনো একটা কবজ দেখতে পেলাম। সাথে সাথে সেটা তুলে নিলাম। তারপর দ্রুত ওই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। কিছুদিনের মধ্যেই আমার বাম হাতটা ফুলে উঠল। ভিতরে প্রচণ্ড যন্ত্রণা। হাতের অনেক জায়গায় পচন ধরল। শেষমেশ ডাক্তারের পরামর্শে হাতটা কেটে ফেলি।

'চাচা! কী বলছেন এসব! আমার এখন কী হবে?!'

'পিশাচটা তোমার পিছনে লেগেছে, মা। ও তোমাকে মেরে ফেলতে চায়। কারণ তোমাকে যদি আবার লাল বৃত্তের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয় তবে ও আবার বন্দি হয়ে যাবে।'

'পিশাচটা এখন কোথায়?'

'ও তোমার শরীরের মধ্যেই আছে।'

'অ্যাঁ!'

'নাদিয়া, একটু উঠে দাঁড়াও তো, মা।' নাদিয়া উঠে দাঁড়াল। হঠাৎ সে নজরুলের হাতে দড়ি দেখতে পেল।

'দড়ি দিয়ে কী হবে, চাচা?'

নজরুল উত্তর না দিয়ে এক হাত দিয়েই নাদিয়াকে শক্ত করে বাঁধার চেষ্টা করল।

'কী করছেন, চাচা! বাঁধছেন কেন?'

'কারণ, আমি তোমাকে ওই ঘরে নিয়ে যাব।' কথাটা শুনে মুহূর্তেই নাদিয়ার চেহারা বদলে গেল। পেশিগুলো টানটান হয়ে উঠল। চোখগুলো জ্বল জ্বল করতে থাকল। জিভ নাড়াতে নাড়াতে নাদিয়া ভয়ঙ্কর ভাবে চিৎকার করে উঠল, হিসহিসে গলায় বলল, 'না। আমি ওই ঘরে যাব না। যাব না। যাব না...'

'যেতে হবে। তোমায় যেতে হবে।'

'না। না। কিছুতেই না।' নাদিয়ার গলায় অন্য কেউ কথা বলছে। হঠাৎ নাদিয়া দড়ি টেনে ছিঁড়ে ফেলল। তারপর এক ঝটকায় একটা চেয়ার শূন্যে তুলে নিয়ে সজোরে নজরুলের দিকে ছুঁড়ে দিল। নজরুল এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। কয়েক মুহূর্ত সে চোখে মুখে অন্ধকার দেখল।

নজরুল হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বলল, 'শান্ত হ। শান্ত হ বলছি। এই দেখ।' নজরুল এতদিন ধরে যত্নে রাখা কবজটা বের করল।

কবজটা দেখে নাদিয়া কেমন যেন শান্ত হয়ে গেল। এরপর ভয়ঙ্কর পুরুষালি গলায় বলল, 'কাছে আসবি না। খবরদার, কাছে আসবি না। আমি কিন্তু এই

BanglaBook.org

মেয়েটাকে মেরে ফেলব।'

হঠাৎ নাদিয়ার শরীর মাটি থেকে কয়েক ফুট উপরে উঠে গেল। সেই পুরুষালি গলায় আবার বলল, 'তুই আরও কাছে আসলে আমি কিন্তু কাপড় খুলে ফেলব।'

নজরুল কথায় কান না দিয়ে নাদিয়ার দিকে এগিয়ে গেল। এ সময় নাদিয়া টেনে হিঁচড়ে নিজের সব কাপড় খুলে ফেলল। নজরুল এক মুহূর্ত চোখ বন্ধ করে, তারপর চোখ খুলে নাদিয়ার নগ্ন শরীর দেখতে পেল। নাদিয়ার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় লাল লাল ছোপ রয়েছে। মনে হচ্ছে ওর শরীরের মধ্য দিয়ে কিলবিল করে কিছু ঘুরে বেড়াচ্ছে। নজরুল ভাবল তার পিছিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। সে পিছিয়ে গেলে পিশাচটা নাদিয়াকে মেরে ফেলবে।

আবার নাদিয়ার কণ্ঠে কেউ বলল, 'কী রে, আমার শরীরটা কেমন? পছন্দ হইছে? আদর করবি? হিঃ হিঃ হিঃ।'

নজরুল নাদিয়ার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল। নাদিয়া মাটিতে শুয়ে গোঙাতে থাকল। নজরুলের কাছে কবজটা থাকায় পিশাচটা কোনও ক্ষতি করতে পারছে না। তবে এত সহজে সে হাল ছেড়ে দিতে রাজি নয়। নজরুল নাদিয়াকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গেল। নাদিয়া চিৎকারের পর চিৎকার করতে থাকল। চিৎকার শুনে দারোয়ানও ছুটে এল। নজরুল নাদিয়ার চুল ধরে দোতলার সিঁড়ি পর্যন্ত নিয়ে গেল। দারোয়ান দৌড়ে এসে বলল, 'একী! নজরুল ভাই! মাইয়াডার একী অবস্থা করছেন? ছিঃ ছিঃ। ছাইড়ে দেন। আপনার কি মাথা খারাপ হইছে?'

নজরুল কোনও কথায় কান না দিয়ে নাদিয়াকে টেনে-হিঁচড়ে দোতলায় নিয়ে গেল। নাদিয়া বারবার তার পায়ে কামড় দিতে চাইছে, আঘাত করার চেষ্টা করছে। তবু নজরুল থামছে না। দারোয়ান ছুটল লোক আনতে। হঠাৎ নজরুল দেখতে পেল নাদিয়ার চোখ, নাক দিয়ে অস্বাভাবিকভাবে রক্ত পড়ছে। সে বুঝতে পারল নাদিয়াকে বাঁচাতে হলে আর বেশি সময় নষ্ট করা যাবে না। দোতলার ওই ঘরটা আগে থেকেই খুলে রেখে গেছে নজরুল। দেরি না করে নাদিয়াকে নিয়ে নজরুল ওই ঘরে ঢুকে পড়ল। নাদিয়া হিংস্র পশুর মত আস্ফালন করছে। ধাক্কা দিয়ে নাদিয়াকে লাল বৃত্তের মধ্যে ফেলে দিল নজরুল। মুহূর্তেই নাদিয়ার চিৎকার বহুগুণে বেড়ে গেল। মনে হলো প্রচণ্ড যন্ত্রণায় তার শরীরটা নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। নজরুল ব্যথাতুর চোখে নাদিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকল। নাদিয়ার শরীরে খিঁচুনি শুরু হয়ে গেল। মৃগী রোগীর মত শরীরটা কাঁপতে থাকল। ভয়ঙ্কর সব গালাগালি করতে লাগল, সেই সাথে তীব্র আর্তনাদ। হঠাৎ অসুরের মত শক্তি নাদিয়াকে লাল বৃত্তের বাইরে ছুঁড়ে দিল। নাদিয়া তখন পুরোপুরি অচেতন। নজরুল বুঝতে পারল পিশাচটা বন্দি হয়ে গেছে। সে নাদিয়াকে বাইরে নিয়ে এসে ঘরের দরজায় তালা লাগিয়ে দিল। এমন সময় জোলেখা বেগম, কয়েকজন লোক এবং দারোয়ান দোতলায় ছুটে এল। নাদিয়ার এমন অবস্থা দেখে মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন জোলেখা বেগম।

BanglaBook.org

পরিশিষ্ট

নাদিয়ার সম্ভ্রম হানির অভিযোগে নজরুলের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হলো। তার সত্য কথাগুলো কেউ বিশ্বাস করতে রাজি হয়নি। নাদিয়াও অবশ্য কিছু বলার সুযোগ পায়নি। তাকে তড়িঘড়ি করে লণ্ডনে তার খালার কাছে পাঠিয়ে দেয়া হলো। আবার এদিকে নজরুলের বিরুদ্ধে মামলা চলতে থাকল। নজরুলের বিরুদ্ধে জোলেখা বেগম এবং দারোয়ান সাক্ষী দিল। নজরুল পরে আর অভিযোগ অস্বীকার করেনি।

লণ্ডনে খালা এক প্রবাসী ছেলের সাথে নাদিয়ার বিয়ে দেন। নাদিয়ার মাঝে মাঝে নজরুল চাচার জন্য খুব কান্না পায়। সে জানে নজরুল চাচা তার কোনও অসম্মান করেননি, বরং তিনিই সেদিন ওকে বাঁচিয়েছিলেন। নাদিয়া তার স্বামী সোয়েবকে জীবনের সব দুর্ঘটনার কথা খুলে বলল। সোয়েব পুরো বিষয়টিই সহজভাবে নিল এবং বিশ্বাস করল। তারা সিদ্ধান্ত নিল পরের মাসে দেশে এসে নজরুল চাচাকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে। কিন্তু তাদের দেশে আসার এক সপ্তাহ আগেই জেলের মধ্যেই তার মৃত্যু হলো।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

দূষিত রক্ত

সোমবার দিনটা কখনোই ভাল লাগে না রূপন্তীর। তার জীবনের বড় বড় দুর্ঘটনাগুলো সোমবারে ঘটেছে। দশ বছর আগে এক সোমবারে সে তার বাবাকে হারিয়েছে। এস.এস.সি পরীক্ষায় বিজ্ঞান পরীক্ষার দিন সে ধর্ম পড়ে গিয়েছিল। সেদিনও ছিল সোমবার। আপন নামের যে ছেলেটিকে সে জীবনের চেয়েও বেশি ভালবাসত, সেই আপনও তার ভালবাসা প্রত্যাখ্যান করেছিল এক সোমবারে। এমনিভাবে সোমবার দিনটা রূপন্তীর জন্য আতঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতি সোমবার সে ভয়ে ভয়ে থাকে, না জানি এ সোমবার কী অপেক্ষা করছে তার জন্য। তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে, রূপন্তী পৃথিবীর আলো দেখেছিল এক সোমবারে।

রূপন্তী আকাশের দিকে তাকাল। আকাশে সূর্যটা যেন আগুন ছড়াচ্ছে। মনের ভিতর কে যেন বারবার বলছে, 'আজ সোমবার। আজ সোমবার।' একটা ভয়ের শিহরণ বয়ে যায় ওর শরীরের মধ্য দিয়ে। ভয়টাকে এক পাশে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে রূপন্তী বাসে উঠে বসল। রূপন্তীর গন্তব্য চট্টগ্রাম। খুলনা থেকে চট্টগ্রাম যাওয়া কঠিন বিষয়। কমপক্ষে ১৩/১৪ ঘণ্টা লাগবে। আর আরিচা ঘাটে জ্যাম বেশি হলে তো কথাই নেই।

রূপন্তীর সিট নম্বর সি-৪, সহযাত্রী কেমন হবে এ নিয়ে সে বেশ চিন্তিত। কোনও ছেলে হলে বড় সমস্যা। একবার ঢাকা যাওয়ার পথে পঞ্চাশোর্ধ্ব এক লোক রূপন্তীর পাশে বসেছিল। ও নিশ্চিন্ত বোধ করেছিল। বয়স্ক মানুষ, তাকে নিয়ে চিন্তা নেই। কিন্তু আধ ঘণ্টা যেতে না যেতেই লোকটি ঘুমে ঢলে পড়তে লাগল। একসময় রূপন্তীর কাঁধের উপর পড়ল লোকটি। রূপন্তী চমকে উঠে লোকটিকে জাগাল। লোকটি জেগে উঠে বিব্রত মুখে তাকাল। তবে ব্যাপারটা এখানেই শেষ হলো না। দুঘণ্টায় গোটা পঞ্চাশবার সে রূপন্তীর কাঁধে মাথা রাখল। শেষ পর্যন্ত সুপারভাইজারকে বলে সিট পরিবর্তন করল রূপন্তী।

আজও রূপন্তীর পাশে একটা লোক এসে বসল। লোকটির বয়স ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে। চোখে কালো সানগ্লাস। পরনে সিল্কের লাল পাঞ্জাবী আর জিন্স প্যান্ট। মাথায় হ্যাট। এই গরমেও লোকটার দুহাতে মোজা রয়েছে। লোকটিকে দেখতে বড্ড অদ্ভুত লাগছে। রূপন্তী বারবার আল্লাহর নাম স্মরণ করতে লাগল। আজ কপালে কী আছে কে জানে! লোকটির হাবভঙ্গি ভাল নয়। মাত্র দুপুর দুইটা বাজে। এমন লোকের সাথে দিন রাত মিলিয়ে তেরো-চোদ্দ ঘণ্টা থাকতে হবে ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিল রূপন্তীর। কে জানে কী মতলব লোকটির। হয়তো বা

BanglaBook.org

রাতের বেলা সুযোগ বুঝে রূপন্তীর শরীরে হাত দেবে, কিংবা...লোকটি অবশ্য সিটে বসেই পত্রিকা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। লোকটির হাতে তিনটি পত্রিকা। দুটো বাংলা, একটা ইংরেজি। লোকটা সানগ্লাস খুলে রেখে একটা সাদা ফ্রেমের চশমা পড়ল। রূপন্তী লোকটির চোখ দেখতে পেল। লোকটির চোখে কেমন যেন একরকম মায়া রয়েছে। আর ভুরু যেন শিল্পীর তুলিতে আঁকা, এত সুন্দর চোখ সানগ্লাস দিয়ে ঢেকে রাখার কোনও অর্থ হয় না। লোকটি পত্রিকা পড়ার মাঝে বিস্কুট খেল, চিপস, চানাচুর খেল। রূপন্তী বেশ অস্বস্তির মধ্যে ছিল, না জানি লোকটি হয়তো হুট করে বলে বসবে, 'আপনিও নিন না।' এরপর খাতির জমাবার চেষ্টা করবে। কিন্তু প্রায় তিন ঘণ্টা লোকটি শুধু পত্রিকা নিয়েই ব্যস্ত থাকল। রূপন্তী ভিতরে ভিতরে জ্বলতে থাকল। এই তিন ঘণ্টার মধ্যে লোকটি একবারও তার দিকে তাকায়নি। রূপন্তী এখনও তরুণ বয়সের মধ্যে রয়েছে। সবদিক থেকেই সে আকর্ষণীয়। তার উপর সে খুব পোশাক সচেতন। কোন্ পোশাকে তাকে মানাবে আর কোন্ পোশাকে তাকে মানাবে না এ সম্পর্কে তার স্পষ্ট ধারণা রয়েছে। সে খুব চিকন নয়, আবার বেশি মোটাও নয়। এককথায় ছেলেদের কল্পনায় যেমন মেয়ের ছবি আঁকা থাকে, রূপন্তী অনেকটা সেরকম। আর এই কিম্ভূতকিমাকার লোকটি একবারও তার দিকে তাকাল না। মনে মনে অবাক হয় রূপন্তী। কিংবা এটা হয়তো লোকটির কোনও কৌশল। প্রথমদিকে আগ্রহ দেখাবে না, পরবর্তীতে ঘুমানোর ভান করে গায়ে এলিয়ে পড়বে। রাতে গায়ে হাত দেয়ার সুযোগ খুঁজবে...

প্রচণ্ড গতিতে গাড়ি ছুটে চলেছে। হঠাৎ ড্রাইভার একটা স্পিড ব্রেকার পূর্ণগতিতে অতিক্রম করল। গাড়িটা জীবন্ত প্রাণীর মত কেঁপে উঠল। অ্যাক্সিডেন্ট হতে হতেও হলো না। সামনের প্রায় সব যাত্রী হাতে, মাথায় আঘাত পেল। তবে কারও গুরুতর কিছু হলো না। রূপন্তীও ছিটকে পাশের লোকটির উপর পড়ল। যাত্রীরা চেঁচামেচি শুরু করল। ড্রাইভার গাড়ি থামাল। কয়েকজন কমবয়সী ছেলে ড্রাইভারকে মারতে এগিয়ে গেল। চেঁচিয়ে বলল, '...বুঝে গাড়ি চালাস না। আজ তোরে...'

তাদের পিছে পিছে আরও অনেক যাত্রী ড্রাইভারের দিকে এগিয়ে গেল। যাত্রীদের চেঁচামেচি বাড়তে লাগল। রূপন্তীর পাশের লোকটিও ড্রাইভারের দিকে এগিয়ে গেল। রূপন্তী বুঝল সেও ড্রাইভারকে মারতে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু লোকটি গিয়ে ছেলেগুলোকে ঠেকাল। চিৎকার করে বলল, 'সবাই থামুন। সবাই থামুন। কেউ উনার গায়ে হাত দিবেন না। উনি একটা ভুল করেছেন। আর করবেন না।'

কমবয়সী একটা ছেলে বলল, 'গাড়িটা তো পুরো নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছিল। ড্রাইভারের এমন ভুলের জন্যই প্রতিদিন এত যাত্রী মারা যায়।'

অন্য যাত্রীরাও ছেলেটির কথায় সায় দিল।

কিন্তু লোকটি স্রোতের বিপরীতে কথা বলতে লাগল। যাত্রীদের শান্ত করল।

গাড়ি আবার চলতে শুরু করল।

লোকটি আবার নিজের সিটে বসে পত্রিকা পড়া শুরু করল। রূপন্তী বলল,

BanglaBook.org

'আপনি তো খুব সাহসী।'

'এখানে সাহসের কিছু নেই। আমার যা মনে হয়েছে করেছি।'

'তবু এতগুলো লোকের বিপরীতে কথা বলতে অবশ্যই সাহস লাগে। আপনার নামটা জানতে পারি?'

'রবিউল চৌধুরী।'

'আমি রূপন্তী। খুলনার একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার। আপনি কী করেন?'

'আমি গার্মেন্টিস ব্যবসার সাথে যুক্ত আছি।'

'আপনি নামবেন কোথায়?'

'আমি কুমিল্লায় নামব। ওখানে আমার বাবা-মা থাকে।'

'আপনিও কি কুমিল্লায় থাকেন?'

'না। আমি ঢাকায় থাকি। আমার এক চাচা খুব অসুস্থ, তাই খুলনা এসেছিলাম, এখন মায়ের সাথে দেখা করার জন্য কুমিল্লা যাচ্ছি।'

'কোনও বিশেষ দরকার আছে মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, মা আমাকে বিয়ে দেয়ার জন্য একটা মেয়ে পছন্দ করেছেন।'

'ভাল তো!'

'কিন্তু আমি বিয়ে করব না।'

'কেন? বিয়ের বয়স তো আগেই হয়েছে। তবে বিয়ে করতে আপত্তি কোথায়? মেয়ে পছন্দ হয় না?'

রবিউল হেসে বলল, 'না, ঠিক তা না।'

রাত আটটা বাজে। ফেরিতে দাঁড়িয়ে আছে রূপন্তী এবং রবিউল। ফেরি এখনও চালু হয়নি। একের পর এক বাস ট্রাক ফেরিতে উঠছে। হঠাৎ একটি ট্রাক দ্রুতগতিতে ফেরিতে উঠল। ওদের দেখেও স্পিড কমানোর চেষ্টা করল না ড্রাইভার, রূপন্তী হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল। রবিউল ঝটকা মেরে রূপন্তীকে সরিয়ে দিল।

ড্রাইভার কড়া ব্রেক করল। তবু ট্রাকটা পুরোপুরি থামল না, মৃদু আঘাত করল রবিউলকে। পড়ে গেল ও, উঠে দাঁড়াল ক্রোধ নিয়ে। লাফিয়ে উঠে কলার ধরে ড্রাইভারকে নীচে নামাল। ঘুসি মারতে উদ্যত হলো। কিন্তু অন্যান্য মানুষের বাধায় সেটা করতে পারল না। ড্রাইভার জানাল তার কোনও দোষ নেই। সে নাকি প্রথমে ওদের দেখতেই পায়নি। অন্যদিন হলে ড্রাইভার হয়তো তর্ক জুড়ে দিত। কিন্তু জনগণ রবিউলের পক্ষে দেখে মাফ চেয়ে নিল সবার কাছে।

রূপন্তী রবিউলের কাছে ছুটে এল। 'আপনি ঠিক আছেন তো?'

'হ্যাঁ।'

'আপনাকে থ্যাংকস।'

'কেন?'

'আমাকে বাঁচানোর জন্য।'

BanglaBook.org

'ওটা হুট করে হয়ে গেছে। কৃতিত্বটা আমার নয়, পরিস্থিতির।'

'ভাল বলেছেন। আপনার সাহসের তারিফ করতে হয়, যেভাবে ড্রাইভারকে কলার ধরে নামালেন। আপনি যখন ওই বদমাশটাকে ঘুসি মারতে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, আমি চোখ বন্ধ করে ফেলেছি।'

'ওকে মারা দরকার ছিল। এমন ভুল ও আবার করবে।'

'আমার বুকের ভিতরটা এখনও কাঁপছে।'

'ভুলে যান এসব। উপরে যাবেন?'

'হ্যাঁ, চলুন।'

রবিউল এবং রূপন্তী ফেরিতে রেস্টুরেন্টে খাওয়া দাওয়া করছে। খাওয়া শেষে তারা ফেরির সবচেয়ে উপরের তলায় উঠে গেল। এখান থেকে রাতের নদীটা অদ্ভুত সুন্দর দেখায়। উপরে বাতাসের বেগ খুব বেশি। রূপন্তীর চুল বাতাসে উড়ছে। মনটা কেমন যেন উদাস হয়ে গেল ওর। রবিউলকে খুব আপন মনে হলো। রূপন্তী বলল, 'আপনি এই গরমে হাত মোজা পরে আছেন কেন? খাওয়ার সময়ও দেখলাম মোজা খুললেন না। চামচ দিয়ে খেলেন।'

রবিউল হেসে বলল, 'আমি আমার হাত সবসময় ঢেকে রাখি। কাউকে দেখাতে চাই না।'

'কেন?' রবিউল হাতের মোজা খুলে ফেলল। রূপন্তী চমকে উঠল। দু'হাতের তালুতে অসংখ্য কাটা চিহ্ন। কাটা চিহ্নগুলো দেখে মনে হচ্ছে যেন সুনিপুণভাবে এগুলোর সৃষ্টি হয়েছে। ডান হাতের কিছু অংশে এখনও ব্যাণ্ডেজ করা। সেখানের ক্ষতটা মনে হচ্ছে নতুন।

'এ কী! আপনার হাতে এত কাটা চিহ্ন কেন?'

'আমি নিজেই আমার হাত কেটে রক্ত ঝরাই।'

'মানে!! ঠিক বুঝলাম না।' রূপন্তী ভয় পেয়ে গেল। লোকটা পাগল না তো!

'আমার এবং আমার বন্ধু কালামের জীবনে কিছু অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল। সেজন্যই আমার হাতের আজ এ অবস্থা।'

'আমি কি ঘটনাগুলো জানতে পারি?'

'আমি বলতে পারি। আর গল্প বলার জন্য পরিবেশটাও চমৎকার। রাতের অন্ধকার, ঝড়ো বাতাস, মৃদু আলো। আসুন ওই পাশটায় বসি। ওপাশে শব্দ কম।'

'আচ্ছা, চলুন।'

রবিউল বলতে শুরু করল:

আমি এই ঘটনাগুলোর মাঝে আপনাকে একটা চিঠি পড়ে শোনাব। চিঠিটা সবসময় আমার পকেটে থাকে। আমার বন্ধু কালামের লেখা চিঠি। যা হোক, অনেক বছর আগের কথা বলছি। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে অনার্স পড়ছি। ক্লাসে আমার মনোযোগ কম। মনোযোগ বাইরের দিকে। সিনেমা দেখতে, আড্ডা দিতে ভাল লাগে। আমি সবসময় সংস্কৃতিমনা। নাটক,

BanglaBook.org

উপস্থাপনা, বিতর্ক, সাহিত্য চর্চা সর্বত্রই ছিল আমার উপস্থিতি। ক্লাসে সবার সাথেই আমার খুব ভাল সম্পর্ক ছিল। আমাদের ক্লাসে কালাম নামে একটা ছেলে ছিল। ছেলেটা কারও সাথে তেমন কথা বলত না। তার মধ্যে ছিল রহস্যের গন্ধ। মাথা নিচু করে ক্লাসে আসত, মাথা নিচু করে চলে যেত। তার হাতে প্রায়ই ব্যাণ্ডেজ দেখতাম। সেটা ছিল আরও রহস্যজনক। আমি ছেলেটিকে গভীরভাবে লক্ষ্য করতে লাগলাম। একদিন তাকে ইউনিভার্সিটির বাসে পেয়ে গেলাম। আমি ওর পাশে বসলাম। আপন বন্ধুর মত ওর কাঁধে হাত রাখলাম। বললাম, 'কী রে, কালাম, কেমন আছিস?'

কালাম জবাব দিল না।

'তুই ক্লাসে কারও সাথে কথা বলিস না কেন?'

'ভাল লাগে না।' স্পষ্ট গলায় কালাম বলল।

'আগামীকাল আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক শুরু হবে। আমি প্রতিযোগী হিসাবে আছি। তুই অবশ্যই আসবি।'

'না। আমার এসব ভাল লাগে না।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে। তোর আসতে হবে না।' একটু থেমে বললাম, 'তোর হাতে প্রায়ই ব্যাণ্ডেজ দেখি। এত হাত কাটে কীভাবে?'

কালাম চুপ করে রইল। এসময় বাস ছেড়ে দিল। বাস ছাড়া মাত্র কালামের মুখে কেমন যেন দুঃশ্চিন্তার চিহ্ন ফুটে উঠল। চেঁচিয়ে বলল, 'ড্রাইভার সাহেব, আস্তে চালান।'

আমি কালামের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কিন্তু ওকে আর ঘাঁটালাম না।

এরপর থেকে কালামের সাথে খাতির করার অনেক চেষ্টা করলাম। আঠার মত ওর পিছে লেগে থাকতাম। কালাম হাতিরপুলের একটা বাসায় এক রুম নিয়ে থাকত। রান্নাবান্না সব নিজেই করত। একদিন ওর বাসায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। আমাকে দেখে কালাম খুব বিরক্ত হলো। বলল, 'তুমি! এখানে কী মনে করে?'

'ভাবলাম তোর সাথে আড্ডা দিব।'

'আমার এসব ভাল লাগে না। আমাকে আর ডিস্টার্ব করবে না।'

আমার মেজাজ খুব খারাপ হয়ে গেল। চেঁচিয়ে বললাম, 'নিজেকে কী মনে করিস তুই? তোকে দেখে আমার মনে হয়েছে তোর মনে অনেক কষ্ট। হয়তো কাউকে বলতে পারিস না। আবার কারও সাথে বন্ধুত্ব করার সাধ্যও তোর নেই। তাই তোর সাথে মিশতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তুই একটা বদরাগী, অসামাজিক, আহাম্মক।'

কালাম হঠাৎ বিব্রত বোধ করে। আমার রাগ কমাবার চেষ্টা করে। লজ্জিত গলায় বলে, 'সরি। আজ হাতটা কেটেছি তো তাই মন মেজাজ দুটোই খারাপ।'

'হাত কেটেছিস, মানে!!!'

কালাম হতাশ গলায় বলল, 'আমি খুব কষ্টে আছি। খুব কষ্টে...'

'আমাকে সবকিছু বলতে পারিস। আমি তোকে সাহায্য করার চেষ্টা করব।'

'আমাকে কেউ সাহায্য করতে পারবে না।'

BanglaBook.org

'তবু বল।'

'কাউকে বলবে না, কথা দাও।'

'কথা দিলাম।'

'আচ্ছা, তোমায় সব বলব। তবে আজ না। অন্যদিন।'

আমি লক্ষ করলাম কালামের ডান হাতের তালুতে ব্যাণ্ডেজ। ব্যাণ্ডেজ চুইয়ে চুইয়ে রক্ত পড়ছে। দুহাতে অসংখ্য কাটা চিহ্ন। আমি বারবার শিউরে উঠতে লাগলাম।

পরবর্তী কয়েকদিন কালামের দেখা পেলাম না। মনে মনে ওর কথাগুলো শোনার ব্যাপারে উদ্‌গ্রীব ছিলাম। হঠাৎ আমার হলের ঠিকানায় কালামের চিঠি এল। চিঠি পেয়ে আমি অবাক হলাম। বেশ কিছুদিন ক্লাসে আসছে না কালাম। ব্যাপারটা কী? দ্রুত চিঠি খুললাম। অনেক বড় চিঠি। চিঠিতে লেখা ছিল:

রবিউল,

তোকে তুই বলব না তুমি বলব এ নিয়ে কনফিউজড ছিলাম। শেষ পর্যন্ত তুই করে বলাই ঠিক করলাম। আমার শরীরটা খারাপ। তাই কিছুদিন ক্লাসে আসব না। আমার ভিতরে প্রবল কিছু সমস্যা রয়েছে, যা কাউকে বলতে পারি না। কেন জানি তোকে সবকিছু বলতে ইচ্ছা করছে। হয়তো তুই আমার মনের দুর্বল জায়গাটায় আঘাত করেছিস, এজন্য।

আমার জন্ম ঝিনাইদহে। আমার বাবা ছোটখাট ব্যবসায়ী ছিলেন। কিন্তু তাঁর অর্থের কোনও অভাব ছিল না। আমার পরিবারটা ছিল অন্যরকম। বাবা-মা দুজনের চরিত্রেই অনেক ত্রুটি ছিল। বাবা গোপনে মাদক ব্যবসা করতেন। এ ছাড়া প্রায় রাতেই তিনি বাড়ি ফিরতেন না। লোকমুখে শুনতাম তাঁর নাকি খারাপ জায়গায় যাওয়ার অভ্যাস আছে। এসব নিয়ে মায়ের কোনও ভ্রূক্ষেপ ছিল না। মাকে আমার সবসময় বেশ অদ্ভুত লাগত। বিচিত্র সাজসজ্জা ছিল তাঁর। আমি একমাত্র সন্তান হওয়াতেও আমার প্রতি তাঁর কোনও লক্ষ ছিল না। আমি বড় হচ্ছিলাম নিজের মত করে। কিশোর বয়সে আমি বড় একটা ধাক্কা খাই। তখন আমার বয়স চোদ্দ পনেরো হবে। সেদিন আগেভাগে স্কুল থেকে চলে এসেছিলাম। বাসায় এসে দেখি বাইরের দরজা খোলা। কিন্তু মায়ের ঘরের দরজা ভিতর থেকে আটকানো। ভিতর থেকে মায়ের গোঙানির শব্দ শুনতে পাচ্ছি। আমি দ্রুত জানালার পাশে চলে গেলাম। দেখলাম মা পাশের বাসার আনিস চাচার সাথে আদিম খেলায় মেতে উঠেছেন। আমার শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল। দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। কেন জানি রাস্তা দিয়ে দৌড়াতে লাগলাম। বাসায় ফিরলাম অনেক রাতে। মা দরজা খুলে দিলেন। বাবা তখনও বাসায় ফেরেননি। মায়ের মুখে পান। চুল বেণী করা। তাঁকে দেখলেই মনে হয় তিনি খুব সুখে আছেন। তিনি আমাকে 'কালা' বলে ডাকেন। এই নামে ডেকে তিনি খুব মজা পান।

আমি মায়ের দিকে তাকাতে পারছিলাম না। আমার শরীরটা বারবার কেঁপে

উঠছিল। চোখ থেকে পানি পড়তে লাগল। মা আমার দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট গলায় বললেন, 'কালা, তুই আজ সব দেখেছিস আমি জানি। আজ তুই খুব কষ্ট পেয়েছিস। কিন্তু এরপর থেকে তোর অভ্যাস হয়ে যাবে। কারণ এমনটা আগেও অনেক হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে। তোকে আজ আমার কিছু কথা বলতে হবে। তুই বুঝবি কি না জানি না। তবু বলব, কালা, আমি খারাপ পাড়ার মেয়ে। আমার জন্মও খারাপ পাড়ায়। আমি জানি না কে আমার বাবা, কে আমার মা। তোর বাবা একদিন ওই পাড়ায় গিয়ে আমাকে পছন্দ করে ফেলে। পরে আমাকে বিয়ে করেন। এমন বিয়ে তার অনেক আছে। আমাদের বিয়ের পর থেকে তোর বাবা তার মত করে অন্ধকার জগতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমি আমার মত করে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমরা কেউই কারও কাজে বাধা দেই না। তুই নিজেকে দুর্ভাগা ভাবতে পারিস যে এমন দুজন মানুষ তোর বাবা-মা। কিন্তু এটাই বাস্তব।'

সেদিন রাতে হঠাৎ আমি কালা থেকে পুরোপুরি কালাম হয়ে গেলাম। আমার মনে হলো আমি এই অন্ধকার থেকে পুরোপুরি দূরে চলে যাব। নতুন জীবন গড়ব।

এর কিছুদিন পর বাবাকে মাদক ব্যবসা এবং জোড়া খুনের অপরাধে পুলিশ গ্রেপ্তার করল। মা বাবাকে ছাড়ানোর অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু কোনও লাভ হলো না। বাবার ফাঁসির আদেশ হয়ে গেল। জেলে থাকতে থাকতে বাবা পৃথিবীর উপর মায়া হারিয়ে ফেললেন। জেলে বসে আত্মহত্যা করলেন। বাবার মৃত্যুর পর মা কেমন বদলে গেলেন। কথা বলা কমিয়ে দিলেন। উদ্ভট সাজগোজ বন্ধ করলেন। এমনকী আজকাল মায়ের কাছে কাউকে আসতেও দেখি না।

একদিন হঠাৎ মা আমাকে বললেন, 'কালা, তুই হয়তো আমাকে এবং তোর বাবাকে খুব ঘৃণা করিস। কিন্তু তোর চাচারা কিন্তু এমন না। তারা তোর বাবার মত শয়তান না। আমার কিছু হলে তুই গ্রামে তোর চাচাদের কাছে চলে যাস। তারা তোকে যত্নে রাখবে!' মায়ের কথা শুনে আমার মনে অজানা ভয় ঢুকে গেল।

সেদিন খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। বাসায় এসে দেখি মা বাসায় নেই। প্রথমে ভাবলাম হয়তো কোথাও গেছেন, চলে আসবেন। কিন্তু পরে বুঝলাম তিনি চিরতরে কোথাও চলে গেছেন। আমার নতুন জীবন শুরু হলো চাচাদের কাছে। আমার তিন চাচা আমার জীবন আদর যত্নে ভরিয়ে দিল। গ্রামে অনেক আনন্দে সময় কাটতে লাগল। মা-বাবার জন্য কোনও কষ্ট অনুভব করতাম না। আমার শুধু একটা সমস্যা ছিল। আমি বিচিত্র সব স্বপ্ন দেখতাম। একটা ভয়ঙ্কর মুখ আমার স্বপ্নে বারবার আসত। মাঝে মাঝে স্বপ্নে ভয়ঙ্কর সব অ্যাক্সিডেন্ট দেখতাম। এই স্বপ্ন দেখা ছাড়া বাকি সবদিক দিয়ে আমার জীবন ভালভাবে চলছিল। রহস্যজনক বিষয়গুলো আমায় খুব টানত। বিভিন্ন শ্মশানে, কবরস্থানে আমি ঘুরে বেড়াতাম। বীভৎস জিনিসগুলো খুব ভাল লাগত। বীভৎস লাশের সন্ধান পেলে সবার আগে আমি ছুটে যেতাম। মনের ভিতর প্রচণ্ড সাহসের সঞ্চার হয়েছিল। মনের ভিতর থেকে মায়া-মমতাও ধীরে ধীরে কমে যেতে লাগল। এর প্রমাণ পেলাম বড় চাচার মৃত্যুর পর। আমার এত পছন্দের চাচা মারা যাওয়ার পরও একটুও মন খারাপ

BanglaBook.org

হলো না। এমনকী চোখে এক ফোঁটা পানিও এল না।

সময় কাটতে লাগল। গ্রামের স্কুল থেকে ভালভাবে এস.এস.সি পাস করলাম। গ্রামের কলেজেই এইচ.এস.সি-তে ভর্তি হলাম। তবে পড়াশোনা একদমই করতাম না। শুধু নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতাম। এইচ.এস.সি পরীক্ষার কয়েক মাস আগে থেকে বেশ ভালভাবে পড়াশোনা শুরু করলাম। এমন সময় একদিন খবর পেলাম উত্তর পাড়ার একটা পরিত্যক্ত বাড়িতে এক রহস্যময় লোকের আগমন ঘটেছে। তিনি মানুষকে দেখেই তার অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ বলে দেন। মানুষকে বিপদ আপদ সম্পর্কে আগাম সতর্কতা দেন। কী করতে হবে তার উপায়ও বাতলে দেন। তিনি মাত্র সাতদিনের জন্য এ গ্রামে এসেছেন। তাঁর কাছে মানুষের ভিড় জমে গেল। তিনি কারও কাছ থেকে কোনও অর্থ নিতেন না। তবে কেউ রান্না করা খাবার দিলে তিনি তা গ্রহণ করতেন। কেউ তাঁকে পীর, কেউ দরবেশ, কেউ জিন সাধক বলতে লাগল।

আমিও একদিন তাঁর কাছে গেলাম। তাঁকে দেখে কেন জানি শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হলো। তাঁর মুখে সাদা দাড়ি, পরনে গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবী, হাতে নানারকম আংটি। তিনি একটা চেয়ারে বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আমি কাছে গিয়ে তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি মিষ্টি করে সালামের উত্তর দিলেন। তারপর বললেন, 'কালা, কেমন আছিস?'

আমি চমকে উঠলাম। মা ছাড়া কেউ আমাকে কালা নামে ডাকেনি। বললাম, 'আপনি আমাকে চেনেন!!'

তিনি মাথা নেড়ে বললেন, 'আমি তোকে চিনি। আমি তোর জন্যই এখানে এসেছি।'

'আমাকে চেনেন! কীভাবে?' তিনি এ প্রশ্নের জবাব দিলেন না।

'আমি তোকে সাহায্য করতে এসেছি, কালা। তোকে সাবধান করতে এসেছি।'

'মানে! আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

'তোর শরীরে দূষিত রক্ত, কালা। তাই তোকে শয়তানের খুব পছন্দ। তোর কারণে বহু মানুষ অপঘাতে মারা যাবে। এটা অবশ্য এক ধরনের শক্তি। খারাপ ধরনের শক্তি।'

'আমি বুঝতে পারছি না...'

'তোর বয়স কি আঠারো পূর্ণ হয়েছে?'

'হ্যাঁ। দুমাস আগে আঠারো পূর্ণ হয়েছে।'

'তা হলে, খারাপ শক্তির প্রভাব শুরু হয়ে গেছে। আচ্ছা, তুই কি উদ্ভট কোনও স্বপ্ন দেখিস?'

'হ্যাঁ। দেখি।'

'এসব স্বপ্ন শয়তান দেখায়।'

'কী?!!'

'শোন, কালা, তোর বাবা-মা দুজনেই পাপী ছিলেন, মহাপাপী। মানুষ পাপ

BanglaBook.org

করতে করতে একসময় শয়তানের কাছাকাছি চলে যায়। তখন তাদের শরীরের রক্ত দূষিত হয়ে যায়। এমন দূষিত রক্তের মানুষ এদেশে বহু আছে। তবে প্রত্যেক দূষিত রক্তের মানুষ খারাপ শক্তির অধিকারী হয় না। তোর মা-বাবার দূষিত রক্ত তোর শরীরেও আছে। আর তুই খারাপ শক্তির অধিকারী হয়েছিস। এখন তোর জন্য আশপাশের মানুষের ক্ষতি হবে, দুর্ঘটনা ঘটবে। কেউ মারা যাবে। তবে তোর নিজের তেমন কিছু হবে না। আচ্ছা, ভেবে বল তো, গত দুমাসে তোর কি কোনও দুর্ঘটনা ঘটেছে?'

'হ্যাঁ, ঘটেছে। আমি রিকশায় করে বাজারে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ রিকশা রাস্তার পাশের খাদে পড়ে যায়। রিকশাওয়ালা হাসপাতালে নেয়ার পর মারা যায়, তবে আমার কিছু হয়নি।'

'এটা কেবল শুরু। এমন ঘটনা আরও ঘটবে। ঘটতেই থাকবে। বিশেষ করে তুই যানবাহনে থাকলে দুর্ঘটনা বেশি ঘটবে। প্রথম দিকে এটা খুব বেশি না হলেও ধীরে ধীরে বাড়তে থাকবে। দুর্ঘটনায় সবসময় মানুষ মারা যাবে তা না, তবু তোকে সাবধানে থাকতে হবে।'

'আমি এখন কী করব?'

'তোর দূষিত রক্ত বের করতে হবে, কালা।'

'কীভাবে?'

'প্রথমে তুই খুব ভালভাবে গোসল করবি। গোসল করার সময় কোনওভাবেই নগ্ন হবি না। এরপর পরিষ্কার কাপড় গায়ে সুগন্ধীযুক্ত আতর মাখবি। এরপর একটা মন্ত্র পড়তে পড়তে হাত বা শরীরের যে-কোনও অংশ ছুরি বা ব্লেড দিয়ে কাটবি। কমপক্ষে বিশ ফোঁটা রক্ত ঝরাবি। এই রক্ত দূষিত রক্ত। কিছুদিন পর তোর ক্ষত শুকিয়ে যাবে। যেদিন ক্ষত পুরোপুরি শুকিয়ে যাবে সেদিন আবারও একই নিয়মে রক্ত ঝরাতে হবে। এর ফলে শয়তান আর কিছু করতে পারবে না। আর সাবধান: তোর এই দূষিত রক্ত যেন ছড়িয়ে না পড়ে। তুই বিয়ে করবি না। কারও সাথে বেশি বন্ধুত্বও করবি না। নিজের মত থাকবি। আমার কথা আমি বলেছি, এখন বাকিটা তোর ইচ্ছা।'

সব শুনে আমার মাথা ঘুরতে লাগল। এসব কী বলছেন তিনি? আমার শরীরে দূষিত রক্ত, যার জন্য মানুষ মারা যাবে, বিপদে পড়বে?! বললাম, 'আপনি কে?'

'আমি কে তা তোর জানার দরকার নেই।'

'আপনার সাথে কি আমার আর কোনওদিন দেখা হবে?'

'না। কোনওদিন দেখা হবে না। এখন তুই যা।'

আমি এইচ.এস.সি.পাস করলাম। চাচাদের সাথে আলোচনা করে ঢাকায় এসে কোচিং করার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমাকে যে করে হোক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হবে। সেদিন ছিল শুক্রবার। আমি ঢাকার উদ্দেশে বাসে উঠলাম। খানিক বাদেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটল। আমাদের বাসের সাথে অন্য একটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হলো। কেউ মারা না গেলেও প্রায় সবাই কম বেশি আহত হলো। শুধু আমাকেই প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেয়া হলো। ঢাকায় এসেও আমার

BanglaBook.org

একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটতে লাগল। এসব দুর্ঘটনায় অনেক মানুষ মারা গেল। একটি দুর্ঘটনায় মারা গেল আমার ছোট চাচা। চাচা আমাকে দেখার জন্য ঢাকায় এসেছিলেন। হঠাৎ আমাকে বললেন, 'চল, ব্যাটা। তোকে পুরনো ঢাকার বিরিয়ানী খাইয়ে আনি।' আমি চাচার সাথে বাসে উঠলাম। সেদিন বাসের ব্রেক ফেল করল। ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটল। গাড়ির কাঁচ চাচার চোখে, পেটে ঢুকে গেল। তিনি মারা গেলেন তীব্র যন্ত্রণায়। মারা গেল আরও অনেকেই। শুধু আমার কিছু হলো না। আমার জীবন ওলট পালট হয়ে গেল। আমি যানবাহন এড়িয়ে চলতে লাগলাম। একটা সাইকেল কিনলাম। সাইকেলে আমি একা থাকি। তাই দুর্ঘটনা ঘটলেও আমার একার ঘটবে। কিন্তু একদিন আমার সাইকেলের সাথে একটা মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হলো। আমি এবং মোটরসাইকেলের দুই আরোহী তিনজনেই ছিটকে পড়লাম। আমার হাত-পা কেটে গেল। মোটরসাইকেলে ছিল এক বাবা আর তার ছোট মেয়ে। বাবা বেঁচে গেলেও মেয়েটার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। রক্ত, ঘিলু রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ল। আমি রাস্তার পাশে বসে বমি করতে লাগলাম। সেদিন রাতে আমার খুব জ্বর এল। আমি সেই ভয়ানক মুখটা বারবার দেখতে লাগলাম। আমি উঠে বসলাম। বাথরুমে গিয়ে ভালভাবে গোসল করলাম। পরিষ্কার কাপড় পরলাম। গায়ে আতর মাখলাম। এরপর মন্ত্র পড়তে পড়তে প্রথমবারের মত হাতের তালু কাটলাম। রক্ত ঝরালাম। পরদিন বাসে উঠলাম। কোনও দুর্ঘটনা ঘটল না। তার পরদিনও না। তারপর দিনও না। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। ক্ষত সারার সাথে সাথে অন্য হাতের তালু কেটে রক্ত ঝরালাম। দুর্ঘটনা থেকে মুক্তি পেলাম। তবে আমি রক্ত ঝরাতে ভুলে গেলেই দুর্ঘটনা ঘটত। তবে সব দুর্ঘটনাই যে বড় ছিল, তা নয়। আমি আর ঝুঁকি নিলাম না। হাত কেটে রক্ত বের করতে লাগলাম। মানুষ থেকে দূরে থাকতে শুরু করলাম। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসে খুব বেশি উঠি না। কারণ যদি কখনও অ্যাক্সিডেন্ট হয়, তবে আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না।

রবিউল, তোকে অনেক কিছু বলে ফেললাম। হয়তো সামনাসামনি কথাগুলো এমনভাবে বলতে পারতাম না। তাই চিঠি লিখলাম। ভাল থাকিস।

ইতি
কালাম

কালামের চিঠিটা পড়া শেষ করে পকেটে রাখল রবিউল। রূপন্তীর দিকে তাকিয়ে আবার বলতে শুরু করে রবিউল:

কালামের চিঠিটা পেয়ে আমি হতবাক হয়ে পড়লাম। আর আনন্দের ব্যাপার হচ্ছে, কালামের সাথে আমার বেশ ভাল বন্ধুত্ব হয়ে গেল। ওর প্রতি আমি তীব্র মায়া অনুভব করতাম। অনেক কিছু বাদ দিয়ে আমি ওকে বেশি সময় দিতে শুরু করলাম। তবে আমার মনে হলো কালাম একটা কুসংস্কারকে লালন করছে। আমি ওকে বোঝাতে লাগলাম যে অ্যাক্সিডেন্টের উপর কারও হাত নেই। আর একজনের পাপের বোঝা আর একজন কেন নেবে? মা-বাবা খারাপ হয়ে থাকলে সন্তান কেন খারাপ হবে?

BanglaBook.org

কালাম বলল, 'আমার মা-বাবার খারাপ রক্ত আমার শরীরে মিশে আছে।'

'আমি এসব বিশ্বাস করি না। আমি তোকে আর রক্ত ঝরাতে দেব না।'

'এমনটা বলিস না, রবিউল। এমন করলে বড় দুর্ঘটনা ঘটবে।'

'আচ্ছা, তবে বিষয়টার পরীক্ষা হয়ে যাক। এবার ক্ষত সারলে তুই আর হাত কাটবি না।'

'না, তোকে পরীক্ষা দিতে গিয়ে আমি অন্য কারও বিপদ ডেকে আনতে পারি না।'

'প্লিজ, আমার কথা শোন। আমি তোর এই যন্ত্রণার অবসান চাই।'

শেষ পর্যন্ত কালাম রাজি হলো। এবার আর কালাম রক্ত ঝরাল না। পরীক্ষার জন্য আমি ওকে নিয়ে রিকশায় উঠলাম। কালাম কিছুতেই আমার সাথে রিকশায় উঠতে চাইছিল না। বলতে লাগল, 'আমার সাথে উঠিস না, তোর ক্ষতি হবে।'

আমি ওকে থামিয়ে দিলাম। পুরোটা সময় অস্বস্তি নিয়ে রিকশায় বসে রইল কালাম। সেদিন খারাপ কিছুই ঘটল না।

আমি বললাম, 'দেখেছিস সব কুসংস্কার। কাল আমরা বাসেও চড়ব।'

কালাম কোনও কথার উত্তর দিল না। ওকে বেশ চিন্তিত দেখাল। সেদিন রাতে আমি কালামের বাসায় থাকলাম। রাতে দুজনে বেশ ফুরফুরে মেজাজে ছিলাম। রাত বারোটার দিকে আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম। রাতে হঠাৎই আমার ঘুম ভেঙে গেল। একটা ভয়াবহ শব্দ শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু অন্ধকারে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। বেশ বুঝতে পারলাম, কালামই শব্দ করছে। হঠাৎ আমি ঘরের ভিতর তীব্র গন্ধ পেলাম। গন্ধে আমার বমি আসতে লাগল। আমি কালামের কাছে এগোতেই বুঝলাম ওর শরীর থেকেই গন্ধ আসছে। কালামের শরীরটা থরথর করে কাঁপছে। আমি ওর শরীরে হাত রেখে চমকে উঠলাম। শরীরটা প্রচণ্ড গরম। মনে হলো আমার হাত পুড়ে যাচ্ছে। আমি বিছানা থেকে উঠে লাইটের সুইচ খুঁজতে লাগলাম। অজানা একটা ভয় আমার উপর ভর করেছে। আমি লাইট জ্বাললাম। দেখলাম কালামের চোখ খোলা। সে শূন্য দৃষ্টিতে উপরের দিকে তাকিয়ে আছে। থরথর করে কাঁপছে ওর শরীর। মাঝে মাঝে গোঙানির মত শব্দ করছে। যেন কেউ ওর গলা চেপে ধরেছে। আমি ওকে জাগানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু কোনও কাজ হলো না। দুর্গন্ধে আর ঠাণ্ডায় আমার প্রচণ্ড কষ্ট হতে লাগল। আমি বাথরুমে গিয়ে বমি করলাম। ঘরের ভিতর অশুভ কিছু আছে বলে আমার মনে হতে লাগল। বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখি ঘরের মধ্যে সেই গন্ধটা আর নেই। কালামও চোখ বন্ধ করে ঘুমাচ্ছে। গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম স্বাভাবিক তাপমাত্রা। ঘরের ভিতর শীতল ভাবটাও উধাও। আমি বাকি রাত জেগে কাটালাম। সকালে উঠে দেখি কালাম বিষণ্ন মুখে বসে আছে। আমি রাতের ঘটনার বিষয়ে ওকে কিছুই বললাম না।

সেদিন আমরা পান্থপথ যাওয়ার জন্য বাসে উঠলাম। কালাম তেমন কোনও কথা বলতে চাইল না। বাস ছাড়ার পর হঠাৎ বলে বসল, 'রবিউল, কাল রাতে আমি খুব খারাপ স্বপ্ন দেখেছি।'

BanglaBook.org

একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটতে লাগল। এসব দুর্ঘটনায় অনেক মানুষ মারা গেল। একটি দুর্ঘটনায় মারা গেল আমার ছোট চাচা। চাচা আমাকে দেখার জন্য ঢাকায় এসেছিলেন। হঠাৎ আমাকে বললেন, 'চল, ব্যাটা। তোকে পুরনো ঢাকার বিরিয়ানী খাইয়ে আনি।' আমি চাচার সাথে বাসে উঠলাম। সেদিন বাসের ব্রেক ফেল করল। ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটল। গাড়ির কাঁচ চাচার চোখে, পেটে ঢুকে গেল। তিনি মারা গেলেন তীব্র যন্ত্রণায়। মারা গেল আরও অনেকেই। শুধু আমার কিছু হলো না। আমার জীবন ওলট পালট হয়ে গেল। আমি যানবাহন এড়িয়ে চলতে লাগলাম। একটা সাইকেল কিনলাম। সাইকেলে আমি একা থাকি। তাই দুর্ঘটনা ঘটলেও আমার একার ঘটবে। কিন্তু একদিন আমার সাইকেলের সাথে একটা মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হলো। আমি এবং মোটরসাইকেলের দুই আরোহী তিনজনেই ছিটকে পড়লাম। আমার হাত-পা কেটে গেল। মোটরসাইকেলে ছিল এক বাবা আর তার ছোট মেয়ে। বাবা বেঁচে গেলেও মেয়েটার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। রক্ত, ঘিলু রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ল। আমি রাস্তার পাশে বসে বমি করতে লাগলাম। সেদিন রাতে আমার খুব জ্বর এল। আমি সেই ভয়ানক মুখটা বারবার দেখতে লাগলাম। আমি উঠে বসলাম। বাথরুমে গিয়ে ভালভাবে গোসল করলাম। পরিষ্কার কাপড় পরলাম। গায়ে আতর মাখলাম। এরপর মন্ত্র পড়তে পড়তে প্রথমবারের মত হাতের তালু কাটলাম। রক্ত ঝরালাম। পরদিন বাসে উঠলাম। কোনও দুর্ঘটনা ঘটল না। তার পরদিনও না। তারপর দিনও না। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। ক্ষত সারার সাথে সাথে অন্য হাতের তালু কেটে রক্ত ঝরালাম। দুর্ঘটনা থেকে মুক্তি পেলাম। তবে আমি রক্ত ঝরাতে ভুলে গেলেই দুর্ঘটনা ঘটত। তবে সব দুর্ঘটনাই যে বড় ছিল, তা নয়। আমি আর ঝুঁকি নিলাম না। হাত কেটে রক্ত বের করতে লাগলাম। মানুষ থেকে দূরে থাকতে শুরু করলাম। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসে খুব বেশি উঠি না। কারণ যদি কখনও অ্যাক্সিডেন্ট হয়, তবে আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না।

রবিউল, তোকে অনেক কিছু বলে ফেললাম। হয়তো সামনাসামনি কথাগুলো এমনভাবে বলতে পারতাম না। তাই চিঠি লিখলাম। ভাল থাকিস।

ইতি
কালাম

কালামের চিঠিটা পড়া শেষ করে পকেটে রাখল রবিউল। রূপন্তীর দিকে তাকিয়ে আবার বলতে শুরু করে রবিউল:

কালামের চিঠিটা পেয়ে আমি হতবাক হয়ে পড়লাম। আর আনন্দের ব্যাপার হচ্ছে, কালামের সাথে আমার বেশ ভাল বন্ধুত্ব হয়ে গেল। ওর প্রতি আমি তীব্র মায়া অনুভব করতাম। অনেক কিছু বাদ দিয়ে আমি ওকে বেশি সময় দিতে শুরু করলাম। তবে আমার মনে হলো কালাম একটা কুসংস্কারকে লালন করছে। আমি ওকে বোঝাতে লাগলাম যে অ্যাক্সিডেন্টের উপর কারও হাত নেই। আর একজনের পাপের বোঝা আর একজন কেন নেবে? মা-বাবা খারাপ হয়ে থাকলে সন্তান কেন খারাপ হবে?

BanglaBook.org

কালাম বলল, 'আমার মা-বাবার খারাপ রক্ত আমার শরীরে মিশে আছে।'

'আমি এসব বিশ্বাস করি না। আমি তোকে আর রক্ত ঝরাতে দেব না।'

'এমনটা বলিস না, রবিউল। এমন করলে বড় দুর্ঘটনা ঘটবে।'

'আচ্ছা, তবে বিষয়টার পরীক্ষা হয়ে যাক। এবার ক্ষত সারলে তুই আর হাত কাটবি না।'

'না, তোকে পরীক্ষা দিতে গিয়ে আমি অন্য কারও বিপদ ডেকে আনতে পারি না।'

'প্লিজ, আমার কথা শোন। আমি তোর এই যন্ত্রণার অবসান চাই।'

শেষ পর্যন্ত কালাম রাজি হলো। এবার আর কালাম রক্ত ঝরাল না। পরীক্ষার জন্য আমি ওকে নিয়ে রিকশায় উঠলাম। কালাম কিছুতেই আমার সাথে রিকশায় উঠতে চাইছিল না। বলতে লাগল, 'আমার সাথে উঠিস না, তোর ক্ষতি হবে।'

আমি ওকে থামিয়ে দিলাম। পুরোটা সময় অস্বস্তি নিয়ে রিকশায় বসে রইল কালাম। সেদিন খারাপ কিছুই ঘটল না।

আমি বললাম, 'দেখেছিস সব কুসংস্কার। কাল আমরা বাসেও চড়ব।'

কালাম কোনও কথার উত্তর দিল না। ওকে বেশ চিন্তিত দেখাল। সেদিন রাতে আমি কালামের বাসায় থাকলাম। রাতে দুজনে বেশ ফুরফুরে মেজাজে ছিলাম। রাত বারোটার দিকে আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম। রাতে হঠাৎই আমার ঘুম ভেঙে গেল। একটা ভয়াবহ শব্দ শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু অন্ধকারে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। বেশ বুঝতে পারলাম, কালামই শব্দ করছে। হঠাৎ আমি ঘরের ভিতর তীব্র গন্ধ পেলাম। গন্ধে আমার বমি আসতে লাগল। আমি কালামের কাছে এগোতেই বুঝলাম ওর শরীর থেকেই গন্ধ আসছে। কালামের শরীরটা থরথর করে কাঁপছে। আমি ওর শরীরে হাত রেখে চমকে উঠলাম। শরীরটা প্রচণ্ড গরম। মনে হলো আমার হাত পুড়ে যাচ্ছে। আমি বিছানা থেকে উঠে লাইটের সুইচ খুঁজতে লাগলাম। অজানা একটা ভয় আমার উপর ভর করেছে। আমি লাইট জ্বাললাম। দেখলাম কালামের চোখ খোলা। সে শূন্য দৃষ্টিতে উপরের দিকে তাকিয়ে আছে। থরথর করে কাঁপছে ওর শরীর। মাঝে মাঝে গোঙানির মত শব্দ করছে। যেন কেউ ওর গলা চেপে ধরেছে। আমি ওকে জাগানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু কোনও কাজ হলো না। দুর্গন্ধে আর ঠাণ্ডায় আমার প্রচণ্ড কষ্ট হতে লাগল। আমি বাথরুমে গিয়ে বমি করলাম। ঘরের ভিতর অশুভ কিছু আছে বলে আমার মনে হতে লাগল। বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখি ঘরের মধ্যে সেই গন্ধটা আর নেই। কালামও চোখ বন্ধ করে ঘুমাচ্ছে। গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম স্বাভাবিক তাপমাত্রা। ঘরের ভিতর শীতল ভাবটাও উধাও। আমি বাকি রাত জেগে কাটালাম। সকালে উঠে দেখি কালাম বিষণ্ন মুখে বসে আছে। আমি রাতের ঘটনার বিষয়ে ওকে কিছুই বললাম না।

সেদিন আমরা পান্থপথ যাওয়ার জন্য বাসে উঠলাম। কালাম তেমন কোনও কথা বলতে চাইল না। বাস ছাড়ার পর হঠাৎ বলে বসল, 'রবিউল, কাল রাতে আমি খুব খারাপ স্বপ্ন দেখেছি।'

BanglaBook.org

'কী স্বপ্ন?'

'দেখলাম সেই ভয়ঙ্কর মুখটা আমাকে দেখে খুব হাসছে। হঠাৎ সে আমার শরীরে তেল মালিশ করা শুরু করল। তেল ছিল আগুনের চেয়েও গরম। স্বপ্নের ভিতর আমি প্রচণ্ড দুর্গন্ধও পেলাম। এরপর দেখলাম অদ্ভুত সব পশু আমার চারপাশে ভিড় করেছে। হঠাৎ স্বপ্নটা বদলে গেল। দেখলাম আমি আর তুই একটা বাসে উঠেছি। বাসের ড্রাইভার কালো সানগ্লাস পরা। বাসের যাত্রী খুবই কম। হঠাৎ বাস ডানে মোড় নিতেই ভয়াবহ অ্যাক্সিডেন্ট হলো।

আমি ওর কাঁধে হাত রেখে বললাম, 'তুই বিষয়টা নিয়ে বেশি টেনশন করছিস। তাই এসব স্বপ্ন দেখছিস।'

'তবু, ড্রাইভারকে একটু দেখে আয় তো, কালো সানগ্লাস পরে আছে কিনা?'

আমি উঠে সামনে গিয়ে চমকে উঠলাম। ড্রাইভারের চোখে কালো সানগ্লাস। চারদিক তাকিয়ে দেখলাম গাড়িতে যাত্রীও খুব কম। আমি কালামের দিকে দৌড়ে আসতে চেষ্টা করলাম। এসময় বাস ডানে মোড় নিল। প্রচণ্ড শব্দ শুনতে পেলাম। প্রচণ্ড গতিতে কিছু একটা আমাকে আঘাত করল। আমি জ্ঞান হারালাম।

আমি চোখ মেলে নিজেকে হাসপাতালের বেডে আবিষ্কার করলাম। আমার সামনে কালামের অপরাধী মুখ। আমার অন্যান্য ক্লাসমেটদেরও দেখতে পেলাম। আমার মাথায় এবং হাতে-পায়ে ব্যাণ্ডেজ। চব্বিশ ঘণ্টা পর নাকি আমার জ্ঞান ফিরল। জানতে পারলাম সেদিন দুর্ঘটনায় কেউ মারা যায়নি। তবে অনেকেই গুরুতর আহত হয়েছে। আমি কালামের হাতের দিকে তাকালাম। সেখানে ব্যাণ্ডেজ দেখতে পেলাম। কালাম তবে আবারও রক্ত ঝরিয়েছে। আমার এক ফুপু ঢাকায় থাকতেন। তিনি হাসপাতালে আমাকে দেখাশোনা করছেন। তিনি জানালেন আমাকে বাঁচাতে দুব্যাগ রক্ত দিতে হয়েছে। আমার গ্রুপের রক্ত পাওয়া অবশ্য বেশ কঠিন। এ নেগেটিভ। কালামই নাকি সময়মত রক্ত জোগাড় করে দিয়েছে। কালামের প্রতি আমার প্রচণ্ড কৃতজ্ঞতাবোধ জেগে উঠল। আমি পুরোপুরি সুস্থ হওয়ার পর কালাম আর আমার সাথে দেখা করতে এল না। হয়তো ও নিজেকে অপরাধী ভাবছে। মানুষের জীবনে এমন ঘটতে পারে কালামকে না দেখলে আমি বিশ্বাসই করতাম না। আমার ফুপুর কোনও ছেলেমেয়ে নেই। তিনি আমাকে সন্তানের মতই ভালবাসেন। তিনি বললেন, 'রবিউল, তোর আর হলে থাকার দরকার নেই। তুই আমার বাসায় থেকে পড়াশোনা করবি। আজ তোকে রিলিজ করে দেবে। তুই সোজা আমার বাসায় যাবি। কয়েকদিন বিশ্রাম নিবি। তারপর তোর জিনিসপত্র সব এনে আমার বাসায় থাকবি।'

আমি রাজি হলাম। এসময় হলে না গিয়ে ফুপুর বাসায় থাকাটা আমার জন্য বেশি ভাল হবে।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে ফুপুর প্রাইভেট কারে উঠে বসলাম। শরীরটা খুব দুর্বল লাগছে। কালামের জন্য আমার এমন ঘটেছে এখনও বিশ্বাস হতে চায় না। গাড়ি চলতে শুরু করল। কারওয়ানবাজার পার হতেই আমাদের গাড়ি একটা লোককে চাপা দিল। আশপাশ থেকে মানুষ ছুটে এল। ড্রাইভার পালিয়ে বাঁচল।

BanglaBook.org

অনেকেই ঢিল ছুঁড়তে শুরু করল। একটা ঢিল ফুফুর মাথায় লাগল। মাথা ফেটে গেল তাঁর। আমি ফুফুকে নিয়ে কোনওমতে বাইরে বেরুলাম। উত্তেজিত জনতা গাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দিল। ফুপুর মাথায় তেরোটা সেলাই দেয়া হলো।

কিছুদিন পর আমি ক্লাসে ফিরে গেলাম। ক্লাসে কালামের সাথে দেখা হলো। কালামের চোখে-মুখে ভয়ের স্পষ্ট ছাপ দেখতে পেলাম। আমি বললাম, 'আবারও ভয়াবহ অ্যাক্সিডেন্টের সম্মুখীন হলাম।'

আমি সবকিছু কালামকে খুলে বললাম। কালাম কেমন যেন বারবার চমকে উঠতে লাগল। কালাম নিজের মুখ ঢেকে বলল, 'আমাকে তুই মেরে ফেল, রবিউল।'

'এসব কী বলছিস তুই?'

'আমি তোর বড় একটা ক্ষতি করেছি।'

'মানে?'

'তোর রক্তও এখন দূষিত হয়ে গেছে।'

'কী!!!'

'তোর যখন রক্তের প্রয়োজন ছিল তখন এক ব্যাগের বেশি রক্ত জোগাড় করা যাচ্ছিল না। তখন আমি তোকে এক ব্যাগ রক্ত দিয়েছিলাম। কারণ আমার রক্তের গ্রুপও এ নেগেটিভ। তখন অতশত বুঝিনি। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি আমার রক্তের মাধ্যমে তোর রক্তও দূষিত হয়ে গেছে। সেই অশুভ শক্তি তোর উপরও ভর করেছে। এখন তোকেও আমার মত সাবধানে থাকতে হবে। রক্ত ঝরাতে হবে। তোর ওই দূষিত রক্তের জন্যই সেদিন ওই দুর্ঘটনা ঘটেছে।'

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'কী বলছিস তুই!! হায় আল্লাহ!'

'প্লিজ, আমাকে মেরে ফেল। আমিই তোর এতবড় ক্ষতি করেছি।'

আমার চিন্তা এলোমেলো হয়ে যেতে লাগল। এরপর আমার জীবনে একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটতে লাগল। একদিন রাতে আমি খুব ভালভাবে গোসল করলাম। পরিষ্কার কাপড় পরলাম। গায়ে আতর দিলাম। তারপর কালামের শেখানো মন্ত্রটা পড়তে পড়তে ধারালো ছুরি দিয়ে হাতের তালু চিরে ফেললাম। রক্ত ঝরালাম। সেই থেকে শুরু। আমি আর ঝুঁকি নেইনি। ক্ষত শুকানোর আগেই অন্য হাত থেকে রক্ত ঝরাই। হাতের তালু থেকে রক্ত ঝরানো তুলনামূলক সহজ। কাউকে এ কাটা দাগগুলো দেখাতে চাই না বলেই হাতে মোজা পরে থাকি।

রূপন্তী বলল, 'আপনি এসব বিশ্বাস করেন?!! এ যুগে বসে আমাকে এসব বিশ্বাস করতে বলছেন?'

রবিউল হেসে বলল, 'না, বিশ্বাস করতে বলছি না। আপনি ইচ্ছা হলে এটাকে বানানো গল্প বলে ধরে নিতে পারেন। আচ্ছা, আমি একটা সিগারেট খেলে আপনার কি খুব সমস্যা হবে?'

'না।'

রবিউল সিগারেট ধরাল।

'আমরা প্রায় ঘাটের কাছে চলে এসেছি। চলুন, গাড়িতে ফিরে যাই।'

BanglaBook.org

'চলুন।'

রূপন্তী ও রবিউল বাসে উঠে বসল। হঠাৎ রূপন্তী বলল, 'আপনার বন্ধু কালামের কী খবর?'

'আপনি তো আমার কোনও কথা বিশ্বাস করেননি। তবে আর কালামের খবর জেনে কী হবে।'

'তবু বলুন।'

'কালাম গত বছর মারা গেছে।'

'মারা গেছে!!!'

'হ্যাঁ। সে তার দূষিত রক্ত আর বইতে পারছিল না। তাই একদিন নিজের সমস্ত রক্ত বের করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল। একটা ধারালো ছুরি দিয়ে হাতের রগটা কেটে দিয়েছিল। ব্যস, সবকিছু থেকে মুক্তি পেয়ে গেল কালাম।'

'ওহ! মাই গড! আপনাদের দুজনেরই মানসিক সমস্যার কারণেই এমন হয়েছে। আপনার বন্ধু কালামের উপর মা-বাবার খারাপ কাজগুলো এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল যে সে নিজেকেও একজন পাপী মানুষ ভাবতে শুরু করেছিল। দুর্ঘটনা তো মানুষের জীবনে ঘটতেই পারে। আর কালামের বলা প্রতিটা দুর্ঘটনাই যে সত্যি তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।'

'আপনার সাথে আমি আর এই বিষয়ে কথা বলতে চাই না।'

'দেখুন, আপনার বিষয়টা বুঝতে হবে। আপনি আপনার বন্ধুর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। এজন্য তার মানসিক রোগটা আপনার মধ্যেও চলে এসেছে।'

রবিউল কোনও কথা বলল না। রূপন্তীও চুপ হয়ে গেল। গাড়ি তুমুল গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ আবারও একটা অ্যাক্সিডেন্ট হতে হতেও হলো না। যাত্রীরা আবার খেপে উঠল।

রূপন্তী বলল, 'আজ তো মনে হচ্ছে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হবেই। এসব ড্রাইভার নিয়ে আর হয় না।'

রবিউল মিষ্টি করে হাসল। অন্ধকারে সে হাসি পুরোপুরি দেখা গেল না।

হঠাৎ রূপন্তী ফিসফিস করে ভয়ার্ত গলায় বলল, 'আপনি গাড়িতে আছেন, এজন্য আজ আবার অ্যাক্সিডেন্ট হবে না তো?'

'না, রূপন্তী, আপনার ভয় নেই। আমি গতকালই আমার হাত কেটে রক্ত ঝরিয়েছি। এই দেখুন, ব্যাণ্ডেজ।'

হঠাৎ করেই রূপন্তী আলতোভাবে রবিউলের ক্ষত-বিক্ষত হাতটি ধরল। অল্প সময়ের জন্য নয়। বেশ কিছুক্ষণের জন্য!

BanglaBook.org

ওরা ভয়ংকর

সাংবাদিক শিকদার রাজুর দিকে বিরক্ত হয়ে তাকিয়ে আছে আনোয়ার। শিকদার রাজু বহুল প্রচারিত এক দৈনিক পত্রিকার বিশেষ প্রতিবেদক। তিনি আনোয়ারের সকালবেলার আনন্দদায়ক ঘুম নষ্ট করেছেন। ভুরু কুঁচকে বসে আছে আনোয়ার। ভুরু ঠিক রাখার চেষ্টা করছে, কিন্তু কাজটা খুব কঠিন লাগছে।

এ মুহূর্তে শিকদার রাজুর হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। তিনি বারবার আনোয়ারের দিকে তাকাচ্ছেন এবং আস্তে আস্তে সিগারেটে টান দিচ্ছেন। তাঁর চোখে, মুখে এবং কথায় বিনয়ের ভাব স্পষ্ট। তিনি সিগারেট ধরানোর আগে আনোয়ারের অনুমতি নিয়েছেন। তাঁর পোশাক-আশাকও চোখে পড়ার মত। মাথায় কালো হ্যাট, গায়ে লাল টি-শার্ট। টি-শার্টে লেখা, 'আই এম ইন অনলাইন'। প্যান্টে পাঁচটার বেশি পকেট। একজন পঞ্চাশ ছুঁইছুঁই মানুষ সাধারণত এমন পোশাক পরেন না। তবে শিকদার রাজু এসব নিয়ে কখনও ভাবেন কি না, কে জানে!

সাংবাদিকদের বিষয়ে আনোয়ারের ভীতি কাজ করে। এরা অনেক সময় তিলকে তাল বানায়। এই লোকের মতলব এখনও বোঝা যাচ্ছে না। আশ্চর্যের বিষয়: তাকে বারবার স্যার ডাকছেন লোকটা।

আনোয়ার একটু পর বলল, 'আপনি আমাকে স্যার ডাকছেন কেন? আপনি আমার চেয়ে বয়সে বড় এবং সম্মানিত মানুষ।'

শিকদার রাজু বিনয়ে গলে গিয়ে বললেন, 'আপনি আমার চেয়েও সম্মানিত। এ জন্যই স্যার ডাকছি।'

'আমি সম্মানিত!'

'অবশ্যই।'

'কীভাবে?'

শিকদার রাজু হাসলেন। ঠোঁটে বাঁকানো হাসি। স্পষ্ট গলায় বললেন, 'আপনার বিভিন্ন কাজ নিয়ে পত্রিকায় অনেকবার লেখালেখি হয়েছে। আপনার তোলা কিছু অতিপ্রাকৃত ছবি দেশজুড়ে আলোড়ন তুলেছে।'

আনোয়ার বিব্রত গলায় বলল, 'ছবিগুলো আমি পত্রিকায় দিতে চাইনি, আমার এক বন্ধু শওকত জামিল একটা সাপ্তাহিক পত্রিকার সহ-সম্পাদক, ও-ই কাজটা করেছে। আর লেখাগুলোও আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ছাপা হয়েছে।'

'আমি যতদূর জানি, আপনি দেশের রহস্যময় জায়গাগুলোতে ঘুরে বেড়ান। অনেক রহস্যময়, ভয়ানক পরিস্থিতির মুখোমুখিও হয়েছেন।'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ, তা হয়েছি।'

'এইজন্যই বলছি, আপনি বিখ্যাত এবং সম্মানিত মানুষ। ফেসবুকে আপনাকে নিয়ে দুটো ফ্যান পেজও আছে।'

'বলেন কী!'

'হ্যাঁ, তরুণ প্রজন্মের অনেকেই আপনার মত রহস্যের পিছনে ছুটতে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। স্যর, দয়া করে আপনার কোনও ঘটনা যদি বলতেন...'

'প্লিজ, আমাকে স্যর ডাকবেন না। নাম ধরে ডাকবেন। আর আমি চাই না পত্রিকায় আমাকে নিয়ে লেখালেখি হোক। সব উল্টোপাল্টা নিউজ এখন পত্রিকায় বেশি প্রাধান্য পায়। এসব তো পত্রিকায় লেখার বিষয় নয়।'

'কিন্তু আনোয়ার ভাই, মানুষ তো এমন ঘটনা জানতে চায়।'

'ভাই, আমি এসব কাউকে জানাতে চাই না। এসব আমি নিজের আনন্দে করি। অনেক অদ্ভুত, ভয়ানক, বিচিত্র, ব্যাখ্যাহীন জিনিস দেখেছি। আমি অজ্ঞ, তাই আমার কাছে ওগুলোর কোনও ব্যাখ্যা নেই। হয়তো আসলে তার অনেকগুলোরই কোনও না কোনও ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু ব্যাখ্যাহীনভাবে এগুলো পত্রিকায় প্রকাশিত হলে মানুষ ভুল মেসেজ পাবে।'

'ভাই, এসব কথা শুনব না। আপনার যে-কোনও একটা ঘটনা আমাকে শোনাতেই হবে।'

দ্বিধা করল আনোয়ার, কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি বলব। তবে আপনাকে একটা কথা দিতে হবে।'

'কী কথা?'

'আমি যে ঘটনা আপনার সাথে শেয়ার করব, আপনি সে ঘটনা পত্রিকায় প্রকাশ করবেন না।'

শিকদার রাজু কয়েক মুহূর্ত ভাবলেন, তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'আচ্ছা, ঠিক আছে।'

'আসলে ঘটনা মুখে বলে বেশিরভাগ সময়ই ঘটনার ভয়াবহতা ঠিক বোঝানো যায় না। অনেক মানুষ এগুলো বানোয়াট বলে মনে করে। আর সত্যি ঘটনা খুব বেশি নাটকীয়ও হয় না। খুব সাধারণ ধরনের হয়। যা হোক, আপনাকে এক বছর আগের একটা ঘটনা বলব। ঘটনাটি ঘটেছিল কুয়াকাটায়।'

নড়েচড়ে বসলেন রাজু।

'একদিন খবর পেলাম কুয়াকাটায় আশ্চর্য এক জন্তুর আগমন ঘটেছে। জন্তুটাকে রাত-বিরাতে সৈকতের ঝাউবনের মধ্যে দেখা যায়। প্রথমে শুনেছিলাম জন্তুটার নাকি তিনটা মাথা; কিন্তু পরে আবার খবর পেলাম মাথা তিনটা না, একটাই। তার মুখটা নাকি অনেকটা মানুষের মত। আমার এক দূরসম্পর্কের মামাতো ভাই বরিশাল মেডিকেলে পড়ে। নাম আনিস, ওর এসব বিষয়ে খুব আগ্রহ। ও-ই আমাকে ঘটনাটা জানাল। যখনই ওর সাথে আমার ফোনে কথা হয়, ও আমাকে কুয়াকাটার ওই রহস্যময় জন্তুর কথা বলে।

'আমি মনে মনে বেশ আগ্রহী হয়ে উঠলাম। একদিন হুট করে বরিশালে

BanglaBook.org

গিয়ে হাজির হলাম। আনিস তো আমাকে দেখে আনন্দে আত্মহারা। সামনে ওর পরীক্ষা। কিন্তু, ওদিকে চিন্তা নেই। ওর চিন্তা আমার সাথে কুয়াকাটা যাওয়া। বরিশাল থেকে কুয়াকাটা যাওয়ার সরাসরি বাস আছে। যদিও শেষ ২০-২৫ কি.মি. রাস্তার অবস্থা ভয়াবহ। আমার মতে কেউ যদি জীবনের প্রতি সব আগ্রহ হারিয়ে ফেলে, তার কুয়াকাটার ওই রাস্তায় যাওয়া উচিত। তা হলে মৃত্যুভয় এমনভাবে জেঁকে ধরবে যে, জীবনের মায়া ফিরে আসতে বাধ্য।

'কুয়াকাটায় ওটাই আমার প্রথম যাওয়া। কুয়াকাটার একটা আলাদা সৌন্দর্য আছে যা কক্সবাজারে নেই। তবে মানুষ কুয়াকাটার অবস্থা শোচনীয় করে ফেলেছে। গাছপালা উজাড় করে ফেলছে। সৈকত ভয়াবহ ধরনের অপরিষ্কার। পর্যটকেরও খুব বেশি আনাগোনা নেই। সৈকতে কোথাও কোথাও ভাঙনও ধরেছে। এসব বিষয়ে কারও খুব মাথাব্যথা আছে বলে মনে হলো না। আনিস আর আমি মোটামুটি মানের একটা হোটেলে উঠলাম। আমাদের উদ্দেশ্য আরাম আয়েশ নয়। আমরা যে-কোনও মূল্যে ওই অদ্ভুত জন্তুর সাক্ষাৎ চাই। স্থানীয় অনেক মানুষের সাথে এ বিষয়ে কথা হলো। কেউ এ বিষয়ে কথা বলতে খুব বেশি আগ্রহী নয়। বেশিরভাগ মানুষের মতে এটা একটা গুজব। আমি আনিসের উপর খুব চটে গেলাম। বললাম, "কোথায় তোর অদ্ভুত জন্তু, দেখা।"

'আনিস মাথা চুলকে বলল, "আমার এক বন্ধুর কাছে শুনেছিলাম, ও নাকি দেখেছে। ভাইয়া, চলো আরেকটু খোঁজ নিই, এত সহজে নিরাশ হয়ো না।"

' "যদি কিছু দেখাতে না পারিস, তবে তোর চেহারা আমি অদ্ভুত জন্তুর মত করে দেব। তখন দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ তোকে দেখতে আসবে।"

'পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে কোথাও আনিসকে দেখতে পেলাম না। ফ্রেশ হয়ে বেরিয়ে দেখলাম আনিস হন্তদন্ত হয়ে হোটেলের দিকেই আসছে। সাথে একজন মধ্যবয়স্ক মানুষ। মানুষটার পরনে লুঙ্গি, আর শরীরের বাকি অংশ উদোম। আনিস বলল, "ভাইয়া, সেই ভয়ংকর জন্তুটার সন্ধান পেয়েছি, আজ রাতে দেখা যাবে আশা করি।"

' "তাই নাকি?"

"হ্যাঁ, ইনি কমল জোলা। এ এলাকায় সবাই ওঁকে চেনে। উনিই আমাদেরকে আজ রাতে ওই জন্তু দেখাবেন।"

'আমি কমল জোলার দিকে তাকিয়ে বললাম, "সত্যিই এমন কোনও জন্তু আছে?"

'কমল মাথা নাড়ল।

' "আপনি নিজে দেখেছেন?"

'কমল আবার মাথা নাড়ল।

' "কেমন দেখতে?"

' "কুচকুচা কালা, মানুষের লাহান মুখ, দেখলে ডর লাগে।"

' "কত বড়?"

' "বিরাট, মেলা বড়," লোকটা হাত দিয়ে সাইজ দেখাল। ভাব দেখে মনে

BanglaBook.org

হলো হাতির চেয়েও বড়।

' "আমরা কোথায় ওটা দেখতে পাব?"

' "ঝাউবনে। রাইতে বের হয়, তয় সবদিন দেহা যায় না।"

' "আজ রাতে যাওয়া যাবে?"

' "হ, আমি আপনাগো লইয়া যামু।"

' "আচ্ছা, রাতে চলে আসবেন। আপনার কষ্টের জন্য আপনাকে টাকা দেয়া হবে।"

'লোকটা হাসল। তার হাসি সুন্দর।

'সারাদিন আমরা অনেক জায়গা ঘুরে দেখলাম। বেশ মজায় কাটল দিনটা।

'রাত আটটার দিকে কমল এসে হাজির হলো। সে কালো রঙের একটা জামা আর নতুন লুঙ্গি পরে এসেছে। দেখে মনে হচ্ছে কমল তার সবচেয়ে সুন্দর পোশাকটা পরেছে।

'কমল আমাদের সাথে হোটেলে রাতের খাবার খেল। একটু বিশ্রামের পর আমরা বেরিয়ে পড়লাম। আমি আর আনিস কাঁধে দুটো ব্যাগ ঝুলালাম। জানি, হয়তো কিছুই দেখা যাবে না। গালগল্প আর বাস্তবতা এক নয়। তবুও এতদূর যখন এসেছি, দেখার চেষ্টা করাই উচিত। তা ছাড়া, রাতের বেলা ঝাউবনে যাওয়াটা এমনিতেও বেশ মজার হবে।

'আনিস, কমল, এবং আমি সৈকতে হাঁটছি। সৈকতে তেমন কোনও ভিড় নেই। আকাশে সুন্দর চাঁদ উঠেছে। সমুদ্রও খেপেছে বেশ। পরিবেশটাই বেশ ভুতুড়ে করে ফেলেছে ঝড়ো বাতাস। কমল আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা প্রায় এক কিলো পথ হাঁটলাম। এই জায়গাটা অন্য জায়গা থেকে অনেক বেশি নির্জন। কমলের ইঙ্গিতে আমরা ঝাউবনে ঢুকলাম। লুকিয়ে থাকলাম একটা গাছের আড়ালে। কমল বলল, এখানেই জন্তুটাকে অনেক দেখেছে। আশপাশে বেশ কিছু বড় গর্ত চোখে পড়ল। আমরা নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে বসে রইলাম।

'রাত গভীর হচ্ছে। আশপাশের পাতা নড়ছে, বিচিত্র শব্দ। কিন্তু কোনও কিছু চোখে পড়ছে না। মশার কামড় ইতিমধ্যে আমাদের অস্থির করে তুলেছে। আনিস মুখটা হাসি হাসি রাখার চেষ্টা করছে। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে তার মনেও শঙ্কা। তবে কমল খুব উত্তেজিত ও সতর্ক হয়ে আছে। আরও কিছু সময় পার হওয়ার পর হঠাৎ কমল লাফিয়ে উঠল। আমাদের আরও নীরব হতে ইঙ্গিত করল। দৃষ্টি তার সামনে নিবদ্ধ। কিছু একটার পায়ের আওয়াজ পেলাম। সামনের দিকে দেখার চেষ্টা করলাম। কিছু একটা আসছে। কী সেটা? সত্যিই কোনও ভয়ংকর জন্তু?

'কমল সামনে কিছু একটার দিকে আঙুল তাক করল। আমরা একটা প্রাণী দেখতে পেলাম। বুকে ভর দিয়ে এগিয়ে আসছে। বিরাট। অন্ধকারে মুখ দেখা যাচ্ছে না, তবে ওর আগমনে জায়গাটা আরও নীরব হয়ে গেছে। তখন আরও দুটো প্রাণী গর্ত থেকে বেরুল। এই দুটো আকারে আগেরটার চেয়ে ছোট। তিনটে প্রাণী চারদিকে এলোমেলোভাবে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াল।

BanglaBook.org

'কুয়াকাটায় এমন জন্তু! আসলেই বেশ বিচিত্র ব্যাপার। এখন প্রাণীগুলোর মুখটা দেখা দরকার। আমি সাহস করে সামনে এগুতে চাইতেই কমল বাধা দিল। আমার হাতে পাওয়ারফুল টর্চ। আলো ফেললাম জন্তুগুলোর মুখে।

'ওগুলো হঠাৎ আলো দেখে চমকে উঠেছে। ভয় পেয়ে উল্টোদিকে ছুটতে শুরু করল। আমরা ওগুলোর মুখের দিকে চাইলাম। সাধারণ সরীসৃপের মুখ, মানুষের মুখ নয়।

'প্রচণ্ড আশাভঙ্গ হলো আমার। তবে আনিস আর কমলের মুখে বিজয়ীর হাসি দেখলাম।

'আমি বললাম, "জন্তুটা তো গুইসাপ প্রজাতির, আকারে বেশ বড়, সন্দেহ নেই। তবে মুখ তো মানুষের মত নয়।"

'আনিস বলল, "ভাইয়া, মানুষের মত মুখ না, তাতে কী, বেশ ইন্টারেস্টিং না?"

' "আনিস, আমি কিন্তু এমন ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখে সময় নষ্ট করি না। এখানে আসা ফালতু সময় নষ্ট মনে হচ্ছে এখন।"

'কমল আমাদের কথা শুনছিল। হঠাৎ বলল, "আপনারা কী দ্যাখতে চান?"

'আনিস ফট করে বলল, "ভূত, আমার এই ভাইয়া ভূত দেখতে চায়।"

'কমল হাসল। তার হাসি দেখে মনে হলো ভূত দেখা কোনও বিষয়ই না।

' "ভূত কি না জানি না, তবে আপনাগো একটা জিনিস দেখাতেই পারি, যদি আপনাগো সাহসে কুলায়।"

'আমি মনে মনে একটুও উৎসাহ বোধ করলাম না। ওটাও কোনও বোগাস জিনিস হবে।

'আনিস বলল, "আমাদের সাহস আছে।"

' "তা হলে কাল রাতে আপনাগো নিয়া যাব।"

'আমি বললাম, "কী দেখাতে নিয়ে যাবেন? আসলেই কি কিছু দেখা যাবে? আমি আর খামোকা এখানে সময় নষ্ট করতে রাজি নই। ঢাকায় অনেক কাজ ফেলে এসেছি।"

'কমল কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, "আপনাগো সাহস থাকলে কাল আমার সাথে যাবেন। আপনাগো কিছু দেখাব। তবে কোনও বিপদ হইলে আমার দোষ নাই।"

' "কোথায় যেতে হবে আমাদের?"

"এহান থেকে ছয়-সাত কিলোমিটার দূরে এক গ্রামে যাইতে হবে। ওইহানে একখান পুরানো স্কুল আছে। বহুদিনের পুরানো। মানুষ ওইহানে যাইতে ভয় পায়। কাল পূর্ণিমা, কালকে অনেক কিছু দেহা যাইব।"

' "কী দেখা যাবে?"

' "রাতের বেলা তাদের নাম আমি নিমু না, তবে এরা রক্ত চায়..." কমল থেমে গেল হঠাৎ।

' "কী, থেমে গেলেন কেন?"

BanglaBook.org

' "আপনারা যাবেন কি না বলেন।"

' "যাব।"

"আমি যদি আপনাদের সত্যি কিছু দেখাইতে পারি, আমারে কিন্তু বেশি টাকা দেওন লাগব।"

' "হ্যাঁ, দেব। অবশ্যই।"

' "কম কইরা বিশ হাজার টাকা দেওন লাগব।"

' "এত কেন?"

' "আমি নিমু দশ হাজার, আর অন্য দশ হাজার লাগব অন্য কাজে। পরে বলব। আর যদি ওই টাকা না লাগে, আবার ফেরত দিয়া দিমু।"

'লোকটা রহস্য করছে মনে হলো আমার। আনিসকে একটু সরিয়ে নিয়ে আলাপ করলাম। ও বলল, লোকটা স্থানীয়, সবাই ওকে বিশ্বাস করে। টাকা মেরে দেবে না।

' "ঠিক আছে, দেব টাকা," আনিসকে বললাম।

'আবার চলে এলাম কমলের সামনে। "টাকা হোটেল থেকে দিয়ে দেব। এবার চলুন ফেরা যাক।"

' "আপনারা মহুয়া খাইবেন?" হঠাৎ জানতে চাইল লোকটা।

' "মহুয়া কী?"

' "খুব মজার জিনিস। কাল আপনাগো খাওয়ামু।"

' "মদ জাতীয় কিছু?"

"একে মদ বলবেন না, সুধা বলেন। কুয়াকাটার বিখ্যাত জিনিস মহুয়া। কাল ওই জিনিস খাওয়ানোর পর আপনাগো ওই স্কুলে লইয়া যামু। মহুয়া খাইলে বুকে সাহস পাইবেন। বড় সুস্বাদু জিনিস।"

' "মহুয়া আমরা খাব। তবে সাহস বাড়ানোর জন্য নয়। আমাদের এমনিতেই সাহস আছে, কমল।"

'কমল হেসে বলল, "কাল দেহা যাইব, তবে আমি আবারও বলতাছি, আপনাগো বিপদ হইতে পারে। ভাইবা দেহেন, যাইবেন কি না।"

' "আমরা যাব, কমল।"

'আমার সাহসের কোনও অভাব নেই এ কথা আমি জোর গলায় বলতে পারি। অনেক বিপদেও আমি মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারি। শিগর নামক অপদেবতা একবার আমার ধৈর্য ও সাহসের চরম পরীক্ষা নিয়েছিল। তাই কমলের কথায় আমি এতটুকু বিচলিত হলাম না।

'আমরা হোটেলে ফিরে এলাম। কমল অগ্রিম দশ হাজার টাকা নিয়ে চলে গেল। ভাবলাম, হয়তো কুয়াকাটা আসাটা পুরোপুরি ব্যর্থই হলো। আমি কমলের কথায় খুব বেশি ভরসা পাইনি। লোকটা হয়তো টাকার লোভে কাল আবারও ফালতু কিছু দেখাবে।

'সকালে আমরা ঘুম থেকে আগে ভাগেই উঠে পড়লাম। উদ্দেশ্য সানরাইজ দেখা। আর ওই স্কুলটা সম্পর্কে একটু খোঁজখবর নেয়াও দরকার। যদি দেখি ওটা

BanglaBook.org

একটা ফালতু জায়গা তবে আজই চলে যাব। এখানে আর বেশি দিন থাকতে ইচ্ছা করছে না।

'আমরা সানরাইজ ভাল করে দেখার জন্য জিপ জোগাড় করলাম। জিপ আমাদের ক্রমশ পুবদিকে নিয়ে গেল। জিপের ড্রাইভারের সাথে স্কুলের ব্যাপারে অনেক কথা হলো। লোকটা হাসিখুশি, নাম লোকমান। আমরা রাতে ওই স্কুলটায় যাব শুনে লোকমান কেমন যেন চমকে উঠল। বলল, "স্যর, ওই স্কুলের নাম আরাকান প্রাইমারি স্কুল। অনেক পুরনো স্কুল। এখন কেউ ওখানে যায় না। ভয়ানক জায়গা। ওখানে যাবেন না, স্যর। প্রতি বছরই আশপাশের গ্রাম থেকে অনেক মানুষ নিখোঁজ হয়। তাদের অনেকেরই বিকৃত লাশ ওই স্কুলে পাওয়া গেছে। গত দুই বছরে প্রায় বিশ-পঁচিশজন লাশ হয়ে ফিরেছে। বেশির ভাগই ছোট বাচ্চাদের লাশ। এসব কারণে বর্তমানে ওই স্কুলের আশপাশে কোনও জনবসতি নেই। ওখানে ভয়ংকর কিছু থাকে, স্যর! ভয়ংকর কিছু।"

' "ভয়ংকর কিছু মানে কী? ভূত?"

"সেটা জানি না। কেউ বলে ভূত, কেউ বলে জিন, কেউ বলে অতৃপ্ত আত্মা। আশপাশের গ্রামের মানুষ শান্তিতে থাকার উদ্দেশ্যে ওখানে হাঁস-মুরগি-পাঁঠা বলি দেয়। এরপর থেকে মানুষ নিখোঁজ হওয়া কমেছে। লাশও তেমন পাওয়া যায় না। তবুও ওখানে দিনের বেলায়ও যেতে চায় না কেউ। আর আপনারা রাতে যেতে চান!"

' "কীভাবে বলি দেয়া হয়?"

' "হাঁস, মুরগি, পাঁঠা ওখানে জবাই হয়। এরপর স্কুল আর এর আশপাশে ওই রক্ত ছড়িয়ে দিতে হয়। অনেক সময় হাড়বিহীন মাংসও টুকরো টুকরো করে চারদিকে ছড়িয়ে দেয়। এভাবেই নাকি ওনারা খুশি হন।"

' "আজব সব পদ্ধতি!"

' "হ্যাঁ। বিভিন্ন গ্রামের ওঝা, গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা মিলে এসব পদ্ধতি বের করেছেন। প্রায় সব পরিবারই এখন বলি দিচ্ছে। তবুও সবার মধ্যেই চাপা ভয় কাজ করে।"

'মানুষের নিরাপদ থাকার কী অসীম চেষ্টা। আমি এমন অনেক দেখেছি। তবে নিজের চোখে না দেখা পর্যন্ত কিছু বিশ্বাস করি না।

'সূর্যোদয় দেখে মনটা ভাল হয়ে গেল। সত্যিই অসাধারণ দৃশ্য। আমরা সূর্য ওঠা দেখে জিপ নিয়ে শুঁটকি পল্লীর দিকে চলে গেলাম। শুঁটকি পল্লী থেকে আনিস এক গাদা শুঁটকি কিনল। আমি শুধু মন দিয়ে শুঁটকি বানানো দেখলাম।

'এই মানুষগুলো আসলে অমানুষিক পরিশ্রম করে, দেখে খুব খারাপ লাগল। সাড়ে এগারোটায় নামলাম উন্মত্ত সমুদ্রে। আনিস কয়েকবার বীরত্ব দেখাতে গিয়ে পেট ভরে সমুদ্রের পানি খেল।

'রাতের খাবার আমরা সাড়ে সাতটার মধ্যে শেষ করলাম। অর্ডারমাফিক খাবার রুমেই দিয়ে গেল। কমল এল আটটার দিকে। সরাসরি আমাদের রুমেই এল। হাতে কাগজে মোড়া একটা প্যাকেট। বুঝতে পারলাম, কমল মহুয়া নিয়ে

BanglaBook.org

এসেছে।

'কমল গলা নামিয়ে বলল, "স্যর, এক নম্বর জিনিস। এইহানে সবাই এক নম্বর জিনিস দিতে পারে না। আমি বহুত কষ্টে জোগাড় করছি। এক্কেবারে খাঁটি মহুয়া। পানি মেশানো নাই।"

'আমরা কমলের আনা খাঁটি মহুয়া খেলাম। সঠিক স্বাদ পাওয়ার জন্য ডাইরেক্ট খেয়ে ফেললাম। তবে পরিমাণে খুব বেশি নয়। আমার তেমন কিছু হলো না। শুধু শরীরটা একটু হালকা লাগতে লাগল। আর মনের ভিতর একটা ফুরফুরে ভাব চলে এল। আনিসের প্রতিক্রিয়া ভাল করে বুঝতে পারলাম না। মহুয়া খাওয়ার পর ও কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল। আমি আর কমল বেরুনোর প্রস্তুতি নিচ্ছি, এমন সময় আনিস বলল, "আমি যাব না, আমার শরীর ভাল লাগছে না।"

'আমি অবাক হলাম। আসলেই কি ওর শরীর খারাপ লাগছে, নাকি ভয় পাচ্ছে? যা হোক, আমাকে তো যেতেই হবে। তাই আনিসের সাথে কথা না বাড়িয়ে কমলকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস। মহুয়া খাওয়ার কারণে কি না জানি না, আমার মধ্যে ভয়ের অনুভূতিই নেই।

'একটা ইজিবাইক আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। এটা আমাদের প্রায় গন্তব্যে পৌঁছে দেবে। তবু আমাদের বেশ কিছুটা পথ হাঁটতে হবে। ইজিবাইক স্টার্ট দিতেই দেখলাম কেউ একজন রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা অবাক হয়ে দেখলাম আনিস দাঁড়িয়ে আছে। আমি বললাম, "আনিস, তুই!"

' "একা একা ভাল লাগছিল না, তাই চলে এলাম।" বলেই ইজিবাইকে উঠে বসল। গায়ের চাদরটা শরীরের সাথে ভালভাবে জড়িয়ে নিল। ওকে দেখে আমি মনে অন্যরকম সাহস পেলাম। অন্যদিকে কমলের উপর মেজাজটা খুব খারাপ হয়ে আছে। যাচ্ছি একটা অ্যাডভেঞ্চারে, কিন্তু কমলকে দেখে মনে হচ্ছে যেন বাজারে যাচ্ছে। ওর হাতে একটা বড়সড় সাইজের মুরগি।

'আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, "মুরগি এনেছেন কেন?"

"আমার নিজের মুরগি। ওই স্কুল ঘুইরা আইসা আমি নিজ হাতে পাক কইরা আপনাগো খাওয়ামু।"

' "তা মুরগিটা হোটেলে বা পরিচিত কোনও দোকানে রেখে আসতে পারতেন, সাথে নিয়ে এলেন কেন?"

'কমল অপ্রস্তুতভাবে হাসল। পুরোটা রাস্তা আমরা সবাই চুপ করে থাকলাম।

'কিছুক্ষণ পর ইজিবাইক থামল।

'এখন আমাদের পায়ে হেঁটে বাকি পথ যেতে হবে। আশপাশে কোনও জনবসতি চোখে পড়ল না। কিছু দেখতে পাব কি না জানি না, তবে পরিবেশটা গা ছমছমে। আনিস পুরো পথে কোনও কথা বলেনি। এবার হঠাৎ করে বলল, "সামনে ডানের রাস্তায় নামতে হবে।"

'কমল ও আমি দু'জনেই অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। আনিস সামনে হাঁটতে শুরু করল। ও কি মহুয়া খেয়ে মাতাল হয়ে গেল? এই অন্ধকারে কোনও ভয়ভীতি ছাড়া এগিয়ে যাচ্ছে। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, জায়গাটা ও

BanglaBook.org

চেনে। কমলের মুরগি কক কক করে ডেকে চলেছে। দূর থেকে ভেসে এল ছাগলের করুণ ম্যা-ম্যা আওয়াজ।

'রাস্তাটা খুব নির্জন, রাতের ঝোপঝাড়ের সাধারণ শব্দগুলোও নেই।

'আমরা স্কুলের মাঠে চলে এলাম। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। তবু জায়গাটা কেমন অতিরিক্ত অন্ধকার এবং ঘোলাটে। মুরগিটা ডাকা বন্ধ করে দিয়েছে। আমার সাহসও হঠাৎ করে শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। মনে হচ্ছে, কেউ একজন আমার কানের কাছে বলছেঃ চলে যাও, চলে যাও...

'কমল বলল, "স্যর, আরও সামনে যাইবেন? নাকি ফেরত যাইবেন।"

'আমার হাতে বড় টর্চ। আমি সেটা হাত বদল করে বললাম, "সামনে যাব। এখনও তো কিছুই দেখতে পেলাম না।"

'কমল নিতান্ত অনিচ্ছায় মাথা নাড়ল।

'আমি আরেকটু এগোতেই বড় কোনও প্রাণীর ডানা ঝাপটানোর শব্দ পেলাম। দুটো বড় কুৎসিত পাখি সোজা আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মনে হলো বিশাল ডানা যেন পুরো আকাশ ঢেকে দিয়েছে। লম্বা ঠোঁট দিয়ে আমার চোখ গলিয়ে দিতে চাইল। আমিও সরে যাওয়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। আমার গাল থেকে মাংস তুলে নিল।

'কমল বলল, "স্যর, শকুন, শকুন! শুইয়া পড়েন। শুইয়া পড়েন।"

'আমি দেরি না করে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম। বিকট ওঁয়া-ওঁয়া শব্দ করছে শকুনগুলো, মাথার উপর ঘুরছে। আবার নেমে এল। নখ ও ঠোঁট দিয়ে আমার পিঠের মাংস তুলে নিতে চাইল। ভয়ানক ব্যথায়, ভয়ে আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম।

'কমল আমাকে বাঁচাতে এগিয়ে এল। এমন সময় শকুনগুলো চলে গেল। আমাকে ধরে তুলল কমল। উঠে বললাম, "ঠিক আছি।"

'আসলে আমি ঠিক নেই। আমার মাথা কাজ করছে না। শরীর ব্যথায় কুঁকড়ে যাচ্ছে। আশপাশে চেয়ে দেখলাম, টর্চটা কয়েক হাত দূরে ছিটকে পড়েছে। অনেক চেষ্টার পরও সেটা জ্বলল না। আমি আনিসকে খুঁজতে লাগলাম।

'বেশ খানিক দূরে দাঁড়িয়ে আছে আনিস। আমি চেঁচিয়ে ডাকলাম, সাড়া দিল না। বুঝতে পারছি এখানে অশুভ কিছু আছে এবং যে-কোনওসময় ভয়ংকর কিছু ঘটবে। দ্রুত এখান থেকে চলে যেতে চাইছি। কিন্তু আনিস কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্তের মত দাঁড়িয়ে আছে। ওর দিকে এগিয়ে গেলাম। কমলকে দেখলাম একটা ঝোপের ভিতর গিয়ে ঢুকল।

'আনিসের হাত ধরলাম। বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল আমার। আনিসের হাতটা অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা। মৃত মানুষের হাতও হয়তো এত ঠাণ্ডা নয়। আর হাতটা লোমে ঢাকা। আনিসের হাতে এত লোম ছিল না।

'ও আমার দিকে তাকাল। আবছা আলোতেই বুঝলাম ওর দৃষ্টি অন্যরকম। আমি নিজের ভয়টা গোপন করে বললাম, "আনিস, চল, আমরা এখন চলে যাব।"

BanglaBook.org

'আনিস কিছু বলল না। পিছনে শব্দ শুনে তাকাতেই দেখলাম কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে। ভাবলাম নিশ্চয়ই কমল। কিন্তু ভাল করে লক্ষ করলাম। আমার পিছনে আরেকজন আনিস দাঁড়িয়ে আছে। এটা কীভাবে সম্ভব? আমি নিশ্চয়ই ভুল দেখছি। আমার হ্যালুসিনেশন হচ্ছে। সামনে দাঁড়ানো আনিসের হাত ছেড়ে দিতে চাইলাম, কিন্তু ও আমার হাত ছাড়ল না। এবার পিছনে দাঁড়ানো আনিস আমার অন্য হাত চেপে ধরল। দুই আনিসের মুখ থেকে অদ্ভুত শব্দ বেরুচ্ছে। মনে হচ্ছে কোনও পশুর চাপা হুংকার।

'তখন আরও ভয়ংকর কাণ্ড ঘটল, আমার ডান ও বাম পাশ থেকে আরও দু'জন আনিস এসে হাজির হলো। ওরা চারজন কিছু না বলে চক্রাকারে আমাকে ঘিরে ফেলল। এমন সময় শকুনদুটোও শব্দ করতে করতে আকাশ থেকে নেমে এল, দূর থেকে দেখতে লাগল আমাকে।

'আমি জানি কী ঘটতে চলেছে। চোখ বন্ধ করলাম। একটু পর চোখ মেলে মনে হলো অনেক নীচে নেমে এসেছে চাঁদটা। এক মুহূর্তে সমস্ত পৃথিবী যেন থমকে গেল। এরপর চোখের পলকে ওরা চারজন আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওদের গলার ভয়ানক আওয়াজ শুনে মনে হলো, এবার মরতেই হবে আমাকে। দু'জন আমার দু'হাত কামড়ে ধরল, অন্য দু'জন দুই পায়ের গোড়ালি।

'বেঁচে থাকার জন্য নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করলাম। এই অসম্ভব যন্ত্রণার মধ্যে আমি কতক্ষণ ছিলাম, জানি না। ওই মুহূর্তে আমার অতি প্রিয় একটি মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠল। নিজের ভুলে যাকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। বুঝতে পারছি, আর কয়েক মুহূর্ত, তারপর সব শেষ। এমন সময় কেউ একজন এল। হ্যাঁ, কমল এসেছে। আমি ছটফট করতে করতে দেখলাম, কমল চারটে ছাগল নিয়ে আসছে দড়িতে বেঁধে। এরপর দেরি না করে ছুরি দিয়ে জবাই করতে লাগল ছাগলগুলোকে। চিৎকার করতে করতে ওগুলোর মাথা আলাদা করে দিচ্ছে। চারদিকে ছিটিয়ে পড়ছে রক্ত।

'কমল গলা ফাটিয়ে চিৎকার শুরু করল, "রক্ত আনছি, রক্ত আনছি, ছাইড়া দেন, মাফ কইরা দেন!"

'এরপর সব দ্রুত ঘটল। ওরা আমাকে ছেড়ে দিল। শীতল বাতাস আমার গায়ে এসে লাগল। উঠে দাঁড়াতে পারছি না, কমল এসে ধরল আমাকে, বলল, "স্যার, উঠেন। তাড়াতাড়ি যাইতে হইব। ওরা আপনারে মাইরা ফেলব।"

'আমি ওর কাঁধে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। ফিসফিস করে বললাম, "আনিস কই? এদের মধ্যে কে আনিস?"

' "উনার কথা ভুইলা যান, উনারে ভূতে ধরছে। চলেন তাড়াতাড়ি।"

'আমার মাথা ভোতা হয়ে গেল। পিছন ফিরে দেখলাম, পুরো মাঠে অসংখ্য ছায়া। তারা মাঝে মাঝে ভয়ংকর শব্দ করছে। পুরো এলাকাটা থরথর করে কাঁপছে।

'কমল বলল, "স্যার, পিছনে তাকাইয়েন না। হাঁটতে থাকেন।"

'আমি আর কমল হাঁটতে শুরু করলাম। পুরো আকাশ হঠাৎ করেই বেশ

BanglaBook.org

আলোকিত হয়ে গেল।

'আমরা হাঁটছি। ইজিবাইক আমাদের যেখানে নামিয়ে দিয়েছিল, সেখানে এসে থামলাম। কোনও ইজিবাইক ভ্যান চোখে পড়ল না। এত রাতে কারও থাকারও কথা নয়। আমরা আবার হাঁটতে লাগলাম। ক্লান্তিতে বুজে আসতে চাইছে চোখ। শরীর অসাড় হয়ে পড়েছে, তবু পা টেনে চলেছি। দূর থেকে একটা আলোর রেখা দেখলাম। একটা ইজিবাইক আসছে।

'আমরা ওটাকে থামালাম। এত রাতে ড্রাইভারের যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না, আর আমার শরীরে রক্ত দেখে লোকটা আরও চমকে গেছে।

'কিন্তু কমল লোকটাকে রাজি করিয়ে ফেলল। জখম যতটা খারাপ ভেবেছি, ততটা হয়নি। হোটেলের কাছাকাছি এসে একটা ডিসপেনসারি খোলা পেলাম। শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ড্রেসিং করিয়ে হোটেলে ফিরলাম। সঙ্গে কমলও।'

আনোয়ার থামল।

শিকদার রাজু বললেন, 'ভাই, কাহিনি কি এখানেই শেষ? আনিসের কী হলো?'

'আমি হোটেলে এসে আনিসকে ঘুমন্ত দেখলাম। ঘুম ভাঙতেই আমাকে দেখে চমকে উঠল আনিস। জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে আমার। কমল সব খুলে বলল।

'আনিস অবাক হয়ে বলল, "কী বলছেন এসব? আমি তো রুম থেকে বেরই হইনি।"

'ক্লান্ত গলায় বললাম, "আনিস ওরা এসেছিল তোমার রূপ ধরে।"

'আনিস বলল, "ওরা কারা?"

' "ওরা ভয়ংকর..." বলেই আমি বিছানায় শুয়ে পড়লাম। চোখ বন্ধ হয়ে গেল আপনাআপনি।

'কুয়াকাটা থাকার ইচ্ছা উবে গেল। পরদিন সকালে আমরা রওনা দিলাম। আমার প্রচণ্ড জ্বর এসেছে, শরীরেও বড় ব্যথা। কমল রাতে হোটেলেই ছিল।

'সকালে কমলকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললাম, "আপনি না থাকলে আমি বেঁচে ফিরতাম না।"

' "স্যর, আমি জানতাম ওইহানে বিপদ হইতে পারে। তাই আগেই কয়েকটা ছাগল নিয়ে রাখছিলাম। রক্ত পাইলেই উনারা খুশি হন।"

'আমি কমলের হাতে সব মিলে আরও পনেরো হাজার টাকা গুজে দিলাম। আগেই দিয়েছিলাম দশ হাজার।

'কিন্তু কমল এত টাকা নিল না। বলল, "আমারে তো বিশ হাজার দেওনের কথা। আমি বেশি নিমু না, স্যর। আপনাগো আমার খুব ভালা লাগছে। আবার কুয়াকাটা আইলে দেহা কইরেন।"

'কমলের কথাবার্তায় বুক নড়ে উঠল আমার। ওর মধ্যে এমন কিছু আছে, যা আমাদের মধ্যে নেই।'

শিকদার রাজু বললেন, 'কমলের সাথে আর যোগাযোগ হয়নি?'

আনোয়ার মাথা নিচু করে বলল, 'না। তবে কয়েক মাস আগে এক পত্রিকায়

BanglaBook.org

ছোট করে একটা খবর ছেপেছিল। সেই খবরে কমলের নাম ছিল।'

'কী ছাপা হয়?'

'আরাকান প্রাইমারি স্কুল থেকে কমল নামের এক ব্যক্তির বিকৃত লাশ উদ্ধার হয়েছে।'

'বলেন কী! কমল মারা গেছে?'

'হ্যাঁ। ওরা বড্ড ভয়ংকর, ওরাই কমলকে মেরে ফেলেছে।' শিকদার রাজু লক্ষ করলেন, আনোয়ারের মুখ গম্ভীর।

পরের শুক্রবার একটি দৈনিক পত্রিকায় 'চিত্র-বিচিত্র' পাতায় 'ওরা ভয়ংকর' নামে একটি ফিচার ছাপা হলো। সেখানে আনোয়ারের কুয়াকাটার ঘটনাগুলোকে অনেক বাড়িয়ে, রসকষ মিশিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। ছবি হিসেবে ইন্টারনেট থেকে নেয়া এক এলিয়েনের ছবি দেয়া হয়েছে। ফিচারে আনোয়ারের নাম-ঠিকানাও প্রকাশ করা হয়েছে।

পত্রিকাটা হাতে নিয়ে হতাশ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল আনোয়ার।

শিকদার রাজু কথা রাখেননি।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অন্য জগতের কেউ

এক

এই আধুনিক সময়ে দেশ যখন ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরিত হচ্ছে, ঠিক তখন আমাদের গ্রামটা ডুবে আছে অন্ধকারে। আমাদের গ্রামসহ আশপাশের দুই-তিন গ্রামে এখনও বিদ্যুৎ এসে পৌঁছায়নি। বিলাসী জীবনে আমি অভ্যস্ত নই, তাই বিদ্যুৎ থাকার সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে খুব একটা ভাবি না। এ নিয়ে আমার মধ্যে কোনও কষ্টও নেই। তবে টিভি না থাকার কষ্ট আমাকে খুব পোড়ায়। একটা টিভির স্বপ্ন আমার ছোটবেলা থেকেই। চার-পাঁচ বছর বয়সে চাচার বাসায় আমি প্রথম টিভি দেখি। এখনও সেই স্মৃতি বার-বার মনে পড়ে।

কয়েক বছর আগে সেই চাচার বাসায় গিয়েই প্রথম মোবাইল ফোন দেখেছিলাম। কী অদ্ভুত জিনিস! যার সাথে ইচ্ছা কথা বলা যায়। টিভির স্বপ্নের পাশাপাশি আমার মনে এখন মোবাইলের স্বপ্নও যুক্ত হয়েছে। আমাদের গ্রামে চেয়ারম্যান চাচার মোবাইল আছে। গ্রামে বিদ্যুৎ না থাকায় তিনি মোবাইলে চার্জ দিতে পারেন না। তাই সেটা বেশির ভাগ সময় বন্ধ থাকে। আমার খুব ইচ্ছা এস.এস.সি. পরীক্ষার পর ঢাকায় যাব। সেখানকার কোনও কলেজে ভর্তি হব। তারপর একটা মোবাইল কিনব। আর ইচ্ছামত টিভি দেখব। কিন্তু এস.এস.সি.-তে ভাল না করলে আব্বা ঢাকায় পড়তে যেতে দেবেন না। চাচাও তেমন আগ্রহ দেখাবেন না। তাই আমার টার্গেট কমপক্ষে ৪.৫০ পয়েন্ট পাওয়া। গ্রামে পড়ে এর থেকে বেশি আশা করা ঠিক না। আমাদের স্কুলে গত বছর একজন এ+ পেয়েছিল। সামসু ভাই। তাকে নিয়ে পত্রিকায় খুব লেখালেখি হয়েছিল। সামসু ভাই এখন ঢাকার বড় কলেজে পড়ে। একটা মোবাইলও কিনেছে। আমাকে আপন মনে করে, তাই বলে ফেলেছে–একটা মেয়ের সাথে নাকি ভাবও হয়েছে। মেয়েটির নাম মুনিয়া। সামসু ভাইয়ের কাছে মুনিয়া আপুর কথা শুনে আমারও মনটা আনচান করে। আমিও একটা মেয়েকে খুব পছন্দ করি। জমির চাচার মেয়ে কুসুম। ছোটবেলায় কুসুমকে তেমন একটা পাত্তা দিতাম না। কিন্তু এখন কেন জানি ওকে দেখলে নিঃশ্বাস আটকে আসে। ঠিকমত কথা বলতে পারি না। আগে ওদের বাসায় কত গিয়েছি। কিন্তু এখন যেতে লজ্জা লাগে। মনে হয়, আমার চোখ দেখে ওর মা-বাবা সব বুঝে ফেলবেন। আমি আর কুসুম একই ক্লাসে পড়ি। ক্লাস টেন। আমাদের ক্লাসের ছেলেরা প্রায়ই বলে:

'ক্লাস টেন,
মেয়ে বিয়ে দেন।'

BanglaBook.org

আমার গোপন কিন্তু লালিত স্বপ্ন–একদিন কুসুমকে বিয়ে করব। কিন্তু সেটা তো আর চাইলেই হয় না। তিন-চার মাস আগে বন্ধু জসিমের পরামর্শে কুসুমকে একটা চিঠি দিই। চিঠিতে আমার মনের কথাগুলো বিস্তারিত বলেছিলাম। ভয় ছিল–ও যদি বাসায় বলে দেয়, তখন কী হবে? কিন্তু কুসুম বাসায় কিছু বলেনি। তবে চিঠি পাওয়ার পর দীর্ঘদিন আমাকে এড়িয়ে চলেছে। তবে গত দেড়-দুই মাস ধরে কুসুমের মধ্যে আশ্চর্য পরিবর্তন এসেছে। কেমন যেন বদলে গেছে কুসুম। এখন আমাকে দেখলেই গল্প জুড়ে দেয়। এমন-এমন কথা বলে যার কোনও আগা-মাথা নেই। কিছু কথা আবার অশ্লীল ধরনের। আমার সাথে কুসুম এই ধরনের কথা বলবে, কোনওদিন ভাবতেই পারিনি। কে জানে হয়তো কুসুম আমাকে আপন করে নিয়েছে। তবে চিঠির বিষয়ে কিছুই বলেনি। আমি এখনও অপেক্ষায় আছি।

দুই

আমার সব সময়ের সঙ্গী জসিম। ন্যাংটোকালের বন্ধু যাকে বলে। তবে এখনও প্রায়ই ওর সাথে আমার মারামারি বাধে। ভয়াবহ ধরনের মারামারি। কিন্তু মারামারি করেও আমরা সেটা মনে পুষে রাখি না। সকালেই হয়তো আমাদের তুমুল মারামারি হলো, বিকালেই জসিম গাছের পেয়ারা নিয়ে আমার সাথে দেখা করতে আসে। আমিও স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলি, 'বড়টা আমাকে দে।'

আমরা একসাথে কত যে মজা করি তার ইয়ত্তা নেই। আব্বা-আম্মার আমাদের নিয়ে বেশি ভাবার সময় নেই। তাঁরা তাঁদের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। তাই বলতে গেলে আমরা পূর্ণ স্বাধীন। সপ্তাহে একদিন বা মাসে দুইদিন মায়ের চড় বা বাবার ঝাড়ি খাওয়া আমাদের গা সওয়া হয়ে গেছে। ওসব নিয়ে আমরা ভাবি না।

তবে বর্তমানে আমাদের স্বাধীনতায় বাধা পড়েছে। বিষয়টি পুরোপুরি ভৌতিক। আমাদের গ্রামটা আধুনিকতা থেকে বহু দূরে। তাই গ্রামের মানুষ অলৌকিক অনেক বিষয় বিশ্বাস করে। গ্রামের মানুষের বিশ্বাস, প্রতি পাঁচ-ছয় বছর অন্তর অশুভ কিছু গ্রামে আসে। তখন অনেক মানুষ নিখোঁজ হয়। অনেকের বিকৃত লাশ পাওয়া যায়। প্রায় দুই-তিন মাস এই দুর্দিন স্থায়ী হয়। ওই সময়ে মানুষ ঘর থেকে বের হতে ভয় পায়। ওঝা ডেকে বাড়ি বন্ধের ব্যবস্থা করে। গ্রামের ওই অশুভ জিনিসটা প্রতিবারই একটা বুড়ির রূপ ধরে আসে। থুত্থুরে বুড়ি। লাঠিতে ভর দিয়ে বুড়ি পথ চলে। দিনের বেলা আঁচল দিয়ে তার মুখ ঢাকা থাকে। গ্রামে ঢোকার প্রথম দিনে বুড়ি এক বাসায় গিয়ে লাঠি দিয়ে মাটিতে শব্দ করতে থাকে। বাড়ির লোক বের হলে বলে, 'একটু পানি দেন, তেয়াশ লাগছে।' তারপর বাড়ির লোক পানি আনার পর বাইরে বুড়িকে দেখতে পায় না। কিন্তু বুড়ি

BanglaBook.org

যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে ছোপ-ছোপ রক্ত। এই ইঙ্গিত থেকে গ্রামবাসী বুঝতে পারে কিছু প্রাণ নিতে বুড়ি আবারও এসেছে। আগের বার, অর্থাৎ পাঁচ বছর আগে বুড়ি এসেছিল লোকমান ঠাকুরের বাড়িতে। সেবার আটজন মানুষ নিখোঁজ হয়েছিল। অপঘাতেও মারা গিয়েছিল কয়েকজন। বর্তমানে বুড়িকে আবারও দেখা যাচ্ছে। দু'মাস আগে সরকার বাড়িতে ঘোমটা মাথায় দেয়া এক বুড়ি এসে পানি চেয়েছিল। পরে পানি না খেয়েই চলে যায়। পুরো উঠোন ছোপ-ছোপ রক্তে ভরে যায়। সেই থেকে গ্রামের মানুষের আতঙ্ক শুরু। আতঙ্কের সত্যতাও অবশ্য মিলেছে। কারণ দু'মাসে বেশ কয়েকজন মানুষ গ্রাম থেকে নিখোঁজ হয়েছে। তবে আমি এসব বিশ্বাস করি না। আমার কাছে সবই কুসংস্কার মনে হয়। কারণ প্রতিবছরই তো গ্রামের বেশ কিছু মানুষ অপঘাতে মারা যায়। কেউ-কেউ বাড়ি-ঘর ছেড়েও চলে যায়। তবে কেন এই বছরের ঘটনাগুলোকে আলাদা করে ভাবা হবে?

মুখে যা-ই বলি, মাঝে-মাঝে আমার বুকটাও যে কেঁপে-কেঁপে ওঠে না, তা-ও নয়। গত দু'মাস ধরে স্কুল বাদে অন্য কোথাও যাওয়া আমার জন্য নিষেধ। আমার আনন্দময় জীবনে এখন দুঃখের কালো ছায়া। আমাদের কয়েক বাড়ি পরেই কুসুমদের বাড়ি। কুসুমের মা প্রায়ই আমাদের বাড়ি আসেন। মায়ের সাথে ফিসফিস করে কী সব বলেন। তাঁদের আতঙ্কটা টের পাওয়া যায়। কয়েকদিন আগে হারিয়ে গেছে পাঁচ বছরের একটা ছেলে। শোকে-দুঃখে বাচ্চাটার মা-ও মরেছে। আম্মার কাছ থেকে জানলাম, কুসুমকে তার নানাবাড়িতে পাঠিয়ে দেয়ার চিন্তা করা হচ্ছে। কুসুম এখন বোরকা ছাড়া কোথাও বের হয় না। স্কুলে এখন কুসুমের সাথে নিয়মিত কথা হয়। বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে কুসুম একদমই চিন্তিত নয় বলে মনে হলো। সে অনেক বদলে গেছে। সেদিন হঠাৎ কথা বলতে-বলতে আমার হাত ধরে বসেছিল। আমি কোথায় খুশি হব, উল্টো লজ্জায় লাল হয়ে গেছি। আমাকে দেখে মাঝে-মাঝে চোখও টিপ দেয়। আমার লজ্জা আরও বাড়ে। এসবের মানে কী? তা হলে কি কুসুম আমার প্রস্তাবে রাজি? আমাকে পছন্দ করতে শুরু করেছে? কুসুমকে নিয়ে আমার কল্পনা লাগামছাড়া হয়ে যায়। জসিমকে সব কথা খুলে বলি। জসিম খুশি হয়। বলে, 'এতদিনে বরফ গলেছে।'

কুসুমকে নিয়ে আমার কল্পনার কথাগুলোও ওকে বলি। শুনে জসিম হাসতে থাকে। বলে, 'বুঝেছি, এস.এস.সি. পাশের পরেই তোর বিয়ে দিতে হবে। আর এইচ.এস.সি. পাশের আগেই আমি চাচা হব ইনশা'আল্লাহ। হাহ্-হাহ্-হাহ্।'

জসিম দাঁত বের করে হাসতে থাকে।

আমি বরাবরের মত লজ্জা পেতে থাকি। তবে সত্যি এমন হলে মন্দ হত না।

সোমবারের দুপুর।

আমি, জসিম আর এহসান স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিলাম। স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার দুটো রাস্তা। একটা সোজা রাস্তা। আর অন্যটা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আঁকাবাঁকা রাস্তা। আমরা প্রতিদিন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ফিরি। মাঝে-মাঝে আমাদের সাথে কুসুম এবং ওর বান্ধবীরাও থাকে। আজ অবশ্য ওরা কেউ নেই।

BanglaBook.org

জঙ্গলের পরিবেশটা দিনের বেলাতেও বেশ ভুতুড়ে। গা কেমন ছমছম করতে থাকে। এহ্‌সান বলল, 'তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চল। জায়গাটা ভাল না।'

জসিম হেসে বলল, 'তোর ভয় তো দিন-দিন বাড়ছে।'

'বাড়বে না! গ্রামের অবস্থা তো জানিস। বুড়ি আবার ফিরে এসেছে। কতগুলো প্রাণ যে যাবে, কে জানে! গত দু'মাসে পাঁচ-ছয়জন নিখোঁজ হয়েছে! আরও কয়েকজন বিচ্ছিরিভাবে মারাও গেছে।'

'তোর ধারণা সব বুড়ি করেছে? আমরা পড়ালেখা জানা ছেলেরা যদি এমন বলি, তা হলে অন্যরা তো বলবেই।'

'ভাই, তোর সাথে তর্ক করতে চাই না। আমার ভয় লাগে। আমি তোর মত সাহসী না।'

'যাক, স্বীকার করেছিস। এই সামান্য জঙ্গল, এত ভয় পাচ্ছিস? আমি কতবার রাতে এখানে এসেছি, জানিস?'

'চাপাবাজি শুনতে চাই না। বাড়ি চল।'

রেগে উঠে জসিম বলল, 'চাপাবাজি আমি করি না।'

রেগে উঠল এহ্‌সানও। বলল, 'তুই চাপাবাজ এবং ধোঁকাবাজ।'

ওদের মধ্যে হাতাহাতি বেধে যাওয়ার উপক্রম হলো।

আমি অনেক কষ্টে ওদের থামালাম।

এহ্‌সান বলে উঠল, 'তোর তো অনেক সাহস। আজ রাতে এই জঙ্গলে আসতে পারবি?'

জসিম একটু বিদ্রূপের হাসি হাসল। সে বোঝাল, এটা কোনও ব্যাপারই না।

এহ্‌সান বলল, 'আচ্ছা, যা, বাজি ধর। তুই আজ রাতে জঙ্গলে এসে এই অশ্বত্থের একটা ডাল ভেঙে নিয়ে যাবি। আমরা পরদিন সকালে গাছের সামনে এসে ডাল মিলিয়ে দেখব। যদি ঠিকমত পারিস, তোকে পেট চুক্তিতে দত্তর দোকানের মিষ্টি খাওয়াব। নতুবা তুই আমাকে খাওয়াবি।'

শুনে জসিম মাথা নাড়ল। ওর মুখের হাসিটা আরও বিস্তৃত হলো। জসিম বলল, 'কখন আসতে হবে?'

'আজ রাত আটটার পর বাসা থেকে বের হবি। বড় মাঠের সামনে আমি আর রিয়াজ থাকব। তারপর আমাদের সামনেই তুই জঙ্গলে ঢুকবি। যদি সময়মত বড় মাঠের সামনে না আসিস, তবে বুঝব তুই হেরে গেছিস।'

'আমি আসব, ডাল কাটার জন্য দা নিয়েই আসব। যদিও বাসায় না জানিয়ে আসতে হবে।'

ওদের কথা শুনে আমার বেশ মজা লাগছিল। অনেকদিন পর আমার মধ্যে উত্তেজনা কাজ করছে। জসিম জঙ্গলে যাবে। আমরা বড় মাঠের সামনে অপেক্ষা করব। মজাই হবে। আর যে-ই জিতুক মিষ্টি নিশ্চয়ই একা খাবে না। আমাকেও ভাগ দেবে। তবে বাসা থেকে বের হওয়াটা একটু কঠিনই হবে। এমনিতেই সবাই বুড়ির ভয়ে অস্থির, তার উপর রাতের বেলা জঙ্গলে যাওয়া!

রাতে আমি আর এহ্‌সান সময়মত বড় মাঠের সামনে এলাম। জসিম তখনও

BanglaBook.org

আসেনি। এহ্সানের মুখে হাসি ফুটল। বলল, 'দেখলি, আমার কথাই ঠিক হলো। ভীতুটা আসেনি।'

আমরা কিছুক্ষণ মশার কামড় খেয়ে বিরক্ত হয়ে গেলাম। রাত নয়টার সময় যখন বিরক্তির মাত্রা চরমে পৌঁছল, তখন বাড়ি ফিরে গেলাম। বাড়ির সবাই গভীর ঘুমে। আমার মুখে হাসি। কাল জসিমের কাছ থেকে মিষ্টি খাব।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে বাইরে বেরুতেই জসিমের বাবাকে দেখলাম। তিনি উদ্বিগ্ন মুখে আমার বাবার সাথে কথা বলছেন। আমাকে দেখে বললেন, 'রিয়াজ, কাল রাত থেকে জসিমকে পাওয়া যাচ্ছে না। তুমি কিছু জানো? ওকে কাল দুপুরে একটা বিষয় নিয়ে মারধর করেছিলাম। সেজন্য রাগ করে কোথাও চলে গেল নাকি!'

আমি ঢোক গিলে মুখটা যথাসম্ভব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে বললাম, 'না, চাচা। আমি কিছু জানি না।'

'বাবা, যদি সত্যি কিছু জেনে থাকো, বলে দাও, ওর মা খুব চিন্তা করছে।'

আমি তুমুল বেগে মাথা নেড়ে একটু জোরের সাথে বললাম, 'না, আমি কিছু জানি না।'

রাজ্যের দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে জসিমের বাবা চলে গেলেন।

স্কুলে গিয়ে এহ্সানের সাথে দেখা হলো। জসিমের বাবা এহ্সানদের বাড়িতেও গিয়েছিলেন। এহ্সানও বলেছে, ও কিছু জানে না।

এহ্সান আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'জসিম কোথায় গেল বল তো?'

আমি ধরা গলায় বললাম, 'বুড়ি জসিমের কোনও ক্ষতি করেনি তো?'

এহ্সানের মুখটাও ভয়ে শুকনো হয়ে গেল। বলল, 'কিন্তু কাল রাতে তো জসিম বড় মাঠের সামনে আসেনি। তা হলে রাতের বেলা গেল কোথায়?'

এমন সময়, ক্লাসের ঘণ্টা পড়ল।

ক্লাস শেষে আমি আর এহ্সান জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ফিরছিলাম। দু'জনের কারও মুখেই কথা নেই। কেন জানি মনে হচ্ছে, জসিম নিখোঁজ হওয়ার জন্য আমরা কোনওভাবে দায়ী। যদিও পুরো হিসাব মিলছে না। সেই অশ্বত্থ গাছের সামনে এসে থমকে দাঁড়ালাম। কিছু মুহূর্ত পরে আমরা দু'জনে হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। অশ্বত্থ গাছের কয়েকটা ছোট ডাল এলোমেলোভাবে নীচে পড়ে আছে। মনে হচ্ছে, কেউ ধারাল কিছু দিয়ে ডালগুলো কেটেছে। তা হলে কি জসিম কাল এখানে এসেছিল?

তিন

আমরা প্রতিদিন জসিমকে খুঁজি। জঙ্গলে এসে জসিম কি কোনও বিপদে পড়েছিল, নাকি ও রাগ করে বাড়ি থেকে চলে গেছে? ব্যাপারটা আমাদের কাছে পরিষ্কার

BanglaBook.org

নয়। আমার মনটা এত খারাপ থাকে যে কাউকে বোঝাতে পারি না। এত মন খারাপের মধ্যে কুসুমকে দেখেই যা একটু মন ভাল হয়। এই কয়দিনে মেয়েটা আরও সুন্দর হয়ে গেছে। চোখে লাগার মত সুন্দর। আমাকে দেখলেই এখন রাজ্যের গল্প জুড়ে দেয় কুসুম। তবে আজ কুসুম এমন কিছু কথা বলল যা আমার মনকে দুমড়ে-মুচড়ে দিয়েছে। আর তিন-চার মাস পর আমাদের এস.এস.সি. পরীক্ষা। কুসুমের বাবা-মা নাকি চাইছেন পরীক্ষার আগেই ওর বিয়ে দিতে। আপাতত আক্‌দ করা থাকবে। এস.এস.সি.-র পর বড় আয়োজনে বিয়ে হবে।

আমি ভাঙা গলায় বললাম, 'তুমি বিয়েতে রাজি?'

'আমার রাজি-নারাজিতে কিছু যায়-আসে না।'

'এখন কী করবে?'

'জানি না। দূরে কোথাও চলে যেতে ইচ্ছা করছে।' কুসুমের মুখে বিষাদের ছাপ স্পষ্ট হয়।

কুসুম বাড়ি চলে গেল। আমার মাথা কাজ করছে না। জসিম থাকলে ওর সাথে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে পারতাম। আসলে গ্রামে এটাই স্বাভাবিক। কুসুমের এ বয়সের আগেই অনেক মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়। আমার কিছুই করার নেই। আমার চোখের সামনেই কুসুমের বিয়ে হয়ে যাবে।

কুসুমের মুখে এমন কথা শোনার পর ঘরে আর আমার মন টেকে না। একা-একা আনমনে ঘুরে বেড়াই। মাঝে-মাঝে জঙ্গলেও যাই। আমারও ইচ্ছা করে জসিমের মত হারিয়ে যেতে। আমার মনের অবস্থাটা কাউকে বোঝাতে পারি না।

সেদিনও একা জঙ্গল দিয়ে হাঁটছিলাম। কেন জানি হঠাৎ খুব ভয়-ভয় করতে লাগল। গ্রামে নতুন করে আরও কিছু মানুষ নিখোঁজ হয়েছে। গ্রামের অনেকেই তাদের সন্তানদের অন্য গ্রামে আত্মীয়ের বাড়িতে রেখে আসতে শুরু করেছে। এই অবস্থায় জঙ্গলে একা ঘুরে বেড়ানো ঠিক না, এটা আমি বুঝি। জঙ্গলে হাঁটতে-হাঁটতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালাম। একটু দূরে ঝোপঝাড়ের মধ্যে কিছু একটা পড়ে আছে। বেশ কটু গন্ধও আসছে ওদিক থেকে। আমি ধীরে-ধীরে এগিয়ে গেলাম। বুকের ভিতরটা কেন জানি খুব কাঁপছে। আমার কাঁপুনি আরও বেড়ে গেল যখন দেখলাম কোনও একটা মানুষের হাত ওখানে পড়ে আছে। হাতটার উপর ভনভন করছে মাছি। হাতটাতে মাত্র দুটো আঙুল অবশিষ্ট আছে। বাকিগুলো মনে হয় ছিঁড়ে নিয়েছে কেউ। হাতের বিভিন্ন অংশের মাংস বের হয়ে আছে। খুব বিচ্ছিরি একটা দৃশ্য। একটু পাশে মাথার কিছু চুল আর শরীরের খণ্ডিত অংশ দেখলাম। স্তব্ধ হয়ে একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বুঝলাম এটা জসিমের লাশ। হাতের একটা আঙুলে ওর প্রিয় আংটিটা দেখলাম। যেটা...

আমার শরীরের ভিতরটা পাক দিয়ে উঠল। দেখতে পেলাম বেশ খানিকটা দূর থেকে এক বুড়ি লাঠিতে ভর দিয়ে হেলতে-দুলতে আসছে। ভয়ে আমার হাত-পা অসাড় হয়ে গেল। নিশ্চিত হলাম, বুড়ি আমার দিকেই আসছে। বেশ জোরে বুড়ি বলল, 'ও, বাছা! তুই চলে যাস না। তোর সাথে আমার দরকার আছে।'

বুঝলাম, বেঁচে থাকতে হলে এখনই পালাতে হবে। কোন্‌দিকে যেতে হবে

BanglaBook.org

জানি না। আমি দিক ঠিক করতে পারছি না। পাগলের মত উল্টোদিকে ঘুরে দৌড়াতে শুরু করলাম। মাথা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। কোন্‌দিকে যাচ্ছি, জানি না। পিছনে তাকানোর সাহসও আমার নেই।

কীভাবে বাড়ি ফিরেছি জানি না। বাড়িতে এসে মৃগী রোগীর মত হাত-পা কাঁপতে লাগল। বার-বার বমি করতে লাগলাম। আম্মা-আব্বা ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁদের বলতে পারলাম না, আমি কী দেখেছি। শুধু কাঁদছি আর কাঁদছি। রাতে বেশ জ্বর এল। আম্মা আমার কাছে থাকতে চাইলেন। রাজি হলাম না। তিনি চিন্তিত মুখে চলে গেলেন। ঘুম আসছে না। বার-বার জানালা দিয়ে বাইরে তাকাচ্ছি। আজ পূর্ণিমা। সব জায়গায় আলোতে ভরপুর।

একটু তন্দ্রামত এসেছিল, তখন মনে হলো কেউ খুব আস্তে-আস্তে আমার নাম ধরে ডাকছে। চোখ মেলে তাকালাম। দেখলাম, জানালার শিক ধরে কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে। লাফিয়ে উঠে কাঁপা গলায় বললাম, 'কে?'

মেয়েলি কণ্ঠে কেউ বলল, 'আমি।'

খুব পরিচিত স্বর।

'আমি কে?'

'আমি কুসুম।'

'কুসুম!! তুমি এত রাতে?'

'একটু বাইরে আসবে?'

বাইরে বের হলাম। কুসুম বোরকা পরে এসেছে। এত রাতে ওর আমার কাছে কী দরকার থাকতে পারে?

কুসুম আমাকে দেখে আবেগী গলায় বলল, 'বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি। বাবা আমার বিয়ে ঠিক করেছেন। আজ রাতেই গ্রাম ছেড়ে চলে যাব।'

'কোথায় যাবে, কুসুম?'

'মধুপুরে। ওখানে আমার খালা থাকেন। খালার কাছে গেলে কেউ আমার বিয়ে দিতে পারবে না।'

'কী বলছ এসব?'

'আমার একা যেতে ভয় করছে। তুমি কি আমাকে খেয়াঘাট পর্যন্ত দিয়ে আসবে? এরপর আর আমার যেতে সমস্যা হবে না।'

আমার জ্বর এক মুহূর্তে যেন সেরে গেল। কুসুমের সাথে এত রাতে একসাথে পথ চলব, এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কী হতে পারে! টর্চ আর কিছু টাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। পকেটে আরও একটা জিনিস নিলাম, যেটা বিপদে কাজে লাগতে পারে। কুসুমকে খেয়াঘাট নয়, মধুপুর পর্যন্তই পৌঁছে দেব। অদ্ভুত শিহরণ বয়ে গেল আমার শরীরের মধ্য দিয়ে। জসিমকে নিয়ে সেই দুঃসহ স্মৃতি কিছুটা ভুলে গেলাম।

BanglaBook.org

চার

কুসুম আর আমি হাঁটছি। রাত বারোটার বেশি বাজে। রাস্তাঘাট একদম ফাঁকা। টর্চটা বার-বার বিগড়ে যাচ্ছে। তবে আকাশে চাঁদ রয়েছে। বকবক করেই চলেছি। কিন্তু কুসুম জবাব দিচ্ছে কদাচিৎ। আমরা বটতলার মোড়ে চলে এলাম। অনেক বছর আগে রইচ উদ্দিন নামে এক লোক এই জায়গায় গাছে ঝুলে আত্মহত্যা করেছিল। অনেকে বলে, এখানে নাকি রইচ উদ্দিনের আত্মা ঘুরে বেড়ায়। আমার মনে অবশ্য ভয়ের অনুভূতি তেমন নেই। কুসুম তো পাশে আছে। হঠাৎ কুসুম দাঁড়িয়ে পড়ল। বোরকা খুলতে শুরু করল।

আমি বললাম, 'বোরকা খুলছ কেন?'

'খুব গরম লাগছে।' কুসুম খুলে ফেলল বোরকাটা। মাটিতে ফেলে দিল ওটা। এরপর স্পষ্ট গলায় বলল, 'আমার হাতটা একটু ধরো তো।'

'মানে!'

'আহা, ধরো না!'

তুমুল অস্বস্তি এবং আনন্দ নিয়ে আলতো করে ওর হাত ধরলাম। পরক্ষণেই, কিছু বুঝে উঠবার আগেই আমাকে জড়িয়ে ধরল কুসুম। যেন পাথরের মত হয়ে গেলাম। তুমুলভাবে আমাকে আঁকড়ে ধরে আছে কুসুম। নড়ার চেষ্টা করলাম। তবু বাঁধন এতটুকু আলগা হলো না। আবার নিজেকে ছাড়ানোর মৃদু চেষ্টা করলাম। কিন্তু কুসুমের শক্তির কাছে হার মানতে হলো। ঠিক তখন আমার মনে হলো, কুসুমের হাতটা খুব খসখসে, গায়ে অসংখ্য লোম, হাত এবং শরীরের আকার যেন স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বড় হয়ে গেছে! হাতের বিভিন্ন জায়গায় ফোঁড়া ও ক্ষতচিহ্ন। বুঝতে পারলাম এটা কুসুম নয়। এবার পাগলের মত নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চাইলাম।

কঠোর গলায় কেউ বলল, 'কী রে, এত ব্যস্ত কেন? খারাপ লাগছে? জড়িয়ে ধরে থাক আমাকে!'

'ছেড়ে দাও! ছে-ছেড়ে দা-দাও আমাকে!'

'হা-হা-হা!' গা হিম করা হাসি অনেকদূর ছড়িয়ে পড়ল।

হঠাৎ আমি ছাড়া পেলাম। দেখলাম সকালের সেই বুড়িকে। এখন আর কুঁজো হয়ে নেই। সটান দাঁড়িয়ে আছে। মুখটা ভয়ঙ্কর কদাকার। চোখগুলো কোটর থেকে বেরিয়ে আসছে। নাকটা বামদিকে ঝুলে আছে। নাকের গরম নিঃশ্বাসে আমার শরীর যেন পুড়ে যাচ্ছে। মুখের হাঁ-টা পশুর মত। বড়-বড় দাঁত বার-বার বেরিয়ে পড়ছে। কথা বলছে হিসহিসে গলায়। মাঝে-মাঝে শব্দ করছে পাগলা কুকুরের মত। যেন অনেকদিনের ক্রোধ জমা হয়ে আছে।

নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছি—ভয় নেই, উত্তেজনা নেই, শুধু অপেক্ষা।

BanglaBook.org

বুড়ি বলল, 'তোর কুসুম তো দুই মাস আগেই শেষ রে। কুসুমের তোর প্রতি ভালবাসা ছিল না। কিন্তু আমার তোর জন্য অনেক ভালবাসা। আমি তোরে অনেক ভালবাসি। দুই মাস ধরে কুসুম হয়ে এই গ্রামে আছি। আজ রাতে এই গ্রাম থেকে চলে যাব। বড্ড তেয়াশ লাগছে। আয়, বাছা! আমার তেয়াশ মেটা!'

ভাঙা গলায় অসহায়ের মত বললাম, 'আমাকে মাফ করে দাও। ছেড়ে দাও।'

বুড়ি আবারও হেসে উঠল। 'তোর বুক চিরে আমি আগে কলিজাটা খাব। তোর এই কলিজার ভিতর কুসুমের জন্য অনেক প্রেম জমা হয়ে আছে।'

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বুড়ি একটা চার পাওয়ালা প্রাণীতে পরিণত হলো। মুখটা আরও বড় হয়ে গেল। মুখ দিয়ে ক্রমাগত লালা ঝরতে লাগল।

আমি দৌড় দেয়ার চেষ্টা করলাম।

বুড়ি কিংবা ভয়ঙ্করদর্শন পশুটা আমার পা কামড়ে ধরল। ভয়ে, ব্যথায় চিৎকার করতে লাগলাম। পশুটা আমার দেহের বিভিন্ন অংশ খেতে শুরু করেছে! খাবলা-খাবলা মাংস তুলে নিচ্ছে!

শেষ চেষ্টা করলাম। বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় পকেটে একটা ছুরি রেখেছিলাম। সেটা দ্রুত বের করলাম। হাতটা প্রসারিত করে সোজা পশুটার শরীরে ঢুকিয়ে দিলাম।

পশুটা দমল না। লাফিয়ে এসে আমার বাম চোখের মধ্যে ওর ধারাল নখ ঢুকিয়ে দিল। ব্যথা সহ্যের সব সীমা অতিক্রম করেছে। প্রচণ্ড আক্রোশে আমার বাম চোখটা তুলে ফেলল পশুটা।

সর্বশক্তি দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলাম। ছুরিটা আবার আমার হাতে। আবারও প্রবল আক্রোশে পশুটার শরীরে ছুরিটা গেঁথে দিলাম। এভাবে বেশ কয়েকবার ছুরি চালালাম। পশুটার কোনও ক্ষতি হলো কি না জানি না। তবে বার-বার আর্তনাদ করতে লাগল। আমার চোখ আর পায়ের রক্তে পুরো শরীর মাখামাখি। পুরো পৃথিবী আমার কাছে অস্পষ্ট। ব্যথা ছড়িয়ে পড়েছে দেহের প্রতিটা কোষে। পশুটা লাফ দিয়ে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, বুঝতে পারছি ও বেশ আহত।

দাঁত বসাল আমার কণ্ঠনালীর উপর। শরীর খামচে ধরেছে ওটার ধারাল নখগুলো।

ডান চোখটা বন্ধ করলাম। হয়তো চিরকালের জন্যই।

কতদিন পর চোখ মেললাম, জানি না।

বাম চোখে ব্যাণ্ডেজ।

নিজেকে খুব হালকা লাগল।

পরে বুঝলাম, হালকা লাগছে–কারণ আমার দুটো পা-ই কেটে ফেলতে হয়েছে।

কণ্ঠনালী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় এখন ঠিকমত কথাও বলতে পারি না।

শরীরের অন্যান্য অংশেও ভয়ঙ্কর জখম।

BanglaBook.org

জানলাম, সেই ভয়ঙ্কর রাতের পর পরদিন সকালে গ্রামের কৃষকরা আমাকে উদ্ধার করেছিল। আমাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। আমার পাশে বুড়ির মৃতদেহও ছিল। ছুরির আঘাতে সে-রাতে বুড়ি মারা গিয়েছিল। কীভাবে মেরেছি জানি না। কোথায় আঘাত লেগেছিল তা-ও মনে নেই। সে-রাতে আমার কাছে আসার আগে বুড়ি এহসানকেও মেরে ফেলেছিল। এহসানের লাশ পাওয়া গেছে ওদের গোয়াল ঘরের পিছনে। একে-একে গ্রামের বিভিন্ন স্থান থেকে জসিম, কুসুমসহ আরও অনেকের বিকৃত মৃতদেহের অংশবিশেষ পাওয়া গেছে। পুরো গ্রামে এখন শোকের মাতম। শুনলাম, বুড়ির মৃতদেহ খণ্ড-বিখণ্ড করে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে।

এখনও মাঝে-মাঝে স্বপ্নে বুড়িকে দেখি।

বুড়ি আমাকে বলে, 'তুই আমারে মেরে ফেললি! আমি তো তোর কুসুম! তোরে আমি ভালবাসি!' এরপর একটু থেমে খিলখিল করে হাসে, 'আমি কিন্তু মরিনি। তোর ভেতর বেঁচে থাকব। হা-হা-হা।'

এই স্বপ্ন দেখলে প্রচণ্ড আতঙ্কের মাঝে ঘুম ভাঙে আমার।

সে-রাতে পূর্ণিমা ছিল। হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। মনে হলো শরীরে যেন প্রফুল্লের ভাব ছড়িয়ে পড়ছে। ডান চোখ মেলে দেখলাম, গায়ে অসংখ্য রোম বেড়ে উঠছে। নাকটা বামদিকে বেঁকে গেছে। দাঁতগুলো যেন মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে। বার-বার মনে হচ্ছে দুই হাতে ভর দিয়ে আমাকে কোথাও যেতে হবে। খুব খিদে পেয়েছে।

আমি উঠে পড়লাম।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

কেবিন নাম্বার ৩০৫

১৮ জুন।

দুপুর ২ টা।

বাসের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে লোকটি। গাজীপুর থেকে ঢাকার দূরত্ব খুব বেশি নয়। এইটুকু সময়ের মাঝে মানুষের ঘুম কীভাবে আসে? প্রশ্নটা আনোয়ারের মাথায় ঘুরপাক খায়। প্রথমে অবাক পরে আতঙ্কের সাথে আনোয়ার লক্ষ করল, লোকটির হাত বাসের জানালা গলে বাইরে চলে গেছে। যে-কোনও সময় অন্য বাসের সাথে ধাক্কা লেগে একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। আনোয়ার দ্রুত লোকটিকে জাগিয়ে তোলে। ঘুম ভেঙে বিব্রত হয় লোকটি। অপরাধী মুখ করে বলে ওঠে, 'আসলে রাতে ভাল ঘুম হয়নি তো তাই...' কথা বলার ভঙ্গিটা এমন যেন আনোয়ারের প্রতি সে কোনও অপরাধ করে ফেলেছে.।

আনোয়ার হেসে বলল, 'ভাই, এত বিব্রত হবেন না। ঘুমানো কোনও অপরাধ নয়। আমি আনোয়ার,' নাম বলে হাত বাড়িয়ে দিল সে।

'আমি ডা. সুমন।' শুকনো মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করে লোকটা।

'আপনি ডাক্তার! বাহ্!'

'জী, হাতুড়ে ডাক্তার নই। রীতিমত মেডিকেল থেকে পাশ করা ডাক্তার।'

আনোয়ার হেসে ওঠে। লোকটার কথা বলার ভঙ্গিটা চমৎকার।

'আপনি কী করেন?' সুমন জিজ্ঞাসা করে।

'আমি ঢাবি থেকে অর্থনীতিতে অনার্স, মাস্টার্স শেষ করে দীর্ঘদিন ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছি।'

'চাকরির চেষ্টা করছেন না?'

'না রে, ভাই। আমার বাবার টাকার অভাব নেই। আর চাকরি আমাকে দিয়ে হবে না। আমি শুধু ঘুরে বেড়াই।'

'সব দর্শনীয় স্থানে ঘুরে বেড়ান?'

'না, ঠিক দর্শনীয় স্থান না, আসলে আমি রহস্যের সন্ধানে ঘুরি। কেউ কোনও সন্ধান দিলেই, ব্যস, বেরিয়ে পড়ি।'

'তাই! ভূত-প্রেতের সাথে দেখা হয়েছে কখনও?'

'হা-হা-হা। ভূত কি না জানি না, তবে জীবনে অসংখ্য ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছি। জীবন নিয়ে টানাটানি পড়ে গেছে অনেকবার।'

'বলেন কী!'

'হ্যাঁ।'

'আমারও স্টুডেন্ট লাইফে অ্যাডভেঞ্চারের খুব শখ ছিল। লাশ কাটা ঘরে

BanglaBook.org

রাতে একা থাকার চেষ্টা করেছিলাম। শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারিনি।'

'চেষ্টাটাই আসল। সফলতা সবসময় আসে না।'

'ভাই, আপনার দুই-একটা ঘটনা একটু বলবেন? যদি আপনার আপত্তি না থাকে,' সুমন অনুরোধ করল খুব আন্তরিকভাবে।

আনোয়ার অনুরোধটা ফেলতে পারল না। একবার শিগব নামে অপদেবতার মুখোমুখি হয়েছিল, সেই ঘটনাটা সুমনকে বলল। এরপর বলল কুয়াকাটায় একটা স্কুলে ভয়াবহ ভৌতিক অভিজ্ঞতার কথা। দুটি ঘটনা শুনে সুমনের চোখ যেন কপালে ওঠে। বলল, 'আপনি যে এখনও বেঁচে আছেন, এটাই তো বিস্ময়ের।'

আনোয়ার হেসে উঠে বলল, 'আমার জীবনে এমন অনেক ঘটনা আছে, ভাই। আমি নিজেও ভেবে অবাক হই, কীভাবে এখনও বেঁচে আছি! তবে বাঁচা-মরা নিয়ে খুব বেশি ভাবি না।'

'এভাবে কেন বলছেন, ভাই? কোনও গোপন কষ্ট আছে নাকি?'

'না রে, ভাই, গোপন কষ্ট নেই। আমি মানুষটা এমনই।'

'হুম, বুঝতে পারছি আপনি মানুষটা একটু অন্যরকম।'

'বাদ দিন আমার কথা। আমার কথা তো অনেক শুনলেন, এবার আপনার কথা বলুন। আপনি কী করতে পছন্দ করেন?'

'এখন আসলে কিছুই তেমন আকর্ষণ করে না আমাকে। শুধু রোগীই দেখি।'

'কোনও কিছু আকর্ষণ না করার কারণটা কী?'

ডা. সুমন উত্তর না দিয়ে হাসার চেষ্টা করল।

আনোয়ার কথাটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে বলল, 'ভাই, আপনি কি জীবনে কখনও কোনও অদ্ভুত পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন?'

'অদ্ভুত পরিস্থিতি? কী বোঝাতে চাইছেন?'

'মানে, অতিপ্রাকৃত কোনও ঘটনা ঘটেছে আপনার জীবনে?'

প্রশ্নটা শুনে ডা. সুমনের মুখ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। আনোয়ার বুঝল তিনি কিছুটা অস্বস্তির ভেতর পড়েছেন।

আনোয়ার বলল, 'আমার মনে হয় আপনার কোনও ঘটনা মনে পড়েছে। কিন্তু এত অল্প পরিচয়ে আমাকে ঘটনাটা বলা ঠিক হবে কি না, তাই নিয়ে চিন্তা করছেন—না?'

ডা. সুমন হেসে বলল, 'ঠিকই ধরেছেন। আমার জীবনে খুব কষ্টের একটা ঘটনা আছে। বিষয়টা যথেষ্টই ভৌতিক। সেটা কেন জানি আপনাকে বলতে ইচ্ছা করছে। আমি নিজে অবশ্য এর কোনও ব্যাখ্যা পাইনি।'

'বলুন, আমি খুব ভাল শ্রোতা।'

সুমনের মুখ থেকে হাসি সরে গেল। সেখানে স্পষ্ট বিষাদের ছায়া। ডা. সুমন বলতে শুরু করল: 'ঘটনাটা প্রায় দুই বছর আগের। আমি মেডিকেল থেকে সবে পাশ করেছি। আমাদের এক সিনিয়র শিক্ষক বললেন তাঁর পরিচিত এক ক্লিনিকে কাজ শুরু করতে। সেটা আমার জন্য অনেক বড় সুযোগ ছিল। সেটি ছিল ঢাকা

BanglaBook.org

শহরের অন্যতম বড় ক্লিনিকগুলোর একটি। বড়-বড় ডাক্তার নিয়মিত আসতেন সেখানে। তাঁদের সাহচর্যে আমি নিজের অভিজ্ঞতাকে বাড়াতে পারব। এসব ভেবে খুশি মনে কাজ শুরু করলাম।

'আমার সাধারণত সপ্তাহে তিনদিন নাইট ডিউটি পড়ত। শনি, সোম আর বৃহস্পতি। তবে কোনও-কোনও রাতে দরকার বোধ করলে নিজ থেকেই ক্লিনিকে থেকে যেতাম। আমার সঙ্গে আরও দু'জন জুনিয়র ডাক্তার ছিল সেখানে। ডা. সোলায়মান আর ডা. সাদি। সাদির সাথে আমার সখ্য ছিল বেশি। কারণ ও ছিল আমার সমবয়সী। প্রায় সময়ই একসাথে নাইট ডিউটি পড়ত আমাদের। তবে একই ফ্লোরে নয়। তবু আমরা আড্ডা দেয়ার ভাল সুযোগ পেতাম। আমাদের ওই ক্লিনিক সবসময় রোগীতে পূর্ণ থাকত। কারণ ক্লিনিকের চিকিৎসা-সেবা নিয়ে রোগীরা বেশ সন্তুষ্ট ছিল।

'যা হোক, মূল ঘটনায় চলে আসি। পারিবারিকভাবেই ছোটবেলা থেকে রোদেলা নামে এক মেয়ের সাথে আমার বিয়ে ঠিক ছিল। রোদেলা আমার দূরসম্পর্কের এক খালার মেয়ে। বোঝাপড়াটা চমৎকার ছিল আমাদের মাঝে। অনার্স থার্ড ইয়ারে পড়ত রোদেলা। আমার আনন্দের সবটুকু জুড়ে ছিল ওর বিচরণ।

'তারিখটা পুরোপুরি মনে আছে আমার। ২০১২ সালের ৩০ শে মে। ওইদিন রাস্তা পার হওয়ার সময় সিএনজি ধাক্কা দেয় রোদেলাকে। মাথায় এবং শরীরের বিভিন্ন জায়গায় বেশ আঘাত লাগে ওর। প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয় একটা বেসরকারি হাসপাতালে। পরে আমি খবর পেয়ে ওকে আমাদের ক্লিনিকে নিয়ে আসি। ক্লিনিকে তখন আমার সবে মাত্র এক মাস পূর্ণ হয়েছে। তবে এই অল্প দিনেই নার্স, ডাক্তার সবার সাথে আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আমি ক্লিনিকে এসে দ্রুত একটা কেবিনের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু দেখা গেল পাঁচতলা ক্লিনিকের প্রতিটা কেবিনই রোগীতে পূর্ণ। শুধু ৩০৫ নাম্বার কেবিনটা খালি। আমি রিসেপশনের লোকটিকে বললাম ৩০৫ নাম্বার রুমটা ঠিকঠাক করতে। তিনি আমতা-আমতা করতে থাকলেন। আমি রেগে গিয়ে বললাম, "আপনাকে কী বললাম? দ্রুত করুন।"

'তিনি প্রতি-উত্তরে আস্তে-আস্তে বললেন, "স্যার, ওই কেবিনের একটু সমস্যা আছে। গত দেড় বছরে ওই কেবিনে পাঁচজন রোগী রহস্যজনকভাবে মারা গেছে। এমনকী এই ফেব্রুয়ারি মাসেও ওই কেবিনে কাওসার নামে একটা ছোট বাচ্চা মারা গেছে। সেই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ক্লিনিক ভাংচুর হয়েছে। কয়েকটা পত্রিকায় এই নিয়ে নিউজও হয়েছে। তাই এখন আমরা ওই রুমটা এড়িয়ে চলি। প্রায় সময়ই রুমটা বন্ধ থাকে।"

'কথাটা শুনে ভিতরে-ভিতরে একটু চমকে উঠলাম। তবে বেশি পাত্তা না দিয়ে জোর করেই রুমটা নিয়ে নিলাম। কুসংস্কার আমার বিশ্বাস হয় না। যে মরার সে এমনিতেই মরবে। কেবিন কাউকে মারতে পারে না। রোদেলার জন্য কেবিন ঠিক করা হলেও ওকে প্রথমে রাখা হলো আইসিইউতে। সেখানে প্রথমে

BanglaBook.org

বড় ডাক্তার ওকে দেখবেন। আমার রোগী হওয়ার জন্য রোদেলা একটু বাড়তি যত্ন পেল। ডাক্তাররা ভাল করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বুঝলেন, রোদেলাকে আইসিইউতে রাখার প্রয়োজন নেই। ওকে কেবিনে ট্র্যান্সফার করা হলো। ওর মোটামুটি জ্ঞান আছে। তবে মূল সমস্যা শ্বাসকষ্ট নিয়ে। তাই ওর মুখে অক্সিজেন মাস্ক পরিয়ে রাখা হলো। বুঝতে পারলাম, শ্বাসকষ্ট ২৪ ঘণ্টা মত থাকবে। তারপর ঠিক হয়ে যাবে। এই সময়টুকুতে অক্সিজেন মাস্ক খোলা যাবে না। বড় ডাক্তাররা আমাকে সব বুঝিয়ে দিলেন: কোন্ ইনজেকশনের পরে কোন্টা দিতে হবে, কোন্ ওষুধ খাওয়াতে হবে। এক ব্যাগ রক্তও দেয়া হয়েছে। এখন সারারাত স্যালাইন চলবে। কেবিনের বাইরে আমার এবং রোদেলার পরিবারের বড়সড় জটলা। সবাই দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন। রাত ৯ টার দিকে আমি সবাইকে জোর করে বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম। আমাদের ক্লিনিকে রোগীর সাথে একজনের বেশি থাকতে পারে না। আমি যেহেতু ডাক্তার, তার উপর এই ক্লিনিকেই কাজ করি, তাই আমার উপর ভরসা করে সবাই চলে গেল। আমি রোদেলার মা-বাবাকে বললাম, "কোনও সমস্যা হলেই আমি আপনাদের খবর দেব। আর রোদেলার অবস্থা উন্নতির দিকে। ভয়ের কোনও কারণ নেই। আমি সারারাত ওর পাশে বসে থাকব।" আমার রোগী বলে কথা। কেবিনে বারবার ডা. সোলায়মান, ডা. সাদি এবং নার্সরা আসতে লাগল। ডা. সাদির সেদিন নাইট ডিউটি ছিল তিনতলাতে। ডিউটি ডাক্তারের রুম অর্থাৎ ৩১০ নম্বর রুমে ও থাকবে। আমি আশ্বস্ত হলাম। কোনও দরকার হলেই ওকে ডাকা যাবে।

'রাত বাড়তে লাগল। ঘুমের ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে রোদেলাকে। স্যালাইন চলছে। অক্সিজেনও চলছে। আমি এক মুহূর্ত ওর দিক থেকে দৃষ্টি সরাতে পারছি না। বড্ড কষ্ট হচ্ছে আমার। বারবার চোখে পানি আসছে। কিন্তু ডাক্তারদের এত নরম মনের হলে চলে না, তাই শক্ত থাকার যথাসম্ভব অভিনয় করছি। কিন্তু রোদেলার চেয়ে আমার ব্যথাটা কম হচ্ছে বলে মনে হয় না। ভালবাসার মানুষের কষ্ট সহ্য করা খুব কঠিন কাজ। তবে সান্ত্বনা এইটুকুই যে আমি ওর পাশেই আছি।

'একটার দিকে একটু বাথরুমে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করলাম। প্রতিটি কেবিনেই বাথরুম রয়েছে। ভাবলাম বাথরুমে যাওয়ার আগে ডা. সাদিকে ডেকে নিয়ে আসি। পরে ভাবলাম, থাক, এই অল্প ব্যাপারে ওকে আর ডাকার দরকার নেই। বাথরুমে আর কয় মিনিটই বা লাগবে!

'আমি বাথরুমে ঢোকা মাত্রই বাথরুমের বাতি নিভে গেল। পায়ের শব্দে আমার মনে হলো কেউ যেন এসে বাতিটা নিভিয়ে দিল। আমি কিছু বোঝার আগেই বাথরুমের দরজাটা বাইরে থেকে আটকে দিল কেউ। একটু পর টের পেলাম, কেবিনের ভিতরের বাতিটাও নিভে গেল। কেবিনের মূল দরজাটাও কেউ সজোরে বন্ধ করে দিল। প্রচণ্ড অন্ধকারে আমি দিগ্বিদিক্শূন্য হয়ে পড়লাম। জোরে-জোরে বাথরুমের দরজা ধাক্কাতে লাগলাম। এমন সময় মনে হলো চাপা স্বরে কেউ আওয়াজ করছে। আর কেবিনের মধ্যে কেউ যেন দ্রুত হাঁটা-চলা

BanglaBook.org

করছে। আমি পাগলের মত চিৎকার করছি আর দরজা ধাক্কাচ্ছি। এমন সময় মনে পড়ল আমার কাছে মোবাইল আছে। কাঁপা হাতে পকেট থেকে মোবাইল বের করলাম। ডা. সাদিকে ফোন দিয়ে দ্রুত বললাম কেবিন নাম্বার ৩০৫-এ আসতে। সাদি ছুটে আসতে লাগল। সে কেবিন ৩০৫-এর সামনে এসে দেখল, ভিতর থেকে লক করা রুম। ভিতরে কেউ যেন গোঙানির মত আওয়াজ করছে।

'সাদি ফোনে আমাকে জানাল সব।

'আমি ভাঙা গলায় বললাম, "দরজা ভেঙে ফেল, দরজা ভেঙে ফেল, সাদি!"

'সাদি ক্লিনিকের নার্স এবং আরও কয়েকজনকে খবর দিল। আমি উন্মাদের মত চেঁচিয়ে চলেছি। বাথরুমের শক্ত কাঠের দরজা কিছুতেই ভাঙতে পারলাম না। কেবিনের মূল দরজা ভেঙে ঢুকতে দশ মিনিট লেগে গেল সাদির। দরজা ভাঙা শেষ হওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে কেবিনের লাইট এবং বাথরুমের লাইট জ্বলে উঠল। সাদি এসে দ্রুত বাথরুমের দরজা খুলে দিল। আমরা দৌড়ে গেলাম রোদেলার কাছে। গিয়ে দেখলাম...'

ডা. সুমন থামল। কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম। পানিতে ছলছল করছে চোখ। সে পানি গোপন করার চেষ্টা করল না।

ডা. সুমনের দিকে তাকিয়ে বলল আনোয়ার, 'আপনার বলতে কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পারছি। থাক, আর বলার দরকার নেই। অন্য একদিন না হয় বাকিটা শুনব।'

মনে হলো না আনোয়ারের কথা ডা. সুমন শুনতে পেল। সে অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, 'রোদেলার কাছে গিয়ে দেখলাম, রোদেলার অক্সিজেন মাস্কটা খোলা, পুরো শরীরে অসংখ্য আঁচড়ের চিহ্ন। গলার কাছ থেকে রক্ত ঝরছে। মনে হচ্ছে কোনও জন্তু যেন কামড় বসিয়েছে সেখানে। শরীরটা কেমন যেন কালচে হয়ে গেছে ওর। এরপর অনেক চেষ্টা করা হলো। ডাক্তাররা সাধ্যের সবটুকু করলেন। কিন্তু আমি বুঝেছিলাম, কোনও কিছুতেই রোদেলা আর ফিরবে না। আমি সেদিন একটুও কাঁদিনি। কেন জানি খুব ক্লান্ত লাগছিল। মনে হচ্ছিল মাথা ঘুরে পড়ে যাব।

'পরদিন খুব সকালে ক্লিনিকের সব ডাক্তার আলোচনায় বসলেন। আমি, সাদি এবং ক্লিনিকের স্টাফরা যা দেখেছি, সব তাঁদেরকে জানানো হলো। ওই রুমে আগেও পাঁচজনের রহস্যময় মৃত্যু হয়েছে এটাও তাঁদের জানানো হলো। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন ক্লিনিকের অন্য রোগী এবং স্টাফদের কাছে এই ভয়াবহ ঘটনা গোপন রাখা হবে। কারণ এতে থানা-পুলিশ হবে, অন্য রোগীরাও ক্লিনিকে আসার সাহস পাবে না। আর কেবিন ৩০৫ স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেয়া হবে।

'রোদেলার মা-বাবার কাছেও সত্য গোপন রাখা হলো। তাঁরা জানলেন যে গতকাল গভীর রাতে রোদেলা হঠাৎ বিছানা থেকে পড়ে গেছে। এরপরই মৃত্যু। গলার দাগ, শরীরের বিভিন্ন ক্ষত দেখেও তাঁরা অন্যরকম কোনও সন্দেহ করলেন না। তাঁদের বোঝানো হলো অ্যাক্সিডেন্টের জন্যই ক্ষতগুলোর সৃষ্টি হয়েছিল। রোদেলার মা আমাকে ধরে বললেন, "তুমি আমার মেয়েটাকে মেরে ফেললে?

BanglaBook.org

তুমি থাকতেও কীভাবে বিছানা থেকে পড়ে গেল? আমরা থাকলে মেয়েটা এভাবে মারা যেত না। আমরা ওকে চোখের আড়াল করতাম না।" রোদেলার মা-বাবার কান্নায় পুরো পরিবেশ ভারী হয়ে আছে। রোগী বিছানা থেকে পড়ে গেল, আর আমি কিছুই করতে পারলাম না। তাই আমার মা-বাবার চোখেও আমি হয়ে গেলাম অপরাধী।

'আমার জীবনটা অন্যরকম হয়ে গেল। বাড়ি যাওয়া ছেড়ে দিলাম। একাকী জীবন যাপন শুরু করলাম। ক্লিনিকের কাছেই বাসা ভাড়া করলাম। নিজের মত সাজিয়ে নিলাম বাসাটা। আমার মা-বাবা আমাকে ক্ষমা করে বারবার তাগাদা দিলেন বাসায় ফিরতে। কিন্তু আমি রাজি হলাম না। আসলে সব কিছুতেই আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছিলাম। প্রতিনিয়ত কষ্ট আমাকে তাড়া করে ফিরত। রোদেলাকে ধরে রাখতে না পারার অক্ষমতা দুমড়ে-মুচড়ে ফেলত প্রতিনিয়ত। সেই সময় আরও একটা পরিবর্তন এল আমার মাঝে। সাহসটা যেন বেড়ে গেল বহুগুণে। কেবিন নাম্বার ৩০৫-এর চাবি জোগাড় করলাম। এরপর বেশ কয়েক রাত ওই রুমে একা-একা কাটালাম। আমি ওই ভয়ঙ্কর জিনিসটার মুখোমুখি হতে চেয়েছিলাম। কিন্তু একদিনও কোনওকিছু দেখিনি। আমার ইনসমনিয়া হয়ে গেল। রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেল। রোগী বাদে অন্য কোনও মানুষের সঙ্গ আমার ভাল লাগত না। এখন অবশ্য আগের থেকে অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছি। যা হোক, আমি সপ্তাহে ছয় দিনই ক্লিনিকে নাইট ডিউটি শুরু করলাম। ক্লিনিকে কয়েকটা বিড়াল আছে। রাতে ওরা আমাকে সঙ্গ দেয়। আমি ক্লিনিকের যেখানেই যাই, ওরাও আমার পিছু নেয়। গোপনে যথাসম্ভব যত্ন করি ওদের। যদিও আমি বাদে ক্লিনিকের অন্য কেউ ওদেরকে সহ্য করতে পারে না। কারণ বিড়ালগুলো কালো রঙের, তাই সবাই ওদেরকে অশুভ মনে করে। সত্যি বলতে মানুষের চেয়ে পশু-পাখিই এখন বেশি ভাল লাগে আমার।'

কথা বলতে-বলতে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল ডা. সুমন। আনোয়ারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভাই, আমার নামার সময় হয়ে গেছে। আপনার সাথে কথা বলে খুব ভাল লাগল। আমার জীবনের অনেক গোপন কথা বলে ফেললাম। আশা করি কারও সাথে শেয়ার করবেন না। আর সময় পেলে আমার ক্লিনিকে চা খেয়ে আসবেন।' ক্লিনিকের নাম আর ওটা কোথায় বলে দিল ডা. সুমন।

এরপর আনোয়ারকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে নেমে গেল।

আনোয়ার জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। কিছু একটা নিয়ে চিন্তিত সে।

১৯ জুন।

সকাল ১০ টা।

নিজেদের বিশাল চারতলা বাড়ি আছে আনোয়ারদের। কিন্তু নিজের বাসা বাদ দিয়ে ছাদের চিলেকোঠার ঘরে একা থাকে ও। কারণ ছাদের এ ঘরে নিজের মত করে সব কাজ করার সুযোগ পাওয়া যায়। কেউ তেমন বিরক্তও করতে পারে না। বন্ধুবান্ধব কেউ ওর সাথে দেখা করতে এলে সরাসরি ছাদেই চলে আসে।

BanglaBook.org

আনোয়ার ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে নিল। এরপর ল্যাপটপটা চালু করল। ইন্টারনেটে বসে পুরানো পত্রিকা দেখছে। ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের পত্রিকাগুলো খুব সাবধানতার সাথে দেখা দরকার। কাওসার নামে এক বাচ্চার মৃত্যুর খবর খুঁজে বের করবে আনোয়ার। একইসাথে ইউটিউবেও সার্চ দেয়া দরকার। যদি এই বিষয় নিয়ে কোনও টিভি চ্যানেল রিপোর্ট করে থাকে, সেটা ইউটিউবে পাওয়া যাওয়ার কথা। ইউটিউবে সার্চ দিয়েও আনোয়ার কোনও চ্যানেল রিপোর্ট পেল না।

তবে পত্রিকার নিউজগুলো পেতে বেশি সময় লাগল না। আধ ঘণ্টার মধ্যে পত্রিকায় কাঙ্ক্ষিত খবরটি পেয়ে গেল। কাওসারের মৃত্যুর খবরটি পর-পর দুইদিন পত্রিকায় এসেছিল। প্রথম দিনের খবরটি এমন ছিল: 'ক্লিনিকে শিশু কাওসারের শরীরটা ক্ষত-বিক্ষত করল কে?' দ্বিতীয় দিনের খবরটি হচ্ছে: 'কাওসারদের বাসায় এখন শোকের মাতম।' খবরগুলো খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়ল আনোয়ার। বেশ কিছু কথা ওর কাছে ঠিক বিশ্বাসযোগ্য মনে হলো না। তবে পত্রিকা থেকে কাওসারদের বাড়ির ঠিকানাটা পেয়ে খুশি হলো আনোয়ার। পত্রিকার খবরের উপর পুরোপুরি ভরসা করা যায় না। তাই পুরোপুরি সঠিক তথ্য জানার জন্য কাওসারদের বাসায় যেতে হবে। কথা বলতে হবে ওর মায়ের সাথে। কারণ ক্লিনিকে সে-রাতে কাওসারের পাশে শুধু তার মা-ই ছিলেন।

২০ জুন।

সকাল ১১ টা।

কাওসারের মায়ের সামনে বসে আছে আনোয়ার। ভদ্রমহিলার প্রকৃত বয়স চল্লিশ-বেয়াল্লিশ হবে। কিন্তু এই বয়সেই ভেঙে পড়েছে তাঁর শরীর। দেখে মনে হচ্ছে খুবই অসুস্থ। সোজা হয়ে বসে থাকতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। চোখের নীচে কালি। বাম হাতের বুড়ো আঙুলটা অনিয়ন্ত্রিতভাবে কাঁপছে। মনে হচ্ছে ছেলের শোক দুই বছরেও তিনি এতটুকু কাটিয়ে উঠতে পারেননি।

আনোয়ার নিজেকে সাংবাদিক হিসাবে পরিচয় দিয়েছে। কাওসারের পরিবারের কাছে বলেছে, সে কাওসারের রহস্যজনক মৃত্যু নিয়ে ফলো-আপ রিপোর্ট করতে চায়। কাওসারের মা রাজি হয়েছেন। মিথ্যা বলতে আনোয়ারের খারাপ লেগেছে, কিন্তু এই পরিচয় ছাড়া কাওসারের মায়ের সাথে কথা বলার সুযোগ মিলত না। কাওসারের বড় বোন জলি বলল, 'আম্মা খুব অসুস্থ। অল্প কথা বলেই তাঁকে ছেড়ে দিতে হবে।'

আনোয়ার মাথা দোলাল। জলি মেয়েটার কথা বলার মধ্যে একটা ধারাল ভাব আছে। বিষয়টা বেশ ভাল লাগল আনোয়ারের। কাওসারের মা আনোয়ারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বলুন, আপনি কী জানতে চান?'

আনোয়ার বলল, 'আসলে আমি শুধু কাওসারের ক্লিনিকের ওই দুর্ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাই।'

কাওসারের মা বললেন, 'এসব কথা এখন পত্রিকায় লিখে কী আর হবে?

BanglaBook.org

আমার ছেলে তো আর ফিরে আসবে না। কারা তাকে মেরেছে এটাও জানা যাবে না। আগেও অনেক লেখালেখি হয়েছে। কোনও লাভ হয়নি।'

'তবুও বলুন। কাওসারের প্রতি যদি কোনও অবিচার হয়ে থাকে, অন্যের ওপরও এমন হতে পারে, তাই আগেই প্রতিরোধ করা উচিত।'

'কেউই কিছু করতে পারবে না। সবাই শুধু নিউজ চায়। কেউ প্রতিকার চায় না।' কাওসারের মায়ের মুখে বিদ্রূপের হাসি।

'আপনি শুধু সেই রাতের কথা বলুন, যে-রাতে কাওসার মারা যায়। ওই রাতে কাওসারের সাথে তো শুধু আপনিই ছিলেন।'

কাওসারের মা চুপ করে আছেন। এসব বলতে তাঁর কষ্ট হয়। তবুও এই দুই বছরে বহুবার এই ঘটনা বলতে হয়েছে।

একটা বড় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, 'কাওসার। ছয় বছরের অতি দুষ্টু ছেলে আমার। এক মুহূর্ত চোখের আড়াল হলে আমার ভয় লাগে। শুধু মনে হয় এই বুঝি কোনও অঘটন ঘটাল ছেলেটা। এক মুহূর্ত চুপ করে বসে থাকতে পারত না। আমি সারাক্ষণ বকাবকি করতাম ওকে। ওর জন্মের দুই বছর পর ওর বাবা মারা যায়। তাই বাবার আদর, শাসন ছাড়াই ছেলেটা বড় হচ্ছিল।

'২০১২ সালের ২২ শে ফেব্রুয়ারি আমার ছেলে দেয়াল থেকে নীচে পড়ে মাথা ফাটিয়ে ফেলে। দুর্ঘটনার সাথে-সাথেই ওকে আমরা ক্লিনিকে নিয়ে যাই। ডাক্তাররা বললেন, গুরুতর কিছু না। তবে দুই-একদিন ক্লিনিকে থাকতে হবে। আমি নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম। ওই রাতে ক্লিনিকে ৩০৫ নাম্বার কেবিনে আমি আর কাওসার ছিলাম। কাওসারের স্যালাইন চলছিল। ডিউটি ডাক্তার বলেছিলেন স্যালাইন প্রায় শেষ হওয়া অবস্থায় নার্সকে খবর দিতে। কারণ পুরানো স্যালাইন খুলে নতুন স্যালাইন লাগাতে হবে। তাই ঘুম-ঘুম চোখে কাওসারের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। রাত দুটো বাজে তখন। দেখলাম স্যালাইন শেষের পথে। দ্রুত নার্সকে ডাকতে বের হলাম। নার্সকে ডাকতে গিয়ে দেখি তিনি ঘুমাচ্ছেন। জাগাতে কিছুক্ষণ সময় লাগল। নার্সকে সঙ্গে নিয়ে এসে দেখি কেবিনের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। প্রথমে অবাক হলাম। পরে প্রচণ্ড আতঙ্ক হতে লাগল। হঠাৎ কেবিনের ভিতরে আমার ছেলের চিৎকার শুনলাম। কেউ যেন ওকে খুব আঘাত করছে। আমরা পাগলের মত দরজা ধাক্কাতে থাকি। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। কয়েক মিনিটে ক্লিনিকের স্টাফ, ডাক্তাররা সবাই জড়ো হয়ে গেলেন। এ সময় দরজার ছিটকিনি এমনিতেই খুলে গেল। আমরা ভিতরে ঢুকে দেখি আমার ছেলে মাটিতে পড়ে আছে। কোনও চিল-শকুন যেন আমার ছেলেকে খুবলে-খুবলে খেয়েছে। ওর পুরো শরীর কালো হয়ে গেছে।' ভদ্রমহিলা আর বলতে পারলেন না। আহাজারি করতে থাকলেন।

জলি উদ্বিগ্ন মুখে বলল, 'আম্মা, তোমাকে আর কিছু বলতে হবে না। তুমি ভেতরে চলো।' মাকে জোর করে অন্দরমহলে পাঠিয়ে দিল জলি। ওখান থেকে ভেসে এল কান্নার শব্দ।

বেশ কিছুক্ষণ পর জলি ফিরে এল। আনোয়ারের দিকে তাকিয়ে বলল,

BanglaBook.org

'দেখুন, আমাদের কষ্ট আপনারা বুঝবেন না। তাই পুরানো ক্ষতে আর আঘাত করবেন না। এসব বিষয় নিয়ে পত্রিকায় লেখালেখি করেও কোনও লাভ নেই। কারণ পুলিশ আমাদের মামলা তো নেয়ইনি, উল্টো ক্লিনিক কর্তৃপক্ষ আমাদের নামে ভাংচুরের মামলা করেছিল। আর পুলিশকেই বা দোষ দেব কেন, সবার চোখের সামনেই ঘটনাটা ঘটেছে। আম্মাসহ অন্যরা যখন কেবিনের দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকলেন, ভিতরে কাউকে দেখা যায়নি। তাই সবার চোখেই ওটা ছিল রহস্যময় এক মৃত্যু। এর বেশি কিছু নয়।'

'আপনাদের কী ধারণা, কে আপনার ভাইকে মেরেছে?'

'আমরা তো আমাদের চাচাদের সন্দেহ করেছিলাম। সাভারের একটা জমি নিয়ে তাদের সাথে আমাদের বিরোধ আছে। কিন্তু ন্যূনতম কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি।'

'পোস্টমর্টেম কি হয়েছিল?'

'নাহ্। পুলিশ যখন মামলা নিল না, আর আমাদের ভাইয়ের লাশ কাটাছেঁড়া করতে দিইনি।'

আনোয়ার বলল, 'আমার একটা শেষ প্রশ্ন ছিল।'

'বলুন।'

'ওইদিন কি কেবিনের জানালা খোলা ছিল?'

জলি কিছুক্ষণ ভেবে বলল, 'হ্যাঁ, ছিল। আম্মার কাছে শুনেছি। কিন্তু জানালায় কয়েকটা শিকও লাগানো ছিল। তাই জানালা দিয়ে কোনও মানুষের বের হওয়ার উপায় ছিল না।'

আনোয়ার হঠাৎ বলল, 'মানুষ হয়তো বের হতে পারবে না, কিন্তু অন্য কিছু তো সহজেই বেরোতে পারবে।'

'অন্য কিছু মানে?'

'না, কিছু না। আমি এখন উঠছি। আশা করি যে কারণে আপনার ভাই মারা গেছে, সে কারণটা খুঁজে বের করতে পারব।'

জলি কিছু না বলে হাসল। অবিশ্বাসের হাসি।

২৮ জুন।

রাত ৮.৩০।

বাইরে ঝুম বৃষ্টি। ডা. সুমন ক্লিনিকে রোগী দেখা শেষ করেছে। এ সময় তাকে জানানো হলো, কেউ তার সাথে দেখা করতে এসেছে।

সুমন বিরক্ত মুখে বলল, 'ওষুধ কোম্পানির কেউ নাকি?'

'তা তো, স্যার, জানি না।'

'আচ্ছা আসতে বলো।'

কিছুক্ষণের মধ্যে আনোয়ার ঘরে এসে ঢুকল।

ডা. সুমন বলল, 'আরে, আনোয়ার সাহেব, আপনি? ভাল আছেন?'

'জী, ভালই আছি। আপনার সাথে দেখা করতে এলাম। বিরক্ত করলাম

BanglaBook.org

নাকি?'

'না-না, রোগী দেখা শেষ। আজ রাতে ডিউটিও নেই। এখন বাসায় যাব।'

'ও, তা হলে তো এখন আপনার বিশ্রামের সময়।'

'সমস্যা নেই। ডাক্তাররা এত অল্প পরিশ্রমে কাতর হয় না। হা-হা!'

'আপনাকে দেখলে বোঝা যায়, আপনার মনের জোর খুব বেশি।'

'আগে বেশি ছিল না। রোদেলাকে হারানোর পর মনের জোর বেড়ে গেছে।'

সুমনের দিকে তাকিয়ে হাসল আনোয়ার।

ডা. সুমনও হাসি-হাসি মুখে বলল, 'আনোয়ার সাহেব, আমার মনে হচ্ছে আপনি আমাকে কিছু বলতে এসেছেন।'

আনোয়ার একটু ঝুঁকে এসে বলল, 'ঠিকই অনুমান করেছেন। আসলেই আমি আপনাকে কিছু বলতে এসেছি।'

'কী তা, বলুন তো? আমার গল্প কিন্তু ওখানেই শেষ। এরপর আর ওই কেবিনে কখনও যাওয়া হয়নি।'

'আমি ৩০৫ নাম্বার কেবিনে এক রাত থাকতে চাই,' স্পষ্ট গলায় বলল আনোয়ার।

ঘরে যেন একটা বাজ পড়ল।

স্তব্ধ হয়ে পড়ল সুমন।

'কী বলছেন এসব?' সুমনের চোখে হতভম্ব ভাব।

'যদিও আপনাকে এত বড় অনুরোধ করার অধিকার আমার নেই, তবু করে ফেললাম।'

'দেখুন, প্রথম কথা, ওই রুমে থাকলে আপনার বড় কোনও ক্ষতি হতে পারে। আর আমার স্যররা জানলে ভয়ঙ্কর রাগ করবেন। তার চেয়েও বড় কথা, এসব অনর্থক ঝুঁকি নেয়ার কোনও মানে হয় না।'

'আপনি কি চান না রোদেলা কেন মারা গেল এটা জানতে?'

'অবশ্যই চাই। অবশ্যই চাই,' জোরের সাথে বলল ডা. সুমন।

'তা হলে প্লিজ, আমাকে সাহায্য করুন। আর আপনি এমন ব্যবস্থা করুন যেন আপনার স্যর মানে বড় ডাক্তারদের কানে এ ঘটনা না পৌঁছে।'

'তা না হয় গোপন রাখলাম। কিন্তু যদি আপনার কোনও ক্ষতি হয়?'

'ক্ষতি নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করি না আমি। এসব অ্যাডভেঞ্চার আমার কাছে নেশার মত। আমাকে নিরাশ করবেন না।'

'আপনাকে কী বলব, বুঝতে পারছি না।'

'আচ্ছা, আপনাদের ক্লিনিকে এখন ৩০৫ বাদে কোনও কেবিন ফাঁকা আছে?'

'না, নেই। সব কেবিনেই রোগী আছে।'

'খুব ভাল। বিষয়টা অনেক সহজ হয়ে গেল তা হলে। আপনি কাউকে দিয়ে ৩০৫ নং কেবিনটা পরিষ্কার করিয়ে রাখবেন। আমি একজন রোগী হিসাবে ওই কেবিনে ঢুকতে চাই। কাল সন্ধ্যায় ডেঙ্গু জ্বরের রোগী সেজে এই হাসপাতালে আসব। ক্লিনিকের স্টাফরা জানবে অন্য কোনও রুম ফাঁকা না পেয়ে বাধ্য হয়ে

BanglaBook.org

আমাকে ওই রুমে রাখা হয়েছে। ভাববেন না, একজন বড় ডাক্তার-নেতার সাথে আমার সখ্য আছে। তাঁর কাছেও যাব। তিনি বলে দিলে আশা করি ওই রুমটা পেতে আমার আর কোনও সমস্যা হবে না।'

'আপনি রোগী সেজে কেন থাকতে চাইছেন?'

'ওই ঘরে রোদেলাসহ যারা মারা গেছে, সবাই রোগী ছিল। তাই আমার মনে হয়, ওই রুমে রোগীদেরই ক্ষতি হয়, কিন্তু ডাক্তার বা অন্য কারও ক্ষতি হয় না। তাই আমি রোগী হিসাবেই যেতে চাই। দেখতে চাই...'

'আপনি কি বুঝতে পারছেন কী ভয়ঙ্কর খেলায় পা দিচ্ছেন?'

'ডা. সুমন, ভয়ঙ্কর খেলা খেলে আমি অভ্যস্ত। চিন্তা করবেন না। আপনি শুধু আমাকে সাহায্য করুন। বাকিটা আমি সামলে নেব। আমি এখনই ওই ডাক্তার-নেতার কাছে যাচ্ছি। তিনি আমার কাজকর্মের সাথে পরিচিত। জানি তিনিও আমাকে সাহায্য করবেন।'

'আমি কি রাতে আপনার পাশে ওই কেবিনে থাকতে পারি?'

'না, ভাই। আমি একা থাকব। দু'জন থাকলে যার সাথে দেখা করতে চাইছি, সে আসবে না। তবে আপনি ডিউটি ডাক্তারের রুমে থাকতে পারেন। আর মোবাইলটা সাথে রাখবেন। কোনও সমস্যা হলে আপনাকে ফোন দেব। আর আপনাকে আরেকটা কাজ করতে হবে। কাল দুপুরের মধ্যে ৩০৫ নম্বর কেবিনের জানালায় খুব ঘন নেট লাগিয়ে দেবেন, বাথরুমের জানালাও স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেবেন। ছোট চড়ুই পাখিও যেন জানালা দিয়ে ঢুকতে না পারে। কেবিনে ঢোকার এবং বের হওয়ার একটাই পথ থাকবে। সেটা হলো কেবিনের মূল দরজা।'

'এসব কেন বলছেন, ভাই?'

'এটা খুবই দরকার। পরে এর সুফল পাবেন। আশা করি কাল এমন কিছু ঘটবে, যা আপনার মনের আক্রোশ মেটাবে এবং আপনার ইনসমনিয়া কেটে যাবে।'

'বুঝতে পেরেছি কী বলতে চাইছেন। আমি আপনার সব কথা শুনব।' ডাক্তার সুমনের চোখ-মুখে ক্রোধের ছায়া স্পষ্ট।

আনোয়ার হঠাৎ দেখল দুটো কালো বিড়াল মিয়াও-মিয়াও করতে-করতে ডা. সুমনের রুমে ঢুকল। ডা. সুমনের সাথে মধুর সম্পর্ক ওদের। পায়ে ঘেঁষে বার কয়েক আদর করল ডাক্তারকে।

সুমন বলল, 'ভিতরে ঢুকেছিস কেন? বাইরে যা, বাইরে যা! কেউ দেখলে তোদের মেরে ভর্তা বানিয়ে দেবে।'

বিড়াল দুটো কী বুঝল কে জানে। বেরিয়ে গেল।

ডা. সুমন বলল, 'এই বিড়াল দুটো আমার খুব আদরের। কিন্তু সবাই ওদের অমঙ্গলের চিহ্ন বলে মনে করে।'

আনোয়ার মাথা দোলাল।

ডা. সুমন আবারও বলল, 'ভাবছি এ দুটোকে বাসায় নিয়ে যাব। আনোয়ার সাহেব, রাতে আমার সাথে ডিনার করুন।'

BanglaBook.org

'আমার কোনও আপত্তি নেই,' হাসিমুখে বলল আনোয়ার।

২৯ জুন।

সন্ধ্যা ৭টা।

আনোয়ার নামে একজন ডেঙ্গু রোগী ৩০৫ নাম্বার কেবিনে ভর্তি হয়েছে। ক্লিনিকের স্টাফরা প্রথমে বিষয়টায় আপত্তি তুললেও বড় জায়গা থেকে নির্দেশের পর বিষয়টা মেনে নিল। আনোয়ার রোগী সাজবার যথাসম্ভব অভিনয় চালিয়ে যাচ্ছে। সুমন এবং সিনিয়র ডাক্তারদের কয়েকজন ছাড়া ক্লিনিকের অন্য কেউই আসল সত্যটা জানে না। আনোয়ারকে নিজের দূরসম্পর্কের আত্মীয় পরিচয় দিয়ে দেখভালের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে ডাক্তার সুমন।

ডা. সুমন বলল, 'আনোয়ার সাহেব, আপনার ভয় করছে?'

'সত্যি বলতে এখনও ভয় করছে না। কৌতূহল হচ্ছে। তবে আপনি চলে যাওয়ার পর মনে হয় ভয় করতে শুরু করবে।'

'আমি কি থাকব?'

'না, আপনি চলে যান। যা করতে চাইছি তাতে সফল হতে দিন।'

আনোয়ারের হাতটা শক্ত করে ধরল ডা. সুমন। বলল, 'চিন্তা করবেন না। আমি বাইরেই আছি।'

'আপনি ডিউটি ডাক্তারের রুমে থাকুন।'

'আচ্ছা।'

রাত ৯ টায় ৩০৫ নাম্বার কেবিন থেকে বেরিয়ে পড়ল ডা. সুমন। কেবিনের মূল দরজাটা খোলা রাখা হলো, যাতে সহজেই কেউ ঢুকতে পারে। আনোয়ার অপেক্ষা করতে লাগল। ও জানে, আজ রাতে ভয়ঙ্কর কিছুর সাথে ওর দেখা হতে পারে।

২৯ জুন।

রাত ১১.৪০।

চোখ বন্ধ করে কেবিনের বিছানায় শুয়ে আছে আনোয়ার। ওর মুখে নকল অক্সিজেন মাস্ক। ঘরে জ্বলছে ডিম লাইটের মৃদু আলো। ভয়ঙ্কর কিছুর জন্য আনোয়ার প্রস্তুত। রাত ৯ টা থেকে এই কেবিনে সে একা। এখন পর্যন্ত কিছুই ঘটেনি। আদৌ কি কিছু ঘটবে?

অনেকক্ষণ পর আনোয়ার টের পেল, ঘরে হঠাৎ শীতল একটা হাওয়া বয়ে গেল। গায়ের চাদরটা ঠিকভাবে জড়িয়ে নিল ও। মন বলছে, এবার কিছু ঘটতে চলেছে। ওর পুরো স্নায়ু উত্তেজিত। হঠাৎ কেউ যেন দরজা দিয়ে কেবিনে ঢুকল। একজন নয়, দু'জন! ঘরে হাঁটছে তারা! আনোয়ার বুঝল, কেবিনের দরজাটা ভিতর থেকে আটকে দিয়েছে কেউ। চোখ বুজে রইল ও। টের পেল, দু'পাশ থেকে দু'জন আসছে ওর দিকে। ছড়িয়ে পড়ল বিশ্রী গন্ধ। পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি যেন বেরিয়ে আসতে চাইল ওর। নিজেদের মাঝে বিচিত্র ভাষায় কিছু বলতে শুরু

BanglaBook.org

করেছে তারা। বুকের ভিতরটা কাঁপছে আনোয়ারের। তবু ভয়ের অনুভূতিটাকে দূরে সরিয়ে চুপচাপ শুয়ে আছে। হঠাৎ বাম পাশেরজন খুলে দিল আনোয়ারের অক্সিজেন মাস্ক।

আনোয়ার চোখ মেলে চাইল। এমন ভাব করছে, যেন অক্সিজেন মাস্ক ছাড়া কষ্ট হচ্ছে ওর। ডিম লাইটের মৃদু আলোতে ডানে-বামে ভয়ঙ্কর দুটো বিড়াল-মানবের মুখ দেখল আনোয়ার। উচ্চতায় পাঁচ ফিটের বেশি হবে তারা। পুরো শরীর রোমে ঢাকা। মুখ দিয়ে অনবরত লালা ঝরছে। চোখ ভাটার মত জ্বলছে। দু-পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অন্য দু-পা মানুষের হাতের মতই ব্যবহার করছে। মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে বড়-বড় দাঁত।

আনোয়ারের অক্সিজেন মাস্ক খুলে দেয়া হয়েছে কয়েক মিনিট হলো। শ্বাসকষ্ট হয়ে আনোয়ার কখন মরবে সেই অপেক্ষা করছে বিড়ালগুলো। কিছু সময় পর আনোয়ারের অবস্থা অপরিবর্তিত দেখে আর ধৈর্য রাখতে পারল না ওগুলো, ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর উপর। এখনই শেষ করে দেবে রোগীকে।

আনোয়ার প্রস্তুত ছিল। আগেভাগেই সঙ্গে রেখেছে ধারাল ছুরি। চাদরের নীচ থেকে ঝট করে ছুরিটা বের করল। বাম পাশের বিড়ালসদৃশ জন্তুটার বুকে সজোরে ঢুকিয়ে দিল।

বিকট আর্তনাদ ছাড়ল জন্তুটা। সশব্দে পড়ে গেল মেঝেতে।

রোগী উল্টো হামলা করবে, চিন্তাতেও ছিল না বাম পাশের জন্তুটার।

তাকে কাবু করতে পেরেছে আনোয়ার, কিন্তু ডান পাশের জন্তুটাকে ঠেকাতে পারল না।

ওটা ভয়ঙ্কর হিংস্রভাবে ক্ষত-বিক্ষত করতে চাইল আনোয়ারের দেহ। বিছানায় শুরু হলো প্রবল হুটোপুটি। খাবলা-খাবলা মাংস তুলে নিতে চাইছে পশুটা। সাহায্যের জন্য চিৎকার শুরু করল আনোয়ার।

পশুটার দাঁতে ভীষণ বিষ।

সেই বিষ যেন মিশতে শুরু করেছে আনোয়ারের রক্তে। ধীরে-ধীরে কালচে হচ্ছে ওর শরীরটা। প্রচণ্ড জোর খাটিয়ে, সমস্ত মনোবল এক করেও জন্তুটার সাথে পেরে উঠছে না আনোয়ার।

এবার ওর কণ্ঠনালী চেপে ধরল জন্তুটা।

আনোয়ার বুঝল, আর কিছুক্ষণ, তারপরেই ওর সময় শেষ।

এদিকে ৩০৫ নাম্বার কেবিনের ভিতরে হৈ-চৈ-চিৎকার শুনে চলে এসেছে ডা. সুমনসহ আরও অনেকেই। দরজা ভাঙতে শুরু করেছে।

সুমন আজ আগেই প্রস্তুত। ৩০৫ নাম্বার কেবিনের আশপাশেই ছিল। ক্লিনিকের কিছু স্টাফকেও সাথে রেখেছিল। আজ সকালে মিস্ত্রিদের দিয়ে ৩০৫ নাম্বার কেবিনের জানালায় নেট লাগিয়েছে। নিজে দেখেছে সব ঠিকভাবে লাগানো হয়েছে কি না। কেবিনের বাথরুমের জানালাও বন্ধ করা হয়েছে।

নতুন দরজাটা আগের মত মজবুত নয়। ভাঙতে বেশি সময় লাগল না। ৩০৫ নাম্বার কেবিনে ঢুকে পড়ল ছয়-সাতজন।

আনোয়ারকে ছেড়ে দিয়ে জন্তুটা ছোট একটা কালো বিড়ালে রূপ নিল। পরক্ষণে পালাতে চাইল।

সুমন বুঝল এটা ক্লিনিকের সেই কালো দুই বিড়ালের একটি। ওগুলোকেই সে এতদিন আদর করেছে!

দুই বিড়াল কেবিনের খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকেছিল, ভেবেছিল সময়মত রোগীকে খুন করে জানালা গলে পালিয়ে যাবে। হামলাও করে রোগীর উপর, ভরসা ছিল কিছু হলেই অনায়াসে বেরিয়ে যাবে জানালা দিয়ে।

কিন্তু রোগী উল্টো হামলা করেছে। ছোরা দিয়ে খুনও করে ফেলেছে বিড়ালের সঙ্গীটাকে।

জানালা বন্ধ দেখে যেন পাগল হয়ে গেল অবশিষ্ট বিড়ালটা। বুঝে গেল, পালানোর পথ নেই ওর।

সুমনসহ অন্য সবার হাতেই লাঠি। শুরু হলো ভয়ঙ্কর আঘাত।

বিড়ালের বিকট আর্তনাদে কেঁপে উঠল চারপাশ।

ভয়ঙ্কর জন্তুটা খুন না হওয়া পর্যন্ত লাঠির বাড়ি বন্ধ করল না সুমন। লাশ পড়ে যাওয়ার পরেও ওই দেহে আঘাত করতেই থাকল। আজ সব প্রতিশোধ যেন নিয়ে ছাড়বে।

পাশে পড়ে থাকা অন্য বিড়ালটার মৃতদেহ খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে বিকৃত করল সুমন। রক্ত আর কটু গন্ধে ভারী হয়ে উঠল ঘরের বাতাস।

কমপক্ষে তিন মিনিট পর ওদের নজর গেল আনোয়ারের দিকে।

রক্তে ভেসে যাচ্ছে মৃতপ্রায় আনোয়ারের শরীর।

সুমন চেঁচিয়ে বলল, 'শরীরের ব্লিডিং বন্ধ করা দরকার!'

আনোয়ারের ব্লিডিং-এর জায়গাগুলো হাত দিয়ে চেপে ধরা হলো।

রোগীকে বাঁচাতে ছোটাছুটি শুরু করলেন ক্লিনিকের ডাক্তাররা।

এবার সত্যিই অক্সিজেন দরকার আনোয়ারের।

আস্তে-আস্তে শীতল হচ্ছে আনোয়ারের শরীর। হার্টবিটও কমছে। ও আছে ঘোরের মাঝে। একবার চোখ মেলে সুমনের দিকে চেয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'বিড়াল। ওগুলো বিড়াল। বড় বিড়াল। কালো বিড়াল।'

'আনোয়ার সাহেব, আপনি কথা বলবেন না।'

'আমাকে বলতে দিন। আপনাকে সত্য জানতে হবে।'

'আপনি সুস্থ হোন, তারপর শুনব।'

'না। আমি এখনই বলতে চাই। এই বিড়াল দুটির মত এমন অনেক ভয়ঙ্কর বিড়াল বিভিন্ন হাসপাতাল এবং ক্লিনিকগুলোতে ঘুরে বেড়ায়। আসলে ওদের ওই বিড়ালের শরীরে বাস করে অন্য কোনও ভয়ঙ্কর জন্তু।'

বড় শ্বাস নিয়ে আনোয়ার বলল, 'প্রতিটি ক্লিনিক এবং হাসপাতালের কিছু রুম বা কেবিন আস্তে-আস্তে অভিশপ্ত হয়। তখন ওই জন্তুগুলো সেই রুমটাকে নিজেদের জন্যে বেছে নেয়। সম্ভবত এই ক্লিনিকে আসার আগেও অনেক মানুষ খুন করেছে। আর এই ৩০৫ নাম্বার কেবিনে আগেও মারা গেছে অনেকে। আমার

BanglaBook.org

ধারণা, তাদের অনেকেই চরম অবহেলায় মারা গেছে। তাই ধীরে-ধীরে ৩০৫ নাম্বার রুমটা অভিশপ্ত হয়ে পড়েছে। রুমটা অভিশপ্ত হওয়ার পর বিড়ালগুলো এই ক্লিনিকে বাস করা শুরু করে। ওরা শুধু অভিশপ্ত রুমেই ওদের স্বরূপে ফিরতে পারত। তাই এই কেবিনের রোগীদেরই শুধু মেরেছে। অন্য কেবিনের রোগীদের ক্ষতি করতে পারেনি। ওদের মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলবেন। অবশ্যই পুড়িয়ে ফেলবেন। না হলে আবারও...' বলতে-বলতে আনোয়ার হাসবার চেষ্টা করল।

নিজেকে খুব অসহায় মনে হলো সুমনের।

আনোয়ার মৃদু গলায় বলল, 'সুমন...'

'বলুন, আনোয়ার সাহেব।'

'আমার না একজনকে দেখতে খুব ইচ্ছা করছে।'

'কাকে? বলুন কাকে দেখতে ইচ্ছা করছে? আমি ব্যবস্থা করছি।'

'এ মুহূর্তে আমার মাথা কাজ করছে না। তাই তার নাম মনে নেই। তবে চোখের সামনে দেখতে পারছি একটা মেয়ের মুখ। সুন্দর মায়াবী একটা মুখ। উজ্জ্বল চোখ। গায়ের রঙ শ্যামলা বর্ণের।'

'আপনি প্লিজ আর কথা বলবেন না। আপনার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে।'

'আমি মনে হয় মারা যাচ্ছি। সবসময় রহস্যের পিছে ছুটেছি। কিন্তু মৃত্যু হচ্ছে জীবনের সবচেয়ে বড় রহস্য। সেই রহস্যের মুখোমুখি হচ্ছি ভেবে ভাল লাগছে। ভয়ও লাগছে।'

'আপনার কিছু হবে না। বড় ডাক্তাররা চলে এসেছেন। আপনি ভাল হয়ে যাবেন,' বলতে-বলতে ডা. সুমনের কণ্ঠ ভারী হয়ে উঠল।

আনোয়ারের মুখে এখন সত্যিকারের অক্সিজেন মাস্ক। শরীরে হঠাৎ শুরু হলো খিঁচুনি। চোখের সামনে ঝাপসা হতে শুরু করল সব।

ডা. সুমন শক্ত করে ধরে রেখেছে আনোয়ারের হাত।

চিৎকার করে আনোয়ার বলতে চাইল, 'আমি বাঁচতে চাই! মৃত্যু-রহস্যের মুখোমুখি হতে চাই না!'

কিন্তু কোনও স্বর বেরল না ওর গলা দিয়ে।

***

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org